অনীশ দেব

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র



কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

অনীশ দেব

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র



পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৫
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ **মার্চ ২০১৩**

KISHORE KALPOBIJNAN SAMAGRA
by
Anish Deb

ISBN 978-81-8374-192-7

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অলংকরণ
সুদীপ্ত মণ্ডল

প্রচ্ছদ
মানস চক্রবর্তী

মূল্য
২০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
Price ₹ 200.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

শুরুর আগে

ছোটদের জন্য লেখা কল্পবিজ্ঞান গল্পগুলোকে একজায়গায় জড়ো করে দু-মলাটে বন্দি করা যায় কি না এ-কথা ভাবতে-ভাবতেই 'সমগ্র'-র কথা মাথায় আসে। শেষপর্যন্ত 'সমগ্র' যেটা তৈরি হল তাতে খুঁজে না পাওয়া চার-পাঁচটি গল্প বাদ থেকে গেল। তবুও আটাশটা গল্প নিয়ে 'কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র' খারাপ কী! এই বই তুলে দিলাম প্রীতিভাজনেষু তাপস মুখোপাধ্যায় ও অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়ের হাতে।

এই বইয়ের প্রযোজনায় আড়ালে থেকে যাঁরা আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন অনিতা রায়, বরুণ রায় ও মানস চক্রবর্তী। ওঁদের কাছে ঋণ থেকে গেল। স্নেহভাজন সুদীপ্ত মণ্ডল সুন্দর ছবি এঁকে বইটিকে অলঙ্কৃত করেছে। ওকে ধন্যবাদ জানাই।

এবারে বলি আশ্চর্য এক দম্পতির কথা : ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও চুমকি চট্টোপাধ্যায়। ওঁদের সাহিত্যবোধ এবং সাহিত্য প্রীতি অবাক করে দেওয়ার মতো—একইসঙ্গে সাহিত্যিক প্রীতিও। ওঁদের সহযোগিতা না পেলে এই বই কখনও দিনের আলো দেখত না—শুধু চাঁদের আলো নিয়েই থাকত।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই তোমাকে—যে এই বইটা হাতে নিয়ে ভাবছ এর আটাশটা গল্প পড়বে কি না। পড়ো আর না-ই পড়ো, গল্পগুলো কিন্তু তোমার জন্যই লিখেছি। এই বই তোমারই জন্য, আর বইয়ের এত যে সাজগোজের ঘটা, সেও শুধু তোমার জন্য।

অনীশ দেব

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

বারোটি রহস্য উপন্যাস
ভয়পাতাল
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট
ভৌতিক অলৌকিক
অন্তরে পাপ ছিল
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
সেরা কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
দুঃখী রাজকুমার
পাই নিয়ে রূপকথা
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা (সম্পাদিত)



সূ চি প ত্র

উপন্যাস

গল্প



উপন্যাস


If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here



সবুজ পাথর

ছোটকা একমনে জিনিসটা পরিষ্কার করছিল। মুখ তুলে হেসে বলল, 'এটার নাম হল ব্লাস্টার গান—যা দিয়ে ব্লাস্ট করা যায়। সহজ কথায় হাওয়া-বন্দুক। এ-জিনিস কাউকে তাক করে ফায়ার করলে সে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে!'

দশ-এগারো বছর বয়েসের দুই পালোয়ান চোখ গোল-গোল করে মুখ হাঁ করে ছোটকার কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিল, তার কথাও শুনছিল। দেখতে দুজনকে হুবহু একরকম, এমনকী গায়ের লাল জামা আর নীল প্যান্টজোড়া পর্যন্ত ছবির মতো মিলে যায়।

এই মুহূর্তে যে-খোকাটি কোমরে দু-হাত রেখে ছোটকার কার্যকলাপের দিকে বাজপাখির মতো নজর মেলে তাকিয়ে আছে তার নাম চন্দ্রকান্ত। আর তার ঠিক পাশেই প্লাস্টিকের হালফ্যাশনের চেয়ারে আধ-বসা অবস্থায় যে-শ্রীমান পাথরের মূর্তির মতো নট-নড়নচড়ন, তার নাম ইন্দ্রকান্ত।

ওদের নাম দুটো সুন্দর হলে কী হবে, ছোটকা ওদের 'ঝালা-পালা' বলে ডাকে। প্রথমে ওরা বুঝতে পারেনি ছোটকা ওদের ওরকম একটা অদ্ভুত নাম রেখে বসে আছে। অল্প-অল্প করে বয়েসে বড় হয়ে উঠতেই ওরা ব্যাপারটা টের পেল। তখন সোজা গিয়ে হাজির ছোটকার দরবারে। সুবিচার চাই-ই চাই! মাথা নীচু

করে মুখ গোমড়া করে দু-ভাই একযোগে অনুযোগ তুলল, 'ছোটকা, তুমি আমাদের ঝালা-পালা বলে ডাকো কেন? ওটা বাজে নাম।'

অভিমানে দু-জোড়া চোখ যেন জলে ভরে আসতে চায়।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ছোটকা সাততাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যমজ জুটির কাছে। মাথায় হাত রেখে বলল, 'জানিস, ছোট্টবেলায় তোরা দুজনে মিলে কান্নাকাটি চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বাড়িসুদ্ধ সবার কান ঝালাপালা করে দিতিস! সেসময় আমার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল, তোদের চিৎকারে পড়াশোনা একেবারে ডকে। রেগে গিয়ে চটাস করে বইপত্তর বন্ধ করে তোদের মাকে বলেছিলুম, 'বৌদি, আজ থেকে এ দুটোর নাম রাখলুম ঝালা-পালা। দাদা আদর করে যতই চন্দ্র-ইন্দ্র-বরুণ ইত্যাদি দেবদেবীর নাম রাখুক, আসলে ঝালা-পালাই এদের লাগসই নাম!' ছোটকা এবারে একগাল হাসল, 'ব্যস, সেই থেকে তোদের নাম দুটো জমে গেল, বুঝলি! চন্দ্রকান্ত হল ঝালা, আর ইন্দ্রকান্ত হল পালা।'

ছোটকাকে ওরা দুজনেই খুব ভালোবাসে। যখন-তখন ওদের বেড়াতে নিয়ে যায়, খেলার জিনিস কিনে দেয়, খাবার খাওয়ায় হরেকরকম। সুতরাং কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে দু-ভাই-ই রাজি হল ছোটকার কথায়। শুধু একটা শর্ত ছিল, 'কিন্তু ছোটকা, তুমি ছাড়া ওই খারাপ নাম ধরে বাড়ির আর কেউ আমাদের ডাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

সুতরাং ওই শর্তেই রফা হয়েছিল ওদের।

ঝালা-পালার ছোটকা চাকরি করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। চাকরির নানা গল্প সে শোনায় চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে, শোনায় হাজাররকম তদন্তের কাহিনি। সুতরাং ছোটকাকে কাছে পেলেই ওদের প্রথম আবদার গল্প শোনানোর। আজ সেইরকম একটা আশা নিয়েই ছোটকার ঘরে এসেছিল ওরা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখে ছোটকা এক টুকরো ফ্লানেল নিয়ে কী একটা অস্ত্র একমনে পরিষ্কার করছে।

জিনিসটা দেখতে অদ্ভুত। অনেকটা রিভলভারের মতো, কিন্তু চেহারায় বেশ বদখত। প্রথমেই মোটা একটা সিসের নল—ইঞ্চি চারেক লম্বা। তবে তার মধ্যের ফুটোটা খুব সরু। তারপর লাগানো একটা সিসের বাক্স—তার গায়ে দুটো বোতাম। একটার রং লাল, অন্যটার কালো। বাক্সের শেষে রয়েছে চ্যাপটা ধাতুর বাঁট। তার সঙ্গে আংটা দিয়ে একটা খাটো চেন লাগানো।

যন্ত্রটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছোটকা বলল, 'প্রফেসর শঙ্কুর গল্প পড়েছিস তো? তাতে অ্যানাইহিলিন—মানে, নিশ্চিহ্নাস্ত্র নামে একটা যন্ত্রের কথা বলা আছে। এ হল সেই জিনিস। যাকে টিপ করে ফায়ার করব সে একেবারে পারমাণবিক ধুলো হয়ে যাবে। এই লাল বোতামটা টিপলে প্রচণ্ড শক্তির রেডিয়ো অ্যাকটিভ রশ্মি বেরিয়ে আসে। আর কালো বোতামটা টিপে দিলেই সব ঠান্ডা। এই অস্ত্রটা আমাকে

অফিস থেকে নতুন দিয়েছে, বুঝলি! তদন্তের কাজে দিন-দিন যা বিপদ বাড়ছে!'

ব্লাস্টার সাফাইয়ের কাজ শেষ করে ছোটকা সেটা একটা বাক্সে বন্দি করে রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু চন্দ্রকান্ত হঠাৎ বলে উঠল, 'ছোটকা, তুমি সত্যি কথা আমাদের খুলে বললে না কিন্তু। অফিস থেকে তোমাকে যখন ব্লাস্টার দিয়েছে, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে নতুন কোনও তদন্তের ব্যাপার আছে, তাই না?'

ছোটকার মুখে বাহবা দেওয়ার হাসি ফুটে উঠল। ব্লাস্টারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। বলল, 'ঝালা-পালা, তোরা ঠিক ধরেছিস। একটা নতুন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে আমাকে। খুব বিপজ্জনক কাজ। কাউকে বলা বারণ। আর যদি তোদের বলি তা হলে উলটে তোদের বিপদ বাড়বে। তবে খুব সংক্ষেপে ঝাপসাভাবে একটু আভাস দিতে পারি, তার বেশি একদম নয়। কী, শুনতে রাজি?'

ঝালা-পালা তো এককথায় রাজি!

'তবে শোন...' বলতে শুরু করল ছোটকা। তার ভুরু কুঁচকে গেল সামান্য। হাতের আঙুলগুলো আলতো করে বোলাতে লাগল ব্লাস্টারের সিসের বাক্সে। চন্দ্র ও ইন্দ্র টেবিলের আরও কাছে এসে দাঁড়াল।

'কাজটা আর কিছুই নয় রে, ভারতের বড়সড়ো বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটু খোঁজ-খবর।' ছোটকা ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। বিকেলের নীল আকাশে কালির ফুটকির মতো দুটো চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আবার, 'গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেশ গোলমাল হচ্ছে। যেমন আগে যারা জলদি-জলদি আবিষ্কার-টাবিষ্কার করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিত, এখন তারা সবাই কেমন যেন থিতিয়ে পড়েছে। এমনিতে কি গবেষণায় মানুষের ভাটা পড়ে না, তা পড়ে। কিন্তু এ যেন একেবারে ওলটপালট ব্যাপার! জ্ঞানীগুণী মানুষগুলো যেন রাতারাতি বোকা বনে গেছে। তাই রাষ্ট্রপতির নির্দেশে আমাদের গোপন তদন্ত বিভাগ এ-বিষয়ে তদন্তের ভার নিয়েছে। তারপর ঘুরে-ফিরে তারই কিছুটা দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে।'

ঝালা-পালা কিছু বলে ওঠার আগেই একটা চিৎকারে তিনজনের পিলে চমকে ওঠার জোগাড়।

'আমার ঘাড়ে—আমার ঘাড়ে ব্যা...ঘাড়ে ব্যা...ব্যা...।'

তীক্ষ্ণ ধাতব কণ্ঠস্বর কানে যেন পিন ফোটাচ্ছে। কাচের গেলাসে চামচ ঠুকলে যেরকম আওয়াজ হয় এটা যেন অনেকটা সেইরকম।

চিৎকার যে করছে সে তখনও ঘরে এসে ঢোকেনি। তবে এদিকপানেই ছুটে যে আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ছোটকা আস্তে-আস্তে বলল, 'আমার কথা শুনে ভ্যাঙাচ্ছে নাকি রে! তা শেষে আবার ব্যা-ব্যা করে ছাগলের ডাকটা জুড়ে দিয়েছে কেন?'

চন্দ্র ও ইন্দ্র এ-ওর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুক এ-ঘরে, মজা দেখাচ্ছি!'

ঠিক তক্ষুনি চিৎকারের মালিক ঘরে এসে ঢুকল। না, ছাগল নয়। তবে 'ব্যা ব্যা' চিৎকারটা সে এখনও করে চলেছে। তাকে দেখেই ঝালা-পালা একসঙ্গে ধমকে উঠল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু!'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুক স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাধ্য ছেলের মতো।

ছোটকা হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'ঝামেলাকে নিয়ে দেখছি ঝামেলার শেষ নেই।'

ঝামেলা নামধারী প্রাণীটি—উঁহু, বস্তুটি—একটি রোবট। না, রোবট ঠিক নয়, বরং বাচ্চা রোবট বললেই বেশি মানানসই হয়। কিন্তু যেহেতু সে রোবট, সেহেতু ঝালা-পালার আদেশে স্ট্যাচু না হয়ে তার উপায় ছিল না।

ঝামেলার উচ্চতা মাত্র তিন ফুট। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড; ধাতুর তৈরি বলে সবসময় রুপোর মতো ঝকঝক করছে। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। কিন্তু আঙুলগুলো পর্যন্ত নিখুঁত করে তৈরি—ঠিক যেন একটা পুতুল। পুতুলের মতোই সবসময় ও জামা-প্যান্ট পরে থাকে। খুব জোরে ছুটতে না পারলেও হাঁটতে পারে হেলেদুলে। আর কথা বলতে পারে নিজের ইচ্ছেমতো—কিন্তু গলার স্বরটা রিনরিনে, মেয়েলি।

পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই বাচ্চা রোবটটা ছোটকাই তৈরি করে উপহার দিয়েছে ঝালা-পালাকে। দেওয়ার সময় বলেছিল, 'দিনরাত্তির তোরা কান ঝালাপালা করিস, এবারে মেতে থাক ঝামেলাকে নিয়ে।'

ইলেকট্রনিক্স বিদ্যায় ছোটকার জুড়ি নেই। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই নাকি নানান অটোমেটিক জিনিস বানাত। চন্দ্র-ইন্দ্র সে-কথা শুনেছে বাবার কাছে। আর ঝামেলাকে তৈরি করতে গিয়ে কম কেরামতি দেখায়নি ছোটকা। বাচ্চা রোবটটার চোখ দুটো যেন টেনিসবল সাইজের কাচের গুলি—ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। আসলে ও-দুটো পুঞ্জাক্ষি, যেমনটা মাছির থাকে। অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি চোখ। তা ছাড়া, ঝামেলার চোখ দুটো এমন যে, একমাইল দূর পর্যন্ত ও স্পষ্ট দেখতে পায়। ঠিক টেলিস্কোপের মতো।

ঝামেলার কান দুটোও বিচিত্র। মানে, কানের জায়গায় রয়েছে দুটো ফুটো। কিন্তু তার ভেতরে নাকি এমন সব কলকবজা আছে যে, কোনও শব্দেরই ওর কান এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই। মানুষ শুনতে পায় না এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো শুধু পশুপাখিরা শুনতে পায়—যাকে বলে আলট্রাসনিক। ঝামেলার শ্রবণশক্তি থেকে কোনও শব্দেরই রেহাই নেই। তাই ছোটকা মাঝে-মাঝে বলে, 'এরকম একটা জম্পেশ রোবট তোদের প্রেজেন্ট করলুম—এটা আমাকে তদন্ত করতে হেল্প করতে পারত। কী চোখের নজর, আর কী কান! কিন্তু ঝামেলার

তো একটাই ঝামেলা! ও এখনও সভ্যসমাজে ঘুরে বেড়ানোর মতো ভদ্রতা রপ্ত করতে পারেনি। যখন-তখন যা-তা গোলমাল বাধায়। তা ছাড়া, এখন তো ওর ট্রেনিং চলছে তোদের কাছে। পোষা কুকুর-বেড়ালের মতো ওকেও ট্রেনিং দিয়ে মানুষ করতে হবে, বুঝলি!'

ছোটকা ঠিকই বলছে। কারণ ঝামেলা এখনও সব বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। হুটহাট করে আটকে যায়, নয়তো ভুলভাল বলে বসে। যেমন এখন 'ব্যা ব্যা' করে চিৎকার করছিল।

সেকথা ছোটকাকে বলতেই ছোটকা বলল, 'ওর তো ঘাড়ের ভেতর ব্যাটারি থাকে। সেই ব্যাটারিতে কোনও গোলমাল হয়নি তো?'

চন্দ্র-ইন্দ্র একমত হল যে, সে-কথা ঝামেলাকেই জিগ্যেস করে দেখা যেতে পারে। অতএব চন্দ্র বলে উঠল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি। এদিকে এসো। কী হয়েছে বলো তো।'

স্ট্যাচু হয়ে থাকলেও ঝামেলা সবকিছু শুনছিল এতক্ষণ। সুতরাং আদেশ পেতেই তাড়াহুড়ো করে কীসব বলতে গিয়ে কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করল, টলমল করে ঘুরপাক খেল। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে সরু গলায় বলল, 'ব্যাটারি নয়, ব্যথা, ও-ঘরে খাটের তলায় আরশোলা ধরতে গিয়ে ঘাড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছি।'

ছোটকা হো হো করে হেসে উঠল ঝামেলার কথা শুনে। বলল, 'ও তো দেখছি এখনও চলতি ভাষায় কথা বলতে শেখেনি। অ্যাদ্দিনেও গুরুচণ্ডালি দোষ কাটাতে পারলি না তোরা! কিন্তু ও আরশোলা ধরে কেন, বল তো? প্রায়ই দেখি খাটের তলায়, নর্দমার ধারে, আরশোলার খোঁজে ঘোরাঘুরি করে। ও কি আরশোলা খায় নাকি রে?'

ইন্দ্রকান্ত ব্যাজার মুখে বলল, 'ঝামেলাকে এ-কথা জিগ্যেস করেছিলাম, ছোটকা। তাতে বলেছে, লক্ষ-লক্ষ বছরেও আরশোলার কোনও বিবর্তন হয়নি। অথচ বানরেরা মানুষ হয়ে তা থেকে রোবট হয়ে গেল। সুতরাং ঝামেলার কর্তব্য আরশোলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওদের বিবর্তনে সাহায্য করা।'

ইন্দ্র থামতেই ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'বানর তো মানুষ হয়েছে বুঝলাম, কিন্তু মানুষ থেকে কবে আবার রোবট হল!'

ইন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'কী জানি, ঝামেলার দারুণ বিশ্বাস, মানুষ থেকেই বিবর্তন হয়ে রোবট তৈরি হয়েছে। তাই জন্যে আমাদের সবাইকে ও নিজের পূর্বপুরুষ ভাবে। দেখো না, কথায়-কথায় বলে, কোন আদ্যিকালে তোমরা পড়ে রয়েছ ভাবলে দুঃখ পাই!'

ছোটকা আবার ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

ঝামেলা ওর পুঞ্জাক্ষি দিয়ে ছোটকার ঘরের আনাচকানাচ সার্চ করছিল আরশোলার খোঁজে। ছোটকার হাসি কানে ধাক্কা মারতেই হেলেদুলে ওদের কাছে

এল। তারপর বলল, 'কী হইল, অট্টহাস্যের কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি?'

এবারে ঝালা-পালাও যোগ দিল ছোটকার অট্টহাসিতে। আর ঝামেলা কিছু বুঝতে না পেরে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাগল। ওর কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ ছোট ছোট বাতিগুলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে আর নিবছে।

ঝামেলা সামান্য খুশি বা উত্তেজিত হলেই আলোগুলো অমন করে জ্বলে-নেবে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলা যখন বাড়ির বাইরে বেরোল, বিকেল তখন ঢলে পড়তে চলেছে, পশ্চিমদিকের আকাশ আপেল আর কমলালেবুর রঙে মাখামাখি। তারই মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানান ঘরবাড়ি-জন্তুজানোয়ারের চেহারা নিয়ে সাদাটে মেঘের জমাট পাহাড়।

রোজ বিকেলে চন্দ্রকান্ত ও ইন্দ্রকান্ত খেলতে বেরোয় মাঠে। খেলা বলতে বল পেটাপেটি বা এলোমেলো ছুটোছুটি হুটোপাটি। ওদের বাড়ির সঙ্গে আছে লাগোয়া বাগান, তাতে রংবেরঙের ফুল আর পাতাবাহার। বাগান পেরোলেই পিচের রাস্তা। তারপর রাস্তা পেরোলেই মখমলের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠ। মাঠেই এখানকার ছেলেমেয়েরা খেলা করে, লোকজন সব বেড়াতে বেরোয়।

সবুজ মাঠের পাশ ঘেঁষেই শুরু হয়েছে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছের দঙ্গল। তেমন ঘন নয় যে জঙ্গল বলা যাবে, কিন্তু তা বলে খুব তুচ্ছ করার মতনও নয়। নানান পাখি আর শেয়াল নাকি আস্তানা গেড়েছে ওই গাছের জটলার ভেতরে।

চন্দ্রকান্ত, ইন্দ্রকান্ত আর ঝামেলা পিচের রাস্তা পেরিয়েই ছুট লাগাল মাঠে। ঝামেলা জোরে ছুটতে পারে না, তাই পড়ে রইল সবার পিছনে। তার ওপর বেচারার হাতে ঝালা-পালা ওদের খেলার ফুটবলটা ধরিয়ে দিয়েছে। তবু হেলেদুলে টলতে-টলতে ঝামেলা যথাসম্ভব জোরে দৌড়োতে চেষ্টা করছে।

বিকেলের আলোয় অন্যান্য ছেলের দল নানান খেলা খেলছে। ঝালা-পালা আর ঝামেলাও রোজকারমতো ওদের খেলা শুরু করল।

খেলা পুরোদমে চলছিল, এমনসময় হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাচ্চা-রোবট ঝামেলা। কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল, তারপর বলে উঠল, 'শব—শব—শব্দ! নতুন ধাঁচের শব্দ। খোঁজ করা দরকার।'

ঝালা-পালাও খেলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিগ্যেস করল অবাক হয়ে, 'কোনদিক থেকে আসছে শব্দটা?'

শব্দটা ঝালা-পালার কানে আসছে না। কিন্তু ঝামেলা যখন শুনতে পাচ্ছে তখন শব্দট নির্ঘাত আলট্রাসনিক।

ঝামেলা মনোযোগ দিয়ে শব্দটা ঠাহর করার চেষ্টা করছিল। মিনিটখানেক

পর কী যেন একটা বলতেও শুরু করল ও। কিন্তু ওর মিহি গলা ছাপিয়ে একটা ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা তিনজন—

'হাসছি মোরা হাসছি দেখো, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিনজনেতে জটলা করে ফোকলা হাসির পাল্লা দি।'

চমকে ফিরে তাকাতেই খুব চেনা মজার মানুষটাকে দেখতে পেল ওরা। প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল। নেড়া মাথায় অল্পস্বল্প খোঁচা-খোঁচা চুল, বেড়ালের গোঁফের মতো খ্যাংরা গোঁফ, কালো জামা, কালো প্যান্ট, পায়ে মোজা এবং বুট-জুতো। ভদ্রলোক নামকরা উদ্ভিদবিজ্ঞানী—বটানিস্ট। ঝালা-পালাদের তিনটে বাড়ি পরেই থাকেন। ভীষণ খামখেয়ালি আর ভাবুক। তবে সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'-এর প্রত্যেকটি ছড়া তাঁর মুখস্থ। ঝালা-পালা মানিকজোড়কে দেখলেই 'আবোল-তাবোল'-এর কোনও না কোনও ছড়া শুনিয়ে দেন প্রফেসর নিধিরাম।

ঝালা-পালাকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখেই প্রফেসর কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলেন, 'বলো দেখি, কোন ছড়া?'

ঝালা-পালা একসঙ্গে বলে উঠল, 'আহ্লাদী!'

'কারেক্ট! এই নাও টফি!' বলে ঝালা ও পালাকে একটা করে টফি দিলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'আচ্ছা আমি এবার চলি। চটপট কিছু গাছপালা খুঁজে বের করতে হবে।'

প্রফেসর নিধিরাম এখন যে মাঠ পেরিয়ে গাছপালার রাজ্যে ঢুকবেন সেটা ঝালা-পালা বেশ ভালো করেই জানে। রোজই বিকেলে উনি ওই আধা-জঙ্গলে ঢোকেন গাছের ছাল-পাতা, শিকড়-বাকড় জোগাড়ের সন্ধানে। তারপর তা নিয়ে কীসব এক্সপেরিমেন্ট চালান।

আসলে কিন্তু প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের নাম অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। ওঁর এই ছদ্মনামটা ঝালা-পালাই দিয়েছে ওদের ছোটকার অনুকরণে। কারণ প্রফেসর সেনশর্মা সর্বদা 'আবোল-তাবোল' আউড়ে বেড়ান, গাছের ছাল থেকে নতুন ধরনের তেল আবিষ্কার করেছেন, তৈরি করেছেন অতি বিকট গন্ধ ও ঝাঁঝওয়ালা বড়ি—যে বড়ির গন্ধে শস্যখেত থেকে কীটপতঙ্গ পালাবে, মশা-মাছিও চম্পট দেবে ত্রিসীমানা থেকে। সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখা ঝালা-পালারও বলতে গেলে একেবারে মুখস্থ। তাই ওরা দুজনেই জানে সুকুমার রায়ের 'সত্যি' গল্পের প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের কথা। নিধিরাম পাটকেল আবিষ্কার করেছিলেন গন্ধবিকট তেল আর কামানের দুর্গন্ধবিকট গোলা। তা ছাড়া, অজয়েন্দ্রবাবুর চেহারাও যেন অবিকল সুকুমার রায়ের আঁকা নিধিরামের ছবির মতো।

ওদের এই নতুন নামকরণ শুনে ছোটকা বেশ মজা পেয়েছিল।

আর ঝামেলা তিড়িং-তিড়িং লাফিয়ে মিহি গলায় আনন্দ প্রকাশ করে বলে

উঠেছে, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'

ফুজিয়ামা জাপানের এক নামকরা আগ্নেয়গিরি। তার সঙ্গে উত্তেজনা বা আনন্দের যে কী সম্পর্ক তা একমাত্র ঝামেলাই জানে! তবে বেশি উত্তেজিত হলে বা খুশি হলে ওই কথাটা ওর বলা চাই-ই চাই।

প্রফেসর নিধিরাম চলে যেতেই ঝামেলা আবার বলল, 'শব্দটা এখনও রয়েছে। ওটা জঙ্গলের দিক থেকে আসছে।' বলে গাছ-গাছালির দিকে আঙুল দেখিয়ে সেদিকে হেলেদুলে ছুটতে আরম্ভ করল ঝামেলা। অগত্যা চন্দ্র-ইন্দ্রও ওর পিছনে দৌড়োল।

আকাশ অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাঠের লোকজন, ছেলেমেয়ে যে-যার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। কিন্তু ওরা তিনজন ছোট-ছোট পা ফেলে ছুটে চলেছে। ঝালা-পালা দেখল, ওরা জঙ্গলের যে-অংশ লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছে, একটু আগেই সেখানে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়েছেন প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল।

ছোটকা বলছিল, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার থিতিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রফেসর নিধিরামের আজব আবিষ্কারে মোটেও ভাটা পড়েনি। জঙ্গলে ঢুকে এখন তিনি কী করছেন কে জানে!

'ওই যে, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি!' উত্তেজনায় চিঁহি-চিঁহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ঝামেলা, 'একটি সবুজাভ প্র—প্র—পাথর! উহা হইতে আলো নির্গত হইতেছে!' বোঝা গেল, 'প্রস্তর' উচ্চারণ করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত 'পাথর' বলল ও।

যে সবুজ পাথরের কথা ঝামেলা বলছে সেটা ও একাই দেখতে পাচ্ছে। ঝালা-পালার তো ওর মতো টেলিস্কোপিক চোখ নেই!

জঙ্গলে ঢুকতেই সবুজ ঘাস মাপে অনেক বড় এবং ঘন হয়ে গেছে। ঝোপঝাড়ও চোখে পড়ছে কিছু-কিছু। এ ছাড়া সব বিশাল-বিশাল দেবদারু, শাল, শিমুল একপায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মাঠে তবু বা কিছু আলো ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। চারপাশে তাকিয়ে ঝালা-পালার গা শিরশির করতে লাগল। বাতাসের ঝাপটা গাছের অলিগলি পেরিয়ে গায়ে এসে লাগছে।

ঝামেলা কিন্তু বেশ নিশ্চিত পা ফেলে হেঁটে চলেছে সবার আগে। কখনও পায়ে-চলা সরু পথ ধরে, কখনও বা পথের বাইরে ঘাসঝোপ ঠেলে। মাথার ওপর থেকে ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচির। ওরা সব ঝাঁক বেঁধে বাসায় ফিরছে।

আরও কিছুটা এগোতেই ইন্দ্র চন্দ্রকে বলল, 'ফিরে চল, আর ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝামেলার চিৎকারে ওরা চমকে উঠল। 'ওঃ, পাইয়াছি রে, পাইয়াছি!'

ওরা তিনজনেই এবারে স্পষ্ট দেখতে পেল সবুজ পাথরটা। সরু পথের ডান দিকে বেশ কিছুটা ভেতরে ঘন ঘাসঝোপের ফাঁকে চুপটি করে বসে রয়েছে টেনিস বলের সাইজের একটা উজ্জ্বল সবুজ পাথর। ঠিক যেন একটা পান্না। ঝামেলা এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ডানহাতে তুলে নিল পাথরটা। তারপর এসে দাঁড়াল বাকি দুজনের কাছে। জিনিসটা চন্দ্রকান্তের হাতে দিল।

পাথরটার গা বলের মতো মসৃণ নয়, কারুকাজ করে নিপুণ হাতে কাটা। তা ছাড়া যে-জিনিসটা সবচেয়ে অবাক করে দেয় তা হল, পাথরটার ঠিক কেন্দ্রে একটা টকটকে লাল আলো জ্বলছে। সেই আলো পাথরের ভেতরে তৈরি করেছে এক অপূর্ব লালচে আভা। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে আলোর আভা চমকে দেওয়ার মতো জ্বলজ্বল করছে।

চন্দ্র বলল, 'পাথরটা হাতে কেমন যেন গরম-গরম ঠেকছে!'

ইন্দ্র অবাক হয়ে গেল এ কথাটা শুনে। হঠাৎ ও ঝামেলার দিকে তাকাতেই দেখে, ও দু-কানের ফুটোয় হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্র জিগ্যেস করতেই ঝামেলা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'শব্দে আমার কান ফেটে যাচ্ছে। তোমাদের তো আর কিছু না!'

আলট্রাসনিকে ঝামেলার কষ্ট হচ্ছে দেখে চন্দ্রকান্ত পাথরটা চট করে ওর হাফপ্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে কান থেকে হাত নামাল।

এমনসময় একটা শেয়ালের ডাক শুনতে পেল ওরা। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে তিনজন বাড়ির দিকে ছুট। ছুটতে-ছুটতে চন্দ্র বলল, 'ছোটকার ব্লাস্টারটা সঙ্গে থাকলে ভালো হত। শেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতাম।'

ঝামেলা দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা শেয়ালকে ভয় পাও! আমি একটুও ভয় পাই না!'

'তা হলে থাকো না। পালাচ্ছ কেন?' ইন্দ্র মুখ না ফিরিয়েই বলে উঠল।

ঝামেলা জবাব দিল, 'শৃগাল বড় অসভ্য। গা চেটে দিতে পারে। তাই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া যাইতেছি।'

চন্দ্র-ইন্দ্র ফিরে তাকালে দেখতে পেত, ঝামেলার কপালে লাল-নীল বাতিগুলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে উত্তেজনায়। আর এও দেখতে পেত, দূরের একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি ওদের লক্ষ করছে।

সে-রাতেই ছোটকার ঘরে মিটিং বসল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম মাথায় উঠল ঝালা-পালার। মাকে আদর-আবদার করে রাজি করিয়ে দুই যমজ পালোয়ান সোজা হাজির ছোটকার ঘরে। সন্ধেবেলাতেই পড়াশোনার ফাঁকে রহস্যময় সবুজ পাথর খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটা

ইন্দ্রকান্ত বলেছিল ছোটকাকে। এও বলেছিল, পাথরটা থেকে আলো বেরোচ্ছে এবং আলট্রাসনিক শব্দও পাওয়া যাচ্ছে অবিরাম।

অবাক চোখে বহুক্ষণ ধরে পাথরটা দেখে ছোটকা ভুরু কুঁচকে আস্তে-আস্তে বলল, 'ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে রে। এ-পাথরটা সাধারণ পাথর নয়। সন্দেহ একটা হচ্ছে, তবে পরীক্ষা না করে কারেক্টলি বলতে পারছি না। এটা নিয়ে আমি এক্ষুনি অফিসে যাব। সেখানে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট-ফেস্ট করে রাতে ফিরব। তখন তোদের সঙ্গে ডিটেলস আলোচনা করব, কেমন?'

ঝালা-পালা দেখল, ছোটকা হঠাৎ কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে গিয়ে পাথরটা ভালো করে কাগজে মুড়ে নিল। তারপর অফিসে বেরোবার পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল ঝটপট। শেষে ব্লাস্টারটাকেও গুঁজে নিল জামার ভেতরে বগলের নীচে। তারপর বলল ঝালা-পালাকে, 'কোনও ভয় নেই। যা, পড়তে বস।' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পরক্ষণেই বাইরে থেকে মোটরবাইক স্টার্ট দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। রওনা হয়ে গেল ছোটকা।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ঝামেলা চুপটি করে এতক্ষণ সব দেখছিল এবং শুনছিল। ছোটকা রওনা হয়ে যেতেই সেতার-বাজানো সুরে ও বলে উঠল, 'পাথরটা নিশ্চয়ই ট্রান্স...ট্রান্সমিটার। আলট্রাসনিক দিয়া সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।'

চন্দ্র ও ইন্দ্র অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকাল। ট্রান্সমিটার! জঙ্গলের মধ্যে ট্রান্সমিটার পড়ে থাকবে কেন? আর ওই ট্রান্সমিটার খবর পাঠাচ্ছিলই বা কাকে? ওরা দুজনে বহু ভেবেও কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। অতএব পড়ার ঘরে এসে বই নিয়ে বসে পড়ল। ঝামেলা কিছুক্ষণ ওদের সামনে বসে রইল। তারপর লিকলিকে হাত দিয়ে ফুটবলের মতো চকচকে মসৃণ মাথায় হাত বুলিয়ে আমতা-আমতা করে বলল, 'যদি বলো তো একটু রান্নাঘরে যাই—।'

একটু থেমে ও আবার মিহি গলায় মিনমিন করে বলল, 'ওখানে আরশোলার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। কয়েকটা ধরি গিয়ে—।'

ঝামেলা টলতে-টলতে রওনা হয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ঝালা ও পালা যুক্ত ও মুক্তকণ্ঠে পড়তে শুরু করল। কিন্তু কোনও পড়াই ওদের মাথায় ঢুকছিল না। মনের মধ্যে শুধু সবুজ পাথরটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ছোটকা বেশ রাত করেই অফিস থেকে ফিরল। তারপর চটপট খাওয়া-দাওয়ার পালা সেরে ঘরে ফিরে দেখে ঝালা-পালা তার বিছানায় বসে অপেক্ষা করছে। ওদের চমৎকার চোখ দুটো কৌতূহলে চকচক করছে। ছোটকা চেয়ার টেনে ওদের কাছে এসে বসল। গম্ভীর গলায় বলল, 'যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। পাথরটা সাধারণ পাথর নয়—একটা নতুন ধরনের ট্রান্সমিটার।'

ঝালা-পালা বলল, 'জানতাম।'

'জানতি? কী করে জানলি?' ছোটকা তো অবাক।

খাটের তলায় কিছুক্ষণ ধরে খুটুরখাটুর শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎই সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ঝামেলা বেরিয়ে এল। বলল, 'আমি বলেছি। তা পাথরটা কোথায়? আওয়াজ পাইতেছি না যে!'

চন্দ্র ইন্দ্রকে বলল, 'ঝামেলাকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা কর। নইলে ফোড়ন কেটে সব আলোচনা পণ্ড করে দেবে।'

ইন্দ্র ঝামেলাকে বলল, 'তন্বীতমালতালীবনরাজিনীলা—এই কথাটা বানান করে উচ্চারণ করো দেখি। ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে প্র্যাকটিস করো, কাল সকালে জিগ্যেস করব।'

ঝামেলা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে তারপর ঘর ছেড়ে রওনা হল। আর একই সঙ্গে মিহি গলায় বানানটা করবার চেষ্টা করতে লাগল, 'ত—ত—তন্...'

ও চলে যেতেই ছোটকা হেসে ইন্দ্রকে বলল, 'দারুণ দিয়েছিস। ব্যাটা আজ রাতের মতো আচ্ছা জব্দ হয়েছে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তা শোন, ঝামেলা ঠিকই ধরেছে। পাথরটা আমি অফিসে রেখে এসেছি। ওটার ওপরে এখনও অনেকরকম এক্সপেরিমেন্ট চলছে। পাথরটা আমাদের বড়সায়েবকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কী করে তোরা পাথরটা পেলি গোটা ব্যাপারটা ভালো করে খুলে বল দেখি! কিচ্ছু বাদ দিবি না।'

তখন ঝালা-পালা পালা করে বলতে শুরু করল।

ছোটকা একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। বোঝা গেল সেও কম দুশ্চিন্তায় পড়েনি।

ওদের সবকথা শোনার পর ছোটকা চোখ ছোট করে প্রশ্ন করল, 'তোদের আগে প্রফেসর নিধিরাম, মানে প্রফেসর সেনশর্মা ওই জঙ্গলে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি তো রোজই ঢোকেন। রাজ্যের গাছ-পাতা জোগাড় করে ফিরে আসেন।'

'আজকে কখন ফিরলেন?'

'তা তো দেখিনি?' এবারে ঝালা-পালা সত্যিই অবাক হল। প্রফেসর নিধিরাম রোজই সন্ধে ঘনিয়ে আসার আগে বেরিয়ে আসেন জঙ্গল থেকে। আজ তো তাঁকে দেখা যায়নি! ঝালা-পালা ও ঝামেলা যখন জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিল তখন তো বেশ অন্ধকার করে এসেছে! জঙ্গলের ভেতরে প্রফেসরের কোনও বিপদ হয়নি তো? তিনি বেশ নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কার করছিলেন। তাইতেই হিংসে করে কেউ তাঁকে বিপদে ফেলেনি তো?

সন্দেহগুলো ছোটকাকে খুলে জানাতেই ছোটকার চুরুটের টান দ্বিগুণ জোরালো হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে সে বলল, 'ঝালা-পালা, অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে

তাতে তোদেরও কিছু কিছু খোলসা করে বলা দরকার। আজ সকালেই বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে-গোলমালের কথা বলছিলুম সেটা আসলে হল এইরকম ঃ ভারতের মোট চারজন বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা একেবারে সবার সেরা। প্রথমজন ব্যাঙ্গালোরের প্রফেসর রায়না, দ্বিতীয়জন বম্বে আই আই টি-র প্রফেসর শ্যামমূর্তি, তিন নম্বর আমাদের অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। আর শেষজন মাদ্রাজের প্রফেসর চিদাম্বরম।'

ছোটকা দম নিতে একটু থামল। তারপর বারদুয়েক চোস্ত টান মারল চুরুটে। প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল যে এত নামকরা লোক সেটা ঝালা-পালা জানত না। এক পাড়ায় থাকেন বলেই হয়তো ওরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ওদের খুব খারাপ লাগল।

ছোটকা আবার বলতে শুরু করল, 'তোরা হয়তো জানিস না, গত বছরে প্রফেসর রায়না হঠাৎ দশদিনের জন্যে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের গোপন তদন্ত বিভাগ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে খুঁজে পায়নি। অবশেষে প্রফেসর রায়না নিজে-নিজেই একদিন ফিরে আসেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি দশদিন কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, এ-বিষয়ে একটি কথাও তাঁর কাছ থেকে আদায় করা যায়নি। হাজার তদন্ত করে আমরাও কিছু বের করতে পারিনি।

প্রফেসরের কাজকর্ম এরপর থেকে ঠিকঠাক চললে কারও আর চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু গোলমালটা বাধল ওইখানেই। মানুষটার গবেষণার বুদ্ধি আর নিত্যনতুন আবিষ্কারের মিছিল যেন তারপর থেকেই মুখ থুবড়ে পড়ল। ভারতের সামরিক বিভাগের জন্য বহু আবিষ্কার উপহার দিয়েছেন প্রফেসর রায়না। সুতরাং তাঁরাও চাপ দিতে লাগলেন গোপন তদন্ত বিভাগকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ফল কিছু পাওয়া গেল না।'

'কেউ ওঁকে ইনজেকশান দিয়ে পাগল বা বোকা করে দেয়নি তো, ছোটকা?' একরাশ আগ্রহ নিয়ে সমাধান জোগাতে চাইল ইন্দ্রকান্ত।

ছোটকা বলল, 'হতে পারে। জানি না। কারণ ফিরে আসার পর থেকে প্রফেসর রায়না লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দিয়েছেন। কেমন যেন খিটখিটেও হয়ে গেছেন। যাই হোক, এরপরে ঠিক একই ঘটনা ঘটল প্রফেসর শ্যামমূর্তির বেলায়। অবশ্য রায়নার মতো নিরুদ্দেশ তিনি হননি। কী একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে রাজস্থান গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসেই একেবারে অন্য মানুষ! নাঃ, এবারও আমরা রহস্যভেদ করতে পারিনি। শুধু ধরে নিয়েছি, খামখেয়ালি মানুষগুলোর বুদ্ধি হঠাৎ করেই অকেজো হয়ে গেছে।'

ছোটকার চুরুটটা নিবে এসেছিল। সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ছোটকা নতুন একটা ধরাল। তারপর বলল, এই দুটো ঘটনার পর গোপন তদন্ত বিভাগ বাকি যেসব নামি-দামি বিজ্ঞানী আছেন তাঁদের একটা লিস্ট বানাল। তাতে প্রথম নাম প্রফেসর অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। তখন বড়সায়েব আমাকে ডেকে বললেন, ওঁর ওপরে

নজর রাখতে। তা আমি নজর রাখি, আর তোদের কাছ থেকেও মাঝেমধ্যে ওঁর খবরাখবর নিই। এতদিন তো কোনও গোলমাল হয়নি, আজই কেমন একটু চিন্তা হচ্ছে।'

ছোটকার কপালে করোগেটেড টিনের চালের মতো অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কাল সকালেই প্রফেসর সেনশর্মার খোঁজ করতে হবে। তোরা দুজনে গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসিস। আমি চাই না আমাকে ভদ্রলোক সন্দেহ করুন।'

ঝালা-পালা এককথায় রাজি। কিন্তু ছোটকার মুখে তদন্তের পুরো ব্যাপারটা শোনার পর ওদের যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। সেটা ছোটকা বোধহয় কিছুটা আঁচ করল। কারণ খাট থেকে নেমে মানিকজোড় রওনা হতেই সে দুজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই রে। আমি তো আছি!'

ঝালা-পালা ফিরে এল ওদের ঘরে। ওরা দুজনে আলাদা একটা ঘরে শোয়—সঙ্গে শুধু থাকে ঝামেলা। ঝামেলার জন্য ঘরের একপাশে একটা ছোট্ট বিছানা পাতা আছে। রোবটের অবশ্য শোওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু ঝালা-পালাকে দেখে ঝামেলা সেই শুরু থেকেই বিছানায় শোওয়ার বায়না ধরেছে। তাই ওর জন্যেও বরাবর একইরকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ঘর অন্ধকার ছিল। চন্দ্রকান্ত সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঝামেলা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আর আপনমনে সেই বানানটা রপ্ত করে চলেছে।

দু-ভাই এ-ওর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ওরা শুনতে পেল, ঝামেলা বানান প্র্যাকটিস থামিয়ে বলছে, 'তোমাদের সব কথাই আমি এখান থেকে শুনিতে পাইয়াছি। কাল ইট-পাটকেলের বাড়ি যাওয়ার সময় আমাকেও নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। গুড নাইট।' তারপর আবার শুরু হল ওর বানান প্র্যাকটিস, 'ত, ম-এ আকার, ল-তমাল, তমাল...'

ঝালা-পালার মনে নানান চিন্তা জট পাকাচ্ছিল। আগামীকাল ইট-পাটকেলের—মানে নিধিরাম পাটকেলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে তো? নাকি দেখা যাবে উনিও প্রফেসর রায়নার মতো রাতারাতি উধাও হয়ে গেছেন!

এসব ভাবতে-ভাবতেই ঝালা-পালা ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রফেসর নিধিরাম পাটকেলের বাড়িটা ছবির মতন। ঝালা-পালাদের বাড়ির মতো এ-বাড়িতেও লাগোয়া বাগান আছে। দূর থেকেই বাগানের রঙিন ফুলগুলো ওদের তিনজনের চোখে পড়ল। তিনজন, কারণ, ঝামেলাও আছে ঝালা-পালার

সঙ্গে। সেই কাকভোরে উঠেই ও 'তন্বীতমালতালীবনরাজিনীলা' বানান ও উচ্চারণ পাঁচ-পাঁচবার করে শুনিয়ে দিয়েছে দু-ভাইকে। তারপর তাড়া লাগিয়েছে অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য।

এখন সবে ছ'টা কি সওয়া ছ'টা বাজে। এই সাতসকালে ওরকম একজন নামজাদা বিজ্ঞানীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করাটা কি ঠিক হবে! অবশ্য যদি ইতিমধ্যেই তিনি উধাও না হয়ে গিয়ে থাকেন। ঝালা-পালার বুকের ভেতরটায় কেমন গুড়গুড় করছে। দু-ভাই হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। আর একটু পিছনেই ঝামেলা কিচিরমিচির করছে আর বলছে, 'অহো, প্রাতঃকালের কী শোভা। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'

নাঃ, ওদের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হল। বাগানেই পাওয়া গেল প্রফেসর নিধিরামকে। নরম মাটির ওপরে বসে ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন। ঝালা-পালা জানে, নিজের হাতেই উনি বাগানের পরিচর্যা করে থাকেন। তা ছাড়া, বাড়িতে ওঁর লোকজন বলতে একটিমাত্র কাজের লোক। রান্নাবান্না থেকে প্রফেসরের দেখাশোনা—সবই সে করে থাকে। আর আছে ইয়া এক বাঘা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কুচকুচে কালো তার গায়ের রং। সবুজ চোখ দুটো সবসময় জ্বলছে। ঠিক যেন হাউন্ড অব দি বাস্কারভিল্‌স্! কুকুরটার দৌলতে অচেনা কেউ বাড়ির আশেপাশে পর্যন্ত ঘেঁষতে পারে না। কুকুরটা প্রফেসরের কথা এমনভাবে মেনে চলে যে, মনে হবে সে বুঝি মানুষের ভাষা বোঝে।

কুকুরটাকে দেখলেই ঝালা-পালা ভয় পায়, কিন্তু ঝামেলা একটুও ভয় পায় না। কারণ একদিন কুকুরটা ছুটে এসে ঝামেলার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঝামেলার তো স্টিলের পা! সুতরাং ওর কিছু হয়নি। বরং 'কেঁউ' আওয়াজ তুলে অ্যালসেশিয়ানটা ছুটে পালিয়েছিল বাড়ির ভেতরে। আর তার একটা চোখা দাঁত ভেঙে পড়েছিল ঝামেলার পায়ের কাছে। তারপর থেকে ঝামেলাকে দেখলেই সাংঘাতিক কুকুরটা একটু ভয়ে-ভয়ে থাকে।

কুকুরটাকে বাগানে দেখা গেল না। এমনকী ওরা তিনজনে বাগানে ঢোকার পরেও তার কোনও 'ঘেউ ঘেউ' শোনা গেল না।

প্রফেসর নিধিরাম ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন। তাঁর হাতে-পায়ে জামায় মাটি মাখামাখি। পাশেই পড়ে রয়েছে একটা কোদাল আর একটা বেলচা। উনি ঝুঁকে পড়ে দু-হাত বাড়িয়ে বাগানের মাটির ওপরে হাত বোলাচ্ছেন। যেন এইমাত্র একটা গর্ত বুজিয়ে ফেললেন।

চন্দ্রকান্ত পিছন থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'বাপ রে, কী ডানপিটে ছেলে! কোনদিন ফাঁসি যাবে, নয় যাবে জেলে।...বলুন তো, কোন ছড়া?'

যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল মুহূর্তে। প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল ক্যাঙারুর মতো এক ঝম্প-লাফ মেরে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একইসঙ্গে পিছন দিকে

ঘুরে তাকাতে গিয়ে বে-তাল হয়ে উলটে পড়েন আর কী! তাঁর মুখ থেকে 'কে? কে?' বলে যে কান-ফাটানো চিৎকারটা বেরিয়ে এল সেটা কোনও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব বলে ঝালা-পালার মনে হল না। প্রফেসরের বিকট ভঙ্গিতে আঁতকে ওঠা দেখে ঝালা-পালা আর ঝামেলা, তিনজনেই যেন পালটা আঁতকে উঠল। ঝামেলা চিঁ-চিঁ করে কীসব শব্দ করতে লাগল, ওর কপালের আলোগুলো জ্বলতে শুরু করল দপ্-দপ্ করে। আর একইসঙ্গে তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল ও।

একটু পরেই প্রফেসর নিধিরাম নিজেকে সামলে নিলেন। মাটি মাখা হাত দুটো প্যান্টে ঘষে সাফ করতে চাইলেন। তারপর হোঁচট-খাওয়া গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এই সাতসক্কালে তোমরা কী মনে করে?'

চন্দ্রকান্ত হেসে বলল, 'যে-ছড়াটা বললাম, বললেন না তো সেটার নাম কী?'

প্রফেসর নিধিরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করার ভান করে বললেন, 'তোমার ছড়া তুমিই জানো। আমি কী করে তার নাম বলি!'

ঝালা-পালা দুজনেই অবাক হল প্রফেসরের কথায়। 'আবোল-তাবোল'-এর 'ডানপিটে ছেলে' ছড়াটার নাম বলতে পারছেন না! নাকি মশকরা করছেন ওদের সঙ্গে?

ঝামেলা হঠাৎই মিহি সুরে জানতে চাইল, 'সারা গায়ে মাটি মেখে এই সাতসক্কালে আপনিই বা কোন রাজকার্যে নিম-নিম-নিমগ্ন ছিলেন? জানিতে পারি কি?'

প্রফেসর নিধিরাম বেশ কৌতূহলী নজরে ঝামেলাকে লক্ষ করছিলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'এই...বাগানের একটু ভালো-মন্দ যত্ন করছিলাম।'

ঝালা ও পালা আড়চোখে কোদাল ও বেলচা দুটোর দিকে দেখছিল। দুটোরই গায়ে চাপ-চাপ মাটি লেগে রয়েছে। একটু আগেই ও দুটো দিয়ে কোনও গর্ত খুঁড়েছিলেন প্রফেসর। কিন্তু কেন?

ঝামেলা প্রফেসর নিধিরামের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ওর প্রকাণ্ড মাথাটা নড়ছিল এপাশ-ওপাশ। কেন জানি না মনে হচ্ছে, প্রফেসরের উত্তর ঝামেলাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ঘুরপাক খেতে-খেতেই ঝামেলা হঠাৎ গানের সুরে বলতে লাগল, 'ঘচাং-ফু, খাব তোকে—ঘচাং-ফু, খাব তোকে—।'

এটা যে একটা সিনেমার গানের লাইন সেটা ঝালা-পালা জানে। কিন্তু ঝামেলা যে কাকে খেতে চাইছে তা ঠিক ওরা বুঝতে পারল না। তা ছাড়া, ওদের মনের কোণে একটা ভয় বাসা বাঁধছিল—প্রফেসরের কালো রঙের বাঘা অ্যালসেশিয়ানটা কোথায়? এমনিতে প্রফেসর নিধিরামকে বহাল তবিয়তে হাজির দেখে ঝালা-পালা একটু খুশিই হয়েছিল। গতকাল রাতে তাঁর জন্যে ছোটকা তো কম চিন্তায় পড়েনি!

কিন্তু এখন সেই খুশি ও স্বস্তির সঙ্গে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি ঢুকে বসে রয়েছে।

এদিকে প্রফেসর নিধিরাম ঝামেলাকে নির্ঘাত পাগল ভাবছিলেন। তিনি কিছু একটা করে ওঠার আগেই চন্দ্রকান্ত ধমক দিল ঝামেলাকে, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে। স্ট্যাচু!'

ঝামেলা স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক তক্ষুনি প্রফেসর নিধিরাম ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কাল ওই জঙ্গলে তোমরা একটা সবুজ পাথর কুড়িয়ে পেয়েছ?'

ঝালা-পালা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওই প্রশ্ন শুনে। সবুজ পাথরের কথা প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল জানলেন কেমন করে? ওরা যখন পাথরটা কুড়িয়ে ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তো নিধিরাম পাটকেলকে ওদের চোখে পড়েনি!

'সবুজ পাথরটা কোথায়?' নিধিরামের গলা খানিকটা কর্কশ হল। সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠায় নিধিরাম পাটকেলের নেড়া মাথা বেশ চকচক করছে।

ঝালা-পালা একটু চুপ করে থেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'আমাদের ছোটকার কাছে।'

নিধিরাম পাটকেলের মুখের রেখা নরম হল। মজা-মজা আজব ভাবটা ফিরে এল। ঝাঁটা গোঁফে বারদুয়েক তা দিয়ে তিনি বললেন, 'আসলে কী ব্যাপার জানো, পাথরটা আমার। গাছের পাতা খুঁটিয়ে পরখ করার জন্যে ওটা আমি তৈরি করেছি। কাল ওটা আমার পকেট থেকে অসাবধানে পড়ে গেছে। তোমাদের ছোটকাকে বলো পাথরটা যেন আজকের মধ্যেই আমাকে ফেরত দেয়।'

প্রফেসর নিধিরামের মিঠে-মিঠে কথাগুলোর মধ্যে যে একটা ভয় দেখানো ব্যঙ্গের সুর চাপা রয়েছে সেটা সহজেই বুঝতে পারল ঝালা-পালা। প্রফেসরের কথা শেষ হতেই ইন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে ঝামেলাকে বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি! এবারে বাড়ি চলো।'

ঝামেলা যেন প্রাণ ফিরে পেল। এবং প্রাণ ফিরে পেয়েই প্রফেসরকে বলল, 'আপনার কালো কুত্তাটি কোথায়? তাহাকে দেখিতে পাচ্ছি না!'

প্রশ্নটা শোনামাত্র প্রফেসর নিধিরামের মজারু মুখখানা ঝট করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে তিনি বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আছে—মানে, বাড়ির ভেতরেই আছে। সবসময়—ইয়ে—খুব গোলমাল করে কিনা, তাই ওকে...।'

ঝামেলা হাত তুলে তাকে থামতে বলল, 'থাক, আর পরিশ্রম করিয়া গুল মারতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। চলো, বাড়ি চলো।'

শেষের কথাগুলো অবশ্যই ঝালা-পালাকে লক্ষ্য করে। অতএব ওরা তিনজনে রওনা হয়ে পড়ল। আর কিম্ভূতকিমাকার প্রফেসর অজয়েন্দ্র সেনশর্মা হতবাক হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো রাগে-অপমানে ধকধক করে জ্বলছিল।

বাড়ি ফেরার পথে ঝালা-পালা ধমক দিল ঝামেলাকে, 'ছিঃ, ওঁর বাড়িতে তুমি কী অসভ্যতা শুরু করেছিলে? এইজন্যেই তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে নেই!'

ঝামেলা চটপট জবাব দিল, 'যমজ দাদাভাইরা, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ ওই ইটপাটকেল প্রফেসরটি একটি একনম্বরের মিথ্যেবাদী? প্রথম কথা, সবুজ পাথরটা কাল ওঁর পকেটে ছিল না। যদি থাকত, তা হলে তোমাদের 'আহ্লাদী' ছড়াটা শোনাবার সময়ে পাথরের আলট্রাসনিক শব্দ আমার কানে আসেনি কেন? আর দু-নম্বর মিথ্যে হল, কালো কুকুরটা প্রফেসরের বাড়িতে নেই। আমি যখনই ও বাড়ির কাছাকাছি যাই তখনই কুকুরটার ফোঁস-ফোঁস, ফিশফাশ, বা ঘেউ-ঘেউ আমার আলট্রাসনিক শুনতে পাওয়া কানে ধরা পড়েই। আজ সেরকম কিছুই শুনিতে পাইলাম না। এখন কহ যমজ ভাইগণ, কী অন্যায় আমি করিয়াছি?'

ঝালা-পালা চলতে-চলতে পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাচ্চা রোবটটার দিকে। রোবটের বাচ্চা তখন নাকি গলায় বেসুরো গাইছে, 'ঘচাং-ফু, খাব তোকে—ঘচাং-ফু...।'

'প্রফেসর সেনশর্মার কুকুরটা কাল রাতে মারা গেছে।' ছোটকা আচমকাই ঘোষণা করল কথাগুলো।

ঝালা-পালার মুখ থেকে সকালের অভিযান-কাহিনি শোনার পর কয়েকটা চুরুটের শ্রাদ্ধ করে ও বারকয়েক 'হুম' শব্দ করে অফিসে বেরিয়ে পড়েছিল ছোটকা। তারপর সারাটা দিন কোথায়-কোথায় কাটিয়ে ফিরে এসেছে সন্ধের মুখে। এখন ছোটকা দু-ভাইকে নিয়ে আসর জমিয়েছে নিজের ঘরে। ঝামেলার উৎপাত থেকে রেহাই পেতে ইন্দ্রকান্ত ওকে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' শব্দটা বানান করে উচ্চারণ করতে দিয়েছে। ঝামেলা সে-চেষ্টাই করে যাচ্ছে ছোটকার ঘরের এককোণে হাঁটুগেড়ে বসে।

'প্রফেসরের বাড়ির কাজের লোকটিকে রাস্তায় ধরে জানতে পেরেছি কুকুর মারা যাওয়ার খবরটা।' ছোটকা বলল।

'তা হলে সকালবেলা প্রফেসর কি কুকুরটাকেই কবর দিচ্ছিলেন বাগানে?' চন্দ্রকান্ত নিজের সন্দেহটা ছুড়ে দিল ছোটকার দিকে।

'নির্ঘাত তাই।' ছোটকা বেশ জোর দিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে, কুকুর কবর দেওয়ার ব্যাপারটা অজয়েন্দ্র সেনশর্মা তোদের কাছে চেপে গেলেন কেন। পোষা কুকুর মারা গেলে যে দুঃখটুঃখ পাওয়ার কথা তা-ও উনি পেয়েছেন বলে মনে হল না...।'

ছোটকার কপালে একরাশ ভাঁজ পড়ল। ছোটকা বলে, যে যত বেশি বুদ্ধিমান, তার কপালে ভাঁজও পড়ে তত বেশি।

ছোটকা আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, '...আর ঝামেলার কথাগুলোও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। সবুজ পাথরের গল্পটা বানানো...কুকুরের মারা যাওয়ার ঘটনা চেপে যাওয়া...নাঃ, আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। ওই নিধিরাম পাটকেলের ওপরে আরও কড়া নজর রাখা দরকার...।'

চন্দ্র ও ইন্দ্র ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ভেতরে-ভেতরে। ওদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য যে করে হোক ছোটকাকে রাজি করাতেই হবে। কিন্তু মা-বাবা কি মত দেবে খুব সহজে? মনের কথা আর চেপে না রেখে মুখে প্রকাশই করে ফেলল ওরা।

ছোটকা খুব চিন্তিত গলায় বলল, 'এ-তদন্তে বেশ বিপজ্জনক গন্ধ পাচ্ছি রে! শেষকালে কি তোদের দুজনকে বিপদে ফেলব?'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের অনুনয় ও আগ্রহ-ভরা সুন্দর মুখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ছোটকা 'না' বলতে পারল না। ওরা মনের খুশিতে একেবারে জাপটে ধরল ছোটকাকে।

'তবে শুধু নজর রাখা! তার বেশি কিছু নয় কিন্তু!' ওদের সাবধান করে দিয়ে বলল ছোটকা, 'রাত আটটায় আমরা বেরোব, কেমন?'

চন্দ্রকান্ত তখন ঘরের কোণে দাঁড়ানো ঝামেলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঝামেলা, এদিকে এসো। রাতে আমাদের সঙ্গে তুমিও যাবে, বুঝলে!'

ঝামেলা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চালে হেলে-দুলে ওদের কাছে এগিয়ে এল। তারপর একই ঢঙে বলল, 'মানুষের চেয়ে রোবট অনেক উন্-উন্নত। এসব কাজে রোবটকে বাদ দিয়ে যে চলতে পারে না তাহা জানিতে আমার বাকি নাই।'

ছোটকা হেসে ওকে বলল, 'খুব যে বড়-বড় কথা বলছ! পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটা তৈরি হয়েছে?'

'তৈরি হয়নি আবার! উহা অতি সহজ শব্দ।' একথা বলে ঝামেলা মিহি সুরে চিৎকার করে উচ্চারণ করল, 'পুণ্ডরীখ্যাঁক্কো!'

ছোটকা ও ঝালা-পালা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল একসঙ্গে।

রাত ঠিক সাড়ে আটটার সময়ে প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরোলেন। ঝালা-পালা, ঝামেলা ও ছোটকা চারজনেরই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ঝালা-পালা গভীর শ্বাস টেনে বলল ফিশফিশ করে, 'কোথায় যাচ্ছে, ছোটকা?'

ছোটকা ওদের পাশটিতেই দাঁড়িয়েছিল। ঠোঁটে আঙুল তুলে বলল,

'শ-শ-শ! কোথায় যাচ্ছে সেটা এক্ষুনি টের পাবি।'

'মানুষের ধৈর্য বড় কম!' চাপা মিহি গলায় মন্তব্য করল ঝামেলা।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলার তেল চকচকে মাথায় একটা আদুরে চাঁটি বসিয়ে দিল। ছোটকা চাপাগলায় আবার সাবধান করল, 'কী হচ্ছে কী!'

প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল তখন এপাশ-ওপাশ দেখে মাঠের দিকে রওনা হয়েছেন। এদিকটায় এমনিতেই লোকবসতি কম, তার ওপর রাত সাড়ে আটটা, ফলে সব নির্জন-নিঝুম। শুধু দু-একটা বাড়ির জানলা দিয়ে ছিটকে আসা আলো গড়িয়ে পড়েছে পিচের রাস্তায়।

প্রফেসরের বাড়ির কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাত দূরে ওরা চারজন শ্যেনদৃষ্টি মেলে মোতায়েন ছিল। না, প্রফেসরের ওপর নজর রাখার কোনও অসুবিধে তাতে হয়নি। কারণ, পঞ্চাশ হাত দূর থেকেও ঝামেলা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

অন্ধকার মাঠের পথে চলতে-চলতে প্রফেসর যখন আরও অন্ধকারে মিশে গেলেন তখন ছোটকা অনুসরণ করার উদ্যোগ করতেই ঝামেলা ছোটকার প্যান্ট ধরে টান মারল। বলল, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমি স্পষ্ট ওঁকে দেখতে পাইতেছি। জঙ্গলের দিকেই উনি যাচ্ছেন। আগে জঙ্গলে ঢুকে পড়ুন, তারপর আমরা ইটপাটকেল মহাশয়কে অনুসরণ করিব। তাহাই জুতসই হইবে নাকি?'

চন্দ্রকান্ত হেসে বলল, 'ঠিকই বলিয়াছ, উহাই জুতসই হইবে।'

ইন্দ্র ও ছোটকা মুখ টিপে হাসল। তারপর আরও মিনিট চার-পাঁচ অপেক্ষা করে ওরা প্রফেসরকে অনুসরণ করল। ঝামেলা তাঁকে দেখতেও পাচ্ছিল আর তাঁর পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল।

অন্ধকারে ভিজে ঘাস মাড়িয়ে ওরা চলেছে। শরীর ভারী হওয়ায় ঝামেলার পা বসে যাচ্ছে নরম মাটিতে। ও বড় বেশি পিছিয়ে পড়ছে দেখে ঝালা-পালা বারবার ওকে তাড়া মারতে লাগল।

চলতে-চলতে হঠাৎই ঝামেলা চিৎকার করে উঠল, 'সবুজ পাথর! সবুজ পাথর! প্রফেসর ইটপাটকেলের হাতে একটা সবুজ পাথর!'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ছোটকা বলে উঠল, 'তোরা আর এগোস না। আমি দেখছি!' তারপর ব্লাস্টারটা জামার ভেতর থেকে বার করে তিরবেগে ছুটতে শুরু করল জঙ্গল লক্ষ করে। পলক পড়তে-না-পড়তেই ওদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল ছোটকার ছুটন্ত শরীরটা।

একটু পরে ঝালা-পালা আর ঝামেলাও মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করল সেদিকে। প্রফেসর সেনশর্মা তখন জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু প্রফেসরের হাতে ধরা সবুজ একটা পাথর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে—ঠিক যেরকম পাথর গতকাল ঝালা-পালা ও ঝামেলা কুড়িয়ে পেয়েছিল। পাথর থেকে বেরিয়ে আসা লালচে আভায় প্রফেসরের মুখটা বীভৎস

দেখাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গলের মাটিতে একটা কাঁপুনি শুরু হল—যেন হালকা ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপরই জঙ্গলের বিশাল-বিশাল কতকগুলো গাছ সরে যেতে লাগল দু-পাশে। মাটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সেই ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসছে সবুজ আলোর আভা।

ছুটন্ত অবস্থাতেই ছোটকা প্রফেসরের কীর্তিকলাপ সব দেখতে পেয়েছিল। তাই চিৎকার করে বলল, 'খবরদার! নড়াচড়া করলেই ব্লাস্টার দিয়ে উড়িয়ে দেব!'

কিন্তু প্রফেসর সেনশর্মা সে-কথায় কোনওরকম আমল না দিয়ে এগিয়ে চললেন ফাঁক হয়ে যাওয়া মাটির দিকে। দেখা গেল, সেই ফাঁক দিয়ে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে সবুজ আলোর ছটা।

প্রফেসর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন পিছনে। ছোটকা তখনও অনেকটা দূরে। তিনি হয়তো ভাবলেন, ছোটকা তাঁকে ধরার আগেই তিনি সিঁড়ি দিয়ে গর্তের ভেতরে নেমে যেতে পারবেন। তাই ছুটলেন গর্ত লক্ষ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছোটকা ব্লাস্টার উঁচিয়ে ফায়ার করল।

না, কোনও শব্দ হল না। কোনও আগুনের ঝলকও দেখা গেল না। শুধু প্রফেসর নিধিরামের বাঁদিকে দাঁড়ানো একটা বিশাল ঝুপসি বটগাছ মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। অবশেষ বলতে পড়ে রইল তার পোড়া কিছু খাপছাড়া টুকরো। যে-চাঁদের আলো এতক্ষণ আড়াল হয়ে ছিল, তা এবার এসে পড়ল জঙ্গলের ঘাসে, লতায়-পাতায়, প্রফেসরের গায়ে।

ছোটকা গর্জন করে উঠল, 'এখনও বলছি সাবধান!' এবং পরক্ষণেই ব্লাস্টার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হতভম্ব প্রফেসর নিধিরামের ওপরে। প্রফেসর একটা চিৎকার করে ছোটকার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন। সবুজ পাথরটা তাঁর হাত থেকে তখন ছিটকে পড়েছে মাটিতে।

ঠিক সেই সময়ে ঝালা-পালা ও ঝামেলা হাজির হল ঘটনাস্থলে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে খুদে-খুদে দুই বীরপুরুষ ছোটকার সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রফেসরের ওপরে। চলতে লাগল চারটে শরীরের জটলা। ব্যাপার দেখে ঝামেলা এগিয়ে এল। চারটে মাথার মধ্যে ন্যাড়া মাথাটি বেছে নিয়ে ওর লোহার ডানহাতটা সজোরে বসিয়ে দিল ব্রহ্মতালুতে। পলকে সব ঝটাপটি শেষ। হাঁফাতে-হাঁফাতে ছোটকা আর ঝালা-পালা উঠে দাঁড়াল। অদূরে ছিটকে পড়া ব্লাস্টারটা কুড়িয়ে নিল ছোটকা। প্রফেসর নিধিরাম তখন অসাড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে।

ঝালা-পালা বলল, 'থ্যাংক য়ু, ঝামেলা।'

ছোটকা সবুজ পাথরটা কুড়িয়ে পকেটে ঢোকাল। তারপর ঝুঁকে পড়ে প্রফেসরের নাকের কাছে হাত রাখল। না, নিশ্বাস পড়ছে।

এমন সময় ঝামেলা মিহি সুরে চিৎকার করে উঠল, 'জলদি! গর্তটা আবার বুজিয়া যাইতেছে!'

চট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেদিকে নজর করল ছোটকা। তারপর 'কুইক'! বলে ছুটল সেদিকে। ঝালা-পালাও ছুটল কোনওরকম দেরি না করে।

অতি সহজেই ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঝামেলা পিছিয়ে পড়েছিল। ছোটকা হাত বাড়িয়ে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

ভেতরটা হালকা সবুজ আলোয় ঝকঝক করছে। দশ-বারোটা সিঁড়ি নামলেই একটা বিশাল ঘর। ঘরে বেশ কিছু অজানা-অচেনা যন্ত্রপাতি। দু-তিনজন মানুষও চলাফেরা করছে ব্যস্তভাবে। ছোটকা ওদের তিনজনকে দাঁড়াতে বলে পকেট থেকে দেশলাই-বাক্সের মাপের কী একটা জিনিস বের করল। তারপর সেটার গায়ে একটা ছোট বোতাম টিপে বাক্সটা রেখে দিল সিঁড়ির ধাপের এককোণে। ঝালা-পালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ট্রান্সমিটারটা দিয়ে আমাদের গোপন তদন্ত বিভাগে খবর চলে যাবে আমরা কোথায় আছি। দশ মিনিটের মধ্যেই সিকিওরিটি ফোর্স চলে আসবে। কিন্তু এখানে কীসব কাণ্ড হচ্ছে বল দেখি!'

ওরা চারজনে সতর্ক পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়াল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে ছোটকা সবার আগে।

ঘরে যে ক'জন লোক ব্যস্ত ছিল তারা হঠাৎই যেন ওদের খেয়াল করল। তাদের প্রত্যেকের পরনে ধবধবে সাদা ফুলশার্ট ও ফুলপ্যান্ট। মাথায় সাদা টুপি। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, লোকগুলো দেখতে হুবহু একরকম। ছোটকা চাপা গলায় বলল, 'ঝালা-পালা, এখানে সবাই দেখছি তোদের মতো যমজ ভাই!' তারপর গম্ভীর স্বরে আদেশ করল ছোটকা, 'যে যেখানে আছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ো! নইলে হাওয়া-বন্দুক দিয়ে হাওয়া করে দেব!'

মোট তিনজন লোক ছিল ঘরে। তারা চটপট দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরের মূর্তির মতো।

ঝালা-পালার তো বুক দুরদুর করছে। ছোটকা একা সবাইকে সামলাতে পারবে তো! ঝামেলার মুখ থেকে নানান আজগুবি কিচিরমিচির শব্দ বেরচ্ছে।

ছোটকা কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজা খুলে একটি লোক ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই ছোটকা অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'প্রফেসর রায়না!'

ততক্ষণে দাড়িওয়ালা দ্বিতীয় একজন ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে। তাকে দেখে ছোটকা আরও অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'একী! প্রফেসর শ্যামমূর্তি!'

ঝালা-পালার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। এই বিজ্ঞানী দুজন এই পাতালপুরীতে এলেন কেমন করে? ঝামেলা তখন ফিশফিশ করে বলছে, 'এসব কী হচ্ছে? আমার নেড়া মস্তকে কিছুই ঢুকিতেছে না।' আর নিজের তেলা মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

প্রফেসর রায়না ও প্রফেসর শ্যামমূর্তি হাসিমুখে ছোটকার কাছে এগিয়ে

এলেন। অন্য তিনজন যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইল।

প্রফেসর রায়না বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই সিক্রেট ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্টের লোক। তা আমাদের দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?'

ছোটকার মুখে কোনও কথা ফুটল না। শুধু ব্লাস্টার বাগিয়ে ধরে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এবারে প্রফেসর শ্যামমূর্তি হেসে বললেন, 'ভয়ের কোনও কারণ নেই। ব্লাস্টারটা আপনি নামিয়ে রাখতে পারেন। জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন সব খুলে বলছি, আসুন, আমাদের সঙ্গে আসুন।'

রায়না ও শ্যামমূর্তি যে-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন সেই দরজার দিকেই এগিয়ে চললেন নিশ্চিন্ত পায়ে। কোনও ভয় নেই, আশংকা নেই, উত্তেজনা নেই। ঝালা-পালার যেন সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ঝামেলাও নিশ্চুপ।

ছোট দরজাটা পেরোতেই একটা ছোট ঘর। এখানেও হালকা সবুজ আলো। প্রফেসর রায়না ছোটকার দিকে ফিরে বললেন, 'এবারে আপনি আরও অবাক হবেন। দেখুন, সামনে কে বসে আছেন!'

কথাটা বলে রায়না সরে দাঁড়াতেই ওরা অবাক হয়ে দেখল ওদের সামনে বসে আছেন আদি ও অকৃত্রিম প্রফেসর অজয়েন্দ্র সেনশর্মা—নিধিরাম পাটকেল! ঝাঁটা গোঁফ চুমরে তিনি হাসছিলেন। ঝালা-পালাকে ছোটকার পিছনে দেখতে পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'বাপরে, কী ডানপিটে ছেলে! কোন দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে!...বলো দেখি, কোন ছড়া?'

ঝালা-পালা এতক্ষণে নির্ভয়ে হাসতে পারল। দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আবোল তাবোল'-এর ডানপিটে!'

'শাবাশ! এই নাও টফি!' বলে প্রফেসর নিধিরাম পকেট থেকে দুটো টফি বের করে এগিয়ে দিলেন চন্দ্র ও ইন্দ্রকে।

ওরা টফি নিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু আজ সকালেই আপনি এটা কোন ছড়া তা বলতে পারেননি!'

ঝামেলা নিজের লোহার হাতটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি যে জঙ্গলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এখানে এলেন কেমন করে?'

প্রশ্নের উত্তরটা শোনা গেল ওদের পিছন থেকে, 'অজ্ঞান উনি হননি, হয়েছিলাম আমি। আর ছড়ার নাম না বলতে পারাটাও আমারই দোষ।'

ছোটকা, ঝালা-পালা, ঝামেলা চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখে আর-একজন প্রফেসর নিধিরাম পাটকেল সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকজন অচেনা মানুষ। তাদের প্রত্যেকের হাতেই ব্লাস্টার গান।

ছোটকা প্রথমে ভীষণ অবাক হয়ে গেল, তারপর এগিয়ে গেল, ব্লাস্টার-হাতে একজন প্রৌঢ়ের দিকে। বলল, 'স্যার, আপনিও এসেছেন?'

ঝালা-পালা বুঝল, ইনি নির্ঘাত ছোটকার বড়সাহেব।

বড়সাহেব তখন দরাজ হেসে বললেন, 'এতবড় একটা অপারেশান, নিজে না এসে পারি?'

'কিন্তু স্যার, আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না!' ছোটকা দিশেহারা হয়ে বলল।

'প্রথমটা আমারও ঢোকেনি। কিন্তু ওঁকে গ্রেপ্তার করামাত্রই সব জানতে পারলাম। এ যেন রূপকথাকেও হার মানায়!'

বড়সাহেব দু-নম্বর প্রফেসর নিধিরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। বড়সাহেবের কথা শেষ হতে-না-হতেই দু-নম্বর নিধিরাম দু-হাত ঘাড়ের কাছে নিয়ে মাথা নীচু করে অনেক কসরত করে একটা মুখোশ ছাড়িয়ে নিল মুখ থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে তাজ্জব কাণ্ড!

কোথায় গেল প্রফেসর নিধিরামের চেহারা! কোথায় গেল তাঁর ঝাঁটা গোঁফ, কিংবা ঝুটো গোঁফ! যে-মানুষটা এখন ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে দেখতে অবিকল সাদা পোশাক পরা লোক তিন জনের মতো। অর্থাৎ, ওরা চারজন যেন একে অপরের ছবি!

ঝালা-পালা আর ছোটকার মুখের অবস্থা দেখে প্রফেসর রায়না হেসে বললেন, 'আসুন, সবাই মিলে আগে আয়েশ করে বসা যাক। তারপর সব আমি বুঝিয়ে বলছি।'

ছোট ঘরটাতেই সকলে এদিক-ওদিক জায়গা খুঁজে বসে পড়ল। শুধু ব্লাস্টার হাতে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রইল ঘরের দরজার কাছে। ঝালা-পালা গুটিসুটি মেরে ছোটকার গা ঘেঁষে। আর ঝামেলা তখন আসল প্রফেসর নিধিরামের গা টিপে-টিপে পরখ করছে। বাচ্চা রোবটটার কৌতূহল বড় বেশি!

প্রফেসর রায়না হুবহু একরকম দেখতে চারজন মানুষকে দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, এই চারজন হলেন প্ল্যানেট এক্স-এর বাসিন্দা। পৃথিবী থেকে বিশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে একটি গ্রহ। তার নাম আমরা দিয়েছি প্ল্যানেট এক্স। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এক্স গ্রহটির চেহারা-চরিত্র অবিকল আমাদের পৃথিবীর মতো। গাছপালা, প্রাণী, এমনকী মানুষের মতো বাসিন্দাও রয়েছে সেখানে। তবে সব বাসিন্দার চেহারাই হচ্ছে একরকম—ঠিক এই চারজনের মতো। কিন্তু প্রশ্ন হল, এক্স গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে কেমন করে এল, কেন এল! প্রথমেই বলে নিই, মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারে এক্স গ্রহ অনেক-অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের তুলনায়। অসীম মহাকাশের প্রায় কোনও জায়গাই ওদের কাছে আর দূর নয়। ফলে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছোনোটা ওদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা—।'

বড়সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'গত কয়েক বছরে পৃথিবীতে—বিশেষ করে

ভারতে—যে উড়ন্ত চাকির ঘনঘন দেখা পাওয়া গেছে—'

'হ্যাঁ, তার জন্যে আমরাই দায়ী—' প্ল্যানেট এক্স-এর বাসিন্দা দু-নম্বর নিধিরাম জবাব দিল।

'এক্স গ্রহের একটা বিরাট সমস্যা ছিল—' প্রফেসর রায়না আবার বলতে শুরু করলেন, 'মহাকাশ অভিযানে পটু হওয়া ছাড়া আবিষ্কারের অন্যান্য দিকগুলোতে কোনও উন্নতিই করতে পারেনি ওরা। যেমন, যানবাহন, খাদ্যশস্য, কল-কারখানা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস—সব বলতে গেলে অনেক বড় লিস্ট হয়ে যাবে। সুতরাং নিজেদের উন্নতি আর অগ্রগতির জন্য এক্স গ্রহের মানুষরা মহাকাশযানে চড়ে সারা মহাকাশ তন্নতন্ন করে খুঁজে চলল, যদি কোথাও কোনওরকমে সাহায্যের হদিশ পাওয়া যায়। এইভাবে খুঁজতে-খুঁজতে একদিন ওরা আমাদের পৃথিবী গ্রহকে খুঁজে পেল। অবাক হয়ে প্ল্যানেট এক্স-এর প্রাণীরা দেখল, আমাদের সঙ্গে ওদের কত মিল। তক্ষুনি ওরা ঠিক করল, অগ্রগতির ব্যাপারে সাহায্য আদায় করতে হবে পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই।

প্রফেসর শ্যামমূর্তি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। কালো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাকিটুকু আমিই বলি, প্রফেসর রায়না।'

একটু থেমে শ্যামমূর্তি সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'এক্স গ্রহের মানুষরা ঠিক করল তারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের চুরি করে নিয়ে যাবে তাদের গ্রহে। তারপর চুরি করা বিজ্ঞানীদের ওরা লাগিয়ে দেবে নানান গবেষণার কাজে। তখন ওরা যানবাহন, কল-কারখানা, খাদ্যশস্য—সবদিক দিয়েই এগিয়ে যাবে পৃথিবীর মতো। সুতরাং ওরা বিভিন্ন দেশের মাটির তলায় ঘাঁটি তৈরি করল। বছরের পর বছর ধরে লক্ষ করল পৃথিবীর মানুষের আচার-ব্যবহার। তাদের ভাষা শিখল, আদব-কায়দা শিখল। তারপর ছদ্মবেশে মাঝে-মাঝে মিশতেও লাগল মানুষের সঙ্গে। তারপর যেদিন তারা বুঝল সময় হয়েছে, তারা কিডন্যাপ করল প্রফেসর রায়নাকে। উদ্দেশ্য, তাঁকে জোর করে প্ল্যানেট এক্স-এ নিয়ে যাওয়া, নতুন-নতুন গবেষণা ও আবিষ্কার করতে বাধ্য করা। প্রফেসর রায়না ওদের অনেক বোঝালেন, তিনি উধাও হয়ে গেলে গোটা ভারতবর্ষের টনক নড়ে যাবে। সারা দেশে তোলপাড় শুরু হবে। হয়তো প্ল্যানেট এক্স-এর মানুষদের কয়েকটা ঘাঁটির সন্ধানও তারা বের করে ফেলবে। তখন সেই বিপদ ঠেকাতে ওদের একজন প্রফেসর রায়না সেজে চলে গেল তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করতে। অভিনয় সে ঠিকই করল—এই মুহূর্তেও হয়তো দু-নম্বর রায়না সেজে সে চলাফেরা করছে ব্যাঙ্গালোরে—কিন্তু গবেষণা বা আবিষ্কারের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ফলে দেশের মানুষ অবাক হয়ে ভাবল, রাতারাতি প্রফেসর রায়নার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। এরপর একই ঘটনা ঘটল আমার বেলায় এবং প্রফেসর সেনশর্মার বেলায়...।'

ছোটকার কাছে ক্রমশ ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছিল। পকেট থেকে সবুজ পাথরটা বের করে সে প্রফেসর শ্যামমূর্তিকে শুধোন, 'এটা দিয়ে কী কাজ করত ওরা?'

শ্যামমূর্তি বললেন, 'এক ঘাঁটি থেকে আর-এক ঘাঁটিতে যোগাযোগ রাখত এই অদ্ভুত ধরনের রেডিয়ো-আলট্রাসনিক ট্রান্সমিটার দিয়ে। এরকম ট্রান্সমিটার আগামী দুশো বছরেও আমরা তৈরি করতে পারব কি না সন্দেহ আছে। যাই হোক, এটা নিয়ে ছদ্মবেশী বিজ্ঞানীরাও ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, ঘাঁটির দরজা খোলা-বন্ধ করার সংকেত পাঠাত।'

ছোটকার বড়সাহেব ভারী গলায় কাশলেন, 'এবারে দু-নম্বর প্রফেসর সেনশর্মার কথাগুলো শোনা যাক।'

তখন প্ল্যানেট এক্স-এর চারটি প্রাণীর একজন মুখ খুলল, 'প্রফেসর সেনশর্মাকে গতকাল যখন আমরা জঙ্গল থেকে ধরে আনি তখন আমার পকেট থেকে একটা ট্রান্সমিটার পড়ে যায়। সেটা কুড়িয়ে পায় ওই যমজ ছেলে দুজন—।'

ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে সরু গলায় ফোড়ন কাটল, 'ওরা নয়, আমি পাইয়াছিলাম।'

নকল নিধিরাম সে-কথা যেন শুনতেই পেল না। সে বলে চলল, 'তারপর প্রফেসর সেনশর্মার কুকুরটাকে আমি মেরে ফেলতে বাধ্য হই। কাজের লোকটা আমাকে নকল বলে চিনতে না পারলেও কুকুরটার নজরকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। সেটাকে যখন বাগানে কবর দিচ্ছি তখন ওই ছেলে দুটো আমাকে দেখতে পায়—।'

'আমিও ছিলাম! তৎসহ আমিও ছিলাম!' ঝামেলা লাফাতে-লাফাতে দু-পা এগিয়ে এল সামনে।

নকল নিধিরাম তখন বলছে, 'আচমকা ওদের ছড়া শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। বিশেষ করে জেল আর ফাঁসি শব্দ দুটো শুনে। তা ছাড়া, সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' তো আমার মুখস্থ ছিল না! তবে কুকুরটাকে মেরে ফেলার জন্যে আমি সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত।' তারপর প্রফেসর সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রফেসর।'

প্রফেসর নিধিরাম হাসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

বড়সাহেব চারপাশে নজর বুলিয়ে ব্লাস্টারটা বাঁ-হাতের তালুতে বারকয়েক ঠুকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আর কী, এবারে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হোক। এখুনি ব্যাঙ্গালোর আর বম্বেতে ওয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। নকল রায়না আর নকল শ্যামমূর্তিকে গ্রেপ্তার করে যেন হেড অফিসে চালান দেওয়া হয়।'

ছোটকা আর ঝালা-পালাও ঘাড় নেড়ে সে-কথায় সায় দিচ্ছিল, কিন্তু ওরা অবাক হয়ে গেল প্রফেসর রায়নার কথা শুনে। তিনি বড়সাহেবকে বললেন, 'তার

বোধহয় আর দরকার পড়বে না।'

সবার চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল। প্ল্যানেট এক্স-এর চার বাসিন্দা সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রফেসর রায়না বললেন, 'প্রথমত, কিডন্যাপ করার সময়টুকু ছাড়া এরা আমাদের বেশ রাজার হালেই রেখেছে। গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি। তা ছাড়া, বহুদিনের চেষ্টায় আজই আমি ওদের রাজি করাতে পেরেছি আমার প্রস্তাবে। ওদের বুঝিয়ে বলেছি, জোর-জবরদস্তি করে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আবিষ্কার আদায় করা যায় না। তার চেয়ে বরং সরকারি চুক্তি করে বিজ্ঞানী ধার করা ভালো। আমরা প্ল্যানেট এক্স-এ গিয়ে ওদের শিখিয়ে দেব আমাদের নানান প্রযুক্তিবিদ্যা। আর বিনিময়ে ওরাও এখানে থেকে পৃথিবীর মানুষদের উপহার দেবে ওদের আধুনিক মহাকাশ অভিযানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কলাকৌশল। ওরা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওদের সমস্ত ঘাঁটিতে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছে। সুখের কথা, তারা রাজিও হয়েছে। '

ছোটকা বলল, 'এত সহজে রাজি হয়ে গেল?'

উত্তরটা দিল নকল নিধিরাম, 'রাজি না হয়ে উপায় কী! এতদিনে আমরা প্রফেসর রায়নার কাছ থেকে একটিও আবিষ্কার আদায় করতে পারিনি।' একটু হেসে সে বলল, 'এই বরং ভালো হল। প্ল্যানেট এক্স-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল প্ল্যানেট আর্থ-এর। আশা করি এ-বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাকবে!'

তারপর সে বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিফ, এ-বন্ধুত্বে আপনার আপত্তি নেই তো? নাকি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন?'

বড়সাহেব ভরাট গলায় হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করব, তবে বন্ধুত্বের হাতকড়া দিয়ে।' বলে তিনি হ্যান্ডশেক করলেন নকল নিধিরামের সঙ্গে।

তারপরই শুরু হয়ে গেল মিলন উৎসব। সবক'টা মানুষ একসঙ্গে খুশিতে মেতে উঠল। কেউ-কেউ গান ধরল হেঁড়ে গলায়। প্রফেসর নিধিরাম গলা ফাটিয়ে গোটা 'আবোল-তাবোল'টাই আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। ছোটকা ঝালা-পালাকে একসঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে হইহই করে নাচতে লাগল।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ঝামেলাও তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে শুরু করল। ওর কপালের লাল-নীল হলদে আলোগুলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে-নিবছে। আর একই সঙ্গে বাচ্চা রোবটটা ওর মিহি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'



টিরা গ্রহের ভয়ঙ্কর

এক ঃ প্রথম দুর্ঘটনা

অন্ধকার মহাকাশে মিটমিট করে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। যেন দেওয়ালির উৎসব শুরু হয়েছে চারিদিকে। মহাকাশযান 'সোলার' ছুটে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। লক্ষ্য পৃথিবীর কক্ষপথ। সুদীর্ঘ অভিযান শেষ করে সোলার ঘরে ফিরে চলেছে।

অশোক চিরিমার নেভিগেশান প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। মুখ-চোখ ফ্যাকাশে। মহাকাশ-মানচিত্র খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে ও। হঠাৎই ওর গোটা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শরীরে কেমন একটা অস্বস্তি। বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠছে।

ঠিক তখনই লম্বা-চওড়া চেহারার আর-একজন মানুষ নেভিগেশান রুমের খাটো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। অশোক চিরিমারের পিঠে আলতো থাপ্পড় মেরে হেসে বলল, 'যাক, শেষপর্যন্ত তাহলে বাড়ি ফেরা হচ্ছে! ওই কাঠখোট্টা রুক্ষ গ্রহে দু-মাস কাটিয়ে আমার মেজাজটাই কাঠখোট্টা হয়ে যাচ্ছিল।'

কথা বলতে-বলতে নেভিগেশান প্যানেলের টিভি-পরদায় চোখ রাখল ধনপত রাই। পরদায় একটা উজ্জ্বল লাল ফুটকি। পৃথিবী! সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে

পুরু প্লাস্টিকের স্বচ্ছ আবরণ দেওয়া জানলার দিকে তাকাল ধনপত রাই। অন্ধকার মহাকাশে অসংখ্য তারার ফুটকি জ্বলছে।

'ঘরে ফেরার এত আনন্দ জানতাম না।' ধনপত রাই বলল। তারপর অশোকের পাশে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল, 'চিরিমার, তোমার আনন্দ হচ্ছে না?'

অশোক ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ধনপতের দিকে দেখল ঃ 'আনন্দ হচ্ছে—তবে শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে—।'

সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঝটকা মেরে উঠল অশোকের শরীর। চোখ বিস্ফারিত। ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে। ও ঝুঁকে পড়ল নেভিগেশান প্যানেলের ওপরে।

ধনপত রাই ওকে চেপে ধরল দু-হাতে। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'চিরিমার, কী হয়েছে! শরীর কেমন লাগছে?'

অতিকষ্টে ফিশফিশ করে জবাব দিল অশোক, 'রাই, শিগগির ডক্টর শ্রীবাস্তবকে খবর দাও। আমার বুকের ভেতরে খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শিগগির—।'

আবার ঝাঁকুনি খেল অশোকের দেহ। প্যানেলের ওপরে ওর হাতের বাঁধন শিথিল হল। অশোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল নেভিগেশান রুমের মেঝেতে।

ধনপত রাই তৎপর ভঙ্গিতে ওকে ধরতে চেষ্টা করল। চিত করে শুইয়ে দিল। জরুরি স্বরে বলল, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই, চিরিমার, এক্ষুনি ডক্টর শ্রীবাস্তবকে খবর দিচ্ছি।'

কিন্তু ততক্ষণে অশোক চিরিমারের দেহ যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। কাশির দমকে মুখ লাল, দম আটকে চোখজোড়া ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখের রং নীল। তীব্র আক্ষেপে শরীরটা ঝাঁকুনি খেতে-খেতে হঠাৎই স্থির হয়ে গেল। সব শেষ।

ধনপত রাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল নেভিগেশান প্যানেলের শেষ প্রান্তে। এক ঝটকায় তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। দ্রুত হাতে ডায়াল ঘুরিয়ে ব্যস্ত গলায় বলে উঠল, 'সেন্ট্রাল কন্ট্রোল? নেভিগেশান রুম থেকে বলছি! শিগগিরই ডক্টর শ্রীবাস্তবকে এখানে পাঠিয়ে দিন। মনে হচ্ছে...।'

'কী মনে হচ্ছে?' ও-প্রান্ত থেকে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন ভেসে এল।

'মনে হচ্ছে...' মেঝেতে পড়ে থাকা নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে ভয়ার্তভাবে একবার দেখল ধনপত রাই। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে নেভিগেশান রুম সুপারভাইজার অশোক চিরিমার এইমাত্র মারা গেছে।'

দুই ঃ সন্দেহের সূত্রপাত

নিউম্যাটিক রিল্যাক্সার-এ আধশোয়া ভঙ্গিতে বসেছিলেন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব। পলিথিনের ব্যাগে বাতাস ঠেসে তৈরি বিচিত্র এই নিউম্যাটিক রিল্যাক্সার—আধুনিক

আরামকেদারা। হেলান দিয়ে বসলেই চোখে ঘুমের আমেজ জড়িয়ে আসে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ডক্টর শ্রীবাস্তবের চোখে ঘুমের আমেজ নেই, বরং দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে আছে। সামনে পা ছড়িয়ে থমথমে মুখে তিনি তাকিয়ে আছেন অবজারভেশান পোর্টের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে বাইরের অন্ধকারের দিকে। অভিব্যক্তিহীন শূন্য দৃষ্টি। মাথার চুল এলোমেলো। ডান হাতের সরু-সরু আঙুলের ফাঁকে ধরা একগোছা কাগজ। সোলার মহাকাশযানে উপস্থিত একাশি জন অভিযাত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট। একটু আগেই কম্পিউটার রুম থেকে রিপোর্টগুলো তাঁর হাতে এসেছে। রিপোর্টগুলো দেখার পরই ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, একা লাগছে, আর ভয় করছে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার অগোছালো চুলে হাত চালিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর দশাসই লম্বা কাঠামো সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। শক্ত চোয়ালের ওপর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সরু গোঁফ। মাথার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে কপাল অনেকটা বড়। কপালে একটা নীল শিরা দপদপ করছে। দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ইশারা।

ডক্টর শ্রীবাস্তব ধীরে-ধীরে কথা বলেন, মার্জিত তাঁর আচরণ, সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেন, সবসময় সকলের শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজখবর করেন, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ না হলেও তিনি পরিশ্রমী, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন। হয়তো এই কারণেই 'টিরা' গ্রহের দীর্ঘ অভিযানে বিশজন চিকিৎসকের মধ্যে থেকে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্বজ্ঞানের জন্য সঙ্গী অভিযাত্রীরা তাঁকে ঠাট্টাও করে। বলে, 'ডক্টর, আপনি বড় বেশি ডাক্তারি করেন।'

ডক্টর শ্রীবাস্তব হেসে উড়িয়ে দেন সে-কথা। তিনি জানেন, এইসব গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সাবধান হওয়াটা কত জরুরি। আর সাবধান ছিলেন বলেই না মেডিক্যাল রিপোর্টের মারাত্মক গরমিলটা তাঁর নজরে পড়েছে। এর আগে তিন-তিনটে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে মেডিক্যাল চেকআপে ঢিলেমির জন্যে পৃথিবীতে ফিরে আসা মহাকাশযানে গ্রহান্তরের মারাত্মক জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

টিরা গ্রহের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ বললে অনেক কমই বলা হয়। সৌরজগৎ থেকে ৮.২৬ আলোকবর্ষ দূরের তারা ম্যাক্সিমা সেন্টরি। আধুনিকতম মহাকাশযান সোলার হাইপারস্পেসের মধ্যে দিয়ে স্পেস জাম্প করে অনেক কম সময়ে অতিক্রম করেছে ৮.২৬ আলোকবর্ষের সুবিশাল দূরত্ব। পৃথিবীর অভিযাত্রী দল সেখানে পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দু-মাস সময় কাটিয়েছে। তন্নতন্ন করে অভিযান চালিয়েছে টিরা গ্রহের রুক্ষ জমিতে। কিন্তু সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়েছে। টিরা সম্পর্কে মানুষের এত আশা ছিল, এত উত্তেজনা ছিল, অথচ শেষপর্যন্ত নিট ফল হল শূন্য। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত শুধুই হতাশা। এই অভিযানের ফলাফলে কোনও কৃতিত্ব নেই, কোনও যশ নেই, কোনও আবিষ্কার নেই, কিচ্ছু নেই।

অন্তত একঘণ্টা পর্যন্ত ফলাফল সেইরকমই ছিল। কারণ তখনও মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো মোহন শ্রীবাস্তবের হাতে আসেনি, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। কিন্তু রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে স্টাডি করার পর অবয়বহীন বিকৃত এক আতঙ্ক জমাট বেঁধেছে ডক্টর শ্রীবাস্তবের মনে।

পায়চারি থামিয়ে বাইরে করিডরে এলেন। আঁধারি করিডরের শেষে ক্যাপ্টেন মিত্রের কেবিন। কেবিনের খাটো দরজার ওপরেই একটা ছোট্ট আলো জ্বলছে। ক্যাপ্টেন মিত্র ঘরেই আছেন তা হলে! দৃঢ় পায়ে সেদিকে এগোলেন ডক্টর। কলিংবেলে চাপ দিলেন। ক্যাপ্টেন কি বিশ্বাস করবেন তাঁর কথা? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আর কোনও পথ খোলা নেই মোহন শ্রীবাস্তবের সামনে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন নীতীশ মিত্র ঘুরে তাকালেন। হেসে বললেন, 'আসুন ডক্টর, কী খবর বলুন—।'

মোহন শ্রীবাস্তব ক্যাপ্টেনের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনের পাশে একটা রিল্যাক্সার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'খবর খারাপ, ক্যাপ্টেন। একটা বিপদের আঁচ পেয়েছি আমি—।'

'বিপদ! কীসের বিপদ?' হালকা মেজাজে হাসলেন নীতীশ মিত্র, 'এই নিষ্ফলা অভিযানে বিপদটা আসবে কোত্থেকে?'

'তা জানি না, তবে এসেছে।' গম্ভীরভাবে বললেন শ্রীবাস্তব, 'আমাদের মহাকাশযানে একজন বিচিত্র মানুষ রয়েছে, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেন মিত্রের হালকা হাসি মিলিয়ে গেল ঃ 'বিচিত্র মানুষ!'

'বিচিত্র শুধু নয়, অবিশ্বাস্য। মানুষটা দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, সুস্থ, জোয়ান—অথচ তার মরে যাওয়ার কথা।'

'মরে যাওয়ার কথা!' অবাক বিস্ময়ে ডক্টর শ্রীবাস্তবকে দেখলেন ক্যাপ্টেন, 'আপনি একজন ডাক্তার হয়ে এসব কী বলছেন!'

মেডিক্যাল রিপোর্টের কম্পিউটার আউটপুটগুলো ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিলেন মোহন শ্রীবাস্তব ঃ 'এই মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো একবার দেখুন। আপনি তো জানেন, টিরা থেকে রওনা হওয়ার পরদিনই আমি প্রত্যেকের থরো মেডিক্যাল চেকআপের নির্দেশ দিয়েছিলাম। তাতে সোলার-এর একাশি জন যাত্রীর প্রত্যেককে মেডিক্যাল বোর্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছে—আপনি আমি কেউই বাদ যাইনি। কোনও অভিযান থেকে ফেরার পর এটাই সাধারণ নিয়ম—অভিযাত্রী দলের কেউ যে কোনও জীবাণু বা অন্য কিছু থেকে ইনফেক্টেড হয়নি সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যেই এত নিয়ম-কানুন।' একটু থেমে ডক্টর শ্রীবাস্তব যোগ করলেন, 'মেডিক্যাল চেকআপের যে-রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা ভারি অদ্ভুত—।'

ক্যাপ্টেন মিত্র একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের রেখা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল।

ডক্টর বলে চললেন, 'একাশি জনের মধ্যে আশি জনের কোনও গোলমাল নেই। তারা সসম্মানে পাশ করেছে পরীক্ষায়। কিন্তু একজন—' কথা থামিয়ে সেই বিশেষ রিপোর্টটি বের করলেন তিনি ঃ 'এ-মানুষটির সবকিছুই স্বাভাবিক—ব্লাড কাউন্ট, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, অ্যালবুমিন—গ্লোবিউলিন রেশন, সবকিছু। কিন্তু ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে আমরা হোঁচট খেলাম—' সামনে পা ছড়িয়ে দিলেন ডক্টর। মেঝের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে নীতীশ মিত্রের চোখে সরাসরি চোখ রেখে বললেন, 'এই লোকটার বডিতে ব্লাড সুগারের কোনও নামগন্ধ নেই! ব্লাড সুগার জিরো।'

ক্যাপ্টেন মিত্রের মুখ কঠিন হল, চোখ বিস্ফারিত অবিশ্বাসে ঃ 'কী বলছেন, ডক্টর! আমি ডাক্তার নই, তবে আমিও জানি যে ব্লাড সুগার ছাড়া কোনও মানুষ—।'

'বাঁচতে পারে না।' ক্যাপ্টেনের কথা কেড়ে নিয়ে শেষ করলেন শ্রীবাস্তব। তারপর মাথা নাড়লেন সম্মতি জানিয়ে ঃ 'ঠিকই বলেছেন আপনি। তবে এখানেই শেষ নয়—আরও আছে। ব্লাড সুগারের কোনও হদিস না পেয়ে আমরা ব্লাড ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে দেখলাম। ক্রিয়েটিনিন তৈরি হয় শরীরের প্রোটিন ভেঙে। কিডনি এটাকে চটপট ছেঁকে বের করে দেয় রক্ত থেকে, আর ক্রিয়েটিনিন শরীর থেকে বেরিয়ে আসে ইউরিনের সঙ্গে। ক্রিয়েটিনিন ছেঁকে রক্ত থেকে বের করে না দিতে পারলে বিপদ নেমে আসে খুব তাড়াতাড়ি। একশো সিসি রক্তে সাধারণত ক্রিয়েটিনিন থাকে এক থেকে চার মিলিগ্রাম। এর পরিমাণ দশ মিলিগ্রামের ওপরে গেলেই রোগীর পক্ষে তা মারাত্মক। কখনও যদি এটা কুড়ি-পঁচিশের ওপরে চলে যায় তা হলে ডায়ালিসিস ছাড়া রোগীকে বাঁচানো অসম্ভব। ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু কুড়ি-পঁচিশের কাছাকাছি নিয়ে কোনও মানুষ সুস্থভাবে হাঁটা-চলা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকতেই পারে না। অথচ—' এক মুহূর্ত থামলেন মোহন শ্রীবাস্তব। কপালের কাল্পনিক ঘাম মুছলেন ঃ 'পরীক্ষায় এই লোকটার ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু বেরিয়েছে একশো পঁয়তিরিশ!'

অপলকে ডক্টর শ্রীবাস্তবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন মিত্র। তারপর মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো নিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন। চুপচাপ সেগুলো উলটেপালটে দেখতে থাকলেন।

দেখা শেষ হলে অনেকটা আপনমনেই বললেন, 'স্যাম্পল নেওয়ার সময় যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে...অথবা ল্যাবরেটরির টেস্টে যদি কোনও বাজে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে...।' আচমকা মুখ তুলে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকালেন। বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, '...তা ছাড়া, কম্পিউটারও তো ক্যালকুলেশনে ভুল করতে পারে—মানে, প্রোগ্রামে যদি কোনও গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকে।'

মোহন শ্রীবাস্তব হেসে ফেললেন : 'ক্যাপ্টেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনার সন্দেহগুলো আপনার নিজের কানেই বেসুরো ঠেকছে। তবুও বলি, না, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম কোনও গোলমাল হয়নি। আমার মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ওই বিচিত্র মানুষটির ব্লাড সুগার ও ক্রিয়েটিনিন ভ্যালু পাওয়ার পর আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে হাসিমুখে ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির। সুস্থ-সবল চেহারা, অসুস্থতার ছায়া পর্যন্ত নেই। আমি আবার তার শরীর থেকে রক্ত নিলাম। তারপর অ্যানালিসিস করলাম আমি নিজেই। দ্বিতীয়বারে যে-রিপোর্ট পেলাম তাতে আবার দুশ্চিন্তা কমে না গিয়ে উলটে বেড়ে গেল। কারণ দ্বিতীয়বারের রক্ত একেবারে স্বাভাবিক—' হাত বাড়িয়ে একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব, 'এই যে, দু-বারের রিপোর্টই এতে আছে।'

ক্যাপ্টেনের আঙুল কেঁপে উঠল। অস্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, 'কোনও মানুষের রক্তের কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি এভাবে নিজে থেকে পালটে যেতে পারে—এরকম আচমকা?'

'না, পারে না। কাকতালীয়, দুর্ঘটনা, যা-ই বলুন না কেন, কোনওমতেই এটা সম্ভব নয়। অথচ এক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। দু-বার রক্ত নেওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র কুড়ি ঘণ্টা। না, স্যাম্পল ওলটপালট হয়নি। কারণ প্রত্যেক স্যাম্পল-এর সঙ্গে ছিল নির্দিষ্ট নম্বর এবং যার স্যাম্পল তার আঙুলের ছাপ। আমরা সেগুলো চেক করে দেখেছি। একই লোকের শিরা থেকে দুটো ব্লাড স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে।'

টেবিলে রাখা ইন্টারকম টেলিফোন বেজে উঠল। নীতীশ মিত্র রিসিভার তুললেন। ও-প্রান্তের ধাতব স্বর ব্যস্তভাবে কী সব বলল। নীতীশ জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, এক্ষুনি যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঝটিতি ঘুরলেন ডক্টরের দিকে : 'ডক্টর শ্রীবাস্তব, নেভিগেশান রুমে আরও বড় বিপদ হয়েছে। সুপারভাইজার অশোক চিরিমার এইমাত্র মারা গেছে!'

তিন : ভয়ঙ্করের সূচনা

মানুষটার দেহে প্রাণ নেই।

মোহন শ্রীবাস্তব মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধনপত রাইয়ের বাহুতে হাত রেখে বললেন, 'ধনপত, তোমার কিছু করার ছিল না। তুমি ফোনে খবর দেওয়ার আগেই অশোক

মারা গেছে।'

দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান ধনপতের চুল উসকোখুসকো, চোখ লালচে, ডানহাত মুঠো, করছে আর খুলছে। রুদ্ধস্বরে ধনপত বলল, 'আজ সকালবেলা ওকে দারুণ মেজাজে দেখেছি। সারাদিন ধরে আমার সঙ্গে কাজ করেছে, একটিবারের জন্যেও মনে হয়নি ও অসুস্থ। হঠাৎই কী করে যে এমনটা হল...!'

দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, ডক্টর?'

ইশারায় ধনপতকে নেভিগেশান রুমের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি। বললেন, 'অশোক চিরিমারের ব্লাড টেস্ট না করে আমি কিছু বলতে চাই না।'

দুজনেই চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। চোখে-চোখে অনেক কথাই যেন হয়ে গেল। অবশেষে ডাক্তারি ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করলেন শ্রীবাস্তব। অ্যালকোহল দিয়ে সিরিঞ্জ পরিষ্কার করে ঝুঁকে পড়লেন অশোকের মৃতদেহের ওপর।

ক্যাপ্টেন মিত্র দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। শ্রীবাস্তবের চোয়ালের রেখা কঠিন। সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ এঁকে দিয়েছে কেউ।

কাজ শেষ করে মোহন শ্রীবাস্তব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন 'ক্যাপ্টেন, দশ মিনিটের মধ্যে টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে আমি আপনার ঘরে হাজির হচ্ছি।'

দুজনেই বেরিয়ে এলেন নেভিগেশান রুমের বাইরে। ধনপত করিডরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'রাই, এখন থেকে তুমি হলে নেভিগেশান রুম সুপারভাইজার।'

'থ্যাঙ্ক য়ু, ক্যাপ্টেন।' ধনপত কাছে এগিয়ে এল।

'উইশ য়ু লাক।' একটু থেমে আবার বললেন নীতীশ, 'চিরিমারের বডিটা ''সাব জিরো'' রুমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। তুমি একটু হেল্প কোরো।'

'ওকে ক্যাপ্টেন।' ধনপত রাই নেভিগেশান রুমে ঢুকে পড়ল।

আবছায়া করিডর ধরে ওঁরা দুজনে ফিরে চললেন। মোহন শ্রীবাস্তবের মুখে নতুন আশঙ্কার ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পনেরো মিনিট পরে ক্যাপ্টেনের ঘরে আশঙ্কা পরিণত হল আতঙ্কে।

'ব্লাড সুগার জিরো, ক্রিয়েটিনিন লেভেল একশো তিরিশের বেশি, আর এন পি এন একশো পঞ্চাশ!' অবসন্ন সুরে উচ্চারণ করলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব, 'অশোক চিরিমারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।'

'এন পি এন...' ক্যাপ্টেন একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

'নন-প্রোটিনাস নাইট্রোজেন। ক্রিয়েটিনিনের সঙ্গেই তৈরি হয়। নরমাল লেভেল প্রতি একশো সি সি রক্তে আট থেকে দশ মিলিগ্রাম। ক্রিয়েটিনিন বাড়লে এন পি এন-ও বাড়ে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এন পি এন-টাও চেক

করেছি. কিন্তু বুঝতে পারছি না...।'

ডক্টরকে বাধা দিয়ে নীতীশ মিত্র বলে উঠলেন, 'তা হলে অশোক চিরিমারই সেই বিচিত্র মানুষ! কিন্তু আপনি না বললেন তার রক্ত আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে?'

শ্রীবাস্তব দু-হাতের আঙুলে জট পাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেটাই তো অবাক কাণ্ড, ক্যাপ্টেন! আমি যার কথা বলেছিলাম সে অশোক চিরিমার নয়।'

নীতীশ মিত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে অস্ফুটে বললেন, 'অশোক চিরিমার নয়!...তা হলে কে সে?'

'কমল সেনগুপ্ত। প্রেসার চেম্বারের মেইনটিনান্সে আছে। চিরিমারের রিপোর্ট এর আগে পুরোপুরি নরমাল ছিল।'

'ডক্টর, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমাদের স্টেরিলাইজেশানকে ফাঁকি দিয়েকোনও জীবাণু হয়তো পৃথিবী থেকেই ঢুকে পড়েছে মহাকাশযানের ভেতরে—।'

'অসম্ভব! অবাস্তব!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন ডক্টর, রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ঃ 'মহাকাশযান থেকে টিরার মাটিতে পা দেওয়ার আগে প্রত্যেকটি অভিযাত্রীর মেডিক্যাল চেকআপ করা হয়েছে। তখন কোনও গোলমাল ধরা পড়েনি। পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে টিরার মিল থাকায় কোনওরকম স্পেস স্যুট ছাড়াই আমাদের লোকজন টিরা গ্রহের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে। দু-মাস ধরে তারা নানা অভিযান চালিয়েছে। তারপর যখন তারা মহাকাশযানে ফিরে আসে তখন ডিসইনফেক্ট করার জন্য প্রত্যেককে আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশানের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় সোলার-এর ভেতরে। তখন তো রোগজীবাণুর হদিস আমরা পাইনি! দু-মাসেও কারও কোনও রোগ হয়নি, অথচ এখন হঠাৎ—' ক্যাপ্টেনের খুব কাছে মুখ এনে শ্রীবাস্তব প্রশ্ন করলেন, 'এটাকে আপনার কি কোনও রোগ বলে মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন?'

নীতীশ সামান্য শিউরে উঠলেন। বাতানুকূল পরিবেশে তাঁর শীত-শীত করতে লাগল। তিনি চেষ্টা করে যুক্তি খুঁজে পেতে চাইলেন ঃ 'ডক্টর—বহু স্পেসশিপকে আমি রোগের কবলে পড়তে দেখেছি। যেমন গত মাসে টাইটান উপগ্রহ থেকে যে স্পেসশিপটা ফিরে আসে তাতে প্লেগ-এর মারাত্মক জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। কোনও উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত মহাকাশযানটিকে জ্বালিয়ে দিতে হয়। ওই জীবাণু প্রতিটি যাত্রীর ফুসফুস অ্যাটাক করেছিল—এবং মাত্র ছ'ঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মহাকাশযানে। অতএব, আবারও ভেবে দেখুন, ডক্টর—।'

মোহন শ্রীবাস্তব কোনও কথাই শুনছিলেন না। চোখ বন্ধ করে রিল্যাক্সারে

হেলান দিয়ে কী একটা বিষয় মনে করার চেষ্টা করছিলেন। খুব কাছাকাছি এসেও ব্যাপারটা তাঁর মনের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অশোক...অশোক চিরিমার..অশোক চিরিমার...মনে পড়েছে!

রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তব। লম্বা কাঠামো ঋজু করে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন দেওয়ালে আঁটা একটা ক্যাবিনেটের দিকে। মহাকাশযানের যাবতীয় মেডিক্যাল রিপোর্ট থাকে ক্যাপ্টেনের ঘরে, এই ক্যাবিনেটে।

'উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশান, ক্যাপ্টেন—' বলে ক্যাবিনেট খুললেন। নতুন-পুরোনো নানা কম্পিউটার প্রিন্টআউট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। কতকগুলো রিপোর্ট বেছে নিয়ে সেগুলো মিলিয়ে দেখলেন। বারবার চেক করলেন। তারপর থমথমে কালো মুখে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি জিতেছি, ক্যাপ্টেন—তবে না জিতলেই বোধহয় ভালো হত...।'

নীতীশ মিত্র অবাক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন শ্রীবাস্তবের দিকে।

রিপোর্টগুলো আবার ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে রেখে মোহন শ্রীবাস্তব ক্যাপ্টেনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'অশোক চিরিমার একবারের জন্যেও টিরার বুকে পা দেয়নি! গত দু-মাসের ওপর ও সোলারের সিক রুমে ছিল। টিরা থেকে রওনা হওয়ার দুদিন পরে ও সেরে ওঠে। গতকাল ওকে আমি লাস্ট ইঞ্জেকশান দিয়েছি। অর্থাৎ, যখন আমরা সবাই টিরার জমি চষে বেড়াচ্ছি তখন ও ছিল বিছানাবন্দি। ওর ইনফেক্শাস মনোনিউক্লিওসিস হয়েছিল। একবারের জন্যেও অশোক চিরিমার মহাকাশযান ছেড়ে মাটিতে নামেনি।'

ক্যাপ্টেন মিত্রের চোখে-মুখে দিশেহারা উৎকণ্ঠা। পরাজিত কোণঠাসা মানুষের মতো নিরুপায় সুরে তিনি বললেন, 'এসবের কারণ কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, ডক্টর!'

রিল্যাক্সারে আবার বসলেন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, 'মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি। টিরা গ্রহের কোনও অদ্ভুত অজ্ঞাত প্রাণী আমাদের কয়েকজন অভিযাত্রীর দেহে ঢুকে পড়েছে!'

চার ঃ অনুমান, আলোচনা, সিদ্ধান্ত

অতিকায় মহাকাশযান সোলার ছুটে চলেছে মহাশূন্যের শরীর ভেদ করে। পৃথিবীর হিসেবমতো চতুর্থ রাত শুরু হয়েছে। পঞ্চম দিনের শুরুতেই সোলার স্পেস জাম্প দেবে হাইপারস্পেসের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং মহাকাশযান পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ সাময়িকভাবে শেষ করে নীতিশ মিত্র এসেছেন শ্রীবাস্তবের কেবিনে।

দুজনের আলোচনা চলছিল। একসময় আলোচনায় ছেদ টেনে কফি তৈরি

করতে উঠলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। কেবিনের একপাশে টেবিলে বসানো মাইক্রোওয়েভ কুকারে কফি তৈরি করে কাপে ঢাললেন। একটা কাপ এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের দিকে, অন্যটায় নিজে চুমুক দিলেন।

ক্যাপ্টেন মিত্র পায়চারি করছিলেন। কফির কাপ নিয়ে একটা রিল্যাক্সারে শরীর এলিয়ে বসলেন। তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ।

মোহন শ্রীবাস্তব নরম সুরে বললেন, 'কুল ডাউন, ক্যাপ্টেন, উত্তেজিত হবেন না।'

কফিতে চুমুক দিয়ে নীতীশ মিত্র জবাব দিলেন, 'উত্তেজিত না হয়ে উপায় কী! এই মহাকাশযানের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব আমার—আমি এই স্পেসশিপের ক্যাপ্টেন। এমনিতেই আমাদের টিরা অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দেশের মানুষের কোটি-কোটি টাকা খরচ করে শূন্য হাতে আমি ঘরে ফিরছি। টিরাতে কোনওরকম প্রাণের সন্ধান আমরা পাইনি, কোনও উদ্ভিদ সেখানে নেই, দামি খনিজ পদার্থের টিকিও দেখা যায়নি। তবুও আমরা প্রাণপণ খেটেছি। স্যাম্পল নিয়েছি পাথরের, মাটির, বাতাসের। ফটো তুলেছি, রিপোর্ট লিখেছি, তারপর কাগজপত্র গুটিয়ে রওনা হয়েছি বাড়ির দিকে। এ যেন পরীক্ষায় ফেল করে মার্কশিট হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরার মতো।...আর এখন, বাড়ি ফেরার পথে রওনা হওয়ার তিনদিন পর আপনি আমাকে ভয়ঙ্কর কথাগুলো শোনালেন। টিরার অদ্ভুত অজ্ঞাত প্রাণী!' কফির কাপ টেবিলে নামিয়ে গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললেন, 'বিশ্বাস হতে চায় না, অথচ অশোক চিরিমার যে মারা গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই বিচিত্র মেডিক্যাল রিপোর্টগুলোকেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না!'

রিল্যাক্সার টেনে নিয়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি বসলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব ঃ 'ক্যাপ্টেন, একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। অশোক চিরিমার আর কমল সেনগুপ্তের শরীরে যে-অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেছে তা কোনও মানুষের শরীরে হওয়া অসম্ভব। আমাদের বডির মেটাবলিজম্ নানান অবস্থার মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু কতকগুলো জিনিস আছে যা হিউম্যান মেটাবলিজম্-এর পক্ষে অসম্ভব ঃ যেমন, জিরো ব্লাড শুগার, একশো তিরিশের ওপর ক্রিয়েটিনিন আর এন পি এন ভ্যালু, অথচ মানুষটা বেঁচে আছে!'

'হতে তো পারে টিরা গ্রহের কোনও-কোনও রোগজীবাণু—।'

'না, হতে পারে না!' এক ঝটকায় মোহন শ্রীবাস্তব সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কফি চলকে পড়ল তাঁর হাতে ধরা কাপ থেকে ঃ 'কতবার একই কথা আপনাকে বলতে হবে, ক্যাপ্টেন? এটা নতুন কোনও রোগজীবাণুর ব্যাপার নয়, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা ঘটনা। হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেমে এ-ধরনের ঘটনা কোনওদিন ঘটতে পারে না, পারে না, পারে না!'

নীতীশ মিত্রের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কফির কাপ টেবিলে রেখে আবার

রিল্যাক্সারে বসলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর হাত কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে কপালের নীল শিরা।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইলেন। তারপর ইতস্তত করে নীচু গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, 'টিরা গ্রহে কোনও প্রাণের সন্ধান তো আমরা পাইনি, ডক্টর।'

'না, পাইনি। আর কেন পাইনি তারও একটা ব্যাখ্যা আমি অনুমানে খাড়া করেছি।' ডক্টর শ্রীবাস্তব সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঃ 'টিরাকে আমরা যেরকম প্রাণহীন ভেবেছি সেরকম যদি না হয়, ক্যাপ্টেন? হ্যাঁ, আপনি হয়তো বলবেন পাগলের কল্পনা, কিন্তু তবুও ধরে নিন টিরা গ্রহে প্রাণ ছিল—চালাক, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল এবং শক্তিশালী প্রাণ। আমরা যখন টিরা গ্রহে নেমেছি তখন ওরা হয়তো তৈরি ছিল—হয়তো ওরা আগে থেকেই টের পেয়েছিল আমরা টিরায় ল্যান্ড করতে চলেছি। তারপর থেকে সর্বক্ষণ ওরা আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযান, খোঁজাখুঁজি যখন চলছিল তখন ওরা সবসময়েই ছিল আমাদের সঙ্গে, তবে অলক্ষ্যে, গোপনে। হয়তো ওরা আমাদের দেখা দিতে চায়নি, অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল ওদের। যদি এমন হয়, টিরার যেসব অংশে আমরা অভিযান চালিয়েছি সেগুলো আমাদের জন্যে আগেভাবেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। ওরাই তৈরি করে রেখেছিল যাতে আমরা কিছু দেখতে না পাই, কিছু খুঁজে না পাই, কিছু জানতে না পারি টিরা সম্পর্কে, এবং ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে ফিরে যাই পৃথিবীতে—যেমন খালি হাতে আমরা রওনা হয়েছিলাম পৃথিবী থেকে।'

সামনে ঝুঁকে এলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। দু-হাত নেড়ে জোর দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন ঃ 'এবারে তর্কের খাতিরে ধরে নিন, টিরার প্রাণীদের আমাদের মতো নির্দিষ্ট কোনও চেহারা নেই। হয়তো ওরা নিছকই এক ধরনের জেলির মতো প্রোটোপ্লাজম—যে-কোনও ধরনের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হয়তো খুশিমতো ওরা যে-কোনও জিনিসকে নকল করতে পারে। এইরকম নকল কোনও চেহারা নিয়েই ওরা হয়তো আমাদেরই নাকের ডগায় বসে আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপের ওপরে নজর রাখছিল। কে বলতে পারে, ওরা হয়তো পাথর, বালি, কিংবা জল সেজে আমাদের দেখছিল। এমনকী—।'

'এমনকী মানুষের চেহারাও নিয়ে থাকতে পারে!' শ্রীবাস্তবের না-বলা কথাগুলোই উচ্চারণ করলেন ক্যাপ্টেন মিত্র। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখার বাইরে চলে গেছেন তিনি।

'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন।' ডক্টর শ্রীবাস্তব সমর্থন করলেন নীতীশ মিত্রকে ঃ 'এবারে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে। মনে করুন, টিরার প্রাণীরা আমাদের গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চায়, আমাদের স্টাডি করে দেখতে চায়, পৃথিবীতে

গিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চায় নিজেদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে—তা হলে বলুন, কী করে এসব কাজ ওদের পক্ষে সহজে করা সম্ভব?'

নীতীশ মিত্র নিশ্চুপ। ডক্টর শ্রীবাস্তবের প্রশ্নের সুর শুনেই বোঝা যায় তার উত্তর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর মনে রয়েছে। অতএব দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে উত্তরটা তিনিই দিলেন।

'ক্যাপ্টেন, আমার অনুমান টিরার প্রাণীদের কেউ মানুষের চেহারা নিয়ে উঠে এসেছে আমাদের মহাকাশযানে। হয়তো টিরার পাথর-বালি ছড়ানো রুক্ষ প্রান্তরে ওরা খুন করেছে কমল সেনগুপ্তকে। তারপর তাকে নকল করে—চেহারায়, কথাবার্তায়, হাবভাবে, সবকিছুতে—ওদের একজন ঢুকে পড়েছে সোলারে। এই আশা নিয়ে ঢুকে পড়েছে যে, তাকে কমল সেনগুপ্ত মনে করে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে যাব। কিন্তু ধরুন, নকল করতে গিয়ে কোথাও যদি গরমিল হয়ে গিয়ে থাকে! মানছি, ওই বিচিত্র প্রাণী কমলের স্মৃতি পর্যন্ত চুরি করেছে, নইলে আপনাকে বা আমাকে নকল কমল চিনতে পারল কেমন করে! কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শরীরে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। অতএব সেই কারণেই নকল কমল জানতে পারেনি মানুষের রক্তের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন কীরকম হয়। আর সেখানেই তার পা ফেলতে ভুল হয়েছে। নিজের আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কমলকে নকল করতে প্রাণীটার সময় লেগেছে। বাইরের খোলসটা হুবহু নকল করে সে তাড়াহুড়ো করে সোলারে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু তখন ভেতরটা পুরোপুরি বুঝে ওঠা হয়নি। সে পাগলের মতো তথ্য হাতড়ে চলেছে...দিশেহারা, বিভ্রান্ত...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেতরটা সঠিক নকল করা দরকার। ঠিক এইরকম বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার শরীর থেকে ব্লাড স্যাম্পল টানা হল। অতএব স্বাভাবিক কারণেই যে-'রক্ত' আমরা পেলাম তা ভুলভাল, গোলমেলে, অবাস্তব, অসম্ভব। প্রাণীটা কিন্তু বসে নেই। তার মন ও অনুভবের অদৃশ্য অ্যান্টেনা দিয়ে সে প্রতিমুহূর্তে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে সোলারের অন্যান্য অভিযাত্রীর কাছ থেকে, মহাকাশযানের নানান নথিপত্র থেকে—সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। এইভাবেই সে জানতে পারল মারাত্মক ভুলটা কোথায় হয়েছে। এও বুঝতে পারল ভুলটা মেডিক্যাল রিপোর্টে ধরা পড়েছে, এবং আমাদের চোখে পড়েছে। তখন আমাদের চোখে ধুলো দিতে, ভুল চাপা দিতে, সে খুন করল অশোক চিরিমারকে। তাকে নকল করল, তারপর মরে যাওয়ার ভান করল। ইচ্ছে করে রক্তে দেখিয়ে গেল 'কমল সেনগুপ্তের' মতো গোলমাল। এর কারণ, আমরা ভাবব কোনও রহস্যময় রোগের জীবাণু আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। আর বাড়ি ফেরার পথে সারাটা সময় এই রহস্যের সমাধান খুঁজে-খুঁজে হয়রান হবে আমাদের মস্তিষ্ক। কিন্তু কোনওমতেই সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে না। আমার এই ধারণা যদি সত্যি হয়, ক্যাপ্টেন?'

ক্যাপ্টেন মিত্র হাতে হাত ঘষলেন। মাথা নীচু করে গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন,

'যদি তাই হয় তা হলে কমল সেনগুপ্ত কমল সেনগুপ্ত নয়! অশোক চিরিমার অশোক চিরিমার ছিল না!' আচমকা মুখ তুললেন তিনি ঃ 'কিন্তু প্রমাণ কই, ডক্টর, প্রমাণ কই? কী করে নিঃসন্দেহ হব আমরা?'

'ভালো প্রশ্ন করেছেন।' কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর বললেন, 'টিরার প্রাণীটি মানুষের দেহে ঢুকে পড়েছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চষে বেড়িয়েছে দেহের প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি কোষ, রাসায়নিক গঠন, অনুপাত, মস্তিষ্কের প্রতিটি চিন্তার ছাপ। তারপর স-ব সে নকল করে ফেলেছে। এবং খুন করেছে মানুষটিকে। কমল সেনগুপ্তের রক্তাক্ত মৃতদেহ হয়তো পড়ে আছে টিরার কোনও খাদে। আর অশোক চিরিমারের মৃতদেহ সম্ভবত সোলারের ডিসপোজাল চেম্বার দিয়ে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে মহাশূন্যে। এখন এই নকল মানুষটা সব দিক দিয়েই আসল মানুষটির মতো—অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিখুঁত কপি করেছে ওরা। শুধু নকল দেহটার ভেতরে এককোণে রয়ে গেছে একটা শয়তান ভিনগ্রহের মন, শয়তানি মতলব নিয়ে শুধু ভাবছে...ওত পেতে রয়েছে।' শ্রীবাস্তব মাথার চুলে আঙুল চালালেন। হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'যত নিখুঁত নকলই ওরা করুক, ক্যাপ্টেন, হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেম এক বিচিত্র জিনিস—একমেবাদ্বিতীয়ম্। সেইখানেই ফাঁদ পাতব আমি। তবে গোপনীয়তার খাতিরে আমার মতলবটা এখনই আপনাকে খুলে বলতে পারছি না। কারণ, নিজেকে ছাড়া আমি এখন আর কাউকে বিশ্বাস করি না!'

দুজনে পরস্পরের চোখে চোখ রাখলেন। মোহন শ্রীবাস্তবকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে। ইঞ্জিনের চাপা গুনগুন শব্দ কেবিনের নিস্তব্ধতাকেও আরও প্রকট করে তুলেছে। ক্যাপ্টেন মিত্রের হাত ঘামছে। সোলারের একাশি জন মানুষ—নাকি ঊনআশি জন?... শুধু তাই নয়, টিরার ভয়ঙ্কর প্রাণী যদি একবার পৃথিবীতে পৌঁছোয় তা হলে গোটা মানবজাতির সর্বনাশ নেমে আসবে। ডক্টরকে সে-কথাই জিগ্যেস করলেন তিনি।

'প্রাণীটার উদ্দেশ্য কোনওরকমে একবার পৃথিবীতে পৌঁছোনো, তাই না?'

'হ্যাঁ—ভয়ঙ্কর মনে হলেও কথাটা সত্যি।'

'যদি আমরা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সোলারকে মহাশূন্যে উড়িয়ে দিই?' উত্তেজনায় দপদপ করছে নীতীশ মিত্রের মুখ।

'তাই দেব—যদি না ফাঁদ পেতে ধরতে পারি।'

'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই, ডক্টর—'।

'জানি। সোলারকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলে এতগুলো মানুষের প্রাণ যাবে, তা ছাড়া, ধুলো হয়ে যাবে কোটি-কোটি টাকার এই মহাকাশযান। সুতরাং শেষ চেষ্টা আমি করবই, ক্যাপ্টেন। এ পর্যন্ত এমন কোনও জালিয়াতি বা নকলের কথা আমি শুনিনি যা ধরা পড়েনি। সুতরাং টিরার প্রাণীকেও ধরা পড়তেই হবে।

আমি হাতেনাতে প্রমাণ করে দেব যে-কমল সেনগুপ্ত আমাদের মহাকাশযানে এখন রয়েছে সে টিরার প্রাণী—একটা নকল পুতুল! এমন ফাঁদ পাতব যা আন্দাজ করা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর কল্পনার বাইরে।'

রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীবাস্তব ঃ 'খুব ঘুম পাচ্ছে, ক্যাপ্টেন। আপাতত গুড নাইট। একটা কথা, আমাদের আলোচনার ব্যাপারটা একটু গোপন থাকলে ভালো হয়—।'

শুভরাত্রি জানিয়ে নীতীশ মিত্র বেরিয়ে এলেন শ্রীবাস্তবের কেবিন থেকে। দুশ্চিন্তার ঢেউ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতরে। মাথা দপদপ করছে। তবুও কোথায় যেন একটা কৌতূহল খোঁচা মারছে ঃ কী ফাঁদ পেতেছেন ডক্টর শ্রীবাস্তব? সেই ফাঁদে টিরা গ্রহের প্রাণী পা দেবে তো? কে জিতবে এই বুদ্ধির খেলায়?

পাঁচ ঃ হার-জিত

মানুষটা বাঙ্কে শুয়ে ছিল। নিশ্চল। ঘুমন্ত। তার মাথার ভিতরে, নিমীলিত দু-চোখের পিছনে অন্য একটা মন নড়ে উঠল—পিছল সরীসৃপের মতো। তারপর চিন্তা ও অনুভূতির অদৃশ্য অ্যান্টেনা ছড়িয়ে দিয়ে আর-একটা মনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। ভিনগ্রহী দুটো শয়তান মন কথা বলতে লাগল। মহাকাশযানের দু-প্রান্তের দুটো কেবিনের মধ্যে যেন তৈরি হয়ে গেল অদৃশ্য টেলিফোন—যার অন্য নাম টেলিপ্যাথি। একটা মন নৃশংস, নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর অন্যজন ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা।

'আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমরা ধরা পড়ে গেছি। ডক্টর শ্রীবাস্তব আমাদের ধরে ফেলেছে...!'

'কক্ষনো না!' তীব্র স্বরে উত্তর দিল দ্বিতীয় মন।

'এখনও ফিরে যাওয়ার সময় রয়েছে! সোলার স্পেস জাম্প দেওয়ার পর আমরা অনেক দূরে চলে যাব। তখন আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকবে না।'

'ভীতু! বিশ্বাসঘাতক!' দ্বিতীয় মন রাগে গর্জে উঠল। সরীসৃপের মতো কিলবিল করে ফুঁসতে লাগল ঃ 'এসব চিন্তা করার আগে তোমার মরে যাওয়া উচিত!'

'কিন্তু আমাকে সন্দেহ করছে যে! ...ডক্টর আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। এত নিখুঁতভাবে নকল করেছি যে, কোথাও কোনও গরমিল নেই, অথচ...ডক্টর মনে-মনে কী মতলব ফেঁদেছে কে জানে...।'

ঘৃণা মেশানো শাসনের সুর ভেসে উঠল নীরব কণ্ঠে ঃ 'ডক্টর শ্রীবাস্তব একটা গর্দভ, বুদ্ধু! ও কিছুতেই আমাদের ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু আমাকে যে কোণঠাসা করতে চাইছে!' আতঙ্ক আরও গাঢ় হয়েছে, তীব্র হয়েছে প্রথম মনে ঃ 'ডক্টরের মতলব আমি আঁচ করতে পারছি না। জানি না নকল করতে গিয়ে কোথাও কোনও ভুল করে ফেলেছি কি না—।'

মনঃসংযোগে শোনা গেল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি ঃ 'ডক্টর আমাকে সন্দেহ করে না—বরং বিশ্বাস করে। ভয় পেয়ো না। ডক্টর শ্রীবাস্তব একটা আস্ত বোকা। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা পৃথিবীতে নামবে। সেখানে এরকম কত তাজা মানুষ রয়েছে একবার ভাবো তো! সেখানে আমরা দিব্যি লুকিয়ে কাজ সারতে পারব—' নির্লজ্জ প্রত্যাশায় যেন লালা ঝরছে দ্বিতীয় মন থেকে ঃ 'তারপর ওদের শেষ করে ওদেরই মহাকাশযান নিয়ে আমরা ফিরে আসব আমাদের দেশে। মহাকাশযান বোঝাই করে আর সবাইকে নিয়ে যাব পৃথিবীতে। ওঃ, তখন সেখানে হবে আমাদের নতুন বসতি...।' আনন্দে উল্লাসে টগবগ করে উঠল নীরব কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু ডক্টর...ওকে আমাদের খুন করতে হবে...।'

'না, না...তা হলে ওরা মহাকাশযান পৃথিবীতে নামাবে না। সবাই সন্দেহ করবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে ওরা মহাকাশযান উড়িয়ে দেবে মহাকাশে। তার চেয়ে বরং ডক্টরকে ওর খেলা খেলতে দাও। ভয় পেয়ো না একটুও।'

'কিন্তু টের পাচ্ছি, আমি কোণঠাসা হয়ে পড়ছি—কীভাবে তা বুঝতে পারছি না। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। এখনই। এখনও সময় আছে...।'

নিষ্ঠুর হাসির মধ্যে দিয়ে ঘৃণা ভরা নৃশংস মনটা যেন তার হাজারো অ্যান্টেনা দিয়ে উগ্র বিষ ঢেলে দিল ঃ 'ভয় পেয়ো না। মনে রেখো, আমাদের একজন বেঁচে থাকলেই চলবে। তুমি...কিংবা আমি...।'

ক্যাপ্টেন নীতীশ মিত্রের কেবিনে ঢুকলেন মোহন শ্রীবাস্তব। ক্যাপ্টেন ফিরে তাকাতেই বলে উঠলেন, 'আমি জিতেছি, ক্যাপ্টেন। আমার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে নকল কমল সেনগুপ্ত। সে ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে।'

শ্রীবাস্তবের মুখে জয়ের হাসি। রিল্যাক্সারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। লাইটারটা হাতে নিয়ে খেলা করতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন মিত্র জয়ের খবরে তেমন যেন আশ্বস্ত হতে পারেননি। নীচু গলায় বললেন, 'ডক্টর, আপনার অনুমানই তা হলে সত্যি হল! আমি আর ভাবতে পারছি না। সবকিছু যেন দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। কাল রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ঘুমোতে পারিনি। তা ছাড়া, আজ যতবারই কমলের মুখোমুখি হয়েছি ততবারই নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়েছে। ছেলেটা এত নিষ্পাপ, সরল—।'

ক্যাপ্টেনকে বাধা দিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন, 'যে-কমল সেনগুপ্তকে আপনি

দেখছেন সে ঘোর পাপী এবং কুটিল। প্রথম সুযোগেই সে আপনাকে আমাকে সবাইকে খতম করে দেবে। কিন্তু এখন আর তা হবে না। উলটে আমরাই তার ব্যবস্থা করব...।'

'কী প্রমাণ পেয়েছেন, ডক্টর?' অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে জিগ্যেস করলেন নীতীশ মিত্র।

পকেট হাতড়ে একটা খাম বের করলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। খাম থেকে বেরোল একটা ফিল্ম। সেটা আলোর দিকে ধরে একবার দেখলেন। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কমল সেনগুপ্তের পাকস্থলীর সনোগ্রাফিক ফিল্ম। সনিক জেনারেটার লাগিয়েছিলাম কেবিনের সিলিংয়ে, এবং ওর বাঙ্কের তলায় ফিল্ম প্লেটটা সেট করে অনেক কষ্টে লুকিয়ে এই ছবি তুলেছি। দেখুন—।'

ক্যাপ্টেন মিত্র ফিল্মটা দেখলেন ঃ 'কীসের ছবি?'

'কাল রাতে কমল সেনগুপ্ত যা-যা খেয়েছিল তার ছবি।'

'কই, কিছু তো দেখা যাচ্ছে না!' ক্যাপ্টেন অবাক হলেন।

শ্রীবাস্তব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন ঃ 'কমল আমার ফাঁদে পা দিয়েছে, তাই কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

ক্যাপ্টেন বিমূঢ় চোখে ডক্টরকে দেখতে লাগলেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

শ্রীবাস্তব হাসলেন। তারপর পকেট থেকে আর-একটা খাম বের করলেন। খাম থেকে বেরোল ছ'টা একই ধরনের ফিল্ম।

'ক্যাপ্টেন, কমলের ছবির সঙ্গে এই ছবিগুলো মিলিয়ে দেখুন। আমাদের মেডিক্যাল টিম বহু পরিশ্রমে গোপনে ছবিগুলো তুলেছে। অবশ্য আমি ছাড়া আর কেউ ছবি তোলার কারণ জানে না।' হাতের সিগারেটে গভীর টান দিলেন ডক্টর। ফিল্মগুলো রাখলেন ক্যাপ্টেনের ডেস্কের ওপরে। তারপর বললেন, 'ক্যাপ্টেন, কাল রাতে ক্রু-দের যে-খাবার দেওয়া হয়েছিল তাতে আমি গোপনে পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম—না, আপনার অনুমতি নিতে পারিনি—তার জন্যে আমি দুঃখিত। রাতের খাবার খেয়ে আজ সকলেই বদহজমের অভিযোগ করেছে—একমাত্র কমল সেনগুপ্ত ছাড়া। ওই ছ'টা ফিল্ম লক্ষ করলে দেখতে পাবেন স্টোনডাস্টের ছবি সনোগ্রাফে অত্যন্ত স্পষ্ট—যা কমলের ছবিতে নেই। অর্থাৎ, স্বাভাবিক কারণেই খাবারের সঙ্গে অজান্তে পাথরের গুঁড়ো খেয়ে ছ'জন অভিযাত্রী তা হজম করতে পারেনি। কিন্তু নকল কমল জানত না পাথরের গুঁড়ো তার হজম করা উচিত কি অনুচিত। আসল কমলের মস্তিষ্কের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে এ-বিষয়ে কোনও খবর সে জানতে পারেনি—আর জানা সম্ভবও ছিল না। এ-খবর একমাত্র দিতে পারত হিউম্যান মেটাবলিক সিস্টেম—যার আচার-আচরণ টিরার অতিচালাক প্রাণীর পক্ষেও হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। অতএব পাথর হজম করে নকল কমল

নিজেকে এক্সপোজ করে দিয়েছে! আর তার লুকোনোর পথ নেই!'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে হাসলেন ডক্টর শ্রীবাস্তব। লাইটার জ্বেলে নতুন একটা সিগারেট ধরালেন ঃ 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম ক্যাপ্টেন, এ-পর্যন্ত এমন কোনও জালিয়াতি বা নকলের কথা আমি শুনিনি যা ধরা পড়েনি। দরকার শুধু সময়...।'

ক্যাপ্টেন মিত্র একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখলেন। তারপর ডক্টরের হাত থেকে লাইটারটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'খবরদার!' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলেন মোহন শ্রীবাস্তব ঃ 'ছোঁবেন না আমাকে!'

ডক্টরের দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করলেন নীতিশ মিত্র ঃ 'আমি লাইটারটা নিতে যাচ্ছিলাম, ডক্টর।'

সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন শ্রীবাস্তব। লজ্জিতভাবে লাইটারটা এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেনের ডেস্কে। বললেন, 'সরি, ক্যাপ্টেন, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। সবাইকেই আমি ভয় করতে শুরু করেছি। সবসময় টিরার প্রাণীর দুঃস্বপ্ন দেখছি। ওদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছি। সবটাই হয়তো বোকামি, কিন্তু আমি সাবধান থাকতে চাই, ক্যাপ্টেন...' ছোট্ট করে হাসলেন শ্রীবাস্তব ঃ 'এখন চলুন, নকল কমলের একটা ব্যবস্থা করি।'

'কী ব্যবস্থা?' সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা ডক্টরের তালুর ওপর ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ডক্টর শ্রীবাস্তব সেটা লুফে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। তারপর ফিল্মগুলো খামে ভরে নিয়ে রিল্যাক্সার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেনও উঠে দাঁড়ালেন তাঁর সঙ্গে রওনা হওয়ার জন্য।

শ্রীবাস্তবের চোয়াল শক্ত হল। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'চরম ব্যবস্থা। চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন...।'

ওঁরা দুজনে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেনের কেবিন ছেড়ে। করিডর ধরে এগোতে-এগোতে মোহন শ্রীবাস্তব বললেন, 'একটু আগে আমি কমলকে স্টারবোর্ডের দিকে স্পেস লকটা পরিষ্কার করতে বলে এসেছি। ও যদি স্পেস লকের মধ্যে থাকে তা হলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।'

ক্যাপ্টেন মিত্র কোনও কথা বললেন না। তিনি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন, কিন্তু ডক্টর শ্রীবাস্তবের র‍্যাঙ্ক তাঁর সমান। তা ছাড়া, মহাকাশযান ও অভিযাত্রীদের রোগজীবাণুমুক্ত রাখতে ডক্টর শ্রীবাস্তব যা ভালো বোঝেন করতে পারেন—ক্যাপ্টেনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। একই কারণে তিনি হুকুম চালাতে পারেন ক্রু-র ওপরে। গত এক দশকে রোগজীবাণুর জন্য বিভিন্ন মহাকাশ-অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। সেই কারণেই আজকাল যে-কোনও অভিযানে চিফ মেডিক্যাল ম্যান ক্যাপ্টেনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ—হয়তো

বা তার চেয়েও বেশি। তবে নীতিশ মিত্র এটুকু আশা করেন, শ্রীবাস্তব যা করবেন তা বুঝে-শুনে দায়িত্ব নিয়েই করবেন।

মোহন শ্রীবাস্তব নিজের বোকামির কথা ভাবছিলেন। কমল সেনগুপ্ত ছাড়াও যে অন্য কেউ টিরার প্রাণী হতে পারে এই সন্দেহের কথা ওভাবে প্রকাশ করাটা ঠিক হয়নি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ব্যাপারটা যদি পাঁচকান হয় তা হলেই বিপদ! নিজের সন্দেহের কথা এই মুহূর্তে তিনি কাউকে জানাতে চান না।

স্টারবোর্ডের স্পেস লকের সামনে করিডরে অফিসার অংশুমান যাদবের সঙ্গে দেখা হল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর যাদবকে বললেন, 'নেভিগেশান রুমে গিয়ে ধনপত রাইকে বলো স্পেস জাম্পের জন্যে তৈরি হতে। আমরা একটু পরে আসছি—।'

যাদবকে সরিয়ে দিয়ে দুজন এগিয়ে গেলেন স্পেস লকের দরজার সামনে। ভারী ধাতব দরজা। দরজার ওপরের অংশে পুরু প্লাস্টিকের স্বচ্ছ প্যানেল বসানো। প্রেসার চেম্বারের ভেতরে কমল সেনগুপ্ত কাজ করছে। একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করছে। নিখুঁত একজন মানুষ—চেহারা, চালচলন, সব।

হঠাৎই ক্ষিপ্র চিতার মতো দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শ্রীবাস্তব। এক ঝটকায় লক আটকে বেরোনোর পথ বন্ধ করে দিলেন। তারপর দরজার পাশেই একটা প্যানেলের লাল বোতামে চাপ দিলেন। চেম্বারের ভেতরে লাল আলো জ্বলে উঠল। মৃদু গুঞ্জন তুলে বায়ু-নিষ্কাশন পাম্প কাজ শুরু করল। প্রেসার চেম্বারের বাতাস ক্রমশ বেরিয়ে যেতে লাগল।

লাল আলো দেখে কমল চমকে উঠল, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ছেড়ে ছুটে এল দরজার কাছে। আতঙ্কে চোখ বেরিয়ে আসছে, মুখে বিমূঢ় বিস্ময়।

'ডক্টর!' ও চিৎকার করে উঠল। ভারী দরজা ভেদ করে ওর ক্ষীণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ 'ডক্টর, শিগগির সবুজ বোতামটা টিপে দিন! দেখছেন না, আমার গায়ে প্রেসার স্যুট নেই!'

ক্যাপ্টেন মিত্রের ঠোঁট চিরে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে তিনি ডক্টরকে দেখছেন। কোনওরকমে বললেন, 'কী করছেন আপনি! ছেলেটা যে মরে যাবে!'

'ছেলেটা নয়, টিরার প্রাণী!' গম্ভীর গলায় শ্রীবাস্তব উত্তর দিলেন, 'আমাদের মতো ওরাও বায়ুমণ্ডলে অভ্যস্ত। অতএব বায়ুশূন্য অবস্থায় বাঁচতে পারবে না। চুপচাপ শুধু দেখে যান।' ডক্টরের চোখ প্লাস্টিক প্যানেলের ওপরে নিবদ্ধ।

কমল সেনগুপ্ত অন্ধ আতঙ্কে কাঁপছে। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল আবার, 'ডক্টর! ক্যাপ্টেন! সবুজ বোতামটা টিপে দিন, প্লিজ! ডক্টর, শিগগির করুন!

নইলে আমি মরে যাব—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—।'

পাগল-করা রাগে, উত্তেজনায়, হতাশায়, কমল ঘুসি মারতে লাগল ধাতব দরজায়, প্লাস্টিক প্যানেলের ওপরে। ওর হাত ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। স্বচ্ছ প্যানেল লালে মাখামাখি হয়ে গেল। তারপর লাল থেকে ধীরে-ধীরে পালটে যেতে লাগল বিচিত্র বেগুনি রঙে।

কমল নিজের গলা আঁকড়ে ধরল, হাঁটুগেড়ে পড়ে গেল মেঝেতে। প্রেসার গেজ-এর কাঁটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে শূন্যের দিকে। কমল ছটফট করছে আহত সরীসৃপের মতো, কাশির দমকে কেঁপে উঠছে ওর শরীর।

হঠাৎই ওর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। শেষ আক্ষেপে মোচড় খেল ওর দেহ। তারপরই সব স্থির। নিস্পন্দ।

এবং কমল সেনগুপ্তের দেহে পরিবর্তন শুরু হল। আকৃতি পালটে যেতে লাগল ধীরে-ধীরে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবয়ব গলে-গলে মিশে যেতে লাগল—হাত-পা, চুল—অবশেষে রয়ে গেল শুধু একতাল বেগুনি জেলি। যেন এক অতিকায় অ্যামিবা। তিরতির কাঁপন জাগছিল জেলির স্তরে। আচমকা সেটাও থেমে গেল। প্রাণের সব স্পন্দন শেষ।

প্যানেল থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নাড়লেন ডক্টর। অবসাদ ভরা শরীরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এই আমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, ক্যাপ্টেন। আমি ভুল করিনি।'

ক্যাপ্টেন মিত্র কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই এক লহমায় টানটান হয়ে দাঁড়ালেন মোহন শ্রীবাস্তব ঃ 'ক্যাপ্টেন, একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে! অশোক চিরিমার মরেছে, কিন্তু তার ভেতরের বেগুনি জেলি মরেনি! নকল কমল সেনগুপ্তেরই একটা অংশ তৈরি করেছিল নকল চিরিমার। সে মরে যাওয়ার ভান করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। আমি এক্ষুনি গিয়ে সাব জিরো রুম লক করে সিল করে দিয়ে আসছি। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে ''মৃত'' চিরিমারকে পরীক্ষা করে দেখব। আর এই প্রেসার চেম্বারটা আপনি সিল করে দিন। কেউ যেন এটা না খোলে। দেখি, ওদিকে আবার কোনও বিপদ হল কি না!'

শ্রীবাস্তব ক্ষিপ্র পায়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলেন। ঘটনাচক্রে অথবা দুর্ঘটনায় কোনও অভিযাত্রী মারা গেলে তার মৃতদেহ অক্ষত রাখার জন্যেই সাব জিরো রুমের ব্যবস্থা। কপাল ভালো বলতে হবে, এখন সেখানে একমাত্র অশোক চিরিমারের 'মৃতদেহ' রয়েছে। তার হাতে সোলারের অন্য কেউ আক্রান্ত হয়েছে কি না কে জানে! আবার কাউকে খুন করে শয়তানটা তাকে নকল করেনি তো! না, এখানে আর পরীক্ষা চালানোর সময় নেই। সামনেই বিপজ্জনক স্পেস জাম্প। অতএব যা করার পৃথিবীতে ফিরেই করতে হবে।

ছুটতে-ছুটতে সাব জিরো রুমে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর। দরজা বন্ধ। আশপাশে

কেউ নেই। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুললেন। বরফ-ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় তাঁর চোখ-মুখ যেন জমে গেল। ঘরের মধ্যে সাদা ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ছে। ধাতব দেওয়াল, ধাতুর বাঙ্ক, সব—সব জায়গাতেই চাপচাপ বরফের স্তর জমে আছে। একটা বাঙ্কে নিশ্চল শুয়ে আছে মৃত অশোক চিরিমার। হাতে মুখে তুষারের কণা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মোহন শ্রীবাস্তব। দরজা বন্ধ করে লক করে দিলেন। কাউকে ডেকে সিল করার ব্যবস্থা করতে হবে এখুনি।

দরজা সিল করে কেবিনে ফিরে যেতে-যেতে তাঁর মনে হল, সাব জিরো রুমের ওই হিমশীতল তাপমাত্রায় টিরার প্রাণী কি আর বেঁচে আছে? স্পন্দনের ইশারা কি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে ওই বেগুনি জেলিতে?

পৃথিবীতে ফিরে গিয়েই সব প্রশ্নের উত্তর তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করবেন তিনি।

ছয় ঃ শত্রুর মুখোমুখি

পরদায় পৃথিবীকে বিশাল দেখাচ্ছে। সবুজ, উজ্জ্বল, প্রক্সিমা সেন্টরির দিকে যাত্রা শুরুর সময় যেরকম দেখা গিয়েছিল। স্পেস জাম্পের পরীক্ষায় নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়েছে সোলার। এখন তার গতি কমে আসছে। পৃথিবীর কক্ষপথে কয়েকবার পাক দেওয়ার পর নির্দিষ্ট 'ব্যালিস্টিক পাথ' ধরে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে সোলার। অভিযাত্রীরা যার-যার নির্ধারিত জায়গায় তৈরি। মহাকাশযান নামার সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রত্যেকটি কর্মীকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে করতে হবে। সেখানে চুলচেরা ভুল হওয়ার উপায় নেই। সুতরাং প্রত্যেকেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

ছায়া-অন্ধকার করিডর ধরে মহাকাশযানের পিছনের অংশে এগিয়ে চলেছেন মোহন শ্রীবাস্তব। সঙ্গে সনোগ্রাফের ফিল্ম সমেত খাম দুটো। ক্যাপ্টেন মিত্রকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে এসেছেন যে, বিপদ কেটে গেছে। টিরার প্রাণী মৃত। একজন মারা গেছে বায়ুশূন্যতায়, অন্যজন হিম তাপমাত্রায়। অতএব সোলার এখন বিপদমুক্ত।

কিন্তু সবটাই শ্রীবাস্তব ভুল বুঝিয়েছেন। গালগল্প প্রচার বন্ধ করার জন্যই তাঁকে ক্যাপ্টেনের কাছে মিথ্যে বলতে হয়েছে। এখন তিনি লাইফবোট রকেটে চড়ে একা রওনা হয়ে যাবেন পৃথিবীর দিকে। পৌঁছোবেন সোলারের আগে। ফিল্মগুলো কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেবেন সোলার-এর প্রতিটি যাত্রীকে যাচাই করার জন্য। বিপজ্জনক মহাকাশযানে নীতীশ মিত্রকে রেখে যেতে

তাঁর খারাপ লাগছে, কিন্তু কোনও উপায় নেই। অন্যান্য যাত্রীর মতো ক্যাপ্টেনকেও তিনি সন্দেহ করেন। কে বলতে পারে, টিরার রুক্ষ ভূমি থেকে একজন, দুজন, না তিনজন—ক'জন ছদ্মবেশী প্রাণী উঠে এসেছিল সোলারে!

লাইফবোট রুমে মোট ন'টা রকেট ছিল। টর্চের আলোয় আটটা রকেটের ইগনিশান সার্কিট শর্ট করে দিলেন শ্রীবাস্তব। এগুলো ঠিক করতে এখন কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। অতএব পৃথিবীতে সবাইকে নামতে হবে সোলারে বন্দি হয়েই। তারপর...।

ন'নম্বর রকেটটা সোলারের আশ্রয় ছেড়ে গা ভাসাল মহাকাশে। সাবলীল গতিতে নেমে চলল উষ্ণ সবুজ পৃথিবীর দিকে।

টিরার প্রাণীরা অজেয় নয়। ডক্টর শ্রীবাস্তব ভাবলেন। ওদের একজনকে তিনি বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছেন, ফাঁদে ফেলেছেন, শেষ করেছেন। অতএব চেষ্টা করলে বাকিগুলোকেও পারবেন। শুধু দরকার সাহস, আর আত্মবিশ্বাস। মৃত্যুর সময় নকল কমল সেনগুপ্তের চোখে-মুখে পাগল করা রাগ ফুটে উঠেছিল। চরম ঘৃণায় টলটল করছিল চোখের দৃষ্টি। টিরার প্রাণী কমলের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখছিল। ফুঁসছিল রাগে।

ডক্টর শ্রীবাস্তব শিউরে উঠলেন। কমল সেনগুপ্তের বেলায় ভাগ্য তাঁর সহায় ছিল। কিন্তু এবারে?

একঘণ্টার মধ্যেই ক্যালকাটা কসমোড্রোমে ল্যান্ড করল শ্রীবাস্তবের লাইফবোট রকেট। তারপরই ব্যস্ত কথাবার্তা, উত্তেজনা, ছুটোছুটি, সনোগ্রাফ পরীক্ষা, সংশয় আতঙ্ক। একটা ম্যাগনেটিক কারে চড়ে আনডারগ্রাউন্ড টানেল ধরে শব্দের গতিতে রওনা হয়ে গেলেন মোহন শ্রীবাস্তব। লক্ষ্য ঃ কসমোড্রোম সিকিওরিটি ব্যুরো।

আকাশের দিকে রুপোলি নাক উঁচিয়ে বিশাল মহাকাশযান সোলার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন অপরূপ এক অতিকায় পাখি ডানা মেলার মুহূর্তে ছবি হয়ে গেছে। মনে-মনে সোলারের গঠনের তারিফ করলেন মোহন শ্রীবাস্তব। তারপর অটোমেটিক এলিভেটরে চড়ে সোলারের গা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে সবুজ য়ুনিফর্ম পরা চারজন কসমোড্রোম সিকিওরিটি পুলিশ। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে আলট্রাসনিক-শকার। ট্রিগারে চাপ দিলেই লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসবে অদৃশ্য আলট্রাসনিক শক্তির ফোয়ারা। শব্দোত্তর তরঙ্গের জোয়ারে অদৃশ্য শত্রু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। বেশিক্ষণ ব্যবহার করলে তার করুণ মৃত্যুও ঘটবে।

ধাতব শব্দের আর্তনাদ তুলে ওপরে, আরও ওপরে, উঠতে লাগল এলিভেটর। এক সময় এসে থামল সোলারের প্রধান দরজার সামনে। সেখানে

দুজন সিকিওরিটি অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডক্টরকে দেখেই তাঁদের একজন বললেন, 'সবাই নেমে গেছে, ডক্টর শ্রীবাস্তব। আপনার কথা মতোই সকলকে সিকিওরিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—।'

'থ্যাংক য়ু, অফিসার।' নির্বিঘ্নে কাজ শেষ হওয়ার তৃপ্তি পেলেন মোহন শ্রীবাস্তব।

সিকিওরিটি কমান্ডার তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছেন। কমান্ডারই আদেশ দিয়েছেন সোলারের প্রতিটি যাত্রীকে সিকিওরিটি ফোর্স দিয়ে সেন্ট্রাল ক্লিনিকে নিয়ে যেতে। অবশ্যই ডক্টর শ্রীবাস্তবের পরামর্শে। ক্লিনিকে প্রত্যেককে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে জেরবার করে ছাড়বেন শ্রীবাস্তব। একের পর এক নতুন-নতুন ফাঁদ পাতবেন। সময় লাগবে, ধৈর্যও লাগবে। তবে টিরার একটি প্রাণীও রেহাই পাবে না।

হঠাৎ কী মনে হতে মোহন শ্রীবাস্তব অফিসারকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, 'স্পেসশিপ থেকে নামার সময় প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের ফটো আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখা হয়েছে?...আর একটা বডি ছিল...।'

'হ্যাঁ, ডক্টর। আমরা লিস্ট মিলিয়ে নিয়েছি। কোনও গরমিল হয়নি। অশোক চিরিমারের ডেডবডি আমরা সাবধানে নামিয়েছি। তারপর পাঠিয়ে দিয়েছি ক্লিনিকে। আপনার কথামতো বডিটা আমরা চেক করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনওরকম ডিফেক্ট পাইনি। তখন স্টেরিলাইজ্‌ড ব্যাগে ভরে নামিয়ে নিয়েছি।'

যাক, নিশ্চিন্ত। হাতে হাত ঘষলেন শ্রীবাস্তব। মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে আরও বেশি শীত করছে। এখানে হাওয়ার দাপট অনেক বেশি। নীচে শুয়ে থাকা কলকাতাকে লিলিপুট-শহরের মতো দেখাচ্ছে। সেন্ট্রাল ক্লিনিকে ফিরে গিয়ে ল্যাবরেটরি টেস্ট শুরু করার জন্য তাঁর মন ছটফট করতে লাগল। কিন্তু, না। এখনও সামান্য একটু কাজ বাকি রয়েছে। স্টারবোর্ড স্পেস লক থেকে সংগ্রহ করতে হবে বেগুনি জেলির পিণ্ডটা—এতক্ষণে ওটা হয়তো শুকিয়ে এসেছে। তা ছাড়া কেবিন থেকে নিতে হবে কিছু নোট্‌স, কয়েকটা রিপোর্ট। শুধু নোট্‌স আর রিপোর্টের কথাই অফিসারকে বললেন তিনি। একজন সিকিওরিটি পুলিশের হাত থেকে একটা আলট্রাসনিক-শকার চেয়ে নিয়ে অফিসার দুজনকে বললেন, 'আপনারা অ্যালার্ট থাকুন। আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখবেন, আর-কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে। কেউ না!'

'ওকে, ডক্টর!' একসঙ্গে বলে উঠলেন দুজন অফিসার। কমান্ডারের নির্দেশ, ডক্টর শ্রীবাস্তবের কথা অক্ষরে-অক্ষরে শুনতে হবে। এত কাণ্ডকারখানার কী কারণ তা তাঁরা কেউই জানেন না।

শকার হাতে নিয়ে সোলারে ঢুকলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর চোখে ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই—যতক্ষণ না পৃথিবীকে বাঁচাতে পারছেন টিরার ভয়ানক শত্রুর হাত থেকে।

পিছনে প্রধান দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই করিডর আবছায়া অন্ধকার হয়ে গেল। অতিকায় মহাকাশযানে নিজেকে ভীষণ একা মনে হল ডক্টর শ্রীবাস্তবের। ইঞ্জিনের সেই চেনা গুঞ্জন নেই, নেই অভিযাত্রীদের কর্মব্যস্ততা। সব শান্ত, চুপচাপ, শূন্য।

করিডরে বাঁক নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চললেন তিনি। তাঁর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ধাতব দেওয়াল থেকে দেওয়ালে।

হঠাৎই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন প্রতিধ্বনি থেকে যেন শব্দের ধাঁধা তৈরি হচ্ছে। আর-একটা শব্দ কানে এল না! তাঁর পায়ের শব্দ নয়। একটু অন্যরকম। ডক্টর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। উৎকর্ণ। প্রতিটি স্নায়ু টান-টান। শকার যে-কোনওরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি।

ওই আবার! অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করলেন ডক্টর। সব আলো কি বিকল হয়ে গেছে? কবরখানার নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছে চারিদিকে। কপালে জন্ম নিচ্ছে নোনা ঘামের বিন্দু। এবারে স্পষ্ট শোনা গেল শব্দটা। পায়ের শব্দ! ভেসে এল করিডরের অন্য প্রান্ত থেকে।

সোলারে মোহন শ্রীবাস্তব একা নন! আরও কেউ রয়েছে...লুকিয়ে...গোপনে...।

কী ভীষণ বোকামি করেছেন তিনি! মহাকাশযানে একা ঢুকে পড়া তাঁর উচিত হয়নি। তিনি ছাড়া আরও একজন রয়েছে ভেতরে। তাঁর শত্রু! কিন্তু কে? সবাই তো নেমে গেছে সিকিওরিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে! তা হলে?

আলট্রাসনিক-শকার চারপাশে ঘুরিয়ে সতর্ক চোখে সব জরিপ করলেন শ্রীবাস্তব। তাঁর মন তখন ব্যস্তভাবে একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

সোলারে এমন কেউ রয়েছে যে কমল সেনগুপ্তের পুরো ঘটনাটা জানে। সে জানে ভিনগ্রহের প্রাণী ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছে সোলারে। জানে, কেন মহাকাশযানের সব যাত্রীকে পাহারা দিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইজন্যই সে ভয়ে নামেনি সোলার থেকে—ধরা পড়ার ভয়ে। সে জানে ডক্টর শ্রীবাস্তবের সন্দেহের কথা।

এত সব জানে শুধু দুজন। একজন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব নিজে, আর দ্বিতীয় জন...।

'ক্যাপ্টেন মিত্র।' চিৎকার করে উঠলেন শ্রীবাস্তব, 'চালাকি করে কোনও লাভ নেই! পালাবার কোনও পথ নেই তোমার! সব আমি ফাঁস করে দিয়েছি। একজন ক্যাপ্টেন মিত্র আগেই নেমে গেছে সোলার থেকে। মহাকাশযানের চারিদিকে কড়া পাহারা। মাছি গলার জো নেই। তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ নকল নীতীশ মিত্র!'

বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে বিদ্রূপের কলরোল তুলে একসময় মিলিয়ে গেল কথার স্বনন। সব চুপচাপ। শত্রুর তরফ থেকে কোনও জবাব নেই। মোহন

শ্রীবাস্তবের শরীর কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড ছুটে চলেছে পাগলা ঘোড়ার মতো উদ্দাম বেগে। একটা ভয় হঠাৎই তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর ধরে ছুটতে শুরু করলেন। ফিরে চললেন প্রধান দরজার দিকে।

দরজার কাছে পৌঁছেই শরীর হিম হয়ে গেল। দরজা ভেতর থেকে লক করা, এবং লকের চাবি উধাও। চেঁচিয়ে বা শব্দ করে কোনও লাভ নেই। বাইরে থেকে কেউ দরজা খুলতে পারবে না। যদি দরজা কাটতে হয়, তা হলে তো ঘণ্টাদুয়েকের ব্যাপার! ততক্ষণে...।

শ্রীবাস্তবের গলা বুজে আসতে চাইল ক্ষোভে, হতাশায়। অসহায় কান্না দলা পাকাতে লাগল বুকের ভেতরে। কী মারাত্মক ভুল করেছেন তিনি! একেবারে ভুলে গেছেন টিরার একজন অনায়াসে দুজন মানুষকে নকল করতে পারে। যেমন, একজন নকল করেছিল অশোক চিরিমার ও কমল সেনগুপ্তকে। বাকি অভিযাত্রীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মহাকাশযান থেকে নেমে গেছেন, তবে তাঁরই একটা অংশ থেকে গেছে সোলারের ভেতরে। এখনও যার চেহারা নীতীশ মিত্রের মতো। সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কীসের জন্য?

যতক্ষণ পর্যন্ত টিরার প্রাণী মহাকাশযানে বন্দি ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসহায়। এখন সে হয়তো মাথা খুঁড়ে মরছে কী করে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরোনো যায়। নৃশংস নিষ্ঠুর ভিনগ্রহীর মনে কোনও দয়া নেই, মায়া নেই। ডক্টরকে বাগে পেলেই সে শেষ করে দেবে। সুতরাং শ্রীবাস্তবই আগে খুঁজে বের করবেন তাকে।

সন্তর্পণে পা ফেলে ছায়া-ছায়া করিডর ধরে আবার এগিয়ে চললেন মোহন শ্রীবাস্তব। শব্দটা আবার শুনতে পেলেন তিনি ঃ ওপরের ডেক থেকে আসছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে চলেছে সামনে। দ্রুতগতিতে বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতায় করিডর ধরে নিঃশব্দে ছুটলেন ডক্টর—যেদিকে চলেছে ওপরতলার পায়ের শব্দ সেদিকে।

খাড়া ধাতব সিঁড়ির কাছে পৌঁছে মোহন শ্রীবাস্তব হাঁফাতে লাগলেন। ওপরে একটা কেবিনের দরজা খুলল, বন্ধ হল। ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকেছে নকল নীতীশ মিত্র। ওপরের করিডর ছাড়া ওই কেবিন থেকে বেরোনোর দ্বিতীয় পথ নেই। শত্রুকে ফাঁদে পাওয়া গেছে। সুতরাং ধীরে-ধীরে চুপিসাড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন শ্রীবাস্তব। উঁকি মেরে দেখলেন। ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ছোট ফোঁকর দিয়ে লম্বা শরীরটাকে তৎপরভাবে ওপরের করিডরে তুলে ফেললেন ডক্টর। তারপর শকার উঁচিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে তৈরি হলেন।

'বেরিয়ে এসো, নীতীশ!' গর্জন করে উঠলেন তিনি, 'তোমার বাঁচার কোনও পথ নেই! স্পেসশিপটা ওরা তুলোধোনা করে খুঁজবে। দরকার হলে সোলারকে ওরা জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে—তোমাকে সমেত। এখনও বেরিয়ে এসো বলছি।'

কোনও শব্দ নেই। কোনও উত্তর নেই। দরজার পাল্লায় এক জোরালো লাথি

বসিয়ে দিলেন শ্রীবাস্তব। পাল্লা খুলে গেল ভেতরে। কেবিন ফাঁকা! সেখানে কেউ নেই।

বিমূঢ় ভাবটা কেটে ওঠার আগেই একটা জোরালো আঘাত আছড়ে পড়ল শ্রীবাস্তবের হাতে। প্রতিটি স্নায়ু যেন চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়। শকার ছিটকে পড়ল যন্ত্রণাবিদ্ধ অসাড় হাত থেকে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষ হল। ঠনঠন। একটা ভারী শরীর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডক্টরের ওপরে। কিন্তু আহত হলেও সহজাত ক্ষিপ্রতায় পলকে সরে গেলেন ডক্টর। দেখলেন নীতীশ মিত্রের দেহটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আবার আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠলেন শ্রীবাস্তব। লাফিয়ে পড়লেন ছিটকে পড়া শকার লক্ষ করে ঃ 'তোমার রেহাই নেই, নকল ক্যাপ্টেন! পাহারাদারদের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না!'

একটা ঠান্ডা হাসি ভেসে এল শত্রুর দিক থেকে। স্ফটিকের পাহাড় ঝুরঝুর করে খসে পড়ার মতো আলতো সেই হাসি। সরীসৃপের হাসি। তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাসি। এবং একটা ভারী ধাতব পিণ্ড ছুটে গেল ডক্টরকে লক্ষ্য করে। তখন তাঁর হাত সবে ঠিকরে পড়া শকারটা ছুঁয়েছে। ভারী ধাতুর আঘাতে ডানহাতের তালুর হাড়গোড় যেন গুঁড়ো হয়ে গেল। লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেল ডান বাহু বরাবর। মস্তিষ্কে পৌঁছে বৈদ্যুতিক শক অচেতন করে দিতে চাইল শ্রীবাস্তবকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এক রক্ত-হিম-করা দৃশ্য ডক্টরের চেতনাকে ঝাঁকুনি দিল প্রাণপণে।

কারণ, নীতীশ মিত্রের অবয়ব তখন ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছে অন্য এক চেহারায়। শ্রীবাস্তবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে নীতীশ মিত্রের কাঠামো আরও লম্বা হল, চোয়াল শক্ত হয়ে ফুটে উঠল সরু গোঁফ, মাথার সামনের চুল অদৃশ্য হয়ে কপাল বিস্তৃত হল, সেখানে দপদপ করছে নীল শিরা। একটা জেলির তাল যেন নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করল নতুন মানুষ।

ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব!

মেঝেতে পড়ে থাকা শ্রীবাস্তব দেখলেন অবিকল তাঁরই চেহারার একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে হাসছে। টিরার ভয়ঙ্কর প্রাণীর দাবা খেলার শেষ চাল। আসল ডক্টরকে খুন করে নকল ডক্টর শ্রীবাস্তব নিরাপদে নির্বিঘ্নে নেমে যাবে মহাকাশযান থেকে। কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। সে সেন্ট্রাল ক্লিনিকে গিয়ে আসল মানুষগুলোকে খতম করে মুক্তি দেবে নকল মানুষগুলোকে। তারা বুকভরা হিংসা ও লালসা নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। তারপর...।

নকল মানুষটা তখন দু-হাতে তুলে নিয়েছে ইস্পাতের তৈরি অস্বাভাবিক ভারী একটা কন্ট্রোল-বক্স। কয়েক মুহূর্ত...তারপরই সব শেষ হয়ে যাবে...প্রাণপণ

শক্তিতে শরীরটাকে দু-পাক গড়িয়ে শকারের কাছে এগিয়ে গেলেন মোহন শ্রীবাস্তব। সুস্থ বাঁ-হাতে কোনওরকমে তুলে নিলেন আলট্রাসনিক-শকার। ভারী কন্ট্রোল-বক্সটা ছুটে আসছে তাঁর দেহ লক্ষ্য করে। ঝাঁকুনি দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে যন্ত্রণায় চোখ বুজে শকারের ট্রিগার টিপলেন ডক্টর। হাই এনার্জি আলট্রাসনিক ওয়েভ ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ল শত্রুকে লক্ষ্য করে। ঝনঝন শব্দে কন্ট্রোল-বক্স দেওয়ালে আছড়ে পড়ল। একটা মরণ-আর্তনাদ বেরিয়ে এল শত্রুর ঠোঁট চিরে। কেঁপে-কেঁপে প্রতিধ্বনি তুলে সেটা মিলিয়ে গেল সোলারের গহ্বরে-কন্দরে।

নকল শ্রীবাস্তবের দেহটা আবার নমনীয় হয়ে গেল। মেঝেতে আছড়ে পড়ল সশব্দে। অবয়বহীন হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল বেগুনি জেলির তাল। তখনও কাঁপছে তিরতির করে। কমল সেনগুপ্তের মতো।

শকারটা ফেলে দিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন মোহন শ্রীবাস্তব। হাতমুখ ঘাম ও রক্তে মাখামাখি। শরীর ক্লান্ত, দুর্বল। কিন্তু আত্মবিশ্বাস এখন যেন শতগুণ বেড়ে গেছে। সামান্য খোঁজ করতেই দরজার লকের চাবিটা দেখতে পেলেন তিনি। জেলির পিণ্ড থেকে কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে সেটা তুলে নিলেন। ধাতব চাবিতে এখনও এক অদ্ভুত উত্তাপ।

করিডর ধরে রওনা হওয়ার আগে আলট্রাসনিক-শকার থেকে জেলি লক্ষ্য করে আর-একবার ফায়ার করলেন শ্রীবাস্তব। জেলির কাঁপন স্থির হয়ে গেল। সব শেষ!

চোয়াল শক্ত করে সোলারের প্রধান দরজার দিকে এগোলেন ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব। মনে-মনে উচ্চারণ করলেন ঃ সেন্ট্রাল ক্লিনিকে টিরার প্রাণী যদি কেউ থেকে থাকো তা হলে মরবার জন্যে তৈরি হও। ডক্টর মোহন শ্রীবাস্তব তোমাদের খতম করতে আসছে।





ইনস্পেক্টর রনি ও অলৌকিক সার্কাস

সার্কাসের বাঘের খেলা থেকেই যত গোলমালের শুরু।

সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। একাই। কিন্তু সার্কাস দেখতে আমার এখন আর ভালো লাগে না। কারণ, সার্কাস দেখতে গেলে মনে পড়ে যায় আমার মেয়ে টুসির কথা। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকবার সার্কাস দেখেছি। ও বাঘ-সিংহের খেলা দেখতে ভালোবাসত। লাল-নীল-সবুজ রঙের ম্যাকাও পাখির কেরামতি দেখে ছোট-ছোট হাতে খুব হাততালি দিত। কতই বা বয়েস ছিল তখন ওর—বড় জোর আট। এখন যদি ও আমার পাশে থাকত তা হলে বয়েসটা আরও দু-বছর বেশি হত।

বাঘের খেলা দেখাচ্ছিল রিং-মাস্টার। পরনে সোনালি রঙের পোশাক, হাতে বৈদ্যুতিক চাবুক। তাকে ঘিরে ন'টা হিংস্র ডোরা-কাটা বাঘ ভিজে বেড়ালের মতো বসে আছে। দেখে কে বলবে, এদের থাবার এক ঘায়ে এরকম আড়াইজন রিং-মাস্টার খতম হয়ে যেতে পারে!

সার্কাসটা একটু নতুনরকমের। বাঘের খেলা বা সিংহের খেলা দেখানোর সময়ে এরা কোনওরকম লোহার রেলিং ব্যবহার করে না। তার বদলে কাজে লাগায় অদৃশ্য ফোর্স ফিল্ড। সেটা পেরিয়ে জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ, কেউই দর্শকদের নাগাল পাবে না। এ ছাড়া, দর্শকদের সুবিধের জন্যে প্রায় দোতলা-সমান

উঁচুতে টাঙানো রয়েছে চার-চারটে বিশাল মাপের লিকুইড ক্রিস্টাল টিভি পরদা। তাতে বাঘ আর রিং-মাস্টারের মুখের ক্লোজ আপ ছবি দেখা যাচ্ছিল।

আমার ঠিক পাশেই বসেছিল বছর পাঁচেকের একটা বাচ্চা মেয়ে। গায়ের রং কালো, তবে মুখখানা ভারী মিষ্টি। মাথা-ভরতি কোঁকড়া চুল। তাতে আবার লাল ফিতে বাঁধা। পরনে গোলাপি রঙের ফ্রক। সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা পুতুল।

বাচ্চা মেয়েটা হাত-পা নেড়ে ফুরফুর করে কথার খই ফোটাচ্ছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বাবা-মাকে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছিল। প্রশ্নের বিষয়ও যথারীতি বহুমুখী। যেমন, বাঘের লেজ কেন রাস্তার কুকুরের মতো গোল পাকিয়ে থাকে না, বাঘ যদি সিংহের মতো দেখতে হত তাহলে কী হত, ডোরা-কাটা বাঘা বেড়ালের সঙ্গে বাঘের সত্যি-সত্যিই কোনও আত্মীয়তা আছে কি না, ইত্যাদি।

মেয়েটার বাবা শেষ পর্যন্ত আর না পেরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কী সাংঘাতিক মেয়ে দেখেছেন! কোথায় মন দিয়ে বাঘ দেখবে, তা না, খালি উদ্ভট সব প্রশ্ন—।'

আমি হাসলাম। মুখের পেশিতে সামান্য টান লাগল। একটা স্বাভাবিক জবাব দেওয়া দরকার। ভদ্রলোক যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন আমার বুকের ভেতরে রয়েছে একটা মাইক্রোপ্রসেসর চিপ, আর মস্তিষ্কের খানিকটা অংশ জুড়ে রয়েছে অর্ধপরিবাহী স্মৃতিকোষ।

তাই অনেকক্ষণ সময় নিয়ে তারপর জবাব দিলাম, 'তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি! কী নাম তোমার?'

মেয়েটা চটপট বলে উঠল, 'আমার নাম শর্বরী। শর্বরী মানে রাত্রি—।'

ওর জবাব দেওয়ার ঢং দেখে আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম। ঠিক তখনই জোরালো সুরে বাজনা বেজে উঠল, আর সেটা ছাপিয়ে শোনা গেল বাঘের গর্জন।

সাধারণ সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর সময় কোনওরকম মিউজিক বাজানো হয় না। কিন্তু এই সার্কাসের সবই একটু অন্যরকম।

আমি শর্বরীকে বললাম, 'তুমি এক-দুই গুনতে পারো?'

ও ঝটিতি ছোট্ট মাথাটাকে কাত করে, প্রায় কাঁধে ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—।'

'তা হলে তুমি বাঘ গুনতে থাকো—।'

টুসিকে শান্ত করার জন্যে এই কৌশলটা মাঝে-মাঝে কাজে লাগাতাম আমি।

আমার কথায় শর্বরী ছোট্ট হাতের তর্জনী উঁচিয়ে 'এক-দুই' করে বাঘ গুনতে শুরু করল।

শর্বরীর মা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'আপনি একাই সার্কাস দেখতে এসেছেন?'

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ—।'

এই অপরিচিত মানুষ দুজনকে কী করে আমি বলি, আমার আর কেউ নেই! টুসিকে নিয়ে শেষ যখন সার্কাস দেখতে এসেছিলাম তখন সঙ্গে সুনন্দা ছিল। এই শর্বরীর মতো টুসিও এসেছিল ওর মা-বাবার সঙ্গে। তারপর হল সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা। আমাকে নিয়ে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। শেষপর্যন্ত মানুষ জিতল বটে, তবে টুসি আর সুনন্দা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রোবট গবেষণায় তাক লাগিয়ে-দেওয়া এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার আমাকে নতুন জীবন দিলেন। ব্যাটারি, তার, মাইক্রোপ্রসেসর, আই সি চিপ, ধাতুর পাত এইসব কেমন করে যেন ঢুকিয়ে দিলেন আমার শরীরের নানা জায়গায়। সেইসঙ্গে কীসব জটিল প্রোগ্রাম চালু করে দিয়েছিলেন। ব্যস! লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অপারেশন ডিভিশনের ইন্সপেক্টর রনি সরকার নতুন জীবন ফিরে পেল। কিন্তু কী অদ্ভুত আমার এই নতুন জীবন! থেমে যাওয়া জীবনকে আবার প্রাণের জোগান দিল ইলেকট্রনিক্স, আর বিশ্বকর্মা ডক্টর মজুমদার—আমার ঈশ্বর, আমার জীবনদাতা। প্রতি মাসে আমি একবার করে ওঁর কাছে যাই, রুটিন চেক আপের জন্যে।

আমার পুরোনো স্মৃতির প্রায় সবটুকুই মুছে গিয়েছিল, কিন্তু ধীরে-ধীরে সেগুলো ফিরে পাচ্ছি। টুসি আর সুনন্দার খোঁজ এখনও করিনি। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, 'এখনও সময় হয়নি—তুমি এখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যন্ত্র, আর পঞ্চাশ ভাগ মানুষ। তোমার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আরও সময় লাগবে। সেই সময়টা যাতে কম লাগে তার জন্যে তোমাকে স্বাভাবিক সব কাজকর্ম করতে হবে। আগের জীবনে যা যা করতে সেইসব কাজ করবে—।'

ডক্টর মজুমদারের পরামর্শেই আমার আজ সার্কাস দেখতে আসা। অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়েছি বিশ্রামের জন্যে। আজ তার দ্বিতীয় দিন।

শর্বরীর বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে তখনও আমাকে দেখছিলেন। শর্বরীর মাও আড়চোখে দেখছেন আমাকে। আমি একটু অস্বস্তি পেলাম। কারণ আমার অভিব্যক্তিগুলো এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ওঁরা সেটা ধরে ফেলেননি তো! তা ছাড়া, আমার গলার স্বরে সামান্য মেটালিক আওয়াজ থেকে গেছে। ফলে ওঁদের সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

কিছু একটা ভেবে বলতে যাব, তার আগেই শর্বরী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি বাঘ গুনতে পারব না। একবার আটটা হচ্ছে, একবার ন-টা হচ্ছে—।'

আমি এবার একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললাম, 'বাচ্চা মেয়ে তো, ভালো করে গুনতে শেখোনি।'

আমার কথায় শর্বরী একেবারে চোখ গোল-গোল করে চেঁচিয়ে উঠল, 'না, আমি হানড্রেড পর্যন্ত কাউন্ট করতে জানি। বিশ্বাস না হয়—।'

তখনই বিশ্বাস হল আমার। দেখলাম, রিং-মাস্টার আটটা বাঘ নিয়ে খেলা

দেখাচ্ছে। অথচ একটু আগেই ন-টা বাঘ ছিল—আমি নিজে দেখেছি। আমার শরীরের ভেতরে রাখা ডিজিটাল কাউন্টারে সেই সংখ্যাটা ধরাও পড়েছিল। কিন্তু এখন আটটা। এটা কি ডক্টর মজুমদার বিশ্বাস করবেন? নাকি আমার প্রোগ্রাম বা সার্কিটের গোলমাল বলে ধরে নেবেন?

'দেখেছেন, ওই বাঘটা মাপে কীরকম বড়!' একটা বাঘের দিকে আঙুল তুলে মন্তব্য করলেন শর্বরীর বাবা। চোখের চশমাটা একবার নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে বসালেন।

বাঘটাকে আমিও দেখলাম। সত্যিই মাপে বেশ বড়। আর গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলোও যেন একটু অন্যরকম। আর একই সঙ্গে লক্ষ করলাম, বাঘের সংখ্যা এখন আবার নয়।

শর্বরীর বাবা-মা দুজনেই এটা লক্ষ করেছিলেন। চারপাশে তাকিয়ে বুঝলাম, আরও কয়েকজন যে ব্যাপারটা খেয়াল করেননি তা নয়। আর আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে রিং-মাস্টারের অসহায় হতভম্ব অভিব্যক্তি স্পষ্ট ধরা পড়ল। চার পাশে আলোর ফোয়ারা, বাজনার ছন্দ, টিভি-পরদায় বাঘের ছবি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। দেখলাম, সার্কাস-কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট গ্যালারিতে বেশ ভিড়। দু-একজন কর্তাব্যক্তি আঙুল তুলে এরিনার দিকে দেখাচ্ছেন। বাঘের গোলমালটা ওঁদেরও নজরে পড়েছে।

কী করব ভেবে ওঠার আগেই সেই প্রকাণ্ড বাঘটা হঠাৎই ফোর্স ফিল্ডের অদৃশ্য দেওয়াল লক্ষ করে লাফ দিল। সাধারণভাবে ফোর্স ফিল্ডে বাধা পেয়ে বাঘটার থেমে যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছুই হল না। ওটা দিব্যি এসে পড়ল দর্শকদের এলাকায়।

আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হইচই।

চিৎকার-চেঁচামেচি-ছুটোছুটি। মাইকে বারবার ঘোষণা করা হতে লাগল, 'আপনারা শান্ত হন। বাইরে যাওয়ার সবক'টা দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তাকর্মীরা কাজে নেমে পড়েছে...।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! চেয়ার উলটে পড়ল, গ্যালারি ভেঙে পড়ল। আর বেপরোয়া ছুটোছুটি চলতেই থাকল। অথচ বাঘটাকে তখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

বাইরে যাওয়ার আটটা দরজাই দর্শকদের ভিড়ে ঠাসা। সেখান দিয়ে বাঘটা যে বেরিয়ে যাবে তার কোনও উপায় নেই। আর রিং-মাস্টারের কাছে চুপচাপ বসে আছে আটটা ডোরা-কাটা পশু।

শর্বরীর বাবা-মা ভয়ে চিৎকার করছিলেন। বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কোথা দিয়ে পালাবেন বুঝতে পারছিলেন না। আমি শর্বরীকে কোলে তুলে নিলাম। মেয়েটা পালকের মতো হালকা। মাকে কাঁদতে দেখে ওরও মুখ কাঁদো-কাঁদো। ওকে কোলে

নিয়ে এগোতে এগোতে বললাম, 'আপনারা আমার পেছনে-পেছনে আসুন—।'

সবুজ ইউনিফর্ম পরা নিরাপত্তাকর্মীর দল তখন তাঁবুর চারপাশটা ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শকার। ওরা হন্যে হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বাঘটাকে খুঁজছে। আর বেয়াদব দর্শকদের শাসন করছে। কিন্তু বাঘের কোনও দেখা নেই। কোথায় গেল অত বড় জন্তুটা?

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছিলাম। আর একইসঙ্গে চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা দেখছিলাম। ছুটোছুটি-ধাক্কাধাক্কি-হইচই যেমন চলছিল তেমনই চলছে। রিং-মাস্টার আটটা বাঘ নিয়ে চলে যাচ্ছে এরিনা ছেড়ে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে অবিরাম। নিরাপত্তাকর্মীরা দিশেহারা দর্শকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

স্বাভাবিক কারণেই দর্শকের ভিড় দরজার কাছেই বেশি। আমি সেদিকে না গিয়ে দুটো দরজার মাঝ-বরাবর একটা ফাঁকা জায়গা লক্ষ করে এগোলাম। শর্বরীর বাবা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এখান দিয়ে কী করে বেরোবেন?'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থা বা সময় কোনওটাই ছিল না। টের পেলাম, শর্বরীর মা আমার শার্টের পিঠের দিকটা খামচে ধরে আছেন।

সার্কাসের গোটা এলাকাটা প্লাইউড আর টিন দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে সুন্দর গোলাপি রঙের আস্তর থাকায় সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। বোঝা গেল দেওয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দেওয়ার পর।

শর্বরীকে ডানহাতে সামলে রেখে আমি প্রথম ঘুসিটা মেরেছিলাম বাঁ-হাতে। তাতেই বেশ বড়সড়ো একটা গর্ত হয়ে ফেটে গেল প্লাইউডের দেওয়াল। তার ওপাশের টিনও গেল তুবড়ে। কিন্তু এখান দিয়ে বেরোতে গেলে ভাঙতে হবে অনেকটাই, আর হাতেও খুব বেশি সময় নেই। তাই শর্বরীকে ওর মায়ের কোলে দিয়ে পরের ঘুসিটা মারলাম ডান হাতে। আর তারপরই ডানপায়ের দুটো জোরালো লাথি।

বেশ জোরে শব্দ হল। প্লাইউডের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে ওপাশের একটা টিন ভেঙে পড়ে গেল। শর্বরীদের ডেকে নিয়ে বেরোতে যাব, কোথা থেকে একজন নিরাপত্তাকর্মী ছুটে এল আমাদের সামনে। আমার দিকে শকার উঁচিয়ে বলল, 'ফ্রিজ! আপনাকে আমার সঙ্গে অফিসে আসতে হবে। আপনি কোম্পানির প্রপার্টি ড্যামেজ করেছেন—।'

আমি জামার বুকপকেট থেকে ম্যাগনেটিক আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে লোকটির দিকে উঁচিয়ে ধরলাম। কার্ডে আমার হলোগ্রাফিক ফটো রয়েছে। রয়েছে পরিচয়।

কার্ডটা ওর চোখের সামনে নেড়ে বললাম, 'ইনস্পেক্টর রনি সরকার অপারেশন ডিভিশন, লালবাজার! সরি অফিসার, এখন আপনার সঙ্গে যাওয়ার

সময় নেই—পরে এসে কথা বলব—।' কার্ডটা আবার রেখে দিলাম পকেটে।

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটা শকার ফায়ার করতে যাচ্ছিল, তাই আমি বাঁ-হাতের তর্জনী শক্ত করে ওর কপালের ঠিক মাঝখানে এক টোকা মারলাম। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল। জানা কথা—হবেই। কারণ আমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো ইস্পাতের রড দিয়ে তৈরি। লোকটা কাত হয়ে পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে টাল সামলে নিল। আর একই সঙ্গে শকারটা মুগুরের মতো ঘুরিয়ে চালিয়ে দিল আমার মুখ লক্ষ্য করে। আমি আড়াআড়িভাবে বাঁ-হাত তুলে সেটা রুখে দিলাম। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের শব্দ হল। আর সংঘর্ষের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লোকটার হাতে গিয়ে পৌঁছোল। ও শকার ছেড়ে দিয়ে হাত ঝাঁকাতে লাগল। অবাক হয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

শর্বরী ততক্ষণে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আর দেওয়ালের ফোকর দিয়ে লোকজন বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। আমি নিরাপত্তাকর্মীর গাল টিপে ধরলাম বাঁ-হাতের দু-আঙুলে। ওর চোখ দেখে বুঝলাম, দু-গালে লোহা টের পেতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বললাম, 'এই দেওয়াল ভাঙা নিয়ে আমরা পরে কখনও কথা বলব, অফিসার। আমার নামটা মনে আছে তো! রনি সরকার, অপারেশন ডিভিশন, লালবাজার—।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে আমি দেওয়ালের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তাতে ফাঁকটা বোধহয় আরও খানিকটা বড় হয়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, শর্বরীরা আমার ঠিক পিছনেই আছে। ওদের পিছনে অন্যান্য লোকজনের ভিড়।

বাইরের খোলা মাঠে বেরোতেই ঠান্ডা বাতাস টের পেলাম। আমার শরীরের টেম্পারেচার সেন্সরগুলো ঠিকমতো কাজ করছে তা হলে! মাঝে-মাঝে ওগুলো গোলমাল করে। ওপরে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার আকাশে লালচে মেঘ জমেছে। দূরে হয়তো কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। শর্বরীর বাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'টালা পার্কের দরজার কাছে আমাদের গাড়ি রয়েছে—।'

আমি বললাম, 'আপনারা জলদি চলে যান। শর্বরীকে সামনে রাখবেন।'

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। তাঁর চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা। একটা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিলেন আমার বুকপকেটে। বললেন, 'একদিন সময় করে এলে সত্যি খুব খুশি হব।'

শর্বরীর মা ছোট্ট করে 'আসি' বললেন। ওঁর কাঁধে এলিয়ে-থাকা শর্বরী কচি গলায় বলল, 'টা টা, আঙ্কল—।'

আমি হাত নাড়লাম। ওঁরা একরকম ছুটে চলে গেলেন।

সার্কাস এলাকার বাইরেটা খোলা মাঠ। তার একটা পাশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাকা রাস্তায়। সার্কাস থেকে বেরিয়ে সেই ঢাল বেয়ে মানুষের ভিড় ছুটে চলেছে রাস্তার দিকে। সার্কাসে ঢোকার সময়ে দেখেছিলাম, বাইরেটায় ঘুগনি, ফুচকা,

ভেলপুরি, গ্যাস বেলুন এসব বিক্রি হচ্ছে। এখন সেসব চোখে পড়ার উপায় নেই। শুধু দেখি তিনটে লাল-হলদে গ্যাস বেলুন সুতো-ছেঁড়া অবস্থায় ভেসে যাচ্ছে আকাশে।

আমি নীচের রাস্তায় নেমে এসে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালাম।

এদিকটা অন্ধকার। সার্কাস এলাকার হ্যালোজেন বাতির আলো এতদূর এসে পৌঁছোতে পারেনি। পেছনের পকেট থেকে মিনি সেলুলার ফোন বের করে অপারেশন ডিভিশনে যোগাযোগ করলাম। বললাম, 'টালা পার্কের কাছে ''রকেট সার্কাস''-এ একটা ঝামেলা হয়েছে।'

ওপাশে ফোন ধরেছিলেন সার্জেন্ট রমাতোষ নন্দী। ভদ্রলোকের বুদ্ধি কম, তবে পরিশ্রম দিয়ে সেটা পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আর বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হলেও দেখায় পঁয়ষট্টির মতো।

নন্দী জিগ্যেস করলেন, 'সরকার, আপনি ওখানে কী করছিলেন?'

সত্যি কথাটাই বললাম, 'সার্কাস দেখছিলাম।'

কয়েক সেকেন্ড ওপাশে হাসির ফোয়ারা ছুটল। শুধু রমাতোষ নন্দী কেন, হেড কোয়ার্টারের প্রায় সকলেই জানে আমার সঙ্গে সার্কাস দেখার মতো কেউ নেই। আসল রনি সরকারের ছিল। রনির সেই পুরোনো জীবনের সঙ্গে নতুন জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা এখন আমাকে বলতে গেলে মানুষ বলেই মনে করে না। কিন্তু সম্পর্ক যে সত্যি একটা আছে সেটা মানি শুধু আমি আর ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার।

অনেকক্ষণ পর নন্দী বললেন, 'আপনি তো এখন ছুটিতে রয়েছেন—।'

'আমি এই মুহূর্তে লিভ ক্যান্সেল করছি। আপনি বসকে জানিয়ে দেবেন। আর এখানে জলদি কাউকে পাঠান। দুজন হলে কাজের সুবিধে হয়। আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।'

নন্দী কী একটা অজুহাত দেখাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি টেলিফোনের সুইচ অফ করে দিয়েছি।

পরের টেলিফোনটা করলাম আর জি কর হাসপাতালে। ফোন করে 'রকেট সার্কাস'-এর গোলমালের কথা বলতেই ওরা বলল, একটু আগেই খবর পেয়েছে। এক্ষুনি ওরা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছে।

ফোনটা অফ করে পকেটে রেখে 'রকেট সার্কাস'-এর দিকে তাকালাম। বিশাল উঁচু তাঁবু। তাকে ঘিরে নানা রঙের আলোর নকশা। সার্কাসের কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস খেলার মডেলও তৈরি করা হয়েছে আলো দিয়ে। আর তার সঙ্গে তার মন-মাতানো বাজনা।

বাইরেটা এত জমকালো, অথচ ভেতরে আতঙ্ক! ফোর্স ফিল্ডকে অগ্রাহ্য করে একটা বাঘ এরিনার বাইরে পালিয়েছে এবং চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

হইচই এখন অনেক কমে গেছে। লোকজনের ছুটোছুটিও নেই। শুধু এখানে-ওখানে নানা জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তারই মধ্যে সার্কাসের নিরাপত্তাকর্মীরা ঘোরাফেরা করছে। আহত ক্ষতবিক্ষত মানুষদের ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের চাপে পায়ের নীচে পিষে কেউ মারা গেছে কি না কে জানে!

আমি ভারী-ভারী পা ফেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। পকেট থেকে রিমোট ইউনিট বের করে বোতাম টিপতেই গাড়ির অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। আমি ভেতরে ঢুকে বসতেই দরজাটা নিজে থেকে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সুইচ টিপে গাড়ির মাথায় বসানো ঘুরপাক খাওয়া লাল-নীল বাতি জ্বেলে দিলাম। এর ফলে লালবাজার থেকে যে-ই আসুক, আমাকে চট করে খুঁজে পাবে।

আমি ছুটিতে থাকলেও অফিস আমাকে গাড়িটা সবসময় ব্যবহার করতে দেয়। যেমন, এই মুহূর্তে আমার উরুর লাগোয়া সিকিওরিটি চেম্বারে একটা হেভি ডিউটি জেনারেটর গান রয়েছে। এটাও অফিস আমাকে সবসময় ব্যবহার করতে দেয়।

আমি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘরে এয়ারকুলার চলছিল। লুকোনো হলদে আলো সুদৃশ্য ঘরটাকে সমানভাবে আলোকিত করে রেখেছে। আমার সামনে সাদা ধবধবে টেবিল। টেবিলে পৃথিবীর একটা রঙিন ছবি। ছবিটা থেকে-থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রং পালটাচ্ছে। বোধহয় ক্রেমোস্ক্যান টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে।

টেবিলটা মাপে বেশ বড়। তার একদিকে আমি আর সার্জেন্ট সন্দীপ বর্মন। হেড কোয়ার্টার থেকে ওকেই পাঠিয়েছে। ও আমাকে এখনও ঠিক সহজভাবে নিতে পারে না, কিন্তু খুব একটা অপছন্দও করে না।

সন্দীপ বর্মন একটু আগেই এসে পৌঁছেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকতে-ঢুকতে আমি ব্যাপারটা মোটামুটি ওকে খুলে বলেছি। 'রকেট সার্কাস'-এর নিরাপত্তাকর্মীরা এখনও আটটা দরজায় শকার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে আহত মানুষদের কাতর আর্তনাদ। এই নিরাপত্তাকর্মীরাই সম্ভবত ত্রাণের কাজে হাত লাগিয়েছে। ওদের একজনকে ডেকে জানালাম আমাদের পরিচয়। বললাম, সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাতে সন্দেহ-মাখা নজরে আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুজন অফিসার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চলার পথে দেওয়ালের ভাঙা জায়গাটা বর্মনের চোখে পড়ল। সেখানে একজন নিরাপত্তা কর্মী পাহারায় ছিল। ও সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,

'সরকার, এটা দেখেছেন?'

আমি ছোট্ট করে বললাম, 'আমি ওখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।'

আমার কথা শুনে আমাদের সঙ্গের দুজন লোক অবাক হয়ে আমাকে খানিকক্ষণ দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

বর্মন পকেট থেকে সিগারেট বের করে ফস করে লাইটার জ্বেলে ধরাল। একটু ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বলল, 'দেখবেন, বসকে যেন আবার ফস্ করে বলে দেবেন না। তা হলে আমার চাকরিটা লস হয়ে যাবে।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। বর্মনের এই একটা মারাত্মক দোষ। ভীষণ সিগারেটের নেশা। অন ডিউটি অফ ডিউটি মানে না।

একটু পরেই আমরা একটা অফিসঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। কানে এল বাঘ অথবা সিংহের গর্জন। আর তারপরই হাতির ডাক। একজন নিরাপত্তা কর্মী বলল, 'আপনারা এখানে একটু ওয়েট করুন—।' তারপর সবুজ রঙের একটা প্লাস্টিকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। দরজার নেমপ্লেটে ঝকঝকে তামার ওপরে টানা-টানা সুন্দর হরফে লেখা রয়েছে—ড. পি. বিজয় রাঘবন। প্রোপ্রাইটার, রকেট সার্কাস।

বর্মন চাপা গলায় আমাকে বলল, 'কী-কী জিগ্যেস করবেন ভেবে রেখেছেন?'

আমি বর্মনের ঠোঁটের দিকে দেখলাম। ঠোঁট নড়া দেখে আমি কথা বুঝতে পারি। চাপা গলায় কেন, ফিশফিশ করে বললেও কারও কথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয় না। বর্মনের কথার উত্তরে বললাম, 'এখনও কিছুই ভাবিনি।'

এমনসময় ভেতর থেকে ডাক এল। বর্মন সিগারেটটা ফেলে দিল একপাশে। তারপর আমরা দুজনে ডক্টর রাঘবনের চেম্বারে ঢুকলাম।

সুন্দরভাবে সাজানো ঘর। ঘরের চার দেওয়ালেই সার্কাসের নানা খেলার রঙিন ফটোগ্রাফ। ড. রাঘবন লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আলতো করে ওঁর হাত ধরলাম, যাতে ব্যথা না লাগে। একই সঙ্গে ওঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

রাঘবন বেশ মোটাসোটা লোক। মাথার চুল প্রায় কদমছাঁট। গায়ের রং মাঝারি। ছাই রঙের একটা কোট পরে রয়েছেন—সেটা বোধহয় ঘরের তাপমাত্রার জন্যে। কপালে সাদা আর লাল টিপের ছোঁওয়া। গলায় চর্বির থাক।

পরিচয় দিয়ে আমি আর বর্মন বসলাম রাঘবনের মুখোমুখি চেয়ারে। আমি বেশ সাবধানেই বসেছি, কিন্তু তাও স্টিল ফ্রেমের চেয়ারে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হল। গদিটাও যেন বসে গেল অনেকটা।

রাঘবন নিজের চেয়ারে বসলেন। তারপর সামনে দাঁড়ানো লম্বা-চওড়া

মানুষটিকে বললেন, 'কৃষ্ণন, তুমিও বসো, কথা আছে।'

রিং-মাস্টার কৃষ্ণনকে আমি আগেই চিনতে পেরেছি। এখন ওর পোশাক-আশাক পালটে গেছে, কিন্তু উপায় কী! কোনও মুখ একবার দেখলে সেটা আমি আর ভুলি না। তবে আমার এই অদ্ভুত ক্ষমতার সবটুকু কৃতিত্বই ডক্টর অভিজিৎ মজুমদারের।

কৃষ্ণন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। লক্ষ করলাম, ওর চোখেমুখে কেমন একটা বেপরোয়া রুক্ষ ভাব। হয়তো সবসময় বাঘ-সিংহ নিয়ে খেলা দেখায় বলে একটা আলগা অহংকার লেগে আছে।

রাঘবন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইন্সপেক্টর সরকার, আমি আর কৃষ্ণন ওই বাঘের গোলমালের ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। আমাদের বাঘ ন'টা। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ আটটা বাঘ নিয়েই কৃষ্ণন শো করছে। কারণ আমাদের একটা ফিমেল বাঘ পদ্মিনী চারদিন আগে খাঁচায় মারপিট করে চোট পেয়েছে।'

রাঘবনের কথার খেই ধরে কৃষ্ণন বলল, 'নাকের পাশে আর কাঁধের কাছটায় বেশ চোট পেয়েছে। অনেকটা রক্ত পড়েছে। আমাদের দলের ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছেন, ইনজেকশানও দিয়েছেন। এ ক'দিন ধরে পদ্মিনী আলাদা খাঁচায় রয়েছে। একটু আগেই ওকে দেখে এলাম। এরিনায় ও আসেনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ন-টা বাঘ আমিও দেখেছি। তক্ষুনি কীরকম যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। সঙ্গে রঙিন আলোর ঝলকানি এবং ভিডিও টেলিফোনের পরদায় একজন নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা গেল। তার চোখেমুখে উত্তেজনা ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

রাঘবন গম্ভীর থমথমে গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, মনসুর?'

'স্যার, হাসপাতাল থেকে লোকজন নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছে। উন্ডেডদের আমরা গাড়িতে তুলে দিয়েছি। আর বাকিদের ফার্স্ট এইড দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু—।'

'কেউ মারাটারা যায়নি তো!'

'না, স্যার। টেন্ট এখন বলতে গেলে ফাঁকা। শুধু আমরাই চারপাশ গার্ড দিচ্ছি। আর তিনজন সুইপার টেন্ট ঝাঁট দিয়ে সাফ করছে।'

'গুড।' রাঘবন তৃপ্তির শব্দ করলেন জিভে। তারপর বললেন, 'তোমরা সবদিকে কড়া নজর রাখো। লালবাজার থেকে পুলিশ অফিসাররা এসেছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলছি। কৃষ্ণনও আমার কাছে আছে। লক্ষ রাখবে, টেন্ট থেকে অচেনা কেউ যেন তোমাদের নজর এড়িয়ে বেরোতে না পারে। আর উটকো কোনও লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। দিস ইজ মাই অর্ডার।'

'ওকে স্যার।' মনসুর ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিল। লোকটা যে ভয় পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন?

'কিন্তু একটা কথা ছিল, স্যার—।'

রাঘবন ভিডিয়ো ফোন অফ করতে গিয়ে থমকে গেলেন।

'কী কথা, মনসুর?'

'টেন্টের মধ্যে কিছু একটা ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটার চলার আওয়াজ পাচ্ছি, বুঝতেও পারছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

রাঘবন যে ঢোঁক গিললেন সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। তাঁর চোখ দুটো বড় হতে চাইছিল, কিন্তু তিনি ঝটিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। উত্তেজিত গলায় বললেন, 'হোয়াট দ্য হেল ডু য়ু মিন?'

'যা বলছি, সব সত্যি, স্যার। আমরা একটু নার্ভাস হয়ে গেছি।'

রাঘবন আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ইন্সপেক্টর সরকার, কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম। তবে এটা বুঝলাম, মনসুর মিথ্যে বলছে না। কারণ ঘণ্টাখানেক আগে, সার্কাস চলার সময়ে, বাঘটা যখন ফোর্স ফিল্ড অগ্রাহ্য করে লাফ দেয়, তখন আমি দেখেছি। লাফ দেওয়ার পরে বাঘটাকে আর দেখা যায়নি।

রাঘবনকে বললাম, 'মনসুর ঠিকই বলছে। চলুন, ওখানে গিয়ে দেখা যাক।'

ডক্টর রাঘবন ভিডিওফোনে বললেন, 'ওকে, মনসুর, আমি যাচ্ছি। তুমি চ্যাটার্জিকে বলো, স্ট্রং ফোর্স ফিল্ড অ্যাপ্লাই করে গোটা তাঁবুটাকে ঘিরে ফেলতে আর তোমরা প্রত্যেকে অ্যালার্ট থাকো।'

ফোন অফ করে দিলেন রাঘবন। আর তখনই কৃষ্ণন চাপাগলায় বলে উঠল, 'ওটা বাঘ নয়। হয়তো কোনও অপদেবতা, জিন।'

আমি অবাক হয়ে কৃষ্ণনকে দেখলাম। ও সত্যিই ভয় পেয়েছে। নইলে এরকম হাস্যকর কথা কখনও বলত না। ছেলে-ভোলানো গল্প তৈরি করতেই একমাত্র অপদেবতা-জিনজাতীয় বস্তুগুলো কাজে লাগে। বাস্তবের ডিকশনারিতে এদের নাম নেই, কখনও ছিল না।

আমরা চারজন উঠে দাঁড়ালাম প্রায় একই সঙ্গে। দরজার কাছে যেতেই দরজাটা নিজে থেকে খুলে গেল। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় বর্মন আমার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সরকার, এই প্রবলেম সল্‌ভ করতে গেলে পুলিশ দিয়ে কোনও কাজ হবে না, ম্যাজিশিয়ান দরকার।'

আমি বর্মনের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলাম। মুখের পেশিতে যথারীতি টান লাগল। তবে এটা ভেবে ভালো লাগল যে, আমি রসিকতা বুঝতে পারছি। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, রসিকতা বোঝাটা কোনও যন্ত্রমানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র সুস্থ মানুষই রসিকতা বুঝতে পারে। তা হলে আমি কী?

প্লাস্টিকের পাতে তৈরি মসৃণ রাস্তা ধরে আমরা এরিনার দিকে এগিয়ে

গেলাম। জন্তু-জানোয়ারের চাপা গর্জন কানে আসছে। সার্কাসের খেলোয়াড়রা এখানে-ওখানে জটলা করছে। এরিনার এলাকায় ওদের ঢোকা এখন বারণ। তাই সিকিওরিটি গার্ডদের কাছ থেকে শোনা কথার ওপর নির্ভর করে যে যার মতো গল্পগুজব করছে।

চলার পথে একজন লোক আমাদের দলে যোগ দিল। পরনে তার নিরাপত্তা কর্মীদের সবুজ ইউনিফর্ম। বুকে একটা লাল রঙের ব্যাজ লাগানো। তার চারপাশে নীল বর্ডার।

ডক্টর রাঘবনের পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে সে বলল, 'স্যার, ফোর্স ফিল্ড চালু হয়ে গেছে। তবে ফোর্স ফিল্ড দিয়ে ওই ইয়েটাকে বোধহয় ঠেকানো যাবে না।'

রাঘবন আমার আর বর্মনের সঙ্গে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনুদীপ চট্টোপাধ্যায়—'রকেট সার্কাস'-এর সিকিওরিটি চিফ। আমি চ্যাটার্জির সঙ্গে হাত মেলালাম। টের পেলাম, ওর গায়ে চিফ হওয়ার শক্তি আছে।

আমাদের দু-পাশে ছোট-ছোট তাঁবু। তার দরজায়-দরজায় কৌতূহলী চোখমুখ। হ্যালোজেন বাতির আলোয় সেইসব মুখে ভয়ের ছাপও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। বর্মন চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছিল। রঙিন ফাইবার গ্লাসের খুঁটি, হ্যালোজেন বাতি, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে—'রকেট সার্কাস'-এর জাঁকজমকের কোনও খামতি নেই। ডক্টর রাঘবন কত টাকা ঢেলেছেন কে জানে!

ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় এগারোটা। কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই। আমার তো স্লিপ সার্কিট 'অন' না করলে ঘুম পায় না। সুতরাং যখন-তখন ঘুম পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। অনুদীপ চ্যাটার্জি পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে কয়েকটা বোতাম টিপল। বোধহয় ফোর্স ফিল্ড 'অফ' হয়ে গেল। তখন চ্যাটার্জি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন—।'

ইলেকট্রিক শকার হাতে তিনজন নিরাপত্তাকর্মী দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়তেই চ্যাটার্জি আবার রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে তার বোতাম টিপতে লাগল।

আমি আর বর্মন তখন এরিনা ও তার আশপাশটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করেছি।

ডক্টর রাঘবন কোটটা খুলে নিলেন গা থেকে। সেটা বাঁ-হাতের ওপরে ঝুলিয়ে চ্যাটার্জিকে বললেন, 'সব লাইট অন করে দিতে বলো—।'

তার দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে সার্কাসের ভেতরটা চোখের পলকে দিন হয়ে গেল। সার্কাস চলার সময় আলোর বেশিরভাগটাই থাকে এরিনার মধ্যে। দর্শকদের

বসার অংশে সেরকম একটা আলোর ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু এখন তফাত বোঝার উপায় নেই। গোটা তাঁবুটাই হ্যালোজেন আলোয় ঝকঝক করছে।

এখন কোনও মিউজিক বাজছে না। তবে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, চারটে টিভি-পরদা জীবন্ত। তাতে তাঁবুর বিভিন্ন অংশ ধরা পড়েছে। একটা পরদায় কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মীকে দেখা যাচ্ছে। ভয়ার্ত মুখ। হাতের শকার যে কোনও মুহূর্তে খসে পড়তে পারে।

তাঁবুর মাথাটা ছুঁচোলো হয়ে কত ওপরে উঠে গেছে কে জানে! অদ্ভুত ধরনের এক পলিমার দিয়ে তাঁবুটা তৈরি। সেটা দেখতে অনেকটা ঘষা কাচের মতো। তাঁবুর ভেতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তবে ডক্টর রাঘবনের ঘরের মতো অত ঠান্ডা নয়। চারপাশের অসংখ্য ফাইবার গ্লাসের খুঁটিতে লাইট এমিটিং ডায়োড দিয়ে তৈরি বহুরকমের রোলিং ডিসপ্লে। তার কোনওটায় লেখা 'ধূমপান নিষেধ', আবার অন্য কোনওটায় লেখা 'রকেট সার্কাস যদি না দেখে থাকেন তা হলে আপনি রকেট কাকে বলে জানেন না, আর সার্কাস কাকে বলে তাও জানেন না।'

সন্দীপ বর্মন আবার সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সরকার, আমি আগে কখনও সার্কাস দেখিনি।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমরা এখানে সার্কাস দেখতে আসিনি।' টের পেলাম, কথাটা বলার সময় গলার স্বরে ধাতব ছোঁয়াটা মাথাচাড়া দিল।

তাঁবুর ভেতরে মোট বাইশজন নিরাপত্তাকর্মী আমার চোখে পড়ল। ওরা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুদীপ চ্যাটার্জিকে দেখেই ওরা খানিকটা তটস্থ হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

আমি কৃষ্ণনকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কখন প্রথম গোলমালটা টের পেয়েছিলেন?'

কৃষ্ণন বিরক্তভাবে আমার দিকে তাকাল। বোধহয় এর আগে ডক্টর রাঘবনও ওকে একই কথা জিগ্যেস করে থাকবেন।

একটু চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'আপনি তো খেলা দেখেছেন। রেখা যখন উঁচু টুলটায় উঠল, তখনই আমি একটা বাড়তি বাঘ টের পেলাম। কারণ, তখন রেখার দু-পাশে তিনটে আর চারটে—মোট সাতটা বাঘ থাকার কথা। কিন্তু দেখলাম, আটটা—মানে মোট ন-টা। তার মধ্যে আবার একটা বাঘ সাইজে বেশ বড়।'

অনুদীপ চ্যাটার্জি আমাদের ছেড়ে নিরাপত্তা কর্মীদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ির শব্দ কানে এল। সেইসঙ্গে কারও চিৎকার।

তাকিয়ে দেখি, অনুদীপ আর তিনজন নিরাপত্তাকর্মী এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে। আর ছ-সাতটা চেয়ার উলটে গেছে। দুজন কর্মী শকার চার্জ করেছে। কারণ শূন্যে বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। কিন্তু আর কিছু চোখে পড়ল না।

তাঁবু এলাকার মেঝেটা নকশা-কাটা প্লাস্টিকের তৈরি। ফলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আমার শরীরের যা ওজন তাতে এর ওপর দিয়ে দৌড়োনো ঠিক হবে না। বর্মন ব্যাপারটা আঁচ করল। এক ঝটকায় সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে হোলস্টার থেকে জেনারেটর গান বের নিল। সেটা উঁচিয়ে ছুটে গেল চ্যাটার্জির দিকে।

'মাই গড!' বলে ডক্টর রাঘবনও ছুটলেন সন্দীপ বর্মনের পিছু-পিছু।

কৃষ্ণন চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'হাওয়া-জিন ওদের ধাক্কা মেরেছে। আমি বাঘের সঙ্গে লড়তে ভয় পাই না, কিন্তু জিনের সঙ্গে তো আর জোর চলে না।' বলে কৃষ্ণন তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল।

আমি ওকে ডেকে বললাম, 'যাবেন না, কৃষ্ণন, দরজায় স্ট্রং ফোর্স ফিল্ড রয়েছে। তারচেয়ে আসুন, আমরা সবাই মিলে ওটাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করি।'

কৃষ্ণন দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি অটোমেটিক লক খুলে সিকিওরিটি চেম্বার থেকে হেভি ডিউটি জেনারেটর গানটা বের করে নিলাম। লেসার গানের তুলনায় এই বন্দুকে নিরাপত্তা অনেক বেশি।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, একটা কিছু তাঁবুর ভেতরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। ডক্টর রাঘবন কয়েকটা খুঁটির আড়ালে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। অনুদীপ চ্যাটার্জি নিজেকে সামলে নিয়ে রাঘবনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আর নিরাপত্তাকর্মীরা আতঙ্কে গোলাপি দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিপদের আশংকা যে ঠিক কতটুকু তা ওরা বুঝতে পারছে না।

এই নাম-না জানা প্রাণীটা যদি অদৃশ্য হয় তা হলে সে কি অন্ধ! কারণ আলোকবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে অদৃশ্য প্রাণীকে অন্ধ হতেই হবে। তার শরীরের প্রতিটি অংশকেই হতে হবে বায়ুর মতো—অর্থাৎ, তার শরীরের প্রতিসরাঙ্কের মান হতে হবে প্রায় ১.০। তার চোখের বেলাতেও তাই। সেইজন্যেই ওই চোখে বায়ুমাধ্যম দিয়ে আসা আলোকরশ্মি কোনও প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারবে না।

এই প্রাণীটাও কি সেইরকম? কিন্তু এ যে মাঝে-মাঝে দিব্যি চোখে-দেখা-যায় এমন বাঘ হয়ে যাচ্ছে!

আমি আর কৃষ্ণন সামনে এগিয়ে গেলাম। এরিনার চারপাশ থেকে ফোর্স ফিল্ড তুলে নেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণন আমাকে বলে সেদিকে উঠে গেল। আর ঠিক তখনই একটা অর্ধেক বাঘ আমার চোখে পড়ল।

আমি কিছুতেই দৃশ্যটাকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ঠিক পেটের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে একেবারে লেজের ডগা পর্যন্ত। শুধু এইটুকুই দেখা যাচ্ছে। এবং সেই অসম্পূর্ণ প্রাণীটা তিরবেগে ছুটছে।

ছুটতে-ছুটতেই সেটা সটান এসে ধাক্কা মারল কৃষ্ণনকে। সেই ধাক্কায় কৃষ্ণন ছিটকে পড়ল হাত-পাঁচেক দূরে, আর ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আমি জেনারেটর গান তাক করে ফায়ার করলাম—একবার, দু-বার।

আমি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই না। এবারও হলাম না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে স্তম্ভিত করে দিল।

জেনারেটর গানের হাই লেভেল ফায়ারিং-এ প্রাণীটা একটুও বিচলিত হল না। বরং চোখের পলকে ওটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেনারেটর গানের হাই লেভেল ফায়ারিং-এ ভীষণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসও থাকে। এই ফায়ারিং-এর তেজ সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও প্রাণীর নেই। অন্তত আমি তাই জানতাম। তাই স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম, এই বিচিত্র অদৃশ্য প্রাণীটা এল কোথা থেকে!

সন্দীপ বর্মন দূর থেকে চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছিল। আমি ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে ডক্টর রাঘবনকে চেঁচিয়ে বললাম, 'ডক্টর রাঘবন, এক্ষুনি একটা বড় জালের ব্যবস্থা করুন। নইলে এই জন্তুটাকে ধরা যাবে না। ওটা বাঘ নয়।'

কৃষ্ণন উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল এরিনার কিনারার কাছে। সেখানে একটা ফাইবার পোলের গায়ে একটা নাইলন দড়ির মই জড়ানো ছিল। সেটা খুলে নিয়ে ও তরতর করে ওপরে উঠে যেতে লাগল। ওর হাতের পেশি, চোয়ালের হাড় ফুলে উঠেছে।

আমি নীচ থেকে চেঁচিয়ে ওকে ডাকলাম, কিন্তু ও শুনল না। দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে একটা ট্র্যাপিজের ওপরে বসে পড়ল।

ততক্ষণে রাঘবন অনুদীপ চ্যাটার্জিকে নির্দেশ দিয়েছেন জাল নিয়ে আসার জন্যে। দুজন নিরাপত্তাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাটার্জি তাঁবুর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য নিরাপত্তাকর্মী এপাশ-ওপাশ ছুটোছুটি করছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সন্দীপ বর্মন ছুটে এল আমার কাছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'সরকার, হেড কোয়ার্টারে খবর দিন। ওরা দু-গাড়ি ফোর্স পাঠাক—।'

একটা ব্যাপার আমাকে বেশ অবাক করেছিল। সেটা হল, অজানা এই প্রাণীটার আচরণ। এ-পর্যন্ত ওটা কারও কোনও ক্ষতি করেনি। ওটা যদি সত্যি-সত্যি একটা বাঘ হত, তা হলে এর মধ্যে ক'জন যে ওটার হাতে খতম হত কে জানে! বোধহয় কৃষ্ণনকে দিয়েই শুরু হত খতমের খেলা। সুতরাং এটা বলা যায়, প্রাণীটা আর যাই হোক, বিপজ্জনক নয়।

সন্দীপ বর্মনের কথার জবাবে বললাম, 'ফোর্সের কোনও দরকার নেই।

এখানে বিশ-বাইশ জন সিকিওরিটি গার্ডই তো আমাদের সাহায্যের জন্যে রয়েছে। তা ছাড়া, প্রাণীটাকে আমি মারতে চাই না—ওটাকে জ্যান্ত ধরতে চাই।'

'কিন্তু এরকম একটা ভয়ংকর প্রাণীকে আপনি—।'

বর্মনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বাধা দিলাম, 'এটাই তো সবচেয়ে বড় গোলমাল, বর্মন। যে-প্রাণী আমাদের চোখে অদৃশ্য, তাই আমাদের কাছে ভয়ংকর। যে-প্রাণী কখনও আমরা চোখে দেখিনি, তাকে সামনাসামনি হঠাৎ দেখতে পেলে আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে কোনও অস্ত্র দিয়ে তাকে ঘায়েল করা। অথচ সেই প্রাণীটা হয়তো নিরীহ, অসহায়।' একটু থেমে আমি আরও বললাম, 'আসল গোলমালটা কোথায় জানেন? মানুষই সবচেয়ে বেশি হিংস্র, বিপজ্জনক। আপনার যদি এখানে ভয় করে তা হলে রাঘবনের চেম্বারে চলে যান। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। ইচ্ছে হলে মাঝে-মাঝে ফোনে খবর নেবেন।'

এইসব কথা বলার সময় আমার উত্তেজনা বাড়ছিল। আর সেইসঙ্গে ধাতব সুর ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ছিল।

বর্মন অপমানিত মুখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'আপনিই জিতলেন' বলে আবার ফিরে গেল ডক্টর রাঘবনের কাছে।

অদৃশ্য প্রাণীটার নড়াচড়া বা ছুটোছুটি বোধহয় থামেনি। কারণ, শব্দ কানে আসছিল, দর্শকদের জন্যে সাজানো চেয়ার থেকে-থেকেই উলটে পড়ছিল, ছিটকে পড়ছিল। নিরাপত্তাকর্মীরাও তাদের ভয়ার্ত ব্যস্ততা বজায় রেখেছে। নিজেদের মধ্যেই চ্যাঁচামেচি করে কীসব বলছে।

এমনসময় চ্যাটার্জি ফিরে এল। সঙ্গে সেই দুজন নিরাপত্তাকর্মী ও চারটে 'মাউস মোবাইল' বা 'মোমো'। চারটে মোমো বয়ে নিয়ে আসছে প্রকাণ্ড একটা নাইলনের জাল। বিশেষ ধরনের নাইলনের সুতোয় বোনা।

মোমোর আকৃতি অনেকটা বাচ্চাদের প্র্যামের মতো। কিন্তু চলে হাই পাওয়ার ব্যাটারিতে। গাড়িগুলোর রং কমলা আর কালো। সামনে হাতের মতো চারটে ধাতব রড বেরিয়ে আছে। আর পিছনে লেজের মতো একটা ক্র্যাঙ্ক চলার তালে-তালে নড়ছে। ঠিক যেন একটা নেংটি ইঁদুর। সেইজন্যেই নাম মাউস মোবাইল।

মোমোর ড্রাইভাররা বসে আছে গাড়ির পেটের ভেতর সেঁধিয়ে। তারা চারজন পাশাপাশি চালিয়ে নিয়ে আসছে গাড়ি। সামনে বেরিয়ে থাকা ষোলোটা রডের ওপরে রাখা আছে নাইলনের জালটা। রং তার সাদা, কিন্তু শঙ্খের মতো চিকচিক করছে। এরকম নাইলন আমি চিনি—খুব হালকা অথচ শক্তিশালী।

আমি চ্যাটার্জিকে বললাম, তাঁবুর একপাশ থেকে জালটা ঘিরে ধীরে-ধীরে টেনে নিয়ে আসতে। ঠিক যেমন করে পুকুরে ঘেরা-জাল দিয়ে মাছ ধরে।

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ব্যস্ততা। চারটে মোমো আর জনাদশেক নিরাপত্তাকর্মী চ্যাটার্জির নির্দেশমতো কাজ শুরু করে দিল। তবে প্রত্যেকের মুখেই আতঙ্কের ছাপ।

আমি জেনারেটর গান সিকিওরিটি চেম্বারে রেখে দিলাম। ওটা যে এখন কোনও কাজে লাগবে না তা একটু আগেই বোঝা গেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণন এখনও ট্র্যাপিজের ওপরে বসে। ভূত-প্রেতের অহেতুক আতঙ্কই ওর বারোটা বাজিয়েছে।

সন্দীপ বর্মন আর ডক্টর রাঘবন ব্যস্তভাবে জাল টানার তদারকি করছিলেন। যে-দেওয়াল ভেঙে আমি সার্কাসের বাইরে বেরিয়েছিলাম, সেদিকটা থেকেই শুরু হয়েছিল জাল টানার কাজ। আর আমি এরিনার এপাশে ঠিক ওদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

মোমোর ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ আর লোকজনের হইচই শব্দের তীব্রতা প্রায় ১১০ ডেসিবেলে নিয়ে গেল। কিন্তু এইসব শব্দের মধ্যে আর-একটা শব্দও শোনা যাচ্ছিল। সেটা ওই প্রাণীটার ছোটাছুটির শব্দ। এই জালের ফাঁদে প্রাণীটাকে ধরা যাবে তো!

আমাদের কপালে যে আরও দুঃখ আছে সেটা একটু পরেই বোঝা গেল। জাল টানার কাজ আধাআধি হতেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, প্রাণীটার ছোটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে জালের ওপিঠ থেকে। অথচ জাল যেভাবে টানা হচ্ছে তাতে জালের পাশ দিয়ে প্রাণীটার সটকে পড়ার কোনও পথ নেই। অন্তত পৃথিবীর কোনও প্রাণী হলে পারত না। তা ছাড়া, জালের ফুটোগুলোর মাপ এক বর্গইঞ্চির বেশি হবে না। তার ভিতর দিয়ে কি গলে বেরিয়ে যেতে পারে এই অদ্ভুত প্রাণী?

জাল টানার কাজ যতই শেষ হয়ে আসছে, আতঙ্কের মাত্রা তার সমানুপাতে বাড়ছে। একটা আস্ত ডোরা-কাটা বাঘ দিয়ে যার শুরু, তার শেষ যদি এইরকম হয় তা হলে ভয় পাওয়ারই কথা।

লোকজনের হইচই-চ্যাঁচামেচি চলছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'ডক্টর রাঘবন, জাল টেনে আর লাভ নেই। ওটা এভাবে ধরা পড়বে না। জাল গুটিয়ে ফেলতে বলুন—।'

সুতরাং চারটে মোমো আর নিরাপত্তাকর্মীরা ক্ষিপ্রগতিতে জালটাকে আবার ভাঁজটাজ করে ষোলোটা ধাতব হাতের ওপরে সাজিয়ে দিল। ইঞ্জিনের গর্জন তুলে মোমোগুলো বেরিয়ে গেল তাঁবুর বাইরে। রওনা হল রকেট সার্কাসের অন্দরমহলের দিকে।

কৃষ্ণন ওপর থেকে চিৎকার করে বলল, 'ইন্সপেক্টর সরকার, দেখলেন, আমার কথা ঠিক হল কি না!'

আমি শুধু একবার ওর দিকে তাকালাম। কিছু বললাম না। তখন আমি ভাবছি, কীভাবে প্রাণীটাকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখা যায়।

ডক্টর রাঘবন আমার কাছে এলেন। হাতের কোটটা কখন যেন একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখেছেন। এই শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও সামান্য ঘেমেছেন। কপালের টিপ ধেবড়ে গেছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে আমাকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'হোয়াট নেক্সট?'

সন্দীপ বর্মন গম্ভীর মুখে হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার সামনে। ওর চোখেমুখে তাচ্ছিল্যের ভাব। বোধহয় আমার দৌড় দেখতে চায়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বর্মন বলল, 'তা হলে এবার হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ফোর্স চেয়ে পাঠাই। ওদের বলি দুটো অ্যানিহিলেটর কামান নিয়ে আসতে—।'

আমি চমকে বর্মনের দিকে তাকালাম। অ্যানিহিলেটর কামান! ওটাই আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। ওটা কোনও জিনিসের দিকে তাক করে ফায়ার করলে পলকে তার তাপমাত্রা ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। প্রায় সব ধাতু ওই তাপমাত্রায় গলে যায়, কোনও প্রাণী তো কোন ছার! অ্যানিহিলেটর ব্যবহার করা মানে এই বোবা প্রাণীটা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ততক্ষণে আর-একটা মতলব মাথায় এসে গেছে আমার। বর্মনকে বললাম, 'একটা শেষ চেষ্টা করে দেখি। তাতে কোনও কাজ না হলে হেডকোয়ার্টারে খবর দেব, ওরা অ্যানিহিলেটর কামান নিয়ে আসবে।' আমি চোখ ফেরালাম ডক্টর রাঘবনের দিকে, 'আপনার কাছে রং করার স্প্রে-গান আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। সার্কাসের যত পেইন্টিং-এর কাজ সবই আমাদের নিজের লোকেরা করে।'

'ক'টা স্প্রে-গান হতে পারে?'

'তা দশ-বারোটা তো হবেই।'

আমি বললাম, 'তা হলে চটপট লোক লাগিয়ে ব্যবস্থা করুন। আমি ওই অদৃশ্য প্রাণীটার গায়ে সাদা রং স্প্রে করে ওর চেহারাটা অন্তত দেখতে চাই।'

অনুদীপ চ্যাটার্জি চোয়াল শক্ত করে পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। আমার কথা শেষ হতেই হইহই করে দলবল নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। লোকটার উৎসাহের প্রশংসা করতে হয়।

বড়জোর মিনিট পনেরো। তারমধ্যেই দেখলাম ওরা তৈরি হয়ে নিয়েছে। মনে হল, প্রাণীটা যে নিরীহ এটা বোধহয় ওরা সকলেই আন্দাজ করেছে।

এবারে কাজে নেমে পড়ল সাতটা মোমো আর চারজন নিরাপত্তাকর্মী। ফলে মোট এগারোটা স্প্রে-গান ধোঁয়ার মতো সাদা রং ওড়াতে লাগল বাতাসে। কর্মীরা

সকলেই নাকে-মুখে রুমাল বেঁধে নিয়েছে। মোমোর ড্রাইভাররাও মুখ ঢেকে নিয়েছে কাপড়ে।

শুধু তাদের কপাল আর চোখ দেখা যাচ্ছে। তাদের প্রায় কাঁধের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে একজন করে নিরাপত্তাকর্মী স্প্রে-গান চালাচ্ছে।

সাদা ধোঁয়া উড়তে লাগল তাঁবুর বাতাসে। স্প্রে-গানের শব্দ, মুখ-ঢাকা অবস্থায় জড়ানো কথার হইচই, আর সাতটা মোমোর ইঞ্জিনের গর্জন বোধহয় শব্দের তীব্রতা ১২০ ডেসিবেলে নিয়ে গেল। আমি দরকারি বোতাম টিপে আমার শ্রবণ ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে নিলাম। নইলে কানে বড় লাগছিল।

ডক্টর রাঘবন রুমালে মুখ ঢেকে আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'ইন্সপেক্টর সরকার, প্রাণীটাকে দেখার পর আমরা কী করব?'

আমি বললাম, 'জানি না। তবে যদি সম্ভব হয়, ওটার কয়েকটা খেলা আপনার সার্কাসের শো-তে কাল থেকে জুড়ে দেবেন।'

ডক্টর রাঘবন হাসলেন না। অনেকটা আপনমনেই বললেন, 'জুওলজি নিয়ে ডক্টরেট করেছি—এরকম কোনও প্রাণী যে পৃথিবীর কোথাও জন্ম নিতে পারে তা কখনও কল্পনাও করিনি। আমার বাবা এই রকেট সার্কাসের পত্তন করেছিলেন। তাঁর ভয়ডর বলতে কিছু ছিল না। আমারও ওই ব্যাপারটা বেশ কম—।'

আমি আঙুল তুলে ওপরে কৃষ্ণনের দিকে দেখালাম।

ডক্টর রাঘবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'ও রিং-মাস্টার হিসেবে খারাপ নয়। আগে আর-একটা কোম্পানিতে ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত। সেখানে বাঘ-সিংহ নিয়ে তালিম নিত। ওই কোম্পানিতে রিং-মাস্টার হঠাৎই হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়—শো চলার সময়। তখন কৃষ্ণন সেই শো চালিয়ে দেয়। সেই থেকেই সার্কাসের সার্কিটে ওর নাম খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমার কাছে ও আছে চার বছর। কিন্তু কখনও এরকম ভয় পেতে দেখিনি—।'

এমনসময় বাড়তি একটা জোরালো শব্দ হল। চমকে তাকিয়ে দেখি কিছু একটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা মোমো উলটে পড়ে গেছে। সাদা ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে ওটাকে দেখা গেলেও ওটার ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ শব্দ, চাকার ভনভন, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মোমোর দুজন মানুষই ছিটকে পড়েছে গাড়ি থেকে। ওরা ওঠার চেষ্টা করছে। আর ওদের সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে চার-পাঁচজন নিরাপত্তাকর্মী।

রকেট সার্কাসের তাঁবু এখন বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। রঙিন যা কিছু ছিল—ফাইবারের খুঁটি, চেয়ার, নাইলনের দড়ি, ইলেকট্রনিক রোলিং ডিসপ্লে—সবই সাদা রঙের পোশাক পরে নিয়েছে। দশটা স্প্রে-গান চলছে তো চলছেই। স্প্রে-গানের ক্যানের রং ফুরিয়ে গেলে দুজন কর্মী তিনটে রঙের ড্রাম থেকে তড়িঘড়ি রং ভরতি করে দিচ্ছে ক্যানে। প্লাস্টিকের মেঝে, এরিনা, দেওয়াল, সব রঙে মাখামাখি।

নিরাপত্তাকর্মীদের আলাদা করে চিনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনুদীপ চ্যাটার্জিকে আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু সন্দীপ বর্মনকে চট করে চিনতে পারলাম ওর হাতে ধরা জেনারেটর গানের জন্যে।

ডক্টর রাঘবনও রঙের হাত থেকে রেহাই পাননি। আর আমার অবস্থাও প্রায় একইরকম।

হঠাৎই এক তীব্র চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা করেছে একইসঙ্গে অন্তত তিনজন। ডক্টর রাঘবন আমার হাত খামচে ধরলেন উত্তেজনায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নিলেন। অবাক চোখে দেখলেন আমার হাতের দিকে।

আমি সবসময় ফুলহাতা শার্ট পরি। তাই বাইরে থেকে ধাতুর কারিকুরি কিছু বোঝা যায় না। সুতরাং রাঘবনও কিছু বুঝতে পারলেন না। শুধু কোনওরকমে চাপা গলায় বললেন, 'ওরা বোধহয় প্রাণীটাকে দেখতে পেয়েছে!'

রাঘবনের কথাই যে ঠিক সেটা বুঝতে পারলাম লোকজনের পরিত্রাহি ছুটোছুটি দেখে। তবে বাকিরা খানিকটা দূরত্ব থেকে কিছু একটা দেখতে চেষ্টা করছে।

অকুস্থলটা এরিনার ডানদিকে, ঠিক পাশ ঘেঁষে।

আমি এগিয়ে চললাম সেদিকে। টের পেলাম, ডক্টর রাঘবন আমার পিছনেই রয়েছেন।

সাদা ধোঁয়ার মেঘ সরিয়ে খানিকটা এগোতেই প্রাণীটা নজরে পড়ল আমার। কী বিচিত্র তার চেহারা! তবে চেহারার নির্দিষ্ট কোনও বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই তা পালটাচ্ছে।

লম্বায় প্রায় কুমিরের মতো। লেজের অংশটার তিনটে মুখ রয়েছে। সারা গায়ে আর্মাডিলোর মতো বড়-বড় আঁশ। মাথাটা থ্যাবড়া মতো। গলার কাছে আট-দশটা ভাঁজ। পা কিংবা হাতের সংখ্যা ছয়। তাতে দুটো করে আঙুল মাঝে-মাঝেই আঙুলের সংখ্যা বেড়ে চারটে হয়ে যাচ্ছে। প্রাণীটার নাক বেশ বড়, তাতে বিশাল দুটো ফুটো। নাকটা ডাইনে-বাঁয়ে নড়ছে। নাকের দু-পাশে দুটো চোখ। এক-একটা চোখ যেন চার ইঞ্চি ব্যাসের মার্বেল। তার ওপরে সাদা রঙের আস্তরণ থাকা সত্ত্বেও নড়াচড়া করছে। হয়তো সবকিছু দেখতেও পাচ্ছে। মুখটা বন্ধ করে রাখলেও কী করে যেন একটা কালো জিভ বারবার বাইরে বেরিয়ে আসছে।

প্রাণীটা মাঝে-মাঝে নিজের শরীরটাকে ভাঁজ করে নিচ্ছিল। ওটার নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথবা রঙের রাসায়নিক ওকে অবশ করে দিয়েছে।

সব ক'টা স্প্রে-গান থেমে গেছে। মোমোগুলোও দাঁড়িয়ে পড়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একটু আগের হইচই শব্দ হঠাৎই কমে গিয়ে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছে চাপা আলোচনা, গুঞ্জন।

বর্মন আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'সরকার, নিন, কাজ গুছিয়ে এবার চলুন।'

আমি তখন ভাবছিলাম, এটা ভিনগ্রহের প্রাণী নয়তো?

'কনট্যাক্ট' নামে একটি সংস্থা প্রায় দশ-বারো বছর ধরে ভিনগ্রহী প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছে। কলকাতায় গত বছরেই ওদের একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। সেখানে ওরা কম্পিউটার গ্রাফিক্সে তৈরি করা অন্তত পঞ্চাশরকমের ভিনগ্রহী প্রাণীর ছবি দেখিয়েছিল। আমাদের ডিপার্টমেন্টকে ওরা সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এ সি বিকাশ মিত্র ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ভিনগ্রহীদের সেই গ্রাফিক্স ছবিগুলো আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। এখন, এই প্রাণীটাকে দেখে, সেই ছবিগুলো আমার মনে পড়ে গেল। ছবিগুলোয় দেখা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এটার মধ্যে যেন দেখতে পাচ্ছি।

'কনট্যাক্ট' সংস্থাকে পৃথিবীর সব দেশই বেশ গুরুত্ব দেয়। কারণ, তার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে দুঁদে কল্পবিজ্ঞান লেখক, মনোবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রযুক্তিবিদ, পরিবেশবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, পুরাপ্রাণীবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ। ওদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল ওরা সম্মেলনে প্রকাশ করে। সুতরাং মনে-মনে খুঁজে পাওয়া মিলগুলো বেশ কয়েকবার খতিয়ে দেখে আমি জোরের সঙ্গে বললাম, 'ডক্টর রাঘবন, এই প্রাণীটা হয়তো অন্য কোনও গ্রহ থেকে কোনওভাবে আমাদের এখানে এসে পড়েছে। আমাদের এখুনি 'কনট্যাক্ট'-এ খবর দেওয়া দরকার।'

'কনট্যাক্ট?' অনুদীপ চ্যাটার্জি একটুকরো কাপড় দিয়ে মুখের রক্ত মুছছিল। অবাক হয়ে কথাটা বলল।

আমি জবাবে কিছু একটা বলতে যাব, ঠিক তখনই একটা তীক্ষ্ণ ভ্রমরগুঞ্জন শোনা গেল। মিহি শব্দটা এত তীক্ষ্ণ যে সকলেই চমকে উঠে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল। প্রাণীটার মধ্যেও যেন হঠাৎই একটু চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। আর তখনই ভেসে বেড়ানো আলোর বিন্দুটা আমাদের নজরে পড়ল।

এরিনার ঠিক মাঝখানে উড়ন্ত জোনাকিপোকার মতো একটা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু পাক খাচ্ছে দুরন্ত গতিতে, ওঠা-নামা করছে নির্দিষ্ট ছন্দে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শোনা যাচ্ছে ভ্রমরগুঞ্জনের শব্দ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, আমাদের অবাক চোখের সামনে, আলোর বিন্দুর ঘিরে-রাখা জায়গায় একটা অবয়ব দেখা দিল। প্রথমে ঝাপসা, তারপর ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই অদ্ভুত চেহারা। গলানো রুপোর মতো নমনীয় হয়ে নড়তে লাগল বেহিসেবিভাবে। যেন ঠিক করতে পারছে না, শেষপর্যন্ত কোন

আকৃতি নেবে।

একটু পরেই মানুষের চেহারা নিয়ে স্থির হল সেই অবয়ব। তার সারা শরীর রুপোর পাতের মতো ঝকঝক করছে। ধারালো নাক-মুখ-চোখ। স্পষ্ট হাত-পায়ের পেশি।

অদ্ভুত মানুষটা সম্পূর্ণ রূপ নিতেই আলোর বিন্দুটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরই পরিষ্কার গলায় কেউ যেন বলে উঠল, 'আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, নিভিয়ালটাকে এতক্ষণ এখানে আটকে রাখার জন্যে। আমার আসতে আর-একটু দেরি হলেই ওটা হয়তো এখান থেকেও পালাত।'

আমরা সকলেই হতবাক। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছি রুপোলি মানুষটার দিকে। সে তার চকচকে চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেখল। তারপর আবার বলল, 'আমাকে দেখে অবাক হবেন না। ভয়ও পাবেন না। আমি আসছি বহুদূরের এক নক্ষত্রের একটি গ্রহ থেকে। এই নক্ষত্রটিকে আপনারা জিটা অরিওনিস নাম দিয়েছেন। আমরা খুব সহজে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারি, মস্তিষ্কের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি। আর অন্য কোনও প্রাণীর স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা নিজেদের স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করে নিতে পারি যখন-তখন। তাই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

রুপোলি মানুষের চেহারা-নেওয়া ভিনগ্রহী প্রাণীটি নেমে এল এরিনা থেকে। তার শরীর থেকে কেমন এক অদ্ভুত আলোর আভা বেরোচ্ছে। ডক্টর রাঘবনের কাছে এসে সে বলল, 'ডক্টর, আপনার মতো আমিও একটা সার্কাসের মালিক। নানা গ্রহে ঘুরে-ঘুরে আমি সার্কাসের শো করি। আমার দলে হরেকরকম বিচিত্র জীবজন্তু রয়েছে। মাঝে-মাঝে এইসব প্রাণী সংগ্রহের জন্যে আমি অন্যান্য গ্রহে চলে যাই। সেখানকার পাহাড়ে, সমুদ্রে, জঙ্গলে, ঘুরে বেড়াই—।'

আমি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'এই নিভিয়ালটাকে কোথায় পেয়েছেন?'

'আপনাদের সৌরজগতের ছ-নম্বর গ্রহটির পঞ্চম উপগ্রহে—।'

'শনির উপগ্রহ—রিয়া?'

'হ্যাঁ, আপনারা ওই নামই দিয়েছেন ওটাকে। আপনারা ওটা আবিষ্কার করেছেন প্রায় ৩২০ বছর আগে। আর আমরা ওটার সন্ধান জেনেছি প্রায় ১০০০ বছর আগে। রিয়ার ব্যাস প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। বরফে ঢাকা। তাতে জমাট-বাঁধা কার্বন ডাই অক্সাইড আর মিথেনই বেশি। কিছুদিন আগে সেখানে আমরা একটা অভিযান চালিয়েছিলাম। তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিন্দুক দেখতে পাই। সিন্দুকে একটা সতর্কবাণী লেখা ছিল—।'

'কী লেখা ছিল?' ডক্টর রাঘবন প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে নিভিয়ালটার কাছ থেকে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল। নিরাপত্তাকর্মীরা 'নড়ছে, নড়ছে!' বলে চিৎকার করে উঠল।

রুপোলি মানুষটি 'কোনও ভয় নেই' বলে এগিয়ে গেল প্রাণীটার কাছে। ডান হাতটা শূন্যে তুলে ধরল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। পরের মুহূর্তেই একটা সবুজ আলোর সুতো বেরিয়ে আসতে লাগল মানুষটির তর্জনীর ডগা থেকে। বিদ্যুতের রেখার মতো এঁকেবেঁকে সেই সবুজ প্রতিপ্রভ সুতো জালের মতো জড়িয়ে যেতে লাগল নিভিয়ালটার গায়ে।

প্রাণীটাকে এখন লক্ষ করে বেশ অবাক হলাম। ওটা শুধু যেন নড়ছে তাই নয়, ওটার গায়ের সাদা রং অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে। আর শরীরের কোনও-কোনও অংশের রং হালকা নীল প্লাস্টিকের মেঝের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ফলে হঠাৎ করে প্রাণীটাকে জায়গায়-জায়গায় খাপছাড়াভাবে অদৃশ্য মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, প্রাণীটার শরীরের আকৃতিও এখন বেশ পালটে গেছে। লেজটা অনেক খাটো হয়ে গেছে। মাথাটা হয়ে গেছে সরু, লম্বা। হাত বা পায়ের সংখ্যা ছয়ের বদলে এখন চার।

প্রাণীটা নড়াচড়া করছিল, তবে মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করছিল না। এখনও পর্যন্ত ওর কোনও গর্জন শোনা যায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা সবুজ আলোর সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি হয়ে গেল।

কাজ শেষ করে রুপোলি ভিনগ্রহী ফিরে তাকাল আমাদের দিকে। ঠোঁট প্রসারিত করে হাসতে চেষ্টা করল।

'কী লেখা ছিল ওই সিন্দুকের গায়ে?' ডক্টর রাঘবন অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করলেন আবার।

হাত তুলে ডক্টর রাঘবনকে আশ্বস্ত করল সে। বলল, 'বলছি। এবারে একটু নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। নিভিয়ালটাকে আমি হাই পাওয়ার লেসার লক দিয়ে বন্দি করেছি, এখন ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত।'

আগন্তুকের বাঁ-কাঁধের কাছটা কেমন যেন গলে গিয়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। সেটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে সে বাঁ-হাতটা শূন্যে তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে গলিত রুপো যেন সুষম স্রোতে প্রবাহিত হয়ে কাঁধের আকার আবার মেরামত করে দিল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম।' আগের কথার খেই ধরে বলতে শুরু করল সে, 'ওই সিন্দুকের গায়ে সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল, একটা আশ্চর্য প্রাণী বন্দি রয়েছে এই সিন্দুকের মধ্যে। নাম নিভিয়াল। একে ক্ষতিকর মনে হওয়ায় কোনও এক অজানা গ্রহ সিরা-টু-র বাসিন্দারা এই প্রাণীটাকে বন্দি করে চিরকালের জন্যে নির্বাসন দিয়েছে। ওরা প্রাণীহত্যা করে না। তাই এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ যেন এই সিন্দুকের কম্বিনেশন লক না খোলে।'

'আপনারা সেই লক খুললেন?' প্রশ্নটা করল সন্দীপ বর্মন। কখন যেন সে আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতে-মুখে স্প্রে-গানের সাদা রং লেগে রয়েছে।

আগন্তুক জবাব দিল সঙ্গে-সঙ্গেই, 'হ্যাঁ, খুললাম। আমাদের দলে একজন তালা খোলার ওস্তাদ ছিল। সে-ই খুলে দিল লকটা। তখন প্রাণীটাকে বের করে আমরা মহাকাশযানে তুলে নিয়ে রওনা হলাম। আমাদের দলের সবাই তো খুব খুশি। এই প্রাণীটাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা নতুন খেলা চালু করা যাবে আমাদের সার্কাসে।

'প্রাণীটার কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার আমরা লক্ষ করলাম। ওটা ইচ্ছেমতো নিজের গায়ের রং খুব তাড়াতাড়ি পালটে ফেলতে পারে। আর ওটার আশ্চর্য ক্ষমতা হচ্ছে, পরিবেশ বা পটভূমির সঙ্গে গায়ের রং হুবহু মিলিয়ে দিতে পারে। ফলে তখন প্রাণীটাকে অদৃশ্য মনে হয়। ধরুন, কোনও দেওয়ালের সামনে ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেওয়ালটায় এলোমেলোভাবে পাঁচরকম রং লাগানো রয়েছে। ওই অবস্থায় ইচ্ছে হলেই এই নিভিয়ালটা দেওয়ালের রঙের নকশা হুবহু কপি করে ফেলতে পারে নিজের গায়ে। তখন ওকে আপনি দেখতেই পাবেন না। অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হবে।'

উন্নত ধরনের বহুরূপী? রুপোলি আগন্তুকের কথা শুনে অন্তত তাই মনে হল। কিন্তু সিরা-টু-র বাসিন্দারা এই নিভিয়ালটাকে ক্ষতিকর মনে করেছিল কেন? সে-কথা জিগ্যেস করতেই আগন্তুক বলল, 'সেটা ঠিক জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি। নিভিয়ালটা আপনাদের এখানে এসে কোনও শব্দ করেনি, তাই না?'

আমরা মাথা নেড়ে জানালাম, তাই।

'আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ওটা প্রায় সবসময় চিৎকার করে, কিন্তু তার সবটাই খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে—সুপারসনিক লেভেলে। এই কম্পাঙ্কের শব্দ সিরা-টু-র বাসিন্দারা বোধহয় সহ্য করতে পারেনি। এতে হয়তো ওদের শরীরের ক্ষতি হত। সে যাই হোক, নিভিয়ালটাকে আমাদের খাঁচায় বন্দি করে ইলেকট্রনিক কম্বিনেশন লক এঁটে দিয়েছিলাম। তার বাইরে থেকে প্রাণীটাকে আমরা কয়েকজন খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম। তাতে দেখলাম, ওটা খুশিমতো নিজের চেহারা পালটাচ্ছে। আবার কোনও জিনিসকে পছন্দ হলে তাকে হুবহু কপিও করে ফেলছে—।'

আমি ডক্টর রাঘবনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এবারে বুঝলেন তো আপনার টাইগার মিস্ট্রি! আর অর্ধেক বাঘের ব্যাপারটাও বোঝা যাচ্ছে। কৃষ্ণনকে এবার ওপর থেকে নেমে আসতে বলুন।'

ডক্টর রাঘবন হেসে এরিনার মাঝে এগিয়ে গেলেন। ওপরে তাকিয়ে হাত

নেড়ে কৃষ্ণনকে নেমে আসতে বললেন। বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর কৃষ্ণন দড়ির মই বেয়ে নামতে শুরু করল।

রুপোলি আগন্তুক তখনও কথা বলছিল, 'নিভিয়ালটাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। ওটার অদৃশ্য হওয়া, সুপারসনিক চিৎকার, যখন-তখন চেহারা পালটানো, সবকিছুই আমাদের সার্কাসের পক্ষে ভালো। কিন্তু শুধু একটা ব্যাপারেই সমস্যা দেখা দিল—।'

আগন্তুকের চকচকে রুপোলি কপালে ভাঁজ পড়ল। চিন্তার সুরে সে বলল, 'কিছুতেই আমরা নিভিয়ালটাকে বন্দি করে রাখতে পারছি না। আর পারছি না বলেই হাইপারস্পেস দিয়ে আমাদের গ্রহে ফিরে যাওয়ার সময় কীভাবে যেন ওটা লক খুলে পালিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ করে আপনাদের সার্কাসে এসে হাজির হয়েছে। এখানে ওটার এসে পড়াটা নেহাতই একটা অ্যাকসিডেন্ট। স্পেস কার্ভেচার আর স্পেস হোলের ব্যাপার—যেমন করে হোক এসে পড়েছে। তারপর ওর কো-অরডিনেট হিসেব করে এখানে এসে পৌঁছোতে আমারও বেশ সময় লেগে গেল। এখন ওকে নিয়ে একটা স্পেস হোল দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব, ফিরে যাব আমাদের স্পেসক্র্যাফটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিভিয়ালটাকে হয়তো ছেড়েই দিতে হবে।'

'কেন, ছেড়ে দেবেন কেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কিছুতেই ওটাকে কম্বিনেশান লক দিয়ে আটকে রাখতে পারছি না। ওই সিন্দুকের কম্বিনেশান লকের গায়ে "প্রাইম লক" কথাটা লেখা ছিল। তার একটাই অর্থ হতে পারে। ওই কম্বিনেশানের নম্বরটা একটা মৌলিক সংখ্যা—প্রাইম নাম্বার।'

বর্মন আমার কাছে সরে এসে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'সরকার, প্রাইম নাম্বার ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

আমি নীচু স্বরে জবাব দিলাম, 'একটা পূর্ণসংখ্যা, যাকে ১ আর সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়—এ ছাড়া অন্য কোনও পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মেলে না। যেমন ১৩, ৫৯, ১৪৯, ৩৩৩১। কেন, এগুলো পড়েননি? ইস্কুলে ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ানো হয়।'

বর্মন হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, 'ওই একটা ব্যাপারেই আমি একটু বেশি উইক।'

আগন্তুক বলছিল তখনও, 'তারপর থেকে আমরা এমন একটা প্রাইম নাম্বার বের করার চেষ্টা করছি যেটা অন্তত দশ অঙ্কের হবে। কারণ সিন্দুকের প্রাইম লকে দশটা কম্বিনেশন ডিজিট ছিল। আমরা আন্দাজে একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে কম্বিনেশন লক সেট করেছিলাম, কিন্তু সেটা এই নিভিয়ালটা উৎপাদকে ভেঙে ফেলেছে। অর্থাৎ, সংখ্যাটা মৌলিক সংখ্যা ছিল না। ফলে উৎপাদকে ভেঙে ফেলামাত্রই লকটা খুলে ফেলেছে প্রাণীটা।'

‘কী সংখ্যা দিয়েছিলেন?’ ডক্টর রাঘবন এর মধ্যে কৃষ্ণনকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। উনিই কৌতূহলে প্রশ্নটা করলেন।

আগন্তুক বলল, ‘৪২৯৪৯৬৭২৯৭।’

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, ‘এর উৎপাদক হল ৬৪১ আর ৬৭০০৪১৭। এই দুটো সংখ্যার গুণফল ওই দশ অঙ্কের সংখ্যাটা। তবে এই উৎপাদক দুটো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা।’

আড়চোখে দেখি বর্মন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুপোলি মানুষটা আমার দিকে এক-পা এগিয়ে এল। অনুনয়ের সুরে বলল, ‘একটা দশ অঙ্কের মৌলিক সংখ্যা বলে দিয়ে আমাকে বাঁচান। এই নিভিয়ালটাকে আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাই না।’

লক্ষ করলাম, সকলেই আমার দিকে প্রত্যাশা-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে। আমি একটা দশ অঙ্কের সংখ্যা ভেবে নিয়ে ওটাকে “প্রাইম টেস্ট” প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিলাম। সঠিক উত্তর বেরোতে অন্তত দশ মিনিট লাগবে। আমি আগন্তুককে বললাম, ‘দশ মিনিট অপেক্ষা করুন।’

এগারো মিনিট পর পরীক্ষা শেষ হল। তখন আমি মৌলিক সংখ্যাটা জানালাম ঃ ‘৫৭৬৩২১১৮৯৭।’

আগন্তুক সংখ্যাটা একবার শুনে নিয়েই বলল, ‘থ্যাঙ্ক য়ু, আর ভয় নেই। আমি তা হলে এবার নিভিয়ালটাকে নিয়ে ফিরে যাই?’

আমরা সবাই পিছিয়ে দাঁড়ালাম। আগন্তুক নিভিয়ালটার কাছে গেল। ডান হাতটা শূন্যে তুলে নতুন ধরনের একটা ভঙ্গি করল। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আর প্রাণীটাকে ঘিরে একটা লাল আলোর রেখা দ্রুতবেগে ঘুরতে লাগল। সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যেই ওদের ঘিরে একটা প্রতিপ্রভ আলোর জালে তৈরি ঘনক দেখা গেল। নিভিয়ালটার চেহারা তখনও একটু-আধটু পালটাচ্ছে।

রুপোলি আগন্তুক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে হাসল। বলল, ‘সুযোগ হলে আমাদের সার্কাস আপনাদের একদিন দেখাব—।’

কৃষ্ণন বিড়বিড় করে বলল, ‘তার আর দরকার নেই। এর মধ্যেই ঢের সার্কাস দেখা হয়ে গেছে আমাদের।’

হঠাৎ লাল ঘনক সমেত ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। শুধু আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে ডক্টর রাঘবন সবাইকে সবকিছু গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আবার শুরু হল কর্মব্যস্ততা।

রাঘবন আমাদের ডেকে নিয়ে চললেন ওঁর অফিসঘরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় পাঁচটা।

রাঘবনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে আমি আর সন্দীপ বর্মন বেরিয়ে এলাম

রকেট সার্কাসের বাইরে।

বর্মন বলল, 'সরকার, এই ব্যাপারটার রিপোর্ট আপনি নিজে লিখবেন, ও আমার দ্বারা হবে না।'

ঢালু জায়গাটা বেয়ে নামতে-নামতে আমি বললাম, 'ঠিক আছে—।'

'এখন তাড়াতাড়ি চলুন, ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসছে।'

'আমারও—' কথাটা বলেই আমি অবাক হলাম। আমার ঘুম পাচ্ছে! অথচ স্লিপ সার্কিট আমি 'অন' করিনি। ব্যাপারটা ডক্টর অভিজিৎ মজুমদারকে জানাতে হবে। আমার স্বাভাবিকভাবে ঘুম পাচ্ছে!

গাড়ির কাছে এসে আমি পকেট থেকে রিমোট ইউনিট বের করলাম। বোতাম টিপতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। চোখ পড়ল আকাশের দিকে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে।

শর্বরীর কথা মনে পড়ল। বুকপকেটে হাত রাখতেই ভিজিটিং কার্ডটা টের পেলাম। শর্বরীদের বাড়িতে একদিন যাব। ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমার দুঃখকষ্টের অন্ধকার রাতগুলো একদিন যেন শেষ হয়ে যায়।





ভয়ঙ্কর ভাইরাস

এক

ছোটকা একদৃষ্টে আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওটার গায়ে আলো ফেললেই ওটা সুড়সুড় করে অন্ধকার লক্ষ করে ছুটছে। তারপর অন্ধকারে পৌঁছেই একেবারে চুপ। যেন মাটির তৈরি খেলনা-আরশোলা।

আসলে আরশোলাটা মাটির তৈরি নয়। মাইক্রোপ্রসেসর, আই-সি চিপ আর ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি। ছোটকার হাতে তৈরি রোবট-আরশোলা। কিছুদিন হল ছোটকা 'ইনসেক্ট রোবট' নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছে।

ল্যাবরেটরির মেঝেতে আয়েশ করে বসে রোবট-আরশোলাটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল ছোটকা। ডান হাতের দু-আঙুলের ফাঁকে সরু চুরুট। কপালে ভাঁজ, চোখ ছোট। একটা টেবিলের ছায়ায় চুপটি করে দাঁড়ানো আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন ভাবছে।

ছোটকার দু-পাশে বসে ছিল হুবহু একইরকম দেখতে দুই রত্ন ঃ চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত। ওরা চোখ বড়-বড় করে ওদের ছোটকার কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

সত্যি, ছোটকা যেন ইলেকট্রনিক-জাদুকর! সবসময় নতুন কিছু করে যমজ দুই ভাইকে তাক লাগিয়েদেয়।

'কী ভাবছ, ছোটকা?' চন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

ঘরের দেওয়ালে ঘুরে বেড়ানো একটা টিকটিকির দিকে আঙুল দেখিয়ে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'পরে ভাববে, ছোটকা। আগে আরশোলাটাকে এদিকে টেনে নিয়ে এসো। নইলে টিকটিকিটা নেমে এসে ওটাকে টপ করে গিলে ফেলবে। তারপর...।'

ছোটকা ইন্দ্রের দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাসল। তারপর টর্চ জ্বেলে তাক করল আরশোলাটার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ছুট লাগাল অন্ধকার আস্তানার দিকে।

চন্দ্রকান্ত আরশোলাটার দৌড় দেখে হেসে ফেলল ঃ 'কী দারুণ! একেবারে আসল আরশোলার মতো!'

ছোটকা গম্ভীরভাবে বলল, 'বুঝলি, ঝালা-পালা, আরশোলা দিয়ে শুরু। তবে আমার টার্গেট হল নতুন মডেলের একটা অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গান তৈরি করা। যার ক্যারেকটার হবে ঠিক ওই রোবট-আরশোলার মতন। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ফাইটার প্লেন যদি ওই অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গানের ওপরে সার্চলাইটের আলো ফ্যালে তা হলে চাকা-লাগানো ফ্রেমে-বসানো বন্দুকটা অটোমেটিক কায়দায় অন্ধকারে ছুটে গিয়ে শেলটার নেবে। ইন্ডিয়ার ডিফেন্স রিসার্চ এখন এই ধরনের অটোমেটিক মোবাইল অস্ত্রশস্ত্রের ওপরে গবেষণা চালাচ্ছে--কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে।'

চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত যমজ দুই ভাই। বাচ্চা বয়েসে ওরা কান্নাকাটি করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত, কান ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা ওদের নাম রেখেছে 'ঝালা-পালা'।

ছোটকা কাজ করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। ডিফেন্স রিসার্চের সঙ্গেও কীরকম যেন যোগাযোগ আছে। আর ইলেকট্রনিক্স হল ছোটকার সবচেয়ে প্রিয় নেশা। সুযোগ পেলেই নিজের ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকে পড়ে।

গত সাতদিনে ছোটকা তিনটে রোবট-পোকা তৈরি করেছে। একটা শুঁয়োপাকা, একট ঝিঁঝিপোকা, আর লেটেস্ট এই আরশোলা।

চন্দ্রকান্ত অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গান নিয়ে কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হঠাৎই শুনতে পেল খনখনে গলায় কে যেন বলছে, 'ভাইরে ভাই, আমার ভেতরে ভাই, সর্বনাশা ভাই, ওরে জবর ভাই...।'

একইসঙ্গে ধাতব পা ফেলার ঠংঠং আওয়াজ হচ্ছিল। চন্দ্র আর ইন্দ্র ইশারা করে চোখাচোখি করল। ছোটকা চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'একে নিয়ে তো মহা ঝামেলা!'

বলতে-না-বলতেই ঘরে ঢুকে পড়ল হাফপ্যান্ট পরা তিনফুট হাইটের বাচ্চা-রোবট ঝামেলা। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড—রুপোর মতো ঝকঝক করছে।

ছোটকা ওকে জিগ্যেস করল, 'তোমার আবার কী প্রবলেম হল? তোমার ভেতরে আবার 'ভাই' কীসের! একবার বলছ সর্বনাশা ভাই, একবার বলছ জবর ভাই—কী ব্যাপার বলো তো! তোমার দু-ভাই ঝালা-পালা তো এখানে বসে আছে!'

চন্দ্র বলল, 'ছোটকা, বাচ্চা-রোবট তো, ভেতরে আর বাইরে গুলিয়ে ফেলেছে।'

ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, এই দুই বিচ্ছু ভাইযুগলের কথা বলছি না। আরও ডেঞ্জারাস ভাই...ভাই...ভাইরাস।'

ছোটকা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'ও, তাই বলো! বেচারা ভাইরাস বলতে গিয়ে আটকে গেছে। কীরে, ঝালা-পালা, তোরা ঠিক করে ওকে ট্রেনিং দে! কথা বলতে গিয়ে বারে-বারে আটকে যায়—সাধু-চলতি ভাষা মিশিয়ে কথা বলে! তা ছাড়া এখানে ভাইরাস আসবে কোথা থেকে?'

'সে-ভাইরাস নয়। আমার অন্তরে কম্পিউটার ভাইরাস ঘুস গিয়া।' ঝামেলা ওর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়তে-নাড়তে বলল। ওর কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো উলটো-পালটাভাবে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

'কম্পিউটার ভাইরাস!' ছোটকা কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'হতে পারে। কারণ, ক'দিন ধরেই দেখছি তুমি উলটোপালটা বকে চলেছ। আপনমনে দু-হাত তুলে নাচছ আর বেড়ালের মতো মিঁউ মিঁউ করে ডাকছ।'

ঝামেলা তখন কীর্তনিয়ার ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে আর হাতের আঙুলগুলো ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে তালে-তালে হাত ঘোরাচ্ছে। সেইসঙ্গে বিড়বিড় করে আওড়ে চলেছে ঃ 'ভাইরে ভাই, ওরে জবর ভাই। আমার ভেতরে ভাই, আমার বাইরে ভাই...।'

ঝালা-পালা ঝামেলাকে কাছে ডাকল।

ঝামেলা হেলেদুলে যমজ দু-ভাইয়ের কাছে এল।

চন্দ্র জিগ্যেস করল, 'তুমি এখন কী করছিলে?'

ঝামেলা বলল, 'দোতলার ভেরান্ডায় মর্নিং ওয়াক করছিলাম।'

মর্নিং ওয়াক! ছোটকা আঁতকে উঠল। এখন ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। রাত আটটার সময় রোবটটা মর্নিং ওয়াক করছে! নিশ্চয়ই ওটার ভেতরে বড়সড়ো কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। হয়তো রিয়েল টাইম ক্লকটাও অকেজো হয়ে গেছে।

'তুমি রাত আটটার সময় মর্নিং ওয়াক করছ!' ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ।' ঝামেলা উদাসীনভাবে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাদের নলেজে থাকা দরকার আমি ধীরে-ধীরে নিশাচর প্রাণী হয়ে যাইতেছি।'

এ-কথা শুনে ছোটকা আর ঝালা-পালা হাঁ করে বাচ্চা-রোবটটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝামেলা ছোটকারই হাতে তৈরি। ঝালা-পালাকে এই বাচ্চা রোবটটা ছোটকা প্রেজেন্ট করেছিল। সবসময় ঝামেলা বাধায় বলে ছোটকাই ওর নাম রেখেছে ঝামেলা। এখন ঝামেলা এক নতুন ঝামেলা নিয়ে হাজির হয়েছে ওদের সামনে।

বলে কী রোবটটা! ও ধীরে-ধীরে নিশাচর প্রাণী হয়ে যাচ্ছে!

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'শোন, কেস খুব সিরিয়াস। মনে হয় কম্পিউটার ভাইরাসের জন্যেই এরকম হচ্ছে। লাস্ট উইকে ওর প্রোগ্রামগুলো যখন আপগ্রেড করছিলাম তখন একটা ফ্লপি ওর মেমোরির সঙ্গে কানেক্ট করেছিলাম। তখনই হয়তো কোনও ভাইরাস প্রোগ্রাম ওর মেমোরিতে ঢুকে পড়েছে।

ঝালা-পালা ছোটকার কথা শুনল বটে, তবে ভালো করে কিছু বুঝতে পারল না।

ছোটকা বলল, 'এই চন্দ্র, আমার ঘরের টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে আয় তো!'

চন্দ্রকান্ত লাফিয়ে উঠে পড়ল। 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি' বলে ছুট লাগাল ছোটকার ঘরের দিকে।

ঝামেলা তখন বলছে, 'আমি নকটার্নাল, আমি নিশাচর। আমি নকটার্নাল, আমি নিশাচর।'

ঝামেলার ছোটখাটো সমস্যা হলে ছোটকা নিজেই ঠিকঠাক করে দেয়। তবে ওর বড়সড়ো কিছু হলে ওকে পাঠানো হয় ড. প্রকাশ দেবনাথের কাছে। ডা. দেবনাথ গত পনেরো বছর ধরে 'রোবট ইনটেলিজেন্স', 'কম্পিউটার ভাইরাস' আর 'মেশিন লার্নিং সিস্টেম' নিয়ে গবেষণা করছেন। বিজ্ঞানীমহলে ওঁর গবেষণা দারুণ কদর পেয়েছে। 'রোবোটিক রিসার্চ' সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হলেই ভারত সরকারের উঁচুমহল থেকে ড. দেবনাথের ডাক আসে। তা ছাড়া ছোটকার 'ইনসেক্ট রোবট' গবেষণাতেও ড. দেবনাথ দরকার পড়লেই ছোটকাকে সাহায্য করছেন।

চন্দ্র ফোনটা নিয়ে এসে ছোটকার হাতে দিল। ছোটকা শেষ হয়ে আসা চুরুটটা হাত বাড়িয়ে একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর ড. দেবনাথের নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল।

ঝামেলা তখনও কীর্তনিয়ার ঢঙে নাচছিল আর ওর নিশাচর হয়ে যাওয়ার

প্রবণতা নিয়ে যা-খুশি-তাই গাইছিল।

চন্দ্রকান্ত ওর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু হয়ে কথা বন্ধ করো।'

আদেশ পাওয়ামাত্রই বাচ্চা-রোবটটা ফ্রিজ শট হয়ে গেল। ছোটকা ততক্ষণে ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে।

'ড. দেবনাথ? আমি প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন। হঠাৎ কী মনে করে?'

'আর বলবেন না! আমাদের বাচ্চা-রোবটটাকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছি...।'

'কেন, ঝামেলা আবার কী ঝামেলা করল?' ড. দেবনাথ হেসে জানতে চাইলেন।

ছোটকা বলল, 'ও তো বলছে ওর ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে। তারপর এও বলছে, ও নাকি ধীরে-ধীরে নিশাচর হয়ে যাচ্ছে।'

ফোনের ও-প্রান্তে প্রকাশ দেবনাথ হাসিতে ফেটে পড়লেন। একটু পরে হাসির দমক সামলে নিয়ে বললেন, 'নিশাচর হয়ে যাচ্ছে! কখনও কোনও রোবটের এই টাইপের প্রবলেম হয়েছে বলে শুনিনি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...।' ড. দেবনাথের হাসি আর থামতেই চায় না।

ছোটকা বলল, 'মনে হয় ওর ''লার্নিং সিস্টেম''-এর মধ্যেও কোনও গোলমাল হয়েছে।'

ঝামেলার মধ্যে একটি 'লার্নিং সিস্টেম' আছে। সেটা ওকে রোজকার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন-নতুন জিনিস শিখতে সাহায্য করে। এর ফলে ওর 'নলেজ বেস' ক্রমাগতই বাড়তে থাকে।

'ওকে নিয়ে চলে আসুন আমার কাছে। কখন আসবেন?' ড. দেবনাথ জানতে চাইলেন।

'আপনার যখন সুবিধে। যদি বলেন কাল সকালে...এই ধরুন দশটা নাগাদ...যেতে পারি।'

'উঁহু, কাল দশটায় আমার ইন্সটিটিউটে একটা মিটিং আছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সময় নিলেন প্রকাশ দেবনাথ। তারপর বললেন, 'আজ রাতে আসতে পারবেন? এলে আমার একটা দারুণ আবিষ্কার দেখাব। শুনলে আপনি চমকে যাবেন।'

'কী আবিষ্কার?'

'ফোনে বলব না—এলে বলব। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, এই নতুন ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোনও রিসার্চ পেপার ছাপাতে পারব না। তাতে সাঙঘাতিক বিপদ হবে।'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ সরু হল।

এমন আবিষ্কার যেটা গোপন রাখাই ভালো!

ড. প্রকাশ দেবনাথ আগে কখনও এরকম কথা বলেননি। বরং উৎসাহ নিয়ে নতুন আবিষ্কারের কথা ছোটকাকে জানিয়েছেন। বলেছেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনাকে জানিয়ে রাখলাম, কারণ কখনও দরকার পড়লেই আমাকে ডাক দেবেন। দেশের জন্যে জান হাজির।'

সেই বিজ্ঞানীর মুখে আজ এরকম কথা!

'আপনার এই নতুন আবিষ্কার জানাজানি হলে কার সাঙঘাতিক বিপদ হবে?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

'আপনার, আমার, সবার। পৃথিবীর কোনও দেশই সেই বিপদের আওতা থেকে বাদ যাবে না।' ড. দেবনাথ সিরিয়াস গলায় বললেন।

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি ঝামেলাকে নিয়ে রওনা হচ্ছি। মনে হচ্ছে, আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার বাড়ি পৌঁছে যাব।'

মোবাইল ফোন অফ করে দিল ছোটকা।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ছোটকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ছোটকা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

ছোটকা শূন্য চোখে ল্যাবরেটরির একটা জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ভুলে গেছে রোবট-আরশোলার কথা, ঝালা-পালার কথা, এমনকী ঝামেলার কথাও।

'কী হল, ছোটকা?' চন্দ্র অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করল।

ছোটকা যেন চমকে উঠল। বলল, 'শোন, তোরা লেখাপড়া নিয়ে বসে যা, নইলে বউদি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। আমি ঝামেলাকে নিয়ে বেরোচ্ছি—ড. দেবনাথের বাড়ি যাচ্ছি। মনে হয় ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'ঝামেলা স্ট্যাচু কাটাকুটি—।'

এ-কথা বলামাত্রই ঝামেলা একটা লম্বা হাই তুলে বলল, 'ভোর হয়ে গেছে? এক কাপ চা দাও—।'

ছোটকা বলল, 'ব্যাটা নিশাচরের অভিনয় করছে নাকি রে?'

চন্দ্র বলল, 'কে জানে! আবার ভাইরাসও হতে পারে।'

ছোটকা ঝামেলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ডাক্তারখানায় চলো। সেখানেই বোঝা যাবে তোমার অসুখটা আসলে কী। সত্যি-সত্যি তোমার ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে, নাকি তুমি এঁচোড়ে পাকা হয়ে উঠেছ...।'

ঝামেলা বলল, 'এঁচোড় পাকলে কাকের কী।'

ইন্দ্রকান্ত ওর ভুল শুধরে দিয়ে বলল, 'ভুল হল, ঝামেলা। কথাটা হচ্ছে, বেল পাকলে কাকের কী।'

ঝামেলা ওর বড়-বড় কাচের গুলির মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'জানি, জানি। জ্ঞান দেওয়াটা এই যমজদিগের হ্যাবিট হইয়া গিয়াছে। শোনো বৎসগণ, বেলটা আসলে বড় একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে বলিয়া বেল চেঞ্জ করিয়া এঁচোড় করে দিলাম।'

ছোটকা ওর হাত ধরে টান মারল। ঝামেলার ঢং নকল করে বলল, 'চলো, চলো, ঢের পাকামি হইয়াছে।

দুই

পৌনে ন'টা নাগাদ ড. প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে পৌঁছে গেল ছোটকা।

সল্টলেকের এ. ই. ব্লকে সবুজ বাগান দিয়ে ঘেরা চমৎকার দোতলা বাড়ি। সদর দরজার কাছে সাদা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় নুড়ি-ছড়ানো পথটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির পাশ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল ছোটকা। তারপর ঝামেলাকে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোল।

নুড়ির ওপর পা ফেলে হাঁটতে ঝামেলার বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তাই ছোটকা ঝামেলার হাত ধরে সামাল দিচ্ছিল--যাতে পঞ্চাশ কেজি ওজনের নেড়া মাথা রোবটটা কাত হয়ে পড়ে না যায়।

সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাথার ওপরে একটা নীল বাতি দপ করে জ্বলে উঠল। দরজার পাশেই লুকোনো স্পিকার থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল ঃ 'ড. প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে আপনাকে স্বাগত জানাই। দয়া করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে নিজের পরিচয় জানান।'

ছোট্ট একটা ঘষা কাচের জানলায় আলো জ্বলে উঠল। তার নীচে লেখা ঃ 'এখানে বুড়ো আঙুল চেপে ধরুন।'

ছোটকা এতটুকু অবাক হল না। কারণ, ড. দেবনাথের বাড়িতে ছোটকা আগেও বহুবার এসেছে। বাড়ি আর ল্যাবরেটরিকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রকাশ দেবনাথ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

রেকর্ডেড ভয়েসের নির্দেশমতো ঘষা কাচের জানলায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল ছোটকা। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যান্ত্রিক ঢঙে কথা শোনা গেল ঃ 'পরীক্ষা করে পরিচয় যাচাই করা হয়েছে। প্রসেনজিৎ চৌধুরী ভেতরে আসতে অনুরোধ করছি।'

একটা স্লাইডিং প্যানেল পাশে সরে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথ খুলে গেল। ছোটকা আর ঝামেলা ভেতরে ঢুকল। স্লাইডিং প্যানেল আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঝামেলা আপনমনেই বলে উঠল, 'গোটা বাড়িটায় কেমন যেন যন্ত্র-যন্ত্র গন্ধ।'

ছোটকা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'যন্ত্র কখনও যন্ত্রের গন্ধ পায়!'

ঝামেলা অভিমানে ছোটকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজেকে যন্ত্র ভাবতে ওর ভালো লাগে না।

আলো-ঝলমলে ড্রইংরুমে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। ঝামেলা দু-চোখের ওপরে হাতের পাতা রেখে আলো আড়াল করার চেষ্টা করছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল, 'আমি নিশাচর। এখন বুঝিতে পারিতেছি, দিনের বেলা পেঁচকের কত কষ্ট।'

হঠাৎই ড্রইংরুমের শেষপ্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল। একজন লোক ছোটকাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

লোকটার চলার ভঙ্গিতে কেমন একটা হ্যাঁচকা মারা টান চোখে পড়ল। তারপর, আরও কাছে এলে, ছোটকা লক্ষ করল ওর মুখে একটা তেল-চকচকে ভাব। তা ছাড়া মাথার চুলও এমন পরিপাটিভাবে ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, মনে হচ্ছে যেন প্লাস্টিকের তৈরি।

লোকটার পরনে গাঢ় রঙের ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা চেক শার্ট। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। শরীরের তুলনায় পা দুটোকে সরু-সরু মনে হচ্ছে। আর ওর বাঁ হাতের পাঞ্জা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। কারণ, ছোটকার সূক্ষ্ম নজর বুঝতে পারল, ওটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি।

ছোটকার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা। ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। তারপর বলল, 'আসুন, মিস্টার চৌধুরী, ডক্টর দেবনাথ আপনার জন্যে ল্যাবরেটরিতে ওয়েট করছেন।'

লোকটার গলার স্বর বেশ গম্ভীর, তবে তার সঙ্গে কোথায় যেন একটু ধাতব উপসুর মিশে রয়েছে।

ড. দেবনাথের বাড়িতে এসে এই লোকটাকে ছোটকা আগে কখনও দেখেনি। তাই জিগ্যেস করল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম রোবিদাস। র-এ ও-কার, ব-এ হ্রস্ব-ই...।'

'থাক, থাক—আর বানান করতে হবে না।'

ছোটকা বুঝল, রোবিদাস প্রকাশ দেবনাথের সাম্প্রতিক মডেলের রোবট। কিন্তু ওর বাঁ হাতটা স্টিলের কেন? মানুষের মতো দেখতে রোবট তৈরি করতে চাইলে স্টিলের ওপরে পলিমারের চামড়া সেঁটে দেওয়াটাই রেওয়াজ। শুধু বাঁ হাতের পাঞ্জাটুকু ঢাকা না দেওয়ার মানে কী?

'রোবিদাস' নামটা মনে-মনে আওড়াল ছোটকা। রোবট আর যন্ত্রদাস শব্দ দুটো জুড়ে কি নামটা ড. দেবনাথ তৈরি করেছেন?

ঝামেলা অবাক হয়ে রোবিদাসকে দেখছিল। কারণ, রোবটের মতো দেখতে নয় এমন রোবট ও আগে কখনও দেখেনি। কিংবা দেখলেও বুঝতে পারেনি।

ওরা তিনজনে যখন ড. দেবনাথের ল্যাবের দিকে এগোচ্ছে তখন ছোটকার নজর এড়িয়ে রোবিদাস ঝামেলাকে মুখ ভ্যাংচাল। জবাবে ঝামেলা রোবিদাসকে লাথি দেখাল।

রোবিদাস চাপা গলায় বলল, 'অ-অসভ্য, ছোটলোক...।'

ঝামেলা চোখ পাকিয়ে বলল, 'ব্যাটা লোহা-লক্কড় দিয়ে তৈরি বড্ডেড লেবার।'

ছোটকা পিছন থেকে কথাবার্তার আঁচ পেয়ে ঘুরে তাকাল। তারপর ঝামেলাকে ধমক দিল ঃ 'ঝামেলা, কী হচ্ছে! জলদি এসো!'

ঝামেলাকে নিয়ে এই এক মুশকিল। কোনও রোবট ওকে কিছু বললেই ও মুখিয়ে ওঠে। ওর ধারণা, রোবটদের মধ্যে ও সবচেয়ে উন্নত। আর মানুষ বহু বিবর্তনের পর রোবটে এসে পৌঁছেছে।

ছোটকা আজ ঝামেলা ল্যাবের কাচের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল।

একগাল হাসি নিয়ে ছোটকাকে স্বাগত জানালেন প্রকাশ দেবনাথ।

ল্যাবটা মাপে বেশ বড়—অন্তত কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট। তার সঙ্গে লাগোয়া একটা অ্যান্টিচেম্বার আছে। ছোটখাটো মিটিং থাকলে সেখানে সেরে নেওয়া যায়। আর তার পাশেই সফট্‌ওয়্যার রুম।

ল্যাবটা এয়ারকন্ডিশন্‌ড। পাঁচটা কম্পিউটার এদিক-ওদিক বসানো। তার মধ্যে দুটো চালু রয়েছে। এ ছাড়া নানানরকম মিটার আর যন্ত্রাংশ তিনটে ওয়ার্ক টেব্‌লএ গাদাগাদি করে রয়েছে। দুটো ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপও নজরে পড়ল।

ল্যাবে খুব হালকাভাবে আনন্দের সুর বাজছে—এরোপ্লেন ল্যান্ডিং-এর পর যেরকম ফুর্তির সুর বাজানো হয় অনেকটা সেইরকম। ড. দেবনাথ বলেন, এতে নাকি ঝরঝরে তরতাজা মেজাজে গবেষণা করা যায়। মিউজিক সিস্টেমের স্পিকারগুলো দেওয়ালে কোনও প্যানেলের আড়ালে বসানো—তাই চোখে পড়ছে না।

ড. দেবনাথ একটা কম্পিউটারে বসে কাজ করছিলেন। ছোটকাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। ঃ 'আরে আসুন, বসুন। অনেকদিন পর দেখা হল।'

ছোটকা একটা চেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ঝামেলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমার সৃষ্টি ঝামেলা এখন অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উলটোপালটা বকবক করে আমাদের সবার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'কোনও চিন্তা করবেন না,' ঝামেলার কাছে গিয়ে ওর নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন প্রকাশ দেবনাথ ঃ 'কালকের মধ্যেই ওকে মেরামত করে দিচ্ছি। আগে ওর অ্যাক্টিভিটি সুইচটা অফ করে কম্পিউটার হুক-আপ করে রুটিন প্রোগ্রামগুলো চেক-আপ করতে হবে।'

রোবিদাস একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ড. দেবনাথ ওকে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

রোবিদাস এগিয়ে আসতেই ঝামেলার সুইচটা অফ করে দিলেন প্রকাশ দেবনাথ, বললেন, 'এই রোবটাকে সফ্‌টওয়্যার রুমে নিয়ে গিয়ে রেসিডেন্ট রুটিনগুলো চেক করে নাও। তারপর ''সুপারস্ক্যান'' অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রামটা চালিয়ে ভাইরাস ডিটেক্ট করো। তারপর সেগুলো ক্লিন করা যায় কি না দ্যাখো।'

রোবিদাস 'ইয়েস, স্যার' বলে পঞ্চাশ কেজি ওজনের বাচ্চা রোবটটাকে অবলীলায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর আয়েশ করে পা ফেলে—যেন বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়েছে—হাঁটা দিল সফ্‌ট্‌ওয়্যার রুমের দিকে।

রোবিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ছোটকা বলল, 'এটাই আপনার নতুন আবিষ্কার?'

প্রকাশ দেবনাথ সামান্য চমকে উঠে বললেন, 'না, না—এই রোবো-অ্যানড্রয়েডটা মাসদেড়েক হল তৈরি করেছি। আমার ল্যাবে বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করার জন্যে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার হয়ে পড়েছে। মানুষের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব নয়। আবার সাধারণ ডোমেস্টিক মোবাইল রোবট দিয়েও কাজ হবে না। তাই একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দিয়ে চৌকস করে রোবিদাসকে তৈরি করেছি। নামটা রেখেছি রোবট আর যন্ত্রদাস অ্যামালগাম করে। আর-একটা ব্যবস্থা রেখেছি—যখনই ও কাউকে নিজের পরিচয় দেয়, তখন নামের বানানটাও শুনিয়ে দেয়...।'

প্রকাশ দেবনাথ হাসলেন।

ছোটকাও হেসে বলল যে, হ্যাঁ, পরিচয় দেওয়ার সময় রোবিদাস ছোটকাকেও নামের বানানটা বলছিল।

'ওর বাঁ হাতটা ওরকম ইস্পাতের খোলামেলা রেখে দিয়েছেন কেন? পলিমারের কোনও চামড়ার কোটিং দেননি...অথচ শরীরের বাকি অংশটা...।'

ছোটকার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন ড. দেবনাথ ঃ 'প্রথমে ভেবেছিলাম রোবিদাসকে অ্যানড্রয়েড মডেলে বানাব। তাতে ওকে দেখতে হুবহু মানুষের মতো হত। এমনকী চামড়া, পেশি-টেশি সবই আসল বলে মনে হত। পরে ভাবলাম, না, ও যে মানুষ নয়, রোবট, সেটা সবাইকে আমি জানাতে চাই। কারণ, যন্ত্র যন্ত্রই—সেটা ভুললে আমাদের চলবে না। রোবট যতই ''বুদ্ধিমান''

হোক, তার জায়গা সবসময় মানুষের নীচে—এমনকী সবচেয়ে নির্বোধ মানুষেরও নীচে।'

প্রকাশ দেবনাথকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হল।

ছোটকা বিখ্যাত বিজ্ঞানীটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

মুখটা রোগাটে। তাকে ঘিরে কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। ঠোঁটের ওপরে মানানসই গোঁফ। হাই পাওয়ারের চশমার কাচের আড়ালে দুটো বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো চোখ। চোখের পাতা ঘন-ঘন পড়ছে। আর বাঁ গালে টোল পড়ার গর্ত।

'ইন্সটিটিউট অফ রোবোটিক্স'-এর সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট প্রকাশ দেবনাথ। এরকম আপাদমস্তক সিরিয়াস বিজ্ঞানী ছোটকা খুব কমই দেখেছে। বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রির বহু রিসার্চ প্রজেক্ট ড. দেবনাথের দায়িত্বে রয়েছে।

ড. দেবনাথ বিয়ে করেননি। বিয়ের কথা কেউ বললে বলেন, 'বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।' বাবা-মা-কে নিয়ে সল্টলেকের এই বাড়িতে থাকেন। তবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশিরভাগ সময়টাই ল্যাবে পড়ে থাকেন।

'এবার আপনার বিপজ্জনক আবিষ্কারের কথা বলুন।'

ড. দেবনাথ একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, বলছি।' তারপর একটি কম্পিউটারের কাছে গিয়ে চেয়ারে বসে খটাখট করে কয়েকটা বোতাম টিপলেন, ছোটকার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এই মনিটরটার দিকে তাকান, চৌধুরীসাহেব।'

ছোটকা মনোযোগ দিয়ে তাকাল কম্পিউটারের রঙিন পরদার দিকে। এবং অবাক হয়ে গেল।

কম্পিউটারের মনিটরে অসংখ্য ইংরেজি অক্ষর ঢেউ খেলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন নদীর জলে শ্যাওলা। তারপর অক্ষরগুলো একে-একে টপাটপ খসে পড়তে লাগল নীচে—'স্ট্যাটাস বার'-এর ওপরে, এবং চোখের সামনে উধাও হয়ে যেতে লাগল।

ছোটকা কম্পিউটারে এরকম ভূতুড়ে কাণ্ড কখনও দেখেনি। তাই চেয়ারটা কম্পিউটারের দিকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে মনিটরের ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়ল, ভালো করে দেখতে চাইল ব্যাপারটা।

মিনিটপাঁচেক ধরে চলল ড. প্রকাশ দেবনাথের 'ম্যাজিক'। তারপর কয়েকটা বোতাম টিপে তিনি কম্পিউটার 'শাট ডাউন' করে দিলেন। চেয়ারটা ছোটকার মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিয়ে বসলেন। উজ্জ্বল চোখে ছোটকাকে প্রায় মিনিটখানেক ধরে দেখলেন।

অবশেষে আলতো গলায় বললেন, 'দিস ইজ মাই ডেঞ্জারাস ডিসকাভারি। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান কম্পিউটার ভাইরাস। ইউনিক ভাইরাল প্রোগ্রাম। একে কিছুতেই ধ্বংস করা যায় না। তাই আমি এর নাম রেখেছি ''অবিনাশ-২০০২''। দ্য আলটিমেট ভাইরাস প্রোগ্রাম।'

ছোটকা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকাল। সেখানে এখন নিরীহ স্বাভাবিক ছবি। একটু আগেই যে পরদায় অভিনব ঘটনা ঘটে গেছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

'অবিনাশকে আপনি বিপজ্জনক বলছেন কেন?' ছোটকা জানতে চাইল।

'বিপজ্জনক, কারণ, একবার কম্পিউটারে ঢুকে পড়লে এর হাত থেকে আর নিস্তার নেই। কম্পিউটারে সবরকম মেমোরিতে গোলমাল বাধিয়ে যত ডেটা স্টোর করা আছে সব একেবারে তছনছ করে দেবে। তা ছাড়া ধরুন কোনও নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে অনেকগুলো কম্পিউটার জুড়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা আছে। এই ভাইরাস সেই নেটওয়ার্কের যে-কোনও একটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই নেটওয়ার্ক সিস্টেম পুরোপুরি কোলাপ্‌স করে যাবে।'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সরু হল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'কোনও অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে এটাকে শায়েস্তা করা যাবে না?'

'না—যাবে না। কারণ, সাধারণত অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামগুলো ভাইরাল প্রোগ্রামের "সিগনেচার" খোঁজে—সিগনেচার মানে, ভাইরাল প্রোগ্রামের বিশেষ একটা সাঙ্কেতিক কোড। তারপর ওরা ভাইরাস তাড়ানোর কাজ শুরু করে। আমার তৈরি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা বারেবারে নিজের সিগনেচার বদলায়। রোগ-জীবাণুর ভাইরাস যেমন মিউটেট করে, অনেকটা সেইরকম। এ ধরনের কম্পিউটার ভাইরাসকে "পলিমর্‌ফিক ভাইরাস" বলে। আমার তৈরি অবিনাশ-২০০২ হল পলিমর্‌ফিক ভাইরাসের শেষ কথা।'

'তা হলে তো ইন্টারনেটে এই ভাইরাস ঢুকিয়ে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ, যাবে—গোটা 'সাইবারস্পেস'টা দূষিত হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা লাটে উঠবে। তা হলেই বুঝুন, এই ভাইরাসটা কীরকম ডেঞ্জারাস!'

'কোনও ক্রিমিনাল যদি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা হাতে পায় তা হলে...।'

'তা হলে আর রক্ষে নেই।' ছোটকার কথা শেষ করলেন প্রকাশ দেবনাথ, 'যদি কোনও ক্রিমিনাল এই ভাইরাস হাতে পেয়ে কোনও দেশের ব্যাঙ্কিং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর ডিফেন্স কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ঢুকিয়ে দেয়, তা হলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আর ডিফেন্স ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। নেটওয়ার্কগুলো এমনভাবে কোরাপ্‌টেড হয়ে যাবে যে, আর ওগুলো ঠিক করা যাবে না।' একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. দেবনাথ। তারপর বললেন : 'সেইজন্যেই বলছিলাম, আমার এই নতুন আবিষ্কার জানাজানি হলে আপনার, আমার—সবার বিপদ। পৃথিবীর কোনও দেশই সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচবে না।'

'তা হলে এরকম একটা আবিষ্কার আপনি করতে গেলেন কেন?'

'ইচ্ছে করে কি আর করেছি!' মুখ নীচু করে হতাশায় মাথা ঝাঁকালেন ড. দেবনাথ ঃ 'মাসছয়েক ধরে আমি নতুন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম নিয়ে রিসার্চ করছিলাম। এই করতে-করতে একেবারে আচমকাই অবিনাশকে আবিষ্কার করে ফেলি। তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে ওটা নিয়ে গবেষণা করে যখন বুঝতে পারলাম কী ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি তখন ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। সেইজন্যেই আপনাকে বলেছি, টেলিফোনে বলা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা তো কাউকে-না-কাউকে জানানো দরকার। নিজের আবিষ্কারের কথা কাউকে বলতে না পারলে ভীষণ কষ্ট হয়। আপনাকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি...তাই আপনাকে বললাম।'

ছোটকা গালে কয়েকবার হাত ঘষল। একটা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে আনমনাভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'আপনার এই অবিনাশের কথা আর কে-কে জানে?'

'আপনি আর আমি--এ ছাড়া আর কেউ না।'

রোবিদাস কখন ঘরে ঢুকে পড়েছে ওরা কেউই খেয়াল করেনি। তাই রোবিদাস যখন কথা বলল, তখন দুজনেই সামান্য চমকে উঠল।

রোবিদাস গম্ভীর গলায় বলল, 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ড. দেবনাথ। ওই রোবটটার মধ্যে তিনরকমের ভাইরাস পা-পা-পাওয়া গেছে ঃ ''ফু মাঞ্চু'', ''ডেটাক্রাইম'' আর ''ডাইহার্ড-ফোর''। এখন সেগুলোর ক্লিনিং অ-অ-অপারেশান চলছে। ভাইরাসগুলো প-প-পরিষ্কার হয়ে গেলে আপনাকে জানাব। তখন যদি অ-অ-অন্য কোনও প-প-পরীক্ষা করতে বলেন করব।'

ড. দেবনাথ একটু বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে--তুমি যাও, ঝামেলার কাছে থাকো।'

রোবিদাস নিখুঁত ছন্দে হেঁটে সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে চলে গেল।

ছোটকা জিগ্যেস করল, 'রোবিদাস কি তোতলা? ঝামেলারও মাঝে-মধ্যে দু-একটা কথা আটকে যায়।'

ড. দেবনাথ হেসে বললেন, 'না, তোতলা নয়--তবে ওর ভয়েস সিন্‌থিসিস সিস্টেমে একটু ডিফেক্ট রয়ে গেছে। ''অ'' কিংবা ''প'' দিয়ে কোনও শব্দ শুরু হলে ও সেটা হোঁচট না খেয়ে উচ্চারণ করতে পারে না। যাই হোক, অবিনাশের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী বলুন...।'

ছোটকা বলল, 'পরামর্শ একটাই ঃ আর কেউ যেন অবিনাশের কথা জানতে না পারে।' হঠাৎ কী ভেবে আরও বলল, 'আচ্ছা, অবিনাশকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না? তা হলে এই বিপজ্জনক ভাইরাসের আর কোনও চিহ্ন থাকবে না...।'

ড. দেবনাথ হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, ‘এভাবে কি নিজের আবিষ্কারকে ধ্বংস করে ফেলতে মন চায়!’

ছোটকা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ল্যাবের এককোণে রাখা সবুজ রঙের টেলিফোনটা হঠাৎই বাজতে শুরু করল।

ড. প্রকাশ দেবনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

‘হ্যালো, ড. প্রকাশ দেবনাথ স্পিকিং...।’

টেলিফোনের ও-প্রান্তে কেউ অদ্ভুতভাবে হাসল। তারপর ব্যঙ্গ মেশানো হিংস্র গলায় বলল, ‘ড. প্রকাশ অবিনাশ দেবনাথ? নাকি অবিনাশের সঙ্গে টু থাউজ্যান্ড টু-টাও বলতে হবে?’

ড. দেবনাথের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রিসিভার ধরা হাতটা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল।

‘কে? কে আপনি?’ ভয়ার্ত গলায় জিগ্যেস করলেন।

‘ধরে নিন আমার নামও অবিনাশ—তবে পদবি ভাইরাস নয়, চাকলাদার।’ কথা শেষ হওয়ার পর আবার সেই চাপা হাসি।

ছোটকা ড. দেবনাথকে লক্ষ করছিল। তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আর ঠকঠকানি দেখে ছুটে চলে গেল তাঁর পাশে।

‘কী হয়েছে, ড. দেবনাথ? কে ফোন করেছে?’

ড. দেবনাথ ফ্যালফ্যাল করে ছোটকার দিকে তাকিয়ে রইলেন—কোনও কথা বলতে পারলেন না।

অবিনাশ চাকলাদার তখন বলছে, ‘অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা আমার চাই, প্রকাশবাবু। তা না হলে আপনাকে খতম করে দেব।’

তারপরই লাইনটা কেটে গেল।

ড. প্রকাশ দেবনাথ তখন এয়ারকন্ডিশন্‌ড ল্যাবে দাঁড়িয়েও কুলকুল করে ঘামছেন।

তিন

ছোটকা কয়েক সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে রইল প্রকাশ দেবনাথের দিকে। তারপর ওরা দুজনে ফিরে এসে দুটো চেয়ারে বসল।

ছোটকা জিগ্যেস করল, ‘কী ব্যাপার, কে ফোন করেছিল? আপনি এত ভয় পেয়ে গেলেন কেন?’

ড. দেবনাথ অবিনাশ চাকলাদারের কথা বললেন।

'কে এই অবিনাশ চাকলাদার? এই নামে কাউকে চেনেন?'

মাথা নাড়লেন প্রকাশ দেবনাথ ঃ 'না, চিনি না—।'

'ভয়েসটা কি চেনা মনে হল? হয়তো আপনার জানাশোনা কেউ গলার স্বর বদলে ফোন করেছিল।'

'সেরকম তো মনে হল না! কিন্তু লোকটা খবরটা পেল কেমন করে?'

'যেভাবেই পেয়ে থাক--পেয়েছে এখান থেকেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন চিন্তা করল ছোটকা--তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনার রিসার্চের সঙ্গে কারা-কারা যুক্ত আছে?'

'সে-কথা আমিও ভাবছি...' বিড়বিড় করে বললেন ড. দেবনাথ, 'দুজন রিসার্চ স্কলার আমার সঙ্গে এই ল্যাবে কাজ করে। এ ছাড়া আমার ইনস্টিটিউটের তিনজন সায়েন্টিস্ট আমার সঙ্গে জয়েন্টলি রিসার্চ করে। আমাদের রিসার্চ গ্রুপ থেকে যত রিসার্চ পেপার আমরা পাবলিশ করেছি তার সবক'টাতে আমাদের ছ'জনেরই নাম রয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও মনকষাকষি নেই—আমাদের সম্পর্ক এককথায় দারুণ। আমাকে প্রত্যেকেই খুব ভালোবাসে, রেসপেক্ট করে—।'

কোন এক ফাঁকে ছোটকা পকেট থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করে ফেলেছিল। তাতে কীসব লিখতে-লিখতে জিগ্যেস করল, 'আপনার ভাইরাস নিয়ে রিসার্চের কথা বাকি পাঁচজন জানত?'

'অবশ্যই জানত। একসঙ্গে কাজ করি—জানবে না!'

'তা হলে অবিনাশ...।'

'না, অবিনাশের কথা আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না।' বেশ জোরের সঙ্গে বললেন প্রকাশ দেবনাথ।

'তা হলে অবিনাশ চাকলাদার খবর পেল কোথা থেকে?'

'সেটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' প্রকাশ দেবনাথের মুখে কেমন একটা বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার চৌধুরী—খবরটা অবিনাশ চাকলাদার পেয়েছে আমার এই ল্যাব থেকেই...।'

'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা যে সর্বনেশে সেটা আপনি কবে বুঝতে পারলেন?'

'ছ'দিন আগে। সেদিন প্রথম বুঝতে পারলাম, বাজারে চালু কোনও অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে অবিনাশকে শায়েস্তা করা যাবে না। কারণ, সেদিন আমার টেস্টিং কমপ্লিট হয়েছিল। তখন আমি আমার তৈরি কয়েকটা অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম অবিনাশের ওপরে অ্যাপ্লাই করি। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তখনই নাম রাখলাম অবিনাশ-২০০২'। হঠাৎ কী ভেবে ড. দেবনাথ রীতিমতো আঁতকে উঠে বললেন, 'আরে! এই ভাইরাসটার যে নাম রেখেছি অবিনাশ-২০০২ সেটাই

বা ওই অবিনাশ চাকলাদার জানল কেমন করে?'

ছোটকা একচিলতে হেসে বলল, 'সেটাই তো তখন থেকে ভেবে চলেছি।'

'আপনি এত প্রশ্ন করায় একটা কথা মনে পড়ছে।' হাতে হাত ঘষলেন প্রকাশ দেবনাথ। ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে কয়েক লহমা কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'ভাইরাসটার কী নাম রাখা যায় সেটা আমি ভাবছিলাম, আর একটা কাগজে নানানরকম নাম লিখছিলাম। প্রায় গোটা তিরিশেক নাম লেখার পর অবিনাশ নামটা আমার মাথায় আসে। তখন সঙ্গে ২০০২-টা জুড়ে দিই। তারপর...তারপর...বাকি নামগুলো কেটে দিয়ে সেই কাগজটা ল্যাবের লিটার বিনে ফেলে দিই...।'

কথা শেষ না করেই ল্যাবের একটা ওয়ার্ক টেবিলের দিকে প্রায় ছুটে গেলেন ড. দেবনাথ। টেবিলটার নীচে একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি রাখা ছিল। সেটার কাছে উবু হয়ে বসে ঝুড়িটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর পাগলের মতো ছেঁড়া দলাপাকানো কাগজগুলো হাঁটকাতে লাগলেন।

কয়েকমিনিট ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছোটকার কাছে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'কাগজটা নেই! অথচ ওই লিটার বিনেই আমি ফেলেছি। আর আমার অর্ডার না পেলে সুইপার লিটার বিন পরিষ্কার করে না।' বারকয়েক মাথা চুলকোলেন ঃ 'কোথায় গেল বলুন তো কাগজটা?'

'অবিনাশ চাকলাদারের কাছে।' হেসে বলল ছোটকা। তারপর সিরিয়াস গলায় যোগ করল, 'আমার মোটামুটি যা জানার জেনেছি। কাল সকাল দশটা নাগাদ আমি আপনার কাছে আসব। আপনার দুই স্কলার আর তিনজন কো-ওয়ার্কার-এর সঙ্গে কথা বলব। আর আপনি আজ রাতে বা কাল সকালে যদি আবার কোনও ভয়-দেখানো ফোন পান তা হলে বলবেন আপনি অবিনাশ চাকলাদারের যে-কোনও প্রস্তাবে রাজি আছেন। তারপর আমি এসে যা করার করব। তবে আপনি চাকলাদারের গলাটা খুব খুঁটিয়ে খেয়াল করবেন—যদি চেনা কোনও গলার আদল খুঁজে পান।'

প্রকাশ দেবনাথ ছোটকার কথায় বাধ্য ছেলের মতো ঘন-ঘন ঘাড় নাড়ছিলেন। ওঁর মুখে-চোখে একটা ভয়ের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটকার কথা শেষ হলে চাপা গলায় একবার বললেন, 'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

ছোটকা অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ানোর মতো সমস্যাটা নিয়ে এলোমেলো ভাবছিল। অবিনাশ চাকলাদার আসলে যে-ই হোক, অবিনাশ-২০০২ তার হাতে গেলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। আর ভাইরাল প্রোগ্রামটা নিয়ে সে যখন কাজে লাগাতে চাইছে, তার মানে ভাইরাল প্রোগ্রাম চালানোর ব্যাপারে তার ভালোই আইডিয়া আছে।

নাঃ, ঘুরে-ফিরে সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হচ্ছে ঃ এই ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত পাঁচজনের একজনই অবিনাশ চাকলাদার নাম নিয়ে এই ভয়-দেখানো ফোনটা করেছে। কিন্তু লিটার বিন থেকে কাগজটা যখন সে হাতিয়ে নিতে পারল তখন ভাইরাস প্রোগ্রামটা গোপনে কপি করতে পারল না কেন!

সে-কথাই ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে জিগ্যেস করল।

উত্তরে ড. দেবনাথ বললেন, 'অবিনাশ-২০০২-এর পোটেনশিয়াল জানার পর আমি প্রোগ্রামটাকে সফ্‌টওয়্যার লক করে রেখেছি। তাতে কেউ চাইলেই ওটা কপি করতে পারবে না। তাকে আগে লকের কোডটা ব্রেক করতে হবে। আমার মনে হয়, অবিনাশ-২০০২-কে লুকিয়ে কপি করতে না পেরে অবিনাশ চাকলাদার হুমকির পথ বেছে নিয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে, আমি নিজে থেকে প্রোগ্রামটা কপি করে না দিলে ওর পাওয়ার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া আমার সফ্‌টওয়্যার লকের কোডটাও বেশ কঠিন। ওটা ব্রেক করা প্রায় অসম্ভব।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে—এবার উঠি।' ছোটকা উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে ঃ 'আপনি খুব কেয়ারফুল থাকবেন। অবিনাশ চাকলাদারের ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না। আচ্ছা, ঝামেলাকে কি কাল পাওয়া যাবে? নইলে আমার দুরন্ত ভাইপো দুটো আমাকে জ্বালাতন করে মারবে।'

ড. দেবনাথ আনমনা হয়ে কীসব ভাবছিলেন। ছোটকার কথায় হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, 'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কালই ওকে পেয়ে যাবেন।'

প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে একটা চুরুট ধরাল ছোটকা। এতক্ষণ চুরুট খেতে না পেরে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিল।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে মোবাইল ফোন থেকে বাড়িতে একটা ফোন করে দিল ছোটকা। বউদিকে বলল, 'চিন্তা কোরো না, বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব।'

বউদির কাছেই ছোটকা শুনল, ঝালা-পালা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকাল থেকেই ঝামেলার খোঁজ পড়ল।

ঝালা-পালা বায়না ধরল যে, ওরা ঝামেলাকে নিয়ে আসতে যাবে। তার ওপর কাল রাতে ড. দেবনাথের সঙ্গে ছোটকার টেলিফোনে কথাবার্তার সময়ে ওরা একটু রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল। কী একটা আবিষ্কার জানাজানি হলে নাকি সাঙঘাতিক বিপদ হবে। তাই ওরা ছোটকাকে চেপে ধরল।

দু-ভাইয়ের স্কুলে যাওয়া মাথায় উঠল। ওরা শুনতে চাইল ড. প্রকাশ দেবনাথের আবিষ্কার আর সাঙঘাতিক বিপদের গল্প।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল ছোটকা। দু-ভাই হাঁ করে ছোটকার কথা গিলতে লাগল।

সব শোনার পর চন্দ্রকান্ত বলল, 'কিন্তু কম্পিউটার ভাইরাসের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ছোটকা।'

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'আমারও ঠিক মাথায় ঢুকল না।'

ছোটকা হেসে বলল, 'আমিও কি পুরোপুরি বুঝেছি রে! সেইজন্যেই তো কাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে-বসে ইন্টারনেটে ভাইরাসের ওপরে পড়াশোনা করছিলাম। ১৯৪৯ সালে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল বলতে পারিস। তখন বেশিরভাগ মানুষ জানতই না যে, বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার তৈরি করে ফেলেছেন। সেই সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জন ফন নয়ম্যান সহগবেষকদের নিয়ে একটি রিসার্চ পেপার লেখেন। সেটার নাম ছিল ''থিয়োরি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ কমপ্লিকেটেড অটোমেটা''। এতে নয়ম্যান যে-আসল কথাটি বলেছিলেন তা হল, কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে-নিজে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে—অনেকটা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির মতো। তখনও কম্পিউটার ভাইরাস নামটা চালু হয়নি। এই নামটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আমেরিকার লেই ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক ফ্রেড কোহেন। ১৯৮৪ সালে কম্পিউটার সিকিওরিটি নিয়ে আমেরিকায় একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে একটা গবেষণাপত্র ফ্রেড কোহেন পেশ করেছিলেন। তাতেই প্রথম তিনি ''কম্পিউটার ভাইরাস'' কথাটি ব্যবহার করেন। ড. কোহেনের মতে কম্পিউটার ভাইরাস হল এমন একটি প্রোগ্রাম যা অন্যান্য প্রোগ্রামে নিজের একটি কপি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই প্রোগ্রামগুলোকে সংক্রামিত করে।'

ছোটকা চুপ করতেই ঝালা-পালা মাথা চুলকোতে লাগল।

ছোটকা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'কী হল রে, মাথা চুলকোচ্ছিস কেন?'

ইন্দ্র বলল, 'এমনিতে ঠিকই আছে—তবে শেষটা কেমন গুলিয়ে গেল। প্রোগ্রামের মধ্যে প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দিলেই সেটা ভাইরাস হয়ে গেল!'

চন্দ্রও সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

ছোটকাও মাথা চুলকে একচিলতে হাসল ঃ 'আমিও কি এ-ব্যাপারে খুব বেশি জানি রে! দাঁড়া, একটা এক্সাম্পল্ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। ধর, একটা অফিসে একজন কেরানিবাবু কাজ করেন। রোজ অফিসে এসে তিনি দেখেন তাঁর টেবিলে সেদিনকার কাজের ফিরিস্তি জানিয়ে একতাড়া কাগজ রাখা আছে। তিনি প্রথম কাগজটা তুলে নিয়ে ওপরওয়ালার লেখা নির্দেশগুলো পড়লেন। সেইমতো সব কাজ শেষ করলেন। তারপর নির্দেশ লেখা প্রথম কাগজটা লিটার বিনে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এরপর আমাদের কেরানিবাবু তুলে নিলেন দ্বিতীয় কাগজটা। তাতে

লেখা নির্দেশগুলো পড়ে নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

'এখন ধরা যাক, সেই অফিসে একটা বদমাশ লোক লুকিয়ে ঢুকে পড়ল। সে কেরানিবাবুর কাগজের তাড়ার মধ্যে একটা বাড়তি কাগজ গুঁজে দিল। সেই কাগজটায় নির্দেশ দেওয়া আছে ঃ এই কাগজটা দুবার কপি করে তোমার পাশের দুজন কেরানির টেবিলে কাগজের তাড়ার মধ্যে গুঁজে দাও। তখন কেরানিবাবু কী করবেন? বদমাশ লোকটার কাগজটা পেয়ে সেটাকে ওপরওয়ালার নির্দেশ বলে ভাববেন এবং তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে মূল কাগজটা লিটার বিনে ছুড়ে ফেলে দেবেন। তারপর নিয়মমাফিক টেবিল থেকে পরের কাগজটা তুলে নিয়ে আবার কাজে মন দেবেন।

'যে-দুজন নতুন কেরানি কাগজটা পেলেন তাঁরা কী করবেন? তাঁরাও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে বদমাশ লোকটার নির্দেশকে ওপরওয়ালার নির্দেশ ভেবে তার দুটো কপি করে আরও দুজন কর্মীর টেবিলে দিয়ে দেবেন। এর ফলে নির্দেশটা মোট চার কপি হয়ে গেল। এইভাবে প্রতিদিন কাগজটা কপি হয়ে হয়ে অন্যান্য কর্মীদের টেবিলে পৌঁছে যাবে এবং একইসঙ্গে বদমাশ লোকটার নির্দেশের কপির সংখ্যা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে থাকবে। ফলে কয়েকদিন পরেই দেখা যাবে ওই অফিসের সব কর্মী অন্য সব জরুরি কাজ ছেড়ে শুধু ওই নির্দেশটাকেই কপি করে চলেছে।'

থেমে একটু দম নিল ছোটকা। তারপর বলল, 'কম্পিউটার ভাইরাস ঠিক এভাবেই কাজ করে। ধরে নে, আমাদের কেরানিবাবু হল কম্পিউটার, আর তাঁর টেবিলে রাখা কাগজের তাড়া হল কম্পিউটার প্রোগ্রাম। আর বদমাশ লোকটার নির্দেশ লেখা কাগজটা হল ভাইরাল প্রোগ্রাম। ভাইরাস ইনফেক্টেড কম্পিউটারে ইনফেক্টেড প্রোগ্রামটা চালালেই তাতে লুকিয়ে থাকা ভাইরাল প্রোগ্রাম অন্যান্য প্রোগ্রামে কপি হয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর একসময় কম্পিউটারের মেমোরি ভরতি হয়ে গিয়ে সবকিছুর বারোটা বেজে যায়।'

ঝালা-পালা চোখ বড়-বড় করে বলল, ''বাব্বাঃ, ভাইরাস মানে এত্তসব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। তা হলেই বোঝ, ঝামেলা বেচারির কী কষ্ট হচ্ছে!'

দাদা-বউদিকে বলে আগে ম্যানেজ করল ছোটকা। তারপর ঝালা-পালাকে নিয়ে সময়মতো বেরিয়ে পড়ল।

গাড়িতে ওঠার আগে ড. দেবনাথকে মোবাইল ফোন থেকে ফোন করে জানতে পারল, অবিনাশ চাকলাদার সকাল আটটা নাগাদ একবার ফোন করেছিল। একই ধরনের হুমকি দিয়ে সে ভাইরাসের কপি চেয়েছে। ওটা না পেলে সে প্রকাশ দেবনাথকে কিডন্যাপ করে খুন করবে।

ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে ড. দেবনাথ একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'..আমাকে ট্রেট করার সময় অবিনাশ চাকলাদার হঠাৎ হাঁচতে শুরু করে। বোধহয় ঠান্ডা লেগে থাকবে। কিন্তু তারপরই যখন সে আবার কথা বলতে শুরু করে তখন তার গলাটা কেমন যেন চেনা মনে হয়। তবে কোথায় এরকম গলা শুনেছি সেটা আমি ঠিক প্লেস করতে পারিনি।'

ছোটকা বলল, 'হাঁচির ঠিক পরে-পরেই হয়তো গলাটা চেঞ্জ করে উঠতে পারেনি। আর শুনুন, আমরা এখুনি আপনার বাড়ি রওনা হচ্ছি।'

ছোটকার মারুতি ছুটতে শুরু করল।

চার

প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছোতেই একটা হট্টগোল কানে এল।

ছোটকা আর ঝালা-পালা ড. দেবনাথের সদর দরজায় হাজির হওয়ামাত্রই দরজা খুলে গেল। ঝামেলা বেরিয়ে এল বাইরে। ওর গোল মাথায় বসানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে। আর ও উত্তেজিতভাবে তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচাচ্ছে।

ঝামেলা খুব খুশি হলে বা উত্তেজিত হলে এরকম করে। তবে তখন ও কেন যে জাপানের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নাম ধরে চেঁচায় তা কেউ জানে না।

ঝালা-পালা একসঙ্গে জানতে চাইল, 'ঝামেলা, কী হয়েছে?'

ঠিক তখনই ঝামেলার পিছনে রোবিদাসকে দেখা গেল। আর রোবিদাসের পিছনে বছর তিরিশের এক ফরসা রোগা যুবক। তার চোখে রিমলেস চশমা, থুতনিতে নুর, পরনে সবুজ টি-শার্ট আর কটন ক্যাসুয়াল।

ওদের দুজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঝামেলা বলল, 'এরা আমাকে কিডন্যাপ করে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া গর্দান মটকাইবে।'

ঝামেলাকে শান্ত করার জন্য ছোটকা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না—তুমি ভুল করছ। তোমার অসুখ করেছিল বলে এখানে সারাতে দিয়ে গিয়েছিলাম।'

ঝামেলা বিরক্তভাবে বলল, 'এরা আবার ডাক্তার নাকি? সব হাতুড়ি ডাক্তার! এই বাড়িটাই হাতুড়ি-নিবাস।'

ছোটকা বুঝল, ঝামেলা 'হাতুড়ে' বলতে গিয়ে 'হাতুড়ি' বলছে। আর মনে-মনে ভাবল, 'নাঃ, বাচ্চা-রোবটটা মহা খেপে গেছে দেখছি!'

ঝালা-পালা বহু কষ্টে নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে ঝামেলাকে শান্ত করল।

রোবিদাস সব দেখে-শুনে কোমর নাচিয়ে বলল, 'ঢ—ং! এরকম বাঁদুরে আদুরে রোবট কখনও দেখিনি। কী ইম্‌পেশেন্ট পে-পে-পেশেন্ট রে বাবা!'

ঝামেলা উত্তরে রোবিদাসকে লাথি দেখাল। বলল, 'তোতলা ডিফেক্‌টিভ

মেশিন। সাহস থাকে বল তো, পাখির পিঠে পাকা পেঁপে...।'

রোবিদাস বারদুয়েক 'পা-পা—' বলে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল।

ঝামেলা হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

ছোটকা গাড়ির রিমোট ইউনিটটা ঝালা-পালাকে দিয়ে বলল, 'ঝামেলাকে নিয়ে তোরা গাড়িতে গিয়ে বোস—কোথাও যাবি না। আমি একটু পরে এসে তোদের ল্যাব-ট্যাবগুলো ঘুরিয়ে দেখাব।'

ঝালা-পালা ঝামেলাকে নিয়ে গাড়ির দিকে চলে যেতেই অচেনা যুবকটি প্রথম কথা বলল, 'আপনাদের রোবটটা ভারি ইন্টারেস্টিং তো!'

ছোটকা হেসে বলল, 'আসলে আমি ওটা তৈরি করেছি। আমার রোবোটিক্স-এ ফর্মাল নলেজ নেই বলে ওটা ওরকম উলটোপালটা লজিকে কাজ করে...।' একটু থেমে ছোটকা জিগ্যেস করল, 'আপনি কি ড. দেবনাথের ল্যাবে রিসার্চ করেন?'

যুবক মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ–আমার নাম প্রভাস–প্রভাস দত্ত। এখানকার সিনিয়ার রিসার্চ স্কলার।'

'আমার নাম প্রসেনজিৎ চৌধুরী—ড. দেবনাথের বন্ধু। উনি ল্যাবে আছেন তো?'

'হ্যাঁ, আছেন। আসুন, ভেতরে আসুন।'

ল্যাবের দিকে যেতে-যেতে প্রভাস বলল, 'আমি রোবট কমিউনিকেশান নিয়ে গবেষণা করছি। সেইজন্যেই দুটো রোবটের ঝগড়া মন দিয়ে শুনছিলাম।'

ছোটকা হেসে বলল, 'রোবটদের কথাবার্তা বা ঝগড়া সবই খুব ইন্টারেস্টিং।'

প্রভাসের রোগাটে মুখে চশমার কাচদুটো ভীষণ বড় লাগছিল। তার ওপর ছোটকা লক্ষ করল, প্রভাস মাঝে-মাঝেই মাথাটা ডানদিকে সামান্য নাড়াচ্ছে— অনেকটা হেঁচকি তোলার মতো।

ল্যাবে ঢুকতেই ড. দেবনাথের সঙ্গে দেখা।

রোবিদাস তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তখন ঝামেলার নামে অভিযোগ করছে : '...জানেন স্যার, বদমাশ রোবটটা আমাকে লাথি দেখিয়েছে! তারপর বলেছে, পা-পা-পাখির...আর বলতে পা-পা-পারছি না। আপনি যেভাবেই হোক আমার তোতলামিটা সারিয়ে দিন। ওই বেঁটে নেড়া রোবটটার কাছে আমি হেরে গেলাম!'

ড. দেবনাথ কিছু বলার আগেই প্রভাস বলল, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই, রোবিদাস, ওটা আমি ঠিক করে দেব। তুমি আমার সঙ্গে এসো–।'

রোবিদাসকে নিয়ে প্রভাস ল্যাবের এক কোণে চলে গেল।

ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে বলল, 'ঝামেলাকে ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ও রোবিদাসের সঙ্গে যেরকম ঝগড়া বাধাল তাতেই বুঝেছি ও সেরে

উঠেছে। ওর কাজই হল যত রাজ্যের ঝামেলা পাকানো। ওকে ভাইপোদের সঙ্গে গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে মনের আনন্দে মেতে থাকবে। এবারে বলুন, এদিকে কী খবর...।'

ড. দেবনাথ বললেন, 'একটা ব্যাপার হয়েছে, মিস্টার চৌধুরী। আজ সকালে কাজ শুরু করার পর আমার দুজন স্কলার—প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরী—ওরা রিপোর্ট করল যে, ওদের কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের অনেক ফাইল ডিলিট হয়ে গেছে...মানে, কেউ মুছে দিয়েছে।'

'হঠাৎ এভাবে কেউ ফাইল মুছতে যাবে কেন?'

'তা জানি না। তবে কম্পিউটারগুলো নিয়ে কেউ যে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তাতে ভুল নেই।'

ড. দেবনাথকে ল্যাবের একপাশে ডেকে নিয়ে গেল ছোটকা। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'প্রভাসের সঙ্গে তো আলাপ হল। বাকি চারজন কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ—অ্যান্টিচেম্বারে মিত্যুনকে নিয়ে টেকনিকাল আলোচনায় বসেছেন। মিটিং-এর ছুতো করে ওঁদের ডেকে এনেছি। চলুন, আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিই।'

'না, ড. দেবনাথ, এরকম আলটপকা আলাপ করালে ওঁরা সন্দেহ করবেন। বিশেষ করে অবিনাশ চাকলাদারের ব্যাপারটা আপনি যখন কাউকে বলেননি...।'

প্রকাশ দেবনাথ দাড়িতে হাত বুলিয়ে ঘাড় নাড়লেন ঃ 'ঠিক বলেছেন। তা হলে?'

তা হলে কী সেটাই বলতে যাচ্ছিল ছোটকা, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে যেন প্রকাণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

মিউজিক সিস্টেমের মিউজিক আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে কারও কথা শোনা গেল।

কথা শুরু হওয়ামাত্রই ড. দেবনাথ ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। কারণ তিনি অবিনাশ চাকলাদারের গলা চিনতে পেরেছেন।

অবিনাশ চাকলাদার তখন বেশ স্পষ্ট গলায় বলছে, 'ড. প্রকাশ দেবনাথ, অবিনাশ চাকলাদার বলছি। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। আপনার নতুন আবিষ্কারটি আমার চাই—কম্পিউটার ভাইরাস অবিনাশ-২০০২। ওটা কালকের মধ্যে না পেলে ভারত একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে হারাবে। আমার কিছু করার নেই। আর হ্যাঁ, ভাইরাল প্রোগ্রামটা দেওয়ার আগে সফ্‌টওয়্যার লকটা খুলে দেবেন। মনে থাকে যেন, ডেডলাইন হল কাল রাত বারোটা। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে ধন্যবাদ।'

অবিনাশ চাকলাদারের কথা শেষ হতেই আবার আনন্দের বাজনা বাজতে শুরু করল।

ঘরের সবাই চুপ।

প্রভাস দত্ত নিজের সিট ছেড়ে চলে এল প্রকাশ দেবনাথের কাছে। ওর পিছন-পিছন রোবিদাস।

নাকের ডগায় চশমা ঠিক করে বসাল প্রভাস। মাথাটা দুবার নেড়ে বলল, 'স্যার, এসব কী ব্যাপার!'

ঠিক তখনই অ্যান্টিচেম্বার থেকে চারজন মানুষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল ল্যাবের ভেতরে।

প্রথমজন বেশ মোটাসোটা চেহারার, গায়ের রং ময়লা, মাথায় অকালে টাক পড়েছে। সে হাত-মুখ নেড়ে অবাক হয়ে বলল, 'মিউজিক সিস্টেমে হঠাৎ এ কী শুনলাম, স্যার? কে এই অবিনাশ চাকলাদার? অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসের ব্যাপারটাই বা কী?'

প্রকাশ দেবনাথ হঠাৎই যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ শান্ত হয়ে গেলেন। তারপর জবাব দিলেন, 'শোনো, মিত্যুন, উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই। বড়জোর দেশের স্বার্থে আমাকে মরতে হবে। তোমাদের কাউকে এতদিন বলিনি--আজ বলছি। দিন সাত-আট আগে একটা নতুন কম্পিউটার ভাইরাস আমি তৈরি করেছি। কোনও অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম ওটাকে ডিফাংক্ট করতে পারে না। তাই আমি ওটার নাম দিই অবিনাশ-২০০২। তারপর...।'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বললেন প্রকাশ দেবনাথ। দুজন স্কলার ও তিনজন বিজ্ঞানী স্তম্ভিত হয়ে তাঁর কথা শুনলেন। তারপর ওঁদের নিজেদের মধ্যে নানান কথার ফুলঝুরি শুরু হল। শান্ত ল্যাবটা হঠাৎই যেন অশান্ত হয়ে উঠল।

ড. দেবনাথ হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই--যদি কোনও বিপদ হয় আমার হবে, আর কারও নয়। গতকাল থেকে অবিনাশ চাকলাদারের হুমকির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। সেইজন্যেই আমি মিস্টার প্রসেনজিৎ চৌধুরীকে খবর দিয়েছি। উনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।' ছোটকার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ ঃ 'মিস্টার চৌধুরী ইলেকট্রনিক্সে এক্সপার্ট, তবে রোবোটিক্সেও সামান্য কিছু কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয়...। উনি আপনাদের এই প্রবেলেমটা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আপনারা কাইন্ডলি ওঁকে একটু হেল্প করবেন। আপনাদের সবার কোঅপারেশন না পেলে অবিনাশ চাকলাদারকে ধরা সম্ভব নয়।'

উত্তরে সকলেই মাথা নেড়ে ড. দেবনাথের কথায় সায় দিল।

ছোটকা লক্ষ করল, প্রকাশ দেবনাথ তার আসল পরিচয়টা গোপন রাখলেন।

সেটা আরও স্পষ্ট হল যখন তিনি ছোটকার কাছে এগিয়ে এসে বাঁ চোখ ছোট করে একটা দুষ্টু ইশারা করলেন, তারপর বললেন, 'আসুন, প্রসেনজিৎবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই...।'

পরিচয় হল।

প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরী রিসার্চ স্কলার।

আর বিজ্ঞানী তিনজন হলেন ড. ওয়াসিম খান, ড. কল্যাণ সেনবর্মা, আর ড. অশোক মিশ্র।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই শুরু হল ঝামেলা।

ড. মিশ্র বেশ বাজেভাবেই ড. দেবনাথকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি ইম্‌মরটাল, ইয়ানি কি অমর, ভাইরাস ডিসকাভার করেছেন, ফির ভি আমাদের বলেননি! কেন জানতে পারি?'

'ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।' প্রকাশ দেবনাথ হাত নেড়ে বোঝাতে চাইলেন ঃ 'আমি ল্যাবে বসে কাজ করছিলাম, সাডেন্‌লি অবিনাশ-২০০২ তৈরি হয়ে গেল। তারপর...।'

মিশ্র বিরক্তভাবে হাত নাড়লেন ঃ 'কম্পিউটার ভাইরাস কখনও সাডেন্‌লি তৈরি হয় না। ভাইরাল প্রোগ্রামকে অনেক মেহনত করে বানাতে হয়। তা ছাড়া পরদিন তো আপনি আমাদের বলতে পারতেন! আমরাও তো নয়া-নয়া আইডিয়া পেলে আপনাকে বলি, নিজেরা আপসমে ডিসকাস করি। উই ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিম, ম্যান!'

'জানি। তবে ভাইরাসটার পোটেনশিয়াল দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি এটা কোনও খারাপ লোকের হাতে পড়ে, তা হলে...।'

'আমরা খারাপ লোক! বুরা আদমি!' রাগে মুখিয়ে উঠলেন ড. মিশ্র ঃ 'তো এখন যে ডেঞ্জার হল তার জন্যে কে দায়ী? কওন হ্যায় ইসকে জিম্মেদার?'

প্রকাশ দেবনাথ চুপ করে রইলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ছোটকা অশোক মিশ্রকে দেখছিল। গোলগাল ফরসা মুখ এখন লালচে। ঠোঁট দেখে মনে হয় পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। বয়েস পঞ্চাশ কিংবা তার কাছাকাছি। গায়ে লাল-হলুদে মাখামাখি রংচঙে শার্ট। লোমশ কবজিতে সোনালি ঘড়ি ঝকমক করছে।

অশোক মিশ্র সবার মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ড.দেবনাথের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে শক্ত গলায় বললেন, 'আপ হ্যায় জিম্মেদার, ড. দেবনাথ, সির্‌ফ আপ! তাই এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে জড়াবেন না। আই অ্যাম দ্য লাস্ট পারসন...আমি এখুনি লালবাজারে ইনফর্ম করছি।'

কথা বলতে-বলতে ড. মিশ্র ল্যাব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ছোটকা তাঁকে বাধা দিল।

'একমিনিট, ড. মিশ্র। যাওয়ার আগে একটা কথা বলি। দয়া করে পুলিশে কোনও খবর দেবেন না। কারণ, আপনার জেনে রাখা দরকার, এই অবিনাশ চাকলাদার লোকটি আমাদের অচেনা নয়। সে এখন এই ঘরের মধ্যেই আছে।'

'তার মানে!'

'মানে খুব সিম্প্‌ল। আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন হল অবিনাশ চাকলাদার। নামটা তার অবশ্যই নকল—এমনকী গলার স্বরটাও। নইলে সে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত। সেইজন্যেই বলছি পুলিশে খবর দেবেন না—তাতে আপনারাই হ্যারাস্‌ড্‌ হবেন।'

ড. মিশ্রের সব সাহস হুউস করে উবে গেল। চোখের পলকে মুখে একটা কাচুমাচু ভাব ছড়িয়ে পড়ল। ছোটকার খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'হায় রাম! এ কী বলছেন আপনি! আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন! বিশওয়াস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

ছোটকা হেসে বলল, 'আপনি সায়েন্টিস্ট মানুষ—বিশ্বাস নয়, লজিক দিয়ে ভাবুন।'

অশোক মিশ্র বাকি চারজনের মুখের ওপর খুব ধীরে-ধীরে চোখ বোলালেন। এদের মধ্যে কে?

ড. ওয়াসিম খান এবার প্রকাশ দেবনাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সুপুরুষ দীর্ঘ চেহারা। পরনে সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। জামার হাতায় বিদেশি কাফলিঙ্ক। গা থেকে সুন্দর পারফিউমের হালকা গন্ধ বেরোচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথার ঝাঁকড়া চুলে বোধহয় কলপ দেওয়া।

'ড. দেবনাথ, মিস্টার চৌধুরীর কথা তো বুঝলাম! কিন্তু আমি ভাবছি, মিউজিক সিস্টেমের মধ্যে অবিনাশ চাকদা না কী যেন বললেন—তার ভয়েসের অডিয়ো সিডিটা কে ঢোকাল? মিউজিক সিস্টেমের সিডিগুলো কে চেঞ্জ করে?'

ড. দেবনাথ দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'জেনারালি রোবিদাস চেঞ্জ করে, তবে ইচ্ছে করলে যে-কেউ করতে পারে। ওই তো, ওই প্যানেলের পেছনে মিউজিক সিস্টেমটা রাখা আছে?' কথা বলতে-বলতে আঙুল তুলে ল্যাবের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একটা সাদা চৌকো প্যানেল দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ : 'ওটার পাশে অনেকগুলো সিডিও রাখা আছে—আপনারা তো সবাই জানেন! এই তো গত পরশু প্রভাস আমাদের সবার সামনেই সিডি চেঞ্জ করল!'

ড. মিশ্র তখন ড. কল্যাণ সেনবর্মার সঙ্গে চাপা গলায় উত্তেজিতভাবে কিছু একটা আলোচনা করছিলেন। বারবার সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ওয়াসিম খান রোবিদাসকে কাছে ডাকলেন, 'রোবিদাস, মিউজিক সিস্টেম থেকে সিডিটা বের করে নাও তো! তারপর ড. দেবনাথকে দেখাও...।'

রোবিদাস অক্ষরে-অক্ষরে আদেশ পালন করল। প্যানেল সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে এবং অভ্যস্ত হাতে একটা সিডি বের করে নিল।

সিডিটা ড. দেবনাথের হাতে দিল রোবিদাস ঃ 'স্যার, এই নিন...।'

সিডিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন ড. দেবনাথ। এর মধ্যে অবিনাশ চাকলাদারের ভয়েস ওভারল্যাপ হল কেমন করে! তাঁর ল্যাবে বসেই কি কেউ এই কাজটা করেছে?

তিনজন বিজ্ঞানী আর দুজন রিসার্চ স্কলার প্রকাশ দেবনাথকে ঘিরে ধরলেন। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন প্রলয়ংকর সিডিটাকে। কী করে যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে ঢুকে পড়ল অবিনাশ চাকলাদারের হুমকি?

ছোটকা বলল, 'ড. দেবনাথ, সিডিটা আপনি আলাদা করে রাখুন। আমরা পরে এর ভয়েস সিগনালটা অ্যানালিসিস করে দেখব। তারপর এই পাঁচজনের ভয়েসের সঙ্গে ম্যাচ করে দেখলেই ধরা পড়ে যাবে...।'

ছোটকাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ফেটে পড়লেন ড. সেনবর্মা ঃ 'দেন ডু ইট রাইট নাউ! আমরা জানতে চাই কে এরকম হুমকি দিচ্ছে। কে অবিনাশ-২০০২-কে হাতিয়ে গোটা পৃথিবীর সর্বনাশ করতে চাইছে!'

ছোটকা সেনবর্মাকে দেখল।

কালো মোটাসোটা চেহারা। ডান হাতের ফোলা-ফোলা আঙুলে তিন-তিনটে রঙিন পাথর। বিজ্ঞানী হয়েও জ্যোতিষশাস্ত্রের মায়া কাটাতে পারেননি। ঘন কালো ভুরুর নীচে ছোট-ছোট চোখ যেন গর্তে ঢুকে আছে। আর বাঁ গালে একটা পুরোনো কাটা দাগ।

ছোটকা হাত নেড়ে কল্যাণ সেনবর্মাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। বলল, 'প্লিজ, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমরা যা স্টেপ নেওয়ার নিচ্ছি। ড. দেবনাথের সেফটির জন্যে আমরা ব্যবস্থা করছি।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! উত্তেজিত জটলা আর কথা চালাচালি চলতেই থাকল।

মিত্যুন ছোটকাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, ব্যাপার-স্যাপার খুব সাঙঘাতিক হয়ে উঠেছে। সময় তো আর বেশি নেই। কিছু একটা করুন। নিজেদের মধ্যে সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে পড়লে আমরা মন দিয়ে গবেষণা করব কেমন করে?'

প্রভাস বলল, 'আমাদের কি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত? আপনি কী বলেন?'

ছোটকা মাথা নাড়ল ঃ 'না, না। বললাম তো, এখনই সব জানাজানি হলে

বিপদ বাড়বে।'

ছোটকা হঠাৎ ঘড়ি দেখল। তারপর সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'আজ আমার একটু তাড়া আছে। কাল সকাল ন'টা নাগাদ আপনারা যদি ড. দেবনাথের এই ল্যাবে আসেন তা হলে ভালো হয়। আপনাদের সঙ্গে আমি আলাদাভাবে একটু কথা বলতে চাই।'

উত্তরে সবাই সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

ড. অশোক মিশ্র বললেন, 'কাল সকালে আমার একটা জরুরি মিটিং ছিল। এনি ওয়ে--নো প্রবলেম। আমি অন ডট ন'টায় হাজির থাকব।'

ড. দেবনাথ হেসে ওঁকে 'থ্যাংক ইউ' বললেন।

হঠাৎই ল্যাবের ফোন বেজে উঠল।

সব কথাবার্তা মুহূর্তে থেমে গেল। ঘরটা নিস্তব্ধ থমথমে হয়ে গেল।

ফোনটা বেজেই চলেছে, অথচ প্রকাশ দেবনাথ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

শেষ পর্যন্ত ছোটকা যখন ফোনটা ধরতে পা বাড়াল তখন প্রকাশ দেবনাথ বলে উঠলেন, 'আপনি ধরবেন না, মিস্টার চৌধুরী।' তারপর রোবিদাসকে বললেন, 'রোবিদাস, ফোনটা ধরো--।'

রোবিদাস এগিয়ে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে বলল, 'হ্যালো—।'

কিছুক্ষণ কথা শোনার পর 'এক্ষুনি বলছি' বলে রিসিভার জায়গামতো রেখে দিল। তারপর ড. দেবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার বাবা দোতলা থেকে ফোন করেছেন। আপনাকে একবার ওপরে ডেকেছেন।'

এতক্ষণে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন।

ড. মিশ্র গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমরা সব ডরপোক হয়ে গেছি।'

ড. ওয়াসিম খান চাপা গলায় মিশ্রকে বললেন, 'কী হচ্ছে, ড. মিশ্র! এখন হাসি-ঠাট্টার সময় নয়—প্লিজ!'

অশোক মিশ্র ড. খানের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

ড. দেবনাথ সবাইকে বললেন, 'এক্সকিউজ মি। আমি একটু ওপরে দেখা করে আসছি।'

ছোটকা ওঁর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি একটু আমার ভাইপো দুটোকে ল্যাবে ডেকে নিচ্ছি। ওদের বলেছিলাম, ল্যাবটা ঘুরিয়ে দেখাব।'

ড. দেবনাথ হেসে বললেন, 'অফ কোর্স'। তারপর ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকাও বেরিয়ে এল ল্যাবের বাইরে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ঝামেলার কোড নম্বর ডায়াল করল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলার শরীরে বসানো ইন্‌বিল্ট টেলিফোন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল। ঝামেলার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ছোটকা এই ব্যবস্থাটা মাসখানেক হল তৈরি করে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে ঝামেলা যমজ দু-ভাইকে সল্ট লেক এবং বিধান রায় সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিল, হঠাৎই ওর কানে সিগনাল বাজল। তারপরই ও ছোটকার কথা শুনতে পেল।

'ঝামেলা, তুমি ঝালা-পালাকে নিয়ে এখুনি ল্যাবে চলে এসো। ল্যাবে পাঁচজন লোক আছে—তুমি তাদের ফটো তুলে নেবে আর ভয়েস রেকর্ড করে নেবে। পরে ভয়েস সিগনালগুলো অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। তোমরা ল্যাবে এমনভাবে ঘুরে বেড়াবে যেন ল্যাব দেখতে এসেছ। চলে এসো, কুইক।'

টেলিফোন সিস্টেম অটোমেটিক অফ হয়ে গেল।

ঝামেলা তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল, 'চলো বৎসগণ, বসের ডাক আসিয়াছে।'

ঝালা-পালা বুঝল ছোটকা ওদের ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ওরা রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপে গাড়ি লক করে দিল।

ঝামেলা হেলেদুলে প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে মাথা নেড়ে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগল ঃ 'ইফ ইওর কল হিয়ার এনিবডি নো কাম দেন অ্যালোন চলো রে...ইফ ইওর কল হিয়ার এনিবডি...।'

সুরটা শুনে...ঝালা-পালা বুঝল ঝামেলা ইংরেজি অনুবাদ করে রবিঠাকুরের গান গাইছে ঃ 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে..।' তবে শেষের 'চলো রে'-টা আর অনুবাদ করে উঠতে পারেনি।

পাঁচ

একতলা থেকে একটা শব্দ ভেসে এল--কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ দেবনাথের তন্দ্রা কেটে গেল। নীচের ল্যাব থেকে এল না শব্দটা!

অন্ধকারে চোখ গেল খোলা জানলার দিকে। কখন যেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঠিকরে পড়া রাস্তার আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রুপোর কুচি বলে মনে হচ্ছে।

কালরাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ার পর অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসেনি।

মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে অবিনাশ-২০০২ আর অবিনাশ চাকলাদারের কথা। আর চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও নেই। তারপরই কিছু একটা কাণ্ড করবে অবিনাশ চাকলাদার। লোকটা তাঁর খুব চেনা—অথচ অচেনা।

বিছানায় উশখুশ করতে-করতে একসময় তন্দ্রা এসে চোখ জড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর...হঠাৎই এই শব্দটা...।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে। নীচের ল্যাবের আলো জানলা দিয়ে ছিটকে পড়েছে বাগানের করবীর ঝোপে।

ক'টা বাজে এখন? প্রকাশ দেবনাথ পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে রাখা ছোট টেবিলের কাছে। টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিলেন। রাত দেড়টা।

এ সময়ে ল্যাবে আলো জ্বলাটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। রোবিদাস অনেক সময় সারা রাত কাজ করে। ও অ্যানড্রয়েড—তাই ও কখনও ক্লান্ত হয় না, ওর কখনও ঘুম পায় না।

কিন্তু শব্দটা কীসের হল?

ড. দেবনাথ ঘড়িটা হাতে পরে নিলেন। ছোট টেবিল থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে দিলেন। তারপর একটা হাফশার্ট গায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলেন।

করিডরটা সামান্য আঁধারি হলেও তাঁর কোনও অসুবিধে হল না। অভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন।

ল্যাবের দিক থেকে আরও একটা শব্দ ভেসে এল।

রোবিদাস ল্যাবে অনেক কাজ করে বটে তবে এতই গোছালো যে, তেমন একটা শব্দ-টব্দ হয় না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ল্যাবের কাছে চলে এলেন প্রকাশ দেবনাথ। কাচের দরজা দিয়ে ল্যাবের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। তবে রোবিদাসকে চোখে পড়ছে না। নিশ্চয়ই সফ্‌টওয়্যার রুমে আছে।

ল্যাবে ঢোকার জন্য কাচের দরজা ঠেলে পা বাড়ালেন ড. দেবনাথ।

সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাবের আলো নিভে গেল।

আচমকা লোডশেডিং হল নাকি?

না, তা তো নয়! কারণ দূরে এককোণে একটা কম্পিউটার 'অন' হয়ে রয়েছে!

'রোবিদাস! রোবিদাস!' চাপা গলায় ডাকলেন ড. দেবনাথ। তিনি চান না যে, চেঁচামেচিতে দোতলায় বাবা-মায়ের ঘুম ভেঙে যাক। ওঁদের ঘুম খুব পাতলা।

আবছা অন্ধকারে ল্যাবের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই ঘাড়ের কাছে শক্ত

কিছু একটা চেপে ধরল কেউ। শক্ত আর ঠান্ডা।

তারপর হিসহিস করে বলল, 'এটা রিভলভারের সাইলেন্সারের নল। ট্রিগার টিপলে শব্দ বেশি হবে না, তবে কাজ হবে। একটুও নড়াচাড়া করবেন না।'

'রোবিদাস কোথায়?' কয়েকবার ঢোঁক গিলে কোনওরকমে জানতে চাইলেন ড. দেবনাথ।

'রোবিদাস অ্যান্টিচেম্বারে—ওর সুইচ ''অফ'' করা আছে। এখন যা বলছি শুনুন...।'

অদৃশ্য লোকটা এমনভাবে কথা বলছিল যে ফিশফিশ করে মন্ত্র পড়ছে—মন্ত্র পড়ে কাউকে নেশা ধরিয়ে দিতে চাইছে।

ফিশফিশ করে কথা বলার জন্য লোকটার গলার স্বর চেনা যাচ্ছিল না।

ড. দেবনাথ শরীরটাকে শক্ত কাঠের মতো করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বুকের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। এক্ষুনি যেন হৃৎপিণ্ডটা ভেঙেচুরে চৌচির হয়ে যাবে। একইসঙ্গে একটা শ্বাসকষ্টও টের পাচ্ছিলেন তিনি।

'ড. দেবনাথ...।' অন্ধকারে কানের পাশে ফিশফিশ করে কথা শুরু হল ঃ 'অনেক চেষ্টা করেও আপনার সফ্টওয়্যার লকটা আমি খুলতে পারলাম না। সেজন্যে ধন্যবাদ জানাই। ইউ আর আ গ্রেট কম্পিউটার উইজার্ড!'

লোকটা কেন ফিশফিশ করে কথা বলছে? কেন লোকটা স্বাভবিক গলার কথা বলছে না? তা হলেই প্রকাশ দেবনাথ পেয়ে যেতেন অবিনাশ চাকলাদারের আসল পরিচয়।

কার গলা এটা? ড. ওয়াসিম খান? কল্যাণ সেনবর্মা, নাকি অশোক মিশ্র? আবার প্রভাস কিংবা মিত্যুনেরও হতে পারে। তবে যে-ই হোক, সে ল্যাবে ঢুকল কী করে?

ড. দেবনাথের মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো তীব্রভাবে ছটফট করছিল। ভয় তো পাচ্ছিলেনই, তবে তার সঙ্গে বেড়ে উঠছিল কৌতূহল।

'...অবিনাশ-২০০২-এর একটা আন-লক্ড কপি আপনি একটা সিডিতে তুলে রাখবেন। এতে কোনও অসুবিধে হবে না—কারণ, আপনার কাছে সিডি রাইটার আছে আমি জানি। সিডির বাক্সের ওপরে একটা লেবেল সেঁটে দেবেন। তাতে লেখা থাকবে ঃ প্রকাশ দেবনাথ-২০০২। এই লেবেল দেখেই আমি বুঝে নেব। সিডিটা ল্যাবে ঢুকে ডানদিকের সেকেন্ড টেবিলটার ওপরে ফেলে রাখবেন। কাল বিকেল পাঁচটার পর থেকে সিডিটা যেন সেই জায়গামতো রাখা থাকে। আমি সময়মতো ল্যাবে ঢুকে ওটা তুলে নেব। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু আনলক দ্য ভাইরাল প্রোগ্রাম। যদি ওটা আনলক করতে ভুলে যান, তা হলে তার জন্যে অনেক বেশি দাম দিতে হবে। ওকে?'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে সাইলেন্সারের নল দিয়ে জোরালো খোঁচা দিল লোকটা।

'কে আপনি? ড. খান?' লোকটার পরিচয় জানতে চেয়ে খানিকটা আন্দাজেই ঢিল ছুড়তে চাইলেন প্রকাশ দেবনাথ।

উত্তরে চাপা ফিশফিশে হাসি শোনা গেল মাথার পিছন থেকে। তারপর ঃ 'আমার নাম তো আপনি জানেন! অবিনাশ চাকলাদার...। মনে থাকে যেন...কাল বিকেল পাঁচটার পর। আর এই কথাটা কাউকে জানাবেন না। জানালে...' হিসহিস করে চাপা হাসি ঃ 'জানেন তো কী হবে...আপনার ডেটা ফাইলটা দুনিয়ার হার্ড ডিস্ক থেকে ডিলিট হয়ে যাবে—আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

কথার শেষে জিভে আক্ষেপের 'চুক-চুক' শব্দ করল লোকটা। তারপর সাইলেন্সারের নলটা সরে গেল ড. প্রকাশ দেবনাথের ঘাড় থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। খুব ভালো করে নজর চালিয়েও তেমন কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। শুধু মনে হল, অন্ধকারের মধ্যে আরও একটা গাঢ় অন্ধকার যেন পিছলে পালিয়ে গেল।

'রোবিদাস! রোবিদাস!' চাপা চিৎকারে ডেকে উঠলেন প্রকাশ দেবনাথ।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে গেলেন সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে। ওই ঘরের দরজার পাশেই রয়েছে আলোর এম সি বি সুইচগুলো।

দেওয়াল হাতড়ে খুঁজে পেলেন গ্যাঙ্‌ড সুইচের ছোট্ট হাতলটা। কেউ ওটা টেনে নীচে নামিয়ে আলোগুলো অফ করে দিয়েছে।

হাতলটা ওপরে তুলতেই ল্যাবের আলো জ্বলে উঠল। সফ্‌টওয়্যার রুমেও জ্বলে উঠল চারটে টিউবলাইট।

তখনই দেখলেন, একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে আছে রোবিদাস।

ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের নীচে হাত দিলেন ড. দেবনাথ। ওর অ্যাক্টিভিটি সুইচটা কেউ অফ করে দিয়েছে।

সুইচটা অন করে দিতেই রোবিদাস নড়েচড়ে উঠল। ড. দেবনাথকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল, বলল, 'সরি, স্যার, আমি বোধহয় একটু ঘুমিয়ে প-প-পড়েছিলাম। এখুনি গিয়ে আপনার ডেটা প্‌-প্‌-প্রিন্টআউটগুলো নিয়ে নিচ্ছি।'

প্রকাশ দেবনাথ বুঝতে পারলেন অবিনাশ চাকলাদার এসে রোবিদাসকে জড়ভরত করে দেওয়ার আগে ও কতকগুলো ডেটার প্রিন্ট নিচ্ছিল। কিন্তু রোবিদাস কি দেখেছে, কে ল্যাবে এসে ঢুকেছে?

সে-কথাই জিগ্যেস করলেন রোবিদাসকে।

উত্তরে রোবিদাস জানাল যে, না কাউকে দেখতে পায়নি। ও সফ্‌টওয়্যার রুমে একটু ঢুকেছিল একটা ফ্লপি নিতে। তখনই হঠাৎ আলো নিভে যায়। আর তারপরই ও 'জ্ঞান' হারিয়ে ফ্যালে।

প্রকাশ দেবনাথ রোবিদাসের কথায় কেমন যেন ধন্দে পড়ে গেলেন। ওকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনোনি?'

'না, স্যার—ঠিক শুনতে পা-পা-পাইনি। আসলে একমনে কাজ করছিলাম তো...।'

রোবিদাসকে ওর কাজ করতে বলে ল্যাব ছেড়ে চলে এলেন ড. দেবনাথ। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, গালে আঙুল বোলালেন বেশ কয়েকবার।

লোকটা কী করে ল্যাবে ঢুকল? কারণ, রাত দশটার পর বাড়িতে ঢোকার ইলেকট্রনিক আইডেন্টিফিকেশান সিস্টেমটা অফ করা থাকে। তার বদলে কম্পিউটারাইজড্‌ অটোলক অন করে দেওয়া হয়।

তা হলে কি লোকটা বিজ্ঞানে এতই দক্ষ যে, ড. দেবনাথের সুরক্ষা পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিতে পেরেছে!

দোতলার ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়লেন প্রকাশ দেবনাথ। অন্ধকারেই তাকিয়ে রইলেন খোলা জানলার দিকে। অবিনাশ-২০০২-এর কথা ভাবতে লাগলেন।

এই ভাইরাসটা আবিষ্কার করে তিনি মনে-মনে চেয়েছিলেন দেশের কাজে লাগাতে। এই ভাইরাসটার ক্ষমতা পরমাণু বোমার চেয়েও বেশি। এই অবিনাশী ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে যে-কোনও শত্রুরাষ্ট্রকে অনায়াসে দমিয়ে দেওয়া যেত। অবিনাশ-২০০২-এর সর্বনাশের ক্ষমতা জানার পর কোনও শত্রুরাষ্ট্রই ভারতকে আর পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখাত না। অথচ...।

অবিনাশ চাকলাদার কি অবিনাশ-২০০২-কে শত্রুরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেবে? নাকি এই ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে নিজের দেশকেই ব্ল্যাকমেল করবে?

কিন্তু লোকটা কাল সিডিটা নিতে আসবে কোন সাহসে! কেউ তো তাকে দেখে ফেলতে পারে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে।

আজ, এখন, সে ওটা লক খুলিয়ে কপি করে নেওয়ার চেষ্টা করল না কেন? পাছে প্রকাশ দেবনাথ তাকে চিনি ফেলেন তাই? কিন্তু কালও তো কেউ চিনে ফেলতে পারে! নাকি লোকটা নিশ্চিত যে, কাল ও নির্বিঘ্নে ভাইরাসের সিডিটা নিয়ে যেতে পারবে?

না, কক্ষনও না! ড. দেবনাথ কাল নিজে ল্যাবে হাজির থেকে লোকটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাতে প্রাণ যায় যাক!

প্রকাশ দেবনাথের ভীষণ রাগ হচ্ছিল লোকটার ওপরে। জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে-দেখতে লোকটাকে জব্দ করার কথা ভাবছিলেন। কাল সকালেই ওই হুমকি

দেওয়া সিডির ভয়েস সিগনালটা অ্যানালিসিস করতে হবে। আর ওঁর ল্যাবের সঙ্গে যে-পাঁচজন গবেষণায় জড়িয়ে আছে তাদের গলা তো টেপ করা আছেই! গতকাল ঝামেলা ওদের ভয়েস রেকর্ড করে নিয়েছে। সেটা প্রসেনজিৎ চৌধুরী ড. দেবনাথকে জানিয়েও দিয়েছে।

নাঃ, আজ রাতের ব্যাপারটা প্রসেনজিৎবাবুকে জানাতেই হবে। ভাবলেন ড. দেবনাথ। ভয় তাঁর নিজের জন্য নয়—দেশের জন্য। দেশদ্রোহীকে কখনও ক্ষমা করা যায় না। কাল প্রসেনজিৎবাবু সকলের সঙ্গে কথা বলার পর দেখা যাক কোনও সূত্র-টুত্র পাওয়া যায় কি না।

চশমা আর জামা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। পাশ ফিরে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রুপোর কুচি তখনও মেঘলা আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে।

ছয়

ঠিক ন'টায় প্রকাশ দেবনাথের ল্যাবে এসে ঢুকল ছোটকা।

এসে দ্যাখে, মিত্যুন আর প্রভাস হাজির। দুটো কম্পিউটারে বসে দুজনে আপনমনে কাজ করছে। আর রোবিদাস একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছে। সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইম্স্' চলছে।

রোবিদাসকে দেখে মোটেই মনে হল না তার মধ্যে এককণাও দুশ্চিন্তা রয়েছে। অবশ্য না থাকারই কথা! রোবট-জীবন মানুষের চেয়ে অনেক সুখী।

রোবিদাসকে জিগ্যেস করতেই ও জানাল, ড. দেবনাথ অ্যান্টিচেম্বারে রয়েছেন। অন্য তিনজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছেন।

'আমি কি ড. দেবনাথকে ডেকে দেব, স্যার?' রোবিদাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল।

ছোটকা বলল, 'না, তার দরকার নেই। তুমি সিনেমা দ্যাখো, আমি অ্যান্টিচেম্বারে যাচ্ছি।'

অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকেই ছোটকা দেখল যা ভেবেছে ঠিক তাই—ড. দেবনাথ যে-তিনজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরা আর কেউ নয়, অশোক মিশ্র, ওয়াসিম খান, আর কল্যাণ সেনবর্মা।

ছোটকাকে দেখেই ড. প্রকাশ দেবনাথ চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন। ছোটকাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন অ্যান্টিচেম্বারের বাইরে। চাপা গলায় সংক্ষেপে গতকাল রাতের ঘটনা জানালেন। শেষে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, লোকটার গলা

আমি ঠিক চিনতে পারিনি। তবে যা-কিছু করার আপনাকে বিকেল পাঁচটার মধ্যেই করতে হবে।'

ছোটকা একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না—আমি দেখছি কী করা যায়। আগে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে ভয়েস সিগনালগুলোর অ্যানালিসিস নিয়ে বসব।'

ড. দেবনাথ অ্যান্টিচেম্বারের দিকে ইশারা করে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'কে জানে, হয়তো অবিনাশ চাকলাদার ওই ঘরেই বসে রয়েছে।'

ছোটকা হেসে বলল, 'কেন, ল্যাবেও তো থাকতে পারে!'

'তা অবশ্য পারে।' ইতস্তত করে বললেন প্রকাশ দেবনাথ।

'এখন চলুন, ওঁদের সঙ্গে একটু আলাদাভাবে কথা বলব—সেটা আপনি ওঁদের বলে বুঝিয়ে ম্যানেজ করুন, যাতে ওঁরা অফেন্ডেড না হন।'

'কোনও চিন্তা নেই। কাল তো ওঁদের বলাই ছিল। আসুন—।' বলে ড. দেবনাথ ছোটকাকে নিয়ে অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

তিনজন বিজ্ঞানী বেশ শান্তভাবেই ড. দেবনাথের কথা শুনলেন। তারপর নিজেদের মধ্যে কীসব কথাবার্তা বলে কল্যাণ সেনবর্মা আর ওয়াসিম খান অ্যান্টিচেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ড. দেবনাথ ছোটকাকে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি কাজ শুরু করুন, আমরা ল্যাবে ওয়েট করছি—।'

ওঁরা তিনজন চলে যেতেই অ্যান্টিচেম্বারের ঝকঝকে পালিশ করা টিক উডের টেবিলকে মাঝখানে রেখে ড. অশোক মিশ্রের মুখোমুখি বসল ছোটকা। হেসে বলল, 'এভাবে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি, ড. মিশ্র। কিন্তু সিচুয়েশানটা এমন যে, এ ছাড়া কোনও পথ ছিল না।'

ড. মিশ্র কোনও জবাব দিলেন না। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা বিরক্তির শব্দ বাইরে ছুড়ে দিলেন।

ছোটকা মানুষটাকে জরিপ করছিলেন।

ড. মিশ্রের গায়ে গাঢ় নীল আর সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। চোখে শৌখিন চশমা। মাথার চুল কপালের দু-পাশটায় ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় কপালের ঠিক মাঝখানে চুল ছুঁচোলো হয়ে ওলটানো ত্রিভুজের মতো নেমে এসেছে। ইংরেজিতে একেই 'উইডোজ পিক' বলে।

ড. মিশ্রের হাবভাবে কেমন যেন একটা জঙ্গি ভাব আছে। তবে ভেতরে-ভেতরে মানুষটা সত্যি-সত্যি জঙ্গি কি না সেটাই আসল ব্যাপার।

পানজাতীয় কিছু একটা চিবোচ্ছিলেন ড. মিশ্র। সামান্য জড়ানো গলায় অধৈর্য সুরে ছোটকাকে বললেন, 'নিন, শুরু করুন। কী জানতে চান, বলুন...।'

ছোটকা হেসে বলল, 'সায়েন্টিস্ট হিসেবে আপনার তো বেশ নামডাক আছে।

মানে, বিদেশে...।'

'এটা আপনাকে কে বলল?' রুক্ষ গলায় প্রশ্ন ছুটে এল।

'কেউ বলেনি—আমি দেশি-বিদেশি রিসার্চ জার্নাল ঘাঁটাঘাঁটি করি... তাই জেনেছি। আপনার রিসার্চ পেপার তো বেশ ভালো-ভালো জার্নালেই ছাপা হয়েছে।'

'আমার একার কাজ নয়—সঙ্গে কো-অথররাও রয়েছেন।' বিনয় করে বললেন অশোক মিশ্র। বোঝা গেল ছোটকার প্রশংসায় তিনি কিছুটা হলেও নরম হয়েছেন।

'কম্পিউটার ভাইরাস নিয়ে আপনি কতদিন গবেষণা করছেন?'

'তা প্রায় ন'-দশ সাল হবে।'

'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা সম্পর্কে আপনি কিছুই জানতেন না?'

'অ্যাবসোলিউটলি নাথিং। কাল তো আপনি আমাদের ল্যাবে ছিলেন—সব তো শুনলেন। ড. দেবনাথ আমাকে কিচ্ছু জানাননি।' ড. মিশ্রর গলায় রাগের ছোঁয়া টের পাওয়া গেল।

'আচ্ছা, ড. মিশ্র, সত্যিই কি এমন ভাইরাস তৈরি করা সম্ভব যেটাকে কিছুতেই আর ডেস্ট্রয় করা যায় না—মানে, যেটার কোনও ভ্যাকসিন হয় না?'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন অশোক মিশ্র। তারপর বললেন, 'কোয়াইট পসিব্‌ল। তবে সেটা ইন্ডিয়ায় দুম করে কেউ আবিষ্কার করে ফেলবে ভাবিনি। অনেক সময় লাক সায়েন্টিস্টদের ফেবার করে—খুদা যব দেতা হ্যায় ছপ্পড় ফাড় কর দেতা হ্যায়।'

'আপনি এখন কী নিয়ে রিসার্চ করছেন?'

'রোবট কমিউনিকেশান...।' সামান্য গম্ভীর হয়ে অশোক মিশ্র বললেন।

'এটাই কি আপনার লাইন?' ছোটকার প্রশ্নটায় একটা চাপা খোঁচা টের পাওয়া গেল।

অশোক মিশ্র একটু উঁচু পরদায় জবাব দিলেন,'আপনিও তো একজন থোড়াবহৎ সায়েন্টিস্ট—আপনি তো ভালো করে জানবেন সায়েন্টিস্টদের কোনটা লাইন কোনটা বেলাইন।'

ছোটকা ড. মিশ্রকে জরিপ করছিল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'এতে রাগ করার কিছু নেই, ড. মিশ্র। আমি শুধু আপনার রিসার্চের মেইন ট্র্যাকটা জানতে চেয়েছি। যদি আপনি...।'

'আমার রিসার্চের মেইন ট্র্যাক হল কম্পিউটার সিকিওরিটি। তবে কভি-কভি আমরা সাইড ট্র্যাকেও যাই।'

ছোটকা চুরুট ধরাতে না পেরে উশখুশ করছিল। ঠোঁটে চাপা একটা

'হুম—' শব্দ করে তারপর আচমকা বলে উঠল, 'অবিনাশ চাকলাদার এই ভাইরাল প্রোগ্রামটা চাইছে কেন? আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

ঠোঁট ওলটালেন অশোক মিশ্র। চোয়াল নাড়তে-নাড়তে অস্পষ্ট গলায় জবাব দিলেন, 'কী আর করবে! হয় কাউকে সেল করবে, নয়তো থ্রেট করবে। তবে যা-ই করুক না কেন, উসকা নতিজা আচ্ছা নহি হোগা।'

'এখানকার কাউকে আপনার সন্দেহ হয়?'

একটু ভেবে অশোক মিশ্র মাথা নাড়লেন ঃ 'কাকে আর সন্দেহ করব?'

ছোটকা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'ধরুন, আপনি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা কায়দা করে হাতিয়ে নিলেন—তা হলে ওটা সেল করার জন্যে কিংবা ওটা দিয়ে কাউকে থ্রেট করতে চাইলে আপনার নেক্সট স্টেপ কী হত?'

'হাউ ডেয়ার য়ু—' বলে ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. মিশ্র।

'আহা—' হাত তুলে ওঁকে শান্ত করতে চাইল ছোটকা ঃ 'রাগ করবেন না, ড. মিশ্র। আমি এমনি কথার কথা বলছিলাম...।'

'আপনি তো বহৎ ফালতু কথা বোলেন।' অশোক মিশ্রের চোখে-মুখে রুক্ষ ছাপ ফুটে উঠল ঃ 'যাই হোক, আমার জবাবটা শুনে রাখুন। আপনি ওটা চুরি করার পর যে স্টেপ নিতেন, আমিও তাই নিতাম। জয় রামজিকি।' শব্দ করে দু-হাতের চেটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জুড়লেন অশোক মিশ্র। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকা মনে-মনে হাসল। ড. মিশ্র খুব রেগে গেছেন। অথচ অবিনাশ চাকলাদার মানুষটা তো ঠান্ডা মাথার লোক! তার সঙ্গে ড. মিশ্রের কোথায়-কোথায় মিল আর কোথায়-কোথায় গরমিল সেটাই ভাবতে লাগল ছোটকা।

একটু পরেই ড. ওয়াসিম খান ঘরে এসে ঢুকলেন।

ফিটফাট পোশাক। সঙ্গে বাড়তি পোশাক হিসেবে হালকা পারফিউম। হঠাৎ করে ড. খানকে দেখলে প্রথমেই মনে হবে তিনি সিনেমা আর্টিস্ট, বিজ্ঞানী নন।

'বসুন, ড. খান। অবিনাশ-২০০২ নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

হাসলেন ওয়াসিম খান, বললেন, 'অবশ্যই—বলুন, কী জানতে চান।' তারপর দীর্ঘ শরীরটাকে চেয়ারে ভাঁজ করে দিলেন।

'ড. দেবনাথ আমাকে অবিনাশ-২০০২-এর ভয়ঙ্কর সব পসিবিলিটির কথা বলেছেন। বলেছেন, এটা একটা ডেড্‌লি ভাইরাস-এর কোনও ভ্যাকসিন নেই। আপনার কি মনে হয়, ড. দেবনাথ যতটা বলছেন ভাইরাসটা ততটাই মারাত্মক?

নাকি ড. দেবনাথ বাড়িয়ে বলছেন?'

ওয়াসিম খান নরম করে হাসলেন : 'ড. প্রকাশ দেবনাথ একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট। ওঁর কথার গুরুত্ব মিথ্যে হতে পারে না। দ্য ভাইরাস মাস্ট বি ডেড্‌লি।'

'একজন ক্রিমিনাল এই ভাইরাসটা হাতিয়ে তারপর কী করতে পারে?'

'কী আর করবে! এই ভাইরাসটাকে পার্সোনাল প্রফিটের জন্যে ব্যবহার করবে। হয়তো বিক্রি করতে চাইবে।'

'কী ধরনের লোক এর বায়ার হতে পারে?'

'লোক কেন?' ধীরে-ধীরে বেশ শান্তভাবেই উচ্চারণ করলেন ড. ওয়াসিম খান, 'কোনও অর্গানাইজেশান এটা কিনতে পারে। বিশেষ করে ডিফেন্স অর্গানাইজেশান—সে আমাদের দেশেরই হোক বা বাইরের দেশেরই হোক।'

'কেনার পর তারা কী করবে? কী লাভ হবে তাদের?'

'এটুকু আপনার বোঝা উচিত, মিস্টার চৌধুরী—য়ু আর অলসো আ সায়েন্টিস্ট অফ সাম সর্ট। এই ভাইরাসটা হাতে থাকলে একটা দেশ অন্যান্য দেশকে কন্ট্রোল করতে পারবে—প্রেসার তৈরি করতে পারবে।'

'এটা বিক্রি করে কীরকম দাম পাওয়া যেতে পারে?'

'আকাশছোঁয়া দাম।' শূন্যে হাত তুলে একটা ভঙ্গি করলেন ড. খান : 'অ্যাকচুয়ালি স্কাই ইজ দ্য লিমিট।'

'এই ল্যাবে—আই মিন, আপনাদের মধ্যে সেরকম কেউ কি আছে যে এই রিস্কটা নিতে পেছপাও হবে না?'

'প্রশ্ন করা আপনার কাজ—'ছোট্ট করে হেসে বললেন ওয়াসিম খান, 'তবে আপনার প্রশ্নের পুরো উত্তর আমার জানা নেই। অন্যদের কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়—আমি শুধু আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি একজন বিজ্ঞানী—চোর নই।'

ড. ওয়াসিম খানের চোখে ঠান্ডা ভাব ফুটে উঠেছিল। তবে শুধু ওইটুকুই। ছোটকার মনে হল, তিনি একইসঙ্গে বিজ্ঞানী এবং অভিনেতা নন তো!

'আপনি কিছু মনে করবেন না, ড. খান। আমি...।'

হেসে ছোটকাকে বাধা দিলেন ওয়াসিম খান : 'আমি কিছুই মনে করিনি। আপনি আপনার কাজ করছেন, আমি আমার...ইট্‌স অল ইন দ্য গেম।'

ভদ্রলোক আশ্চর্যরকম ঠান্ডা মাথার মানুষ। মনে মনে ভাবল ছোটকা।

এর পর ড. খানের গবেষণা নিয়ে ছোটকা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'ড. সেনবর্মাকে কাইন্ডলি যদি একবার এখানে আসতে বলেন...।'

'ইট উইল বি মাই প্লেসার।' হেসে বললেন ওয়াসিম খান।

ড. খান ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর ছোটকার মনে হল, ভদ্রলোক কখনও হৃদয় দিয়ে চলেন না, মগজ দিয়ে চলেন। এরকম আবেগহীন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের পক্ষে কতটা উপকারী কে জানে!

ড. কল্যাণ সেনবর্মা ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করলেন, 'কী, অবিনাশ চাকলাদারের খোঁজখবর কিছু পেলেন?'

ছোটকা বলল, 'না, এখনও পাইনি...তবে হাল ছাড়িনি।'

'ভয়েস সিগনাল অ্যানালিসিস করে কিছু পাওয়া গেল?'

'না, এখনও ওটা করা হয়নি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলার পর অ্যানালিসিসের কাজে হাত দেব।'

একটু ইতস্তত করে ড. সেনবর্মা বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলব, মিস্টার চৌধুরী?'

'অফ কোর্স—বলুন।'

'আমার একজনকে সন্দেহ হয়...।'

'কাকে?' ছোটকার চোখে-মুখে কৌতূহল।

'ড. প্রকাশ দেবনাথকে--।'

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন? অবিনাশ-২০০২ চুরি করার ভান করে ওঁর কী লাভ?'

'আছে, লাভ আছে—' চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলেন কল্যাণ সেনবর্মা ঃ 'উনি কোনও একজনকে শাগরেদ বানিয়ে তাকে অবিনাশ চাকলাদার সাজিয়েছেন। তারপর আপনাকে আর আমাদের সাক্ষী রেখে এইসব নাটক-ফাটক করেছেন। আসলে উনি নিজেই হয়তো ভাইরাসটা লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকায় বিক্রি করতে চান। সরাসরি করতে চাইলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। তা ছাড়া মান-সম্মান নিয়েও টানাটানি পড়বে। বরং একজনকে শিখণ্ডী খাড়া করলে সবদিক দিয়ে সুবিধে। সবাইকে বোকা বানিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ হবে।'

'এরকম সন্দেহ আপনার হল কেন?'

'কেন হল?' হাতের আঙুলে ঢোকানো রঙিন পাথরের আংটিগুলোর দিকে তাকালেন ড. কল্যাণ সেনবর্মা। তারপর মুখ তুলে ছোটকার দিকে সরাসরি চোখ রাখলেন ঃ 'ড. দেবনাথের এখন রাহুর দশা চলছে।'

ছোটকার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সেটাকে বেশ কষ্ট করে ধামা চাপা দিল। একদিকে ভদ্রলোক বিজ্ঞান করছেন, আর অন্যদিকে রাহু-কেতু নিয়ে পড়ে আছেন! কিন্তু সেসব বাদ দিলেও সন্দেহের একটুখানি ছায়া থেকেই যাচ্ছে। ওঁর সন্দেহটা কি সত্যি-সত্যি হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

প্রসঙ্গ বদলাতে ছোটকা জিগ্যেস করল, 'আপনারা তো একটা গ্রুপে রিসার্চ করেন। রিসার্চের ব্যাপারে ড. দেবনাথের সঙ্গে কখনও কারও কোনও প্রবলেম হয়েছে?'

কল্যাণ সেনবর্মা বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভাবলেন। তারপর যেন হঠাৎই মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'বছরদেড়েক আগে অশোক মিশ্রের সঙ্গে ভীষণ ঝামেলা হয়েছিল।'

'কী নিয়ে?'

'একটা রিসার্চ পেপারে নাম আগে-পরে দেওয়া নিয়ে। তবে মিশ্র একটু রগচটাগোছের লোক—অল্পেতেই খেপে যায়। তো আমরা সবাই মিলে ব্যাপারটা মিটমাট করিয়ে দিয়েছিলাম।'

এর পর ছোটকা কম্পিউটার ভাইরাস আর ডেটা সিকিওরিটি নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

প্রায় আধঘণ্টামতন কথা বলার পর ড. সেনবর্মা ছুটি পেলেন।

তারপর একে-একে প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলল ছোটকা।

প্রভাস রোবট কমিউনিকেশান নিয়ে গবেষণা করছে। না, ওর গবেষণা নিয়ে কোনওরকম সমস্যা নেই। মিত্যুনের সঙ্গেও ওর সমঝোতা চমৎকার। যেসব রিসার্চ পেপার ড. দেবনাথের ল্যাব থেকে পাবলিশ্‌ড হয় তার সবক'টাতেই সকলের নাম থাকে। তা ছাড়া রিসার্চ গাইড হিসেবে ড. দেবনাথ যথেষ্ট জ্ঞানী এবং গুণী। না, ওঁর এগেইনস্টে প্রভাসের কোনও কমপ্লেন নেই। শুধু টিফিন খেতে ওকে আর মিত্যুনকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়—তাতে গবেষণার অনেক সময় নষ্ট হয়।

এর পর মিত্যুন এল।

মিত্যুন ভীষণ চাপা স্বভাবের। অবিনাশ-২০০২-এর ঘটনাটা নিয়ে ওকে বেশ ডিসটার্ব্‌ড মনে হল। ছোটকার প্রশ্নের উত্তরে ও খুব সংক্ষেপে—বলতে গেলে একরকম 'হুঁ-হাঁ' করে—জবাব দিয়ে গেল। আর অন্তত বারতিনেক অনুনয় করে বলল, 'যেভাবে হোক স্যারকে আপনি বাঁচান।'

পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলার পর ছোটকা সবকিছু আবার প্রথম থেকে ভাবতে শুরু করল। টিভির অ্যাকশান রিপ্লের মতো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলো বারবার ছায়া ফেলে গেল ছোটকার মনের পরদায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রহস্য যেমন জট পাকিয়ে ছিল তেমনই জট পাকিয়ে রইল।

নাঃ, অবিনাশ চাকলাদারকে হাতেনাতে ধরতে না পারলে রক্ষে নেই! শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে এরকম সম্মানিত বিজ্ঞানীদের হ্যারাস্ করা যায় না। সুতরাং একমাত্র পথ বিকেলের জন্যে অপেক্ষা।

আজও বিকেল পাঁচটার পর অবিনাশ চাকলাদার এই ল্যাবে সিডিটা নিতে আসবে।

সত্যি আসবে তো? নিজেকেই প্রশ্ন করল ছোটকা।

সাত

একটা গাঢ় বাদামি রঙের টাটা সুমোর ভেতরে বসে ছিল ছোটকা, ঝালা-পালা আর ঝামেলা। গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে বছর পঁচিশের এক শক্তপোক্ত যুবক। নাম তিওয়ারি। গাড়িটা ছোটকা আজকের অপারেশনের জন্য ভাড়া করেছে।

ড. দেবনাথের বাড়ি থেকে অন্তত পৌনে এক কিলোমিটার দূরে গাড়িটা রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করে রাখা আছে। রাস্তার পাশে বড়-বড় গাছ আর জংলা ঝোপ। কয়েকটা কাঠবিড়ালী গাছের শাখাপ্রশাখা বেয়ে ছুটোছুটি করছে। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি কখনও পড়ছে, কখনও থামছে—তার টাইমটেবিলের কোনও ঠিক নেই।

ছোটকারা বেলা একটার পর থেকে ড. দেবনাথের বাড়ির ওপরে নজরদারির কাজ শুরু করেছে। ছোটকার মন বলছিল, অবিনাশ চাকলাদার সিডিটা আজ নেবেই। ও বলে গেছে বিকেল পাঁচটার পর, কিন্তু ছোটকার মনে হয়েছে একটু আগে থেকে নজর রাখলে ক্ষতি কী!

অপেক্ষা করতে-করতে এখন প্রায় বিকেল চারটে। কিন্তু ড. দেবনাথ এখনও কোনও সিগনাল দেননি। তিনি বলেছেন, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তিনি ছোটকাকে মোবাইল ফোনে ফোন করে খবর দেবেন।

ঝামেলা হঠাৎই চোখের ওপরে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, 'আর পারিতেছি না। মম পুঞ্জাক্ষি ব্যা-ব্যা-ব্যা—।'

চন্দ্রকান্ত বলল, 'এই সেরেছে! আবার ওর কথা আটকে গেছে!'

ছোটকা সামনের সিটে বসে ছিল। পিছন ফিরে তাকাল ঝামেলার দিকে ঃ 'কী হয়েছে? পুঞ্জাক্ষি ব্যথা করছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব্যথা করিতেছে।' ঝামেলা তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

ঝামেলার বলের মতো চোখ দুটো আসলে পুঞ্জাক্ষি—মাছি বা মৌমাছিদের যেমন থাকে। এই চোখ দিয়ে ঝামেলা এক কিলোমিটারের বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। এ ছাড়া ওর শ্রবণক্ষমতাও সাংঘাতিক। আলট্রাসনিক শব্দও ওর কানে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। সেইজন্যই ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ছোটকা এত দূর থেকে প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির ওপরে নজর রাখছে।

'ঝামেলা, আর-একটু কষ্ট করো—ক্রিমিনাল ধরা পড়লেই তোমার ছুটি।'

এমন সময় চন্দ্র বলল, 'ছোটকা, আমার টয়লেট পেয়ে গেছে।'

ঝামেলা জিগ্যেস করল, 'বড়, না ছোট?'

চন্দ্র রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি জেনে কী করবে? তোমার তো আর ওসব প্রবলেম নেই!'

ইন্দ্র বলল, 'ছোটকা আমারও পেয়ে গেছে—ছোট।'

ঝামেলা বিরক্ত হয়ে বলল, 'মনুষ্যদিগের কী যে মারাত্মক প্রবলেম! খালি খাওয়া আর টয়লেট যাওয়া, খাওয়া আর টয়লেট যাওয়া। এই কারণেই রোবটরা মানুষের তুলনায় যার-পর-নাই উন্নত। রোবটদের বাড়িতে রান্নাঘরও থাকে না, বাথরুমও থাকে না। কী অসাধারণ চমৎকার!'

'ঝামেলা, তুমি থামবে!' ছোটকা ধমক দিয়ে উঠল। তারপর চন্দ্র আর ইন্দ্রকে বলল, 'যা, গাড়ি থেকে নেমে ওই ঝোপের মধ্যে সেরে আয়।'

আজ সকালে ড. দেবনাথ ছোটকাকে গতরাতের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিয়েছেন। পরে ছোটকা আর ড. দেবনাথ ভয়েস অ্যানালিসিস নিয়ে বসেছে।

ঘণ্টাখানেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যা জানা গেছে তাতে ছোটকা খুব একটা খুশি হতে পারেনি। কারণ, সিডির কণ্ঠস্বরটা বিশ্লেষণ করে টের পাওয়া গেল তাতে বেশ কয়েকটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির ভয়েস সিগনাল মিশিয়ে দেওয়া রয়েছে। বোধহয় অবিনাশ চাকলাদার নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য এইভাবে ড. দেবনাথকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। দুজন স্কলার ও তিনজন বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সিডির কণ্ঠস্বরটা তুলনা করে নিশ্চিত কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। তবে ড. ওয়াসিম খান, ড. অশোক মিশ্র আর প্রভাস দত্তের গলার সঙ্গে সিডির গলার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেক্ট্রামের বেশ খানিকটা মিল পাওয়া গেল।

ছোটকা বলল, 'আমাদের কপালটাই খারাপ। এর ওপরে বেস করে কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না। বিশেষ করে এঁরা যখন খুব রেসপেক্টেব্‌ল সায়েন্টিস্ট...।'

ড. দেবনাথও দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ গলায় বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। ওঁদের কাউকেই আমি কাল রাতের হানাদার বলে ভাবতে পারছি না। তবে ডেডলাইন আজ রাত বারোটা—আর বিকেল পাঁচটার পর অবিনাশ চাকলাদারের সিডি নিতে আসার কথা। ওই যে, সিডিটা আমি রেকর্ড করে রেখে দিয়েছি...'কাছেই একটা টেবিলে রাখা সিডিটা আঙুল দিয়ে দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ।

'আপনি অবিনাশ-২০০২-এর কোনও কপি রাখেননি?' ছোটকা জানতে চাইল।

ছোটকার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন ড. দেবনাথ। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'ওই সিডিটা ছাড়া আর একটা কপিই রেখেছি। সেটা সফ্‌টওয়্যার লক করা আছে...।'

নিজের আবিষ্কার কখনও নিঃশেষে নষ্ট করা যায় না। সন্তান যতই খারাপ

হোক, পিতৃস্নেহ তাকে আগলে-আগলে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ছোটকা আর কোনও কথা বলেনি। শুধু ঘুরে-ঘুরে ল্যাব, সফ্‌টওয়্যার রুম আর অ্যান্টিচেম্বারটা ভালো করে দেখেছে। রোবিদাসকে দু-চারটে প্রশ্নও করেছে। কিন্তু সেরকম কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে বলেছে, 'আপনি আজ সারাটাদিন ল্যাবেই থাকবেন। বিশেষ করে পাঁচটার পর আর ল্যাব ছেড়ে একেবারে বেরোবেন না। সন্দেহজনক কেউ ল্যাবে এলেই আমাকে মোবাইল ফোনে কনট্যাক্ট করবেন। আমি আপনার বাড়ির ওপরে কনস্ট্যান্ট ওয়াচ রাখব।'

এখন টাটা সুমোর সামনের সিটে বসে ছোটকা সেই কাজটাই করছিল। তবে এত দূর থেকে ড. দেবনাথের বাড়িটাকে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। তবুও সেদিকে তাকিয়ে একটার পর একটা সরু চুরুট খেয়ে যাচ্ছিল।

ঝামেলা ওর পুঞ্জাক্ষি দিয়ে নজরদারির কাজটা ঠিকমতোই করছিল। শুধু তার সঙ্গে টপাটপ করে হাই তুলেছিল। ওর মোটেই ঘুম পায় না। ও হাই তোলে হাই তুলতে ওর ভালো লাগে বলে। ছোটকা এ নিয়ে প্রশ্ন করায় ঝামেলা জবাব দিয়েছে, 'কেন, রোবটের কি কোনও হবি থাকতে নেই!'

ছোটকা আর কিছু বলতে ভরসা পায়নি। হাই তোলাটা যে কোনও রোবটের হবি হতে পারে সেটা ছোটকার জানা ছিল না।

ড. দেবনাথের বাড়িতে কেউ ঢুকলে বা বেরোলে ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে তার বিবরণ শুনিয়ে দিচ্ছে। সেই ধারাবিবরণী শুনে ছোটকা বুঝতে পারছে ঠিক কতজন লোক প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে রয়েছে। বেলা বারোটার পর থেকে বিজ্ঞানী তিনজন বেশ কয়েকবার এলেন, আবার চলে গেলেন। রিসার্চ স্কলার দুজন প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরী সকাল এগোরোটা নাগাদ ল্যাবে এসে ঢুকেছিল। তারপর দুপুর আড়াইটের সময় দুজনে একসঙ্গে টিফিন খেতে বেরিয়েছে। ফিরে এসেছে তিনটে পনেরো নাগাদ। আর তার পর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

সাড়ে ছ'টার সময় মিত্যুন ড. দেবনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওর গবেষণার কাজ আজকের মতো শেষ। ও চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পর প্রভাস বেরিয়ে এল—রওনা হয়ে গেল বাসস্টপের দিকে।

লক্ষ রাখতে-রাখতে ছোটকারা বিরক্ত হয়ে গেল। ঝালা-পালার ঘুম পাচ্ছিল। তাই থেকে-থেকেই প্যাকেটে করে নিয়ে আসা খাবার মুখে দিয়ে ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করছিল।

জল খেতে-খেতে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'এভাবে আর পারা যাচ্ছে না, ছোটকা। তখন থেকে বসে আছি—কিছু একটা না হলে ভালো লাগে! খালি ঘুম পাচ্ছে।'

ঝামেলা বলল, 'মানুষের এই থার্ড প্রবলেম—ঘুম। এইজন্যেই কবি বলেছেন, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

ছেটকা ধমকে উঠল ঃ 'ঝামেলা, তুমি থামবে! আমরা একটা সিরিয়াস মিশনে...।'

ঝামেলা ছোটকাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এবারে তুমি থামো—একটা গাড়ি এসে গেছে। গাড়িটা ড. দেবনাথের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি মনুষ্যপুঙ্গব শকট হইতে অবতরণ করিতেছে...'

ঝামেলার কথা শোনামাত্রই সবাই চুপ করে গেল।

ছোটকারা ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। তাই ছোটকা তিওয়ারিকে বলল, রাস্তার ধার ঘেঁষে খুব ধীরে ধীরে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গাড়িটা যখন প্রায় দুশো মিটারের মধ্যে চলে এসেছে তখনই ছোটকার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ছোটকা গাড়িটা থামাতে বলল। তারপর পকেট থেকে ফোন বের করে বোতাম টিপে কানে ধরল।

'হ্যালো, বলুন...।'

'প্রকাশ দেবনাথ বলছি।' ড. দেবনাথের গলা কাঁপছিল ঃ 'এইমাত্র একটা গাড়ি আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে...।'

'আপনি চিন্তা করবেন না—আমরা ওয়াচ রাখছি।'

গাড়িটা স্যান্ট্রো বলে চেনা যাচ্ছিল, তবে মানুষটিকে চেনা যাচ্ছিল না। একটা গাছের নীচে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল বলে রাস্তার আলো অনেকটাই আড়াল হয়ে গিয়েছিল। আর গাড়ি থেকে নেমে আসা লোকটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছিল।

ঝামেলা বলল, 'গাড়িতে আর কেহ নাই। আর লোকটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না।'

ফোনে প্রকাশ দেবনাথ জানতে চাইলেন, 'আমি এখন কী করব?'

ছোটকা বলল, 'ফোন অফ করবেন না। আমাকে ইনফরমেশান দিতে থাকুন। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকটাই অবিনাশ চাকলাদার। কিন্তু ওকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না।'

হঠাৎই লোকটা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পকেট থেকে কী একটা বের করে কানে চেপে ধরল।

ঝামেলা বলল, 'ব্যক্তিটির ফোন আসিয়াছে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দেখল, লোকটা ফোন পকেটে রেখে একছুটে ঢুকে গেল প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে।

ছোটকা মোবাইল ফোন কানে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে, যাতে কোনও

কথা বা শব্দ কান এড়িয়ে না যায়।

একটু পরেই শুনতে পেল ঃ 'আরে আপনি! আসুন, আসুন...।' প্রকাশ দেবনাথের গলা। আগন্তুককে স্বাগত জানাচ্ছেন। নিশ্চয়ই লোকটা ওঁর চেনা। কিন্তু কে সে?

আগন্তুকের আবছা গলা শোনা গেল ঃ 'একটা বিশেষ কাজে এসেছি। তবে আমি একা নই—উনিও আছেন...।'

তারপরই ড. দেবনাথ বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! তার মানে?'

উত্তরে আর-একটা গলা শোনা গেল ঃ 'তার মানে অবিনাশ-২০০২।'

আর তার পরমুহূর্তেই একটা ভারী আঘাতের শব্দ। সেই সঙ্গে একটা চাপা যন্ত্রণার চিৎকার।

টেলিফোনে ড. দেবনাথের গলা আর শোনা গেল না।

ছোটকা সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বাঁ হাতে ফোনটা কানে চেপে ধরে আছে। ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে বের করে নিল একটা ব্লাস্টার গান। তারপর একরকম ছুটতে শুরু করল ড. দেবনাথের বাড়ি লক্ষ করে।

কিন্তু ছোটকা পঞ্চাশ-ষাট মিটার পেরোতে-না-পেরোতেই তিনজন লোক বেরিয়ে এল প্রকাশ দেবনাথের বাড়ি থেকে। দুজন পায়ে হেঁটে—আর-একজন কাঁধে চড়ে। কারণ, প্রকাশ দেবনাথের অসাড় দেহটা একজনের কাঁধে নেতিয়ে দু-ভাঁজ হয়ে ঝুলছে।

চোখের পলকে গাড়ির দরজা খুলে ওরা উঠে বসল। আর গাড়িটা চলতে শুরু করল।

ঝামেলা চেঁচিয়ে বলল, 'পশ্চাদ্ধাবনং অবশ্যন্তি! পশ্চাদ্ধাবনং অবশ্যন্তি!'

তিওয়ারি সেই 'দেবভাষা' কী বুঝল কে জানে, তবে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এক হ্যাঁচকায় সেটা ছুটিয়ে নিয়ে গেল ছোটকার কাছে।

ঝালা-পালা উত্তেজনায় চিৎকার করছিল। চন্দ্রকান্ত সিট টপকে চলে এল সামনে-চট করে খুলে ধরল বাঁদিকের দরজা। ছোটকা ছুটন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

'গাড়িটাকে ফলো করো! কুইক!' ইন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠল।

ছোটকা হাঁফাতে-হাঁফাতে ঝামেলাকে জিগ্যেস করল, 'কাউকে চিনতে পারলে?'

ঝামেলা মাথা নেড়ে বলল, 'না পারু, না পারু! তবে ফোল্ড করা বডিটা ড. দেবনাথের।'

'এটা না বললেও চলত।' ইন্দ্রকান্ত মন্তব্য করল।

তিওয়ারি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। বাঘের মতো হিংস্র চোখে

ও তাকিয়ে ছিল সামনের রাস্তার দিকে। সুমোর হ্যালোজেন হেডলাইটে কালো রাস্তা আলো হয়ে উঠেছে।

ছোটকা মোবাইল ফোন পকেটে রেখে বলল, 'ড্রাইভারসাব, ওই গাড়িটাকে ধরা চাই।'

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই তিওয়ারি হেসে বলল, 'ইয়ে সান্ত্রোকি বচ্চা যায়গা কঁহা! ব্যস, থোড়া টাইম কি বাত হ্যায়...চুপচাপ ব্যয়ঠকে মেরা কামাল দেখিয়ে।'

দূরে স্যান্ট্রোর ব্যাকলাইট চোখে পড়ছিল। কখনও-কখনও সেটা বাঁক ঘুরে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তিওয়ারি গাড়ির স্টিয়ারিং এমনভাবে ম্যানেজ করছিল যে, মনে হচ্ছিল ওটা ওর হাতেরই একটা বাড়তি অংশ। অত বড় গাড়িটাকে লাউডগা সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে চালিয়ে ও একটার পর একটা গাড়ি ওভারটেক করে যাচ্ছিল। আর স্যান্ট্রোর ব্যাকলাইট ক্রমেই ওদের কাছে আরও বড়, আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে স্যান্ট্রোটা বাইপাসে এসে পড়ল। আর যেই না পড়া অমনই তিওয়ারি দাঁত বের করে হেসে বলল, 'সালা বুদ্ধু হ্যায়। বাইপাসমে কাহে আ গিয়া! অব তো বচ্‌না নামুমকিন হ্যায়।'

অ্যাক্‌সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল তিওয়ারি। ওর মাথাটা আরও সামনে ঝুঁকে পড়ল। টাটা সুমোর ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ শব্দে কানে প্রায় তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছিল ঝড়ের মতো।

সল্টলেক স্টেডিয়াম পেরোনোর পর দুটো গাড়ির দূরত্ব ভীষণ কমে গেল। ঝালা-পালা হাত-পা ছুড়ে 'আরও জোরে, আরও জোরে' বলে চেঁচাতে লাগল। আর ঝামেলা মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বারবার বলতে লাগল, 'বহৎ খুব। বহৎ খুব। শুক্রিয়া। শুক্রিয়া।'

ছোটকা অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব কী উলটোপালটা বলছ! কথাগুলোর মানে জানো?'

ঝামেলা বলল, 'না, জানি না। কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। এর মানে হল, ''শাবাশ। শাবাশ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।'' মানে না জেনে কাকে এসব বলছ?'

'কাউকে না। তিওয়ারিকাকুর হিন্দি শুনে আমারও কেমন উর্দুর বেগ এসে গেল, তাই।'

তিওয়ারির টাটা সুমো তখন স্যান্ট্রোর পাশাপাশি দৌড়োচ্ছে। আর একইসঙ্গে বাঁদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে তিওয়ারি স্যান্ট্রোটাকে চাপতে শুরু করল।

বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় গাড়ির চাকা গড়িয়ে চলার চড়বড়-চড়বড় শব্দ হচ্ছিল। এবার স্যান্ট্রোটা বাঁদিকে সরতে-সরতে ফুটপাথের গায়ে এসে ব্রেক কষতেই বীভৎস

আওয়াজ হল—যেন কয়েকটা বুনো ঘোড়া একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু তিওয়ারি তাতেও থামল না। ওর গাড়ির বাঁদিকটা ঘষে দিল স্যান্ট্রোর মুখে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘষা লাগার শব্দ হল। তার সঙ্গে মিশে গেল ভিজে রাস্তায় ভালকানাইজ্ড রবার ঘষে যাওয়ার আওয়াজ। টাটা সুমোটাকে আরও পাঁচ-ছ' হাত এগিয়ে নিয়ে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড় করাল তিওয়ারি।

ঝালা-পালা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

স্যান্ট্রোর সামনের একটা চাকা উঠে গেল ফুটপাথে। রাস্তায় পথচারী খুব কম ছিল। তা নইলে দু-চারজন আহত হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

তিওয়ারি গাড়ি থেকে নামল। সিটের তলা থেকে একটা লোহার রড বের করে নিল। তারপর নাক উঁচু করে থমকে দাঁড়ানো স্যান্ট্রো গাড়িটাকে লক্ষ করে বলল, 'কেয়া, বাচ্চু, এক চুমা দে দিয়া তো হাওয়া নিকল গই?'

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার উঁচিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। আর ছোটকার দেখাদেখি ঝালা-পালা আর ঝামেলাও সুমোর পিছনের দরজা খুলে নেমে পড়ল রাস্তায়।

আট

স্যান্ট্রো গাড়িটার জানলার কাচগুলো কালো হওয়ায় ওভারটেক করার সময় গাড়ির ভেতরটা কিছু দেখা যায়নি। তাই ড্রাইভারকে দেখার জন্য ছোটকা তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল স্যান্ট্রোর কাছে।

টাটা সুমোর ধাক্কায় স্যান্ট্রোর বডির পাশটা তুবড়ে গিয়েছিল। তাই শত চেষ্টা করেও গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে বেরোতে পারছিল না। মাথাটা ঝুঁকিয়ে থাকায় তাকে ভালো করে চেনাও যাচ্ছিল না।

তিওয়ারি মারমুখী হয়ে স্যান্ট্রোর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। আচমকা গাড়ির ভেতর থেকে গুলি ছুটে এসে তিওয়ারির বাঁ হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

গুলির শব্দ খুব জোরে শোনা না গেলেও গাড়ির শ্যাটারপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি উইন্ডশিল্ডটা নিমেষে মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেল।

তিওয়ারি একপলক থমকে গেল। রক্তে ভিজে ওঠা বাঁ হাতটা একবার দেখল। তারপর একটা গালাগাল দিয়ে হাতের রডটা ভীষণ জোরে ছুড়ে দিল ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কাটা জায়গাটা চেপে ধরল। যন্ত্রণার ওর মুখ কুঁচকে গেল।

গাড়ির ড্রাইবার বাঁ হাত তুলে রডের আঘাতটা রুখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু

পারল না। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে আবার গুলি চালাল সে। কিন্তু নিশানা ঠিক না থাকায় সেটা ছুটে গেল অন্ধকার আকাশের দিকে।

ছোটকা ততক্ষণে স্যান্ট্রোর একেবারে পাশে চলে এসেছে।

ব্লাস্টারটা উঁচিয়ে ধরে ছোটকা বলল, 'ছিটেফোঁটা নড়াচড়া করলেই গাড়িসমেত সব ধুলো করে দেব।'

ছোটকার ব্লাস্টারের লেজার পয়েন্টারের লাল আলোটা ড্রাইভারের কপালে টিপের মতো জ্বলছে।

ছোটকা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'রিভলভারটা ফেলে দিন। তারপর ওপাশের দরজাটা খুলে ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে আসুন, ড. মিশ্র—নাকি বলব অবিনাশ চাকলাদার?'

ড. অশোক মিশ্র ছোটকার হুকুম অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। রিভলভারটা ফেলে দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। এবার চোখে পড়ল...তিওয়ারির ছুড়ে দেওয়া রডের আঘাতে ওঁর কপালের ওপরদিকটায় কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

দুটো গাড়ি ঘিরে ততক্ষণে লোক জমতে শুরু করেছে। অনেকেরই হাতে ছাতা। কেউ-কেউ আবার বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মাথায় পলিথিন কিংবা কাগজের আড়াল দিয়েছে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলা ভিড় ঠেলে ছোটকার কাছে চলে এল।

ছোটকা পকেট থেকে নিজের আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে উঁচিয়ে ধরল। তারপর অনেকটা হুকুমের সুরে বলল, 'আমরা স্পেশাল ফোর্সের লোক। আপনারা সব দূরে সরে যান—নইলে উন্ডেড হতে পারেন। প্লিজ, আপনারা দূরে সরে যান।'

ছোটকার কথায় খানিকটা কাজ হল।

তখন চন্দ্রকান্ত হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'ড. দেবনাথ কোথায় গেলেন, ছোটকা?'

অশোক মিশ্রর দিকে ব্লাস্টার তাক করে ছোটকা রূঢ় গলায় বলল, 'শিগগির এগিয়ে এসে গাড়ির বনেটের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। ভুলেও পালানোর চেষ্টা করবেন না।'

অশোক মিশ্র কথা শুনতে এতটুকুও দেরি করলেন না। বাধ্য ছেলের মতো স্যান্ট্রোর বনেটের ওপরে শরীরটাকে উপুড় করে দিলেন।

ছোটকা এবার তিওয়ারিকে বলল, 'তিওয়ারি এই শয়তানটার ওপরে নজর রাখো। পালাতে চেষ্টা করলেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ো...।'

তিওয়ারি ড. মিশ্রর খুব কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে জিগ্যেস করল, 'কেয়া, বাচ্চু, ভাগনা হ্যায় কেয়া?' তারপর অশোক মিশ্রর পিঠে ভয়ঙ্কর এক কিল বসিয়ে দিল।

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার তাক করে স্যান্ট্রোর পিছনের দরজা ধরে টান মেরেছে।

দরজা খুলে যেতেই রাস্তার আলোয় ড. প্রকাশ দেবনাথকে দেখা গেল। সিটে কাত হয়ে পড়ে আছেন—দু-চোখ বোজা। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

ছোটকা মাথা নীচু করে গাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখতে চাইল। দ্বিতীয় লোকটা কোথায় গেল?

ছোটকার ব্লাস্টার গানের লেজার পয়েন্টারের আলো সেই লোকটার মুখে গিয়ে পড়তেই সে আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'পি-পি-প্লিজ, ফায়ার করবেন না! ড. দেবনাথ ভালো আছেন... শুধু অ-অ-অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনার প-প-পায়ে প-পড়ি, ফায়ার করবেন না!'

ড. দেবনাথকে গাড়ির সিটে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে রোবিদাস বাইরে বেরিয়ে এল।

ওকে দেখামাত্রই ছোটকার অঙ্কটা মিলতে শুরু করল।

এই যন্ত্রমানুষটাকে ছোটকা কিংবা প্রকাশ দেবনাথ মানুষের মধ্যেই ধরেননি। তাই ওঁদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

অবিনাশ চাকলাদার অবশ্যই অশোক মিশ্র। কিন্তু তাঁকে প্রতিটি ধাপে সাহায্য করে গেছে প্রকাশ দেবনাথের এই 'বুদ্ধিমান' রোবট অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ছোটকা ড. দেবনাথকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল। ঝালা-পালাকে বলল টাটা সুমো থেকে জলের বোতল নিয়ে আসতে। তারপর ফুটপাথের ওপরেই ড. দেবনাথকে শুইয়ে দিল।

বারকয়েক জলের ঝাপটা দিতেই প্রকাশ দেবনাথ চোখ মেললেন। যন্ত্রণার কয়েকটা টুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। কোনওরকমে উঠে বসে তিনি মাথার পিছনটায় হাত বোলাতে লাগলেন।

ছোটকা মোবাইল ফোন বের করে লালবাজারে ডায়াল করে সংক্ষেপে খবর জানাল। অনুরোধ করল যেন একটা ডিটেকটিভ স্কোয়াড আর একটা রেসকিউ ভ্যান এখুনি স্পটে চলে আসে। কারণ, ড. প্রকাশ দেবনাথ একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট।

ছোটকার ফোন করা শেষ হলে ড. দেবনাথ ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছোটকার কাছ থেকে ব্লাস্টার গানটা চাইলেন।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন? ব্লাস্টার দিয়ে কী করবেন?'

'এই পাগল অ্যানড্রয়েডটাকে উড়িয়ে দেব। ওর এতবড় সাহস যে, আমার গায়ে হাত তোলে!'

ছোটকা মাথা নাড়ল ঃ 'উঁহু, ভুলেও ও-কাজটি করবেন না। এই কেসে রোবিদাস আমাদের রাজসাক্ষী। কারণ, রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না।'

ঝামেলা রোবিদাসের কাছে এগিয়ে এসেছিল। ব্লাডহাউন্ডের মতো ও রোবিদাসকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল আর গন্ধ শুঁকতে লাগল।

ঝালা-পালা বলল, 'কী করছ, ঝামেলা—?'

ঝামেলা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'গন্ধ শুঁকে দেখছি। এই বন্ডেড লেবারটার গায়ে শুঁটকি মাছের মতো দুর্গন্ধ।'

রোবিদাস মুখ ভেংচে বলল, 'ব্যাটা নেড়া চাকর!'

ঝামেলা তখন চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'বল তো, পাখির পিঠে পাকা পেঁপে!'

রোবিদাস বারকয়েক 'পা-পা-পা' বলে পালিয়ে গেল গাড়ির আড়ালে।

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'গাড়ির ভেতরে একটা সিডি আছে—খুঁজে বের কর তো! দেখিস, যেন কাচের টুকরোয় হাত-পা না কাটে। আর রিভলভারটা টাচ করবি না—ওতে ড. মিশ্রর আঙুলের ছাপ আছে।'

ঝালা-পালা সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকশন শুরু করে দিল।

সিডিটা সহজেই পাওয়া গেল। গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিল। সেটা নিয়ে দু-ভাই ছোটকার হাতে এনে জমা দিল।

ছোটকা সবাইকে টাটা সুমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেল। স্যান্ট্রোর আড়ালে দাঁড়ানো রোবিদাসকেও ডাকল। শুধু তিওয়ারিকে বলল স্যান্ট্রোর পিছনের সিটে বসে বিশ্রাম নিতে। পুলিশ যে-কোনও সময় এসে পড়বে। তারপরই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

তিওয়ারি হেসে বলল, 'কোনও চিন্তা নাহি, স্যার। হামার কুছু হোয়নি।'

ছোটকা বলল, 'সে জানি। তবে গাড়ির ভেতরে ড. মিশ্রর রিভলভারটা পড়ে আছে। ওটাও তো পাহারা দেওয়া দরকার। তুমি গাড়িতে বসে ওয়েট করো, আমরা কয়েকটা কাজের কথা সেরে নিই। ভয় নেই, ড. মিশ্রর দিকে আমার নজর থাকবে।'

ঝালা-পালা আর ঝামেলা টাটা সুমোর কাছে চলে এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা এখন থেমে গেছে। তবে জোলো বাতাসে গাছপালা নড়ছে। আকাশের পশ্চিম কোণে কালো মেঘের পাহাড়। একটু পরেই আবার হয়তো বৃষ্টি শুরু হবে।

ব্লাস্টার উঁচিয়ে ড. অশোক মিশ্রকেও বড় গাড়িটার কাছে নিয়ে এল ছোটকা। বলল, অকারণে পালানোর চেষ্টা করে তিনি যেন ছোটকাকে দিয়ে খারাপ কাজ না করান।

ড. মিশ্র মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রকাশ দেবনাথ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছিঃ ড. মিশ্র! আপনি এইরকম দেশদ্রোহিতার কাজে নামলেন!'

অশোক মিশ্র কেঁদে ফেললেন। ড. দেবনাথের দু-হাত চেপে ধরলেন ঃ

'আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাজারে আমার লাখ-লাখ টাকা ধার। কীভাবে সেই লোন চুকতা করব সে-কথা ভেবে-ভেবে আমি পাগল কুত্তামাফিক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন রোবিদাসের কাছ থেকে আপনার লাজবাব কম্পিউটার ভাইরাসের কথা জানতে পারি। তখন আমি প্রভাসের হেল্প নিয়ে রোবিদাসের সঙ্গে স্পেশাল কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা করি। তবে প্রভাসকে কিছু বুঝতে দিইনি। ও জানত আমি রিসার্চের জন্যে এসব কাজ করছি। তারপর যা করার সব রোবিদাসের হেল্প নিয়ে করেছি।'

'অবিনাশ-২০০২ হাতিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি কী করতেন?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. মিশ্র ঃ 'ঠিক জানি না। হয়তো কোনও ইন্টারেস্টেড পার্টিকে বিক্রি করতাম...।'

ছোটকা ড. দেবনাথকে বলল, 'এবার নিশ্চয়ই পুরো গল্পটা বুঝতে পারছেন! আপনার ল্যাবের ভেতরে থেকে রোবিদাস প্রথম থেকেই অশোক মিশ্রকে হেল্প করে গেছে। কারণ, রোবট কখনও তার লজিক দিয়ে দেশদ্রোহিতার মানে বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারবে না, কোনও জিনিস বিক্রি করার মানে কী। টাকা রোবটের কাছে শুধুই ছাপা কাগজ। আসলে রোবটের মধ্যে লোভ, হিংসা, ভালোবাসা, প্রভুভক্তি এসব কিচ্ছু নেই—থাকা সম্ভব নয়।'

'তার মানে রোবিদাস কুকুরেও অধম!' ঝামেলা মন্তব্য করল।

'আর তুমি কী?' চন্দ্রকান্ত চাপা গলায় ঝামেলার কানে-কানে জিগ্যেস করল।

ঝামেলা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভান করে ছোটকার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রকাশ দেবনাথ এবার সব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিলেন।

কে প্রথম অবিনাশ-২০০২-এর কথা জানতে পারে?

কে লিটার বিন থেকে ভাইরাসের নাম লেখা কাগজটা হাতিয়ে নিয়েছিল?

কে মিউজিক সিস্টেমে অন্য সিডি ঢুকিয়ে দিয়েছিল?

অশোক মিশ্রকে সবার অলক্ষে বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা কে করে দিয়েছে?

আর আজ সন্ধেবেলা ল্যাবে রোবিদাস যে তাঁর মাথায় বাঁ হাত দিয়ে কষে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে সে তো ড. দেবনাথ ভালো করেই জানেন!

প্রকাশ দেবনাথ মাথার পিছনে একবার হাত বোলালেন। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে ছোটকাকে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, ভাইরাসের সিডিটা আমাকে দিন।'

ছোটকা সিডিটা দিতেই প্লাস্টিকের খাপ খুলে চকচকে চাকতিটা বেরে করে নিলেন প্রকাশ দেবনাথ। বললেন, 'অবিনাশ-২০০২-এর এটাই এখন একমাত্র কপি। কারণ, আজ বিকেল চারটের পর আমি আমার পার্সোনাল কপিটা ডেস্ট্রয় করে দিয়েছি। এটাও আর রাখব না। কারণ, লোভ বড় সাঙঘাতিক জিনিস।'

কথাটা শেষ করেই সিডিটা জল-কাদার ওপরে ফেলে দিলেন ড. দেবনাথ। ওটাকে পাগলের মতো জুতোয় পিষতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিসটেক! ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিসটেক!'

ছোটকা অবাক চোখে অদ্ভুত দেশপ্রেমী বিজ্ঞানীটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝামেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অবশেষে সবকিছুর নিষ্পত্তি হইল। আমাকে লইয়াই ভাইরাস প্রবলেমের সূচনা, আবার আমার জন্যেই সমাধান হল।'

ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে! তুমি একাই সবকিছুর ক্রেডিট নিতে চাও?'

'নাও, তুমি সব নাও। আমার সকল কৃতিত্বের ফল আমি তোমাকে দান করিলাম। আমার প্রবল দুঃখ হইতেছে। হিরোশিমা! হায় হিরোশিমা!'

চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত 'ফুজিয়ামা' শুনে অভ্যস্ত। তাই 'হিরোশিমা' শুনে একটু অবাক হল। চন্দ্র ঝামেলাকে জিগ্যেস করল, 'লাস্টে হিরোশিমা বললে কেন?'

ঝামেলা মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'ওটা গভীর দুঃখের এক্সপ্রেশন। আজ থেকে ইউজ করব ঠিক করেছি।'

এমন সময় একটা পুলিশের জিপ আর একটা ভ্যান ছোটকাদের টাটা সুমোর কাছে এসে দাঁড়াল।



গল্প



চোর ধরল ঝামেলা

কোনও রোবটের পুজোর জামা কেনা যে কীরকম ঝকমারি সেটা এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ছোটকা। তার ওপর যদি সেই রোবট বাচ্চা খোকা হয়, আর তার নাম হয় ঝামেলা, তা হলে তো কথাই নেই।

যমজ দুই ভাইপো, চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে পুজোর জামা-প্যান্ট কিনে দেবে বলে ছোটকা ওদের নিয়ে রওনা হচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে হেলে দুলে হাঁটতে-হাঁটতে সামনে এসে হাজির হল তিনফুট মাপের বাচ্চা রোবট ঝামেলা। রিনরিনে মেয়েলি গলায় বলল, 'টুইন দুই ব্রাদারের সহিত আমিও পূজার জামা কিনিতে যাব...কিনিতে যাব...কিনিতে যাব...।'

ঝামেলার 'কিনিতে যাব...' ব্যাপারটা আর থামছিল না বলে ছোটকা ওর ন্যাড়া ধাতব মাথায় মারল এক চাঁটি। তারপর বলল, 'ওর ভেতরের সার্কিটে বোধহয় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। পরে দেখে দেব, বুঝলি, ঝালা-পালা—।'

শেষ কথাগুলো ছোটকা বলেছে চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে লক্ষ্য করে। ছোটবেলায় এই যমজ জুটি কান্নাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচি করে বাড়িসুদ্ধ সবার কান ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা ওদের নাম রেখেছিল ঝালা-পালা। তবে এ-নামে আর কেউ ওদের ডাকলে দু-ভাই ভীষণ খেপে যায়।

ঝামেলার ঝকঝকে মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড। হাত-পাগুলো

কাঠির মতো সরু লিকলিকে। তবে আঙুলগুলো খুব নিখুঁতভাবে তৈরি। সবসময় ও জামা-প্যান্ট পরে থাকে। ছুটতে পারে না, হেলে দুলে হাঁটতে পারে। ইচ্ছেমতো কথা বলতে পারে, কিন্তু গলার স্বরটা মিহি মেয়েলি।

সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটা কথা-বলা পুতুল।

পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই 'বাচ্চা' রোবটটা ছোটকাই তৈরি করে দু-ভাইকে উপহার দিয়েছে।

ছোটকার চাঁটি খেয়ে ঝামেলা চুপ করে গিয়েছিল—তবে সে মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য।

ঝালা-পালা যখন পুজোর জামা কিনতে যাওয়ার আনন্দে হইহুল্লোড় শুরু করে দিয়েছে তখন ঝামেলা গম্ভীরভাবে বলে উঠেছে, 'এত লম্ফঝম্পপূর্ণ উল্লাসের কী হইয়াছে? সেই কোন আদিম যুগে পড়ে আছ। বিবর্তন হয়ে আমার জায়গায় পৌঁছোলে বুঝতে সভ্যতার আর এক নাম সংযম। আমাকেই অবলোকন করো না। আনন্দ কি আমারও হইতেছে না? কিন্তু আমি কি শাখামৃগের ন্যায় জাম্প দিচ্ছি?'

ঝামেলার এই একটাই গোলমাল। এখনও শুদ্ধ বাংলা বলতে শেখেনি। সাধু-চলিত আর ইংরেজির জগাখিচুড়ি তৈরি করে যা প্রাণ চায় বলে বেড়ায়। যদিও অবশ্য ওর 'প্রাণ' বলতে ঘাড়ের কাছে লুকিয়ে রাখা ব্যাটারি।

ছোটকা বলে, ঝালা-পালার কাছে ঝামেলার এখন ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঝামেলা, স্টপ!'

ওর নির্দেশে ঝামেলা নীরব স্ট্যাচু হয়ে গেল।

ছোটকা হেসে বলল, 'ঝামেলা তোদের পোষা রোবট, না গার্জেন!

ঝালা-পালা কোনও কথা না বলে ছুটল মায়ের কাছে। মাকে খুশির খবরটা বলে ঝটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ছোটকা সেই ফাঁকে ঝামেলার নানান পার্ট্স চেক করে নিতে লাগল।

ঝালা-পালা তৈরি হয়ে আসতেই ওরা চারজন রওনা হয়ে পড়ল।

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'ঝামেলা, স্টার্ট—।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলার কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ রঙের ছোট ছোট বাতিগুলো জ্বলে উঠল। তারপর দপদপ করে জ্বলতে আর নিভতে লাগল। ঝামেলা খুশি হলে বা উত্তেজিত হলে এই বাতিগুলো এইরকম জ্বলে-নেভে।

ঝামেলা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তাই-তাই-তাই, পুজোর জামা চাই।'

ছোটকা একটা ট্যাক্সি ডাকতেই সবাই তাতে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটে চলল ধর্মতলার দিকে।

রাস্তায় অনেক লোকজন, যানবাহন। চারপাশে ছড়িয়ে আছে শরতের রোদ্দুর। মাথার ওপরে ঝকঝকে নীল আকাশ।

এপাশ-ওপাশ মাথা ঘুরিয়ে সবকিছু দেখতে-দেখতে ঝামেলা মন্তব্য করল, 'বাতাসে কেমন একটা পূজা-পূজা স্মেল। তোমরা টের পাইতেছ?'

ছোটকা হেসে বলল, 'হ্যাঁ পাইতেছি। কিন্তু তুমি দয়া করে একটু চুপ করবে? নইলে তোমার পুজোর জামা কিনে দেব না—।'

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলা চুপ।

কিন্তু ঝামেলাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হল রেডিমেড জামাকাপড়ের বিশাল মাপের দোকানটায় ঢুকতেই।

না, ঝামেলা রোবট বলে নয়। কারণ আজকাল অনেকেই নানা মাপের নানা ঢঙের রোবট সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরোয়। বহু কোম্পানি রোবট তৈরি করে, টিভিতে তারা ইনস্টলমেন্টে রোবট বিক্রির বিজ্ঞাপনও দেয়।

দোকানে ঢুকে জামাকাপড় পছন্দ করার সময় ঝামেলা হঠাৎ ছোটকার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'আমি একজন তস্করকে দেখিতে পেয়েছি।'

ছোটকা এবং ঝালা-পালা তিনজনেই অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকাল। কারণ, ঝামেলার দেখা ও শোনার ব্যাপারটা যে মোটেই সাধারণ নয় সেটা ওরা জানে। ঝামেলার টেনিসবল সাইজের কাচের গুলির মতো চোখ দুটো পুঞ্জাক্ষি—অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি। এই চোখ দিয়ে ঝামেলা একমাইল দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়—ঠিক টেলিস্কোপের মতো। আর ওর কানের জায়গায় রয়েছে স্রেফ দুটো ফুটো। কিন্তু তার ভেতরে এমন সব কলকবজা আছে যে, ও আলট্রাসনিক—মানে, শব্দোত্তর তরঙ্গ—পর্যন্ত শুনতে পায়।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী দেখতে পেয়েছ?'

'তস্কর, তস্কর। সাদা বাংলায় থিফ—মানে, চোর।'

কথা বলার সময় ঝামেলার কপালের বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলে উঠতে লাগল। ঝালা-পালা বুঝল ঝামেলা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

ছোটকা ঝামেলার কথা মোটেই উড়িয়ে দিতে পারল না। কারণ, রোবটটা ওর নিজের হাতে তৈরি। তা ছাড়া রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না। অবশ্য কোনও ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করাটা রোবটের পক্ষে অসম্ভব নয়।

ছোটকা দোকানের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানটায় জামাকাপড়ের যেমন স্টক তেমনই খদ্দেরের ভিড়ে একেবারে গিজগিজ করছে। প্রচুর সেল্‌সম্যান ও সেল্‌সগার্ল এদিক-ওদিক নানান কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। স্টিরিও স্পিকারে গমগম করে মিউজিক বাজছে। দোকানের বিশাল-বিশাল দেওয়ালে নানা রঙের ইলেকট্রনিক রোলিং ডিসপ্লে। তাতে নামি কোম্পানির জামা-প্যান্টের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে পুজোর স্পেশাল ডিসকাউন্টের ঘোষণা পর্যন্ত রয়েছে। দোকানের দরজার পাশে এক কোণ

ঘেঁষে দশ বাই দশ মাপের একটা কাচের ঘর। সেখানে তিনটে কম্পিউটার নিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই ছোটকা ঝামেলাকে একপাশে ডেকে নিল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'ঝামেলা, ঝটপট বলো, কোথায় তুমি চোর দেখলে—।'

ঝামেলা বলল, 'আমার সঙ্গে ওদিকটায় চলো, মেয়েটাকে দেখাইয়া দিতেছি। আমার পু...পু...'

ছোটকা ঝামেলার মাথায় এক চাঁটি মারতেই ও বলল, 'পু...পুঞ্জাক্ষিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ই সুকঠিন।'

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'তোরা এই কাউন্টারেই থাক—জামা-প্যান্ট পছন্দ কর—আমি এক্ষুনি আসছি...।'

ঝালা-পালাকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ছোটকা ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভিড় ঠেলে একটা কোণের দিকে পৌঁছেই ঝামেলা ছোটকাকে ইশারায় থামতে বলল। তারপর ফিশফিশে গলায় বলল, 'তোমার পশ্চাৎদিকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কেয়ারফুলি তাকাও। হলুদ টপ এবং কালো স্কার্ট পরা ফরসা মেয়েটিকে লক্ষ করিতেছ? উনিই হলেন শ্রীমতী তস্কর।'

ঝামেলার কথা মতো ধীরে-ধীরে পিছনে ফিরল ছোটকা। তারপর মোটামুটি তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নজরটা ঘোরাতেই মেয়েটিকে দেখতে পেল।

মেয়েটির গড়ন সুন্দর ছিপছিপে। বয়েস বড়জোর ষোলো কি সতেরো হবে। ওর হাতে একটা ছোট মাপের সাইডব্যাগ। ব্যাগটার রং নীল আর কালোয় তৈরি দাবার ছক—তবে বেশ মলিন। বিশেষ করে মেয়েটির চেহারা ও পোশাকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

ঝালা-পালা কিন্তু ছোটকার পিছু ছাড়তে চায়নি। বিশেষ করে ঝামেলার 'তস্কর দর্শন' রহস্য ওদের কৌতূহলী করে তুলল।

সুতরাং ভিড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে যমজ জুটি সামান্য চেষ্টাতেই পৌঁছে গেল ছোটকার কাছে। দোকানের বেশ কয়েকজন ক্রেতা অবিকল একই চেহারার একই পোশাক পরা দুই ভাইকে বারবার অবাক নজরে দেখেছিল। কিন্তু ঝালা-পালার সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না। ওরা শুধু ঝামেলাকে দেখছিল।

ঝালা-পালাকে দেখে ছোটকা শাসনের সুরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝামেলা ওর শক্ত হাতে ছোটকার পেটে চোরা চিমটি কাটল, আর একইসঙ্গে মিহি গলায় বলল, 'লুক! লুক! অপহরণ করছে—।'

ছোটকা এবং ঝালা-পালা তিনজনেই স্পষ্ট দেখতে পেল ব্যাপারটা।

প্রমাণ মাপের একটা জিন্‌সের প্যান্ট কাউন্টার থেকে তুলে নিয়ে ছোট সাইডব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল মেয়েটি। এবং ওদের সবাইকে অবাক

করে দিয়ে প্যান্টটা অনায়াসেই ঢুকে গেল ব্যাগের ভেতরে।

বড়সড়ো ব্যাগ বা ঝোলা নিয়ে দোকানে ঢোকা নিষেধ। তাই দরজার কাছেই রয়েছে ব্যাগ জমা দেওয়ার কাউন্টার। কিন্তু পার্স বা ছোট সাইডব্যাগ জমা রাখার কোনও দরকার নেই। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে সবাই ঢুকতে পারে দোকানের ভেতরে—যেমন এই মেয়েটি ঢুকেছে।

পার্স বা ছোট সাইডব্যাগে জামাকাপড় লুকিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। সে-কথা মাথায় রেখেই দোকানের নিরাপত্তাকর্মীরা মেয়েটিকে ওই ছোট ব্যাগসমেত দোকানে ঢুকতে দিয়েছে। কিন্তু ছোটকারা চোখের সামনে যে-ঘটনা দেখল তা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

ছোটকা কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝামেলা বলে উঠল, 'এইরূপ জামাকাপড় প্রচুর লইয়াছে এবং ওই ব্যাগের ভেতরেই সব ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে—।'

ঝালা-পালা প্রায় একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে বলল, 'ছোটকা, ঝামেলার সার্কিটে মনে হয় বেশ বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। তাই ও উলটোপালটা দেখছে আর ভুলভাল বকছে। ওইটুকু ব্যাগে কখনও এত জামাকাপড় ঢোকে!'

ঝামেলা রেগে গিয়ে বলল, 'তোমরা কী করে বুঝিবে! বানর থেকে মানুষ হওয়ার পর সেই কোন আদিমকালে পড়ে রয়েছ! যদি আমাদের মতো রোবট হতে তা হলে বুঝিতে!'

ঝামেলার বিশ্বাস, মানুষ থেকে বহু বিবর্তনের পর এসেছে রোবট। তাই ও মাঝে-মাঝেই ঝালা-পালাকে আদিমযুগের মানুষ বলে খোঁটা দেয়।

হঠাৎই ছোটকা ঠোঁটে আঙুল তুলে ওদের চুপ করতে ইশারা করল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'ওই দ্যাখ মেয়েটা আবার চুরি করছে!'

তারপর ওদের চোখের সামনেই রীতিমতো অলৌকিক ঘটনা ঘটতে লাগল।

মেয়েটি বেশ কয়েকটি জামাকাপড় সেল্‌সম্যান-সেল্‌সগার্লদের চোখ এড়িয়ে পটাপট ঢুকিয়ে ফেলল ওর ব্যাগে।

ছোটকা আপনমনেই বলল, 'মেয়েটা ক্লেপ্‌টোম্যানিয়াক নয় তো?'

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ক্লেপ্‌টোম্যানিয়াক মানে?'

ইন্দ্রকান্তও বলে উঠল, 'সেটা আবার কী?'

ছোটকা বলল, 'ক্লেপ্‌টোম্যানিয়া মানে হল চুরি করার অসুখ। মেয়েটার সেরকম কোনও অসুখ নেই তো!'

ঝামেলা বলল, 'ব্যাপার বড়ই বিপত্তারিণী।'

ঝালা-পালা ভুরু কুঁচকে ঝামেলার দিকে তাকাতেই ছোটকা বলল, 'ও বোধহয় বলতে চাইছে, ব্যাপার বড়ই বিপজ্জনক।'

আরও দু-এক মিনিট মেয়েটিকে লক্ষ করার পর ছোটকা বলল, 'দাঁড়া, আমি

ওর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি। তোরা এখানেই থাক, কোথাও যাস না কিন্তু—।'

ছোটকা ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে চাকরি করে। সুতরাং গোয়েন্দাগিরির অভ্যেস তো ওর আছেই, সেইসঙ্গে নানা অস্ত্রশস্ত্রও নাড়াচাড়া করতে পারে। ওরা দেখল, ছোটকা দিব্যি ভালোমানুষ-ভালোমানুষ মুখ করে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে মেয়েটির ঠিক পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটির ব্যাগের মুখটা খোলাই ছিল। উঁকি মেরে ব্যাগের ভেতরে তাকিয়ে ছোটকার তো চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগের ভেতরটা শূন্য! কোনও জামাকাপড়ই সেখানে নেই!

তা হলে এতক্ষণ ধরে মেয়েটি যে জামাকাপড়গুলো ব্যাগের মধ্যে ঢোকাল সেগুলো গেল কোথায়!

ছোটকা আর থাকতে পারল না। পকেট থেকে অফিসের আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে শক্ত গলায় মেয়েটিকে বলল, 'তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ। আমতা-আমতা করে ও বলল, 'আমি...আমি... মানে...।'

ছোটকা ওর কথায় কান না দিয়ে একজন সেল্‌সম্যানকে ডেকে জিগ্যেস করল দোকানের মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না।

উত্তরে সেল্‌সম্যানটি আঙুল তুলে ক্যাশিয়ারদের কাচের ঘরটা দেখিয়ে বলল, 'আমাদের মালিক মিস্টার আস্থানা ওই ঘরে আছেন—।'

ছোটকা তখন মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

মেয়েটি হোঁচট খেয়ে কোনওরকমে জবাব দিল, 'আমার দু-বন্ধু। ওরা এসব কিছু জানে না। ওরা ওইদিকটায় জিন্‌সের শার্ট দেখছে। প্লিজ, ওদের কিছু বলবেন না।'

ছোটকা দু-চার সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমি ওই কাচের ঘরটায় যাচ্ছি। তুমি বন্ধুদের যা-হোক কিছু একটা বলে ওখানে চলে এসো। ভুলেও পালানোর চেষ্টা কোরো না। আর এই সাইডব্যাগটা আমাকে দিয়ে যাও—।'

মেয়েটি শুকনো মুখে ছোটকার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করল। বন্ধুদের খবর দিয়ে একমিনিটের মধ্যেই ও চলে এল কাচের ঘরের সামনে।

ছোটকা মিস্টার আস্থানার সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ওকে ভেতরে আসতে বলল।

অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ছোটকার কথাবার্তা ঝামেলা সবই শুনতে পাচ্ছিল। আর সেগুলো ও মিহি চাপা গলায় রিলে করে শোনাচ্ছিল যমজ দু-ভাইকে। মেয়েটি কাচের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তেই ঝামেলা বলে উঠল, 'এবার গ্লাসঘরের নিকটে চলো। নহিলে কিচ্ছু শুনতে পাইব না। আমার ভেরি

কিউরিয়োসিটি হইতেছে, তৎসহ উত্তেজনা। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'

ঝামেলার কপালের রঙিন বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে নিভতে লাগল। অনেক সময় আনন্দে বা উত্তেজনায় ঝামেলা 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা'! বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর আনন্দ বা উত্তেজনার সঙ্গে জাপানের এই আগ্নেয়গিরিটির যে ঠিক কী ধরনের সম্পর্ক সেটা ঝালা-পালা বা ছোটকা এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি।

ওরা তিনজনে কাচের ঘরের খুব কাছটিতে এসে দাঁড়াল। ঝালা-পালা সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। আর ওদের শোনার সমস্যার সমাধান করে দিল আলট্রাসনিক কানের মালিক ঝামেলা।

দোকানের মালিক মিস্টার আস্থানা মোটাসোটা প্রৌঢ় মানুষ। মাথায় টাক। ঘাড়ের কাছে কয়েক গোছা সাদা চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলল ছোটকা।

ব্যাপার-স্যাপার শুনে ভদ্রলোক খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ছোটকা ব্যাগটা খুলে আগেই দেখেছিল, এখন মিস্টার আস্থানাকে দেখাল।

ব্যাগের ভেতরটা কালো, অন্ধকার—জামাকাপড়ের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই!

ছোটকা ব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকাল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ছোটকার হাত ব্যাগের কোনও তল খুঁজে পেল না!

ব্যাগের মুখটায় নিকেল করা ধাতুর পটি লাগানো ছিল। সেটার উষ্ণতা স্বাভাবিক মনে হলেও ছোটকা টের পেল যে, ব্যাগের ভেতরটা ভীষণ ঠান্ডা। ঠিক যেন দার্জিলিং।

মিস্টার আস্থানা হতভম্ব হয়ে ছোটকাকে দেখছিলেন। আর মেয়েটিও মুখ কাঁদো-কাঁদো করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছিল।

মিস্টার আস্থানার টেবিল থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিল ছোটকা। সেটা টুপ করে ফেলে দিল ব্যাগের ভেতরে। পেনটা যথারীতি অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাগের ভেতরে হাতড়ে ওটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ বাইরে থেকে ব্যাগটার গভীরতা সাত-আট ইঞ্চির বেশি মনে হয় না।

ছোটকা একজন ক্যাশিয়ারের টেবিল থেকে একটা মেটাল স্কেল তুলে নিল। স্কেলটার দৈর্ঘ্য একফুট। অথচ সেটা খাড়াভাবে ব্যাগে ঢোকাতেই স্কেলটা বিনা বাধায় তলিয়ে গেল ব্যাগের অতলে।

মিস্টার আস্থানা অবাক হয়ে ছোটকাকে জিগ্যেস করলেন, 'এ তো ভারী পিকিউলিয়ার মিস্টিরিয়াস ব্যাপার! আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন?'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। ব্যাগটার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ও গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। কিছুক্ষণ পর বারকয়েক মাথা নেড়ে ছোটকা জবাব দিল, 'একটু একটু আঁচ করতে পারছি।'

তারপর ছোটকা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?'

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে উত্তর দিল, 'আমার নাম রূপালি—রূপালি চ্যাটার্জি। সল্টলেকে বিডি মার্কেটের কাছে থাকি।'

'এই ব্যাগটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'সল্টলেকে বাস স্টপেজের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

রূপালির কথা থেকে জানা গেল, ব্যাগটা যখন ও কুড়িয়ে পায় তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। তাই ও ব্যাগটা নিয়ে বাসে উঠে পড়ে। কাঁকুড়গাছির কাছে ওর বন্ধু রীতার বাড়ি। সেখানে ওদের আর-এক বন্ধু রঙ্গনার আসার কথা। তারপর তিন বন্ধুতে মিলে ধর্মতলায় পুজোর ড্রেস কিনতে রওনা হবে এইরকমই ঠিক করা ছিল।

বাস থেকে নেমে রীতার বাড়ি যাওয়ার সময় ও কী ভেবে ওর ছোট্ট পার্স আর রুমালটা এই ব্যাগটায় রাখে। কিন্তু তারপরই দ্যাখে যে ওগুলোর আর কোনও হদিস নেই। তখন ও অবাক হয়ে ঢিল-পাটকেল, গাছের পাতা, চায়ের ভাঁড়, অনেক কিছুই ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং দ্যাখে যে, সেগুলোও বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমটায় ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই ওর মনে হয়, ব্যাপারটা খুব মজার। তাই রীতা আর রঙ্গনাকে ও কিছুই জানায়নি। শুধু বলেছে, বাস থেকে নামার পর ওর পার্সটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তারপর এই দোকানে ঢুকে ও স্রেফ মজা করার জন্যই বেশ কিছু জামাকাপড় ব্যাগটায় ঢুকিয়ে অদৃশ্য করে দেয়। কিন্তু ওগুলো যে কোথায় গেছে ও তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

কথা শেষ করে রূপালি কেঁদে ফেলল। ছোটকাকে বারবার করে অনুরোধ করল ওর বাড়িতে যেন কিছু না জানানো হয়।

ছোটকা মালিকের কাছ থেকে একটা প্যাডের কাগজ নিয়ে খসখস করে একটা রিপোর্ট লিখে সই করে দিল। তারপর তিন জায়গায় ফোন করে মিনিটকয়েক ধরে কথাবার্তা বলল।

কথাবার্তা শেষ হলে ছোটকা রূপালিকে বলল, 'তোমার আর কোনও চিন্তা নেই—তুমি যাও। শুধু জেনে রেখো, আজ তুমি সাংঘাতিক বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। কারণ এই ব্যাগটা আসলে ব্যাগ নয়...একটা টানেল।'

রূপালি কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছতে-মুছতে বন্ধুদের খোঁজে চলে গেল।

মিস্টার আস্থানার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ব্যাগটা নিয়ে ছোটকাও বেরিয়ে এল কাচের ঘর থেকে।

ছোটকা বেরিয়ে আসতেই ঝামেলা জিগ্যেস করল, 'কী হল, সল্‌ভ হইল?'

ছোটকা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, হইল।' তারপর ঝালা-পালাকে লক্ষ্য করে বলল,

'এখন চটপট তোদের প্যান্ট-জামা পছন্দ কর তো।'

চন্দ্রকান্ত আবদারের সুরে বলল, 'ব্যাগটার মিস্ট্রিটা আমাদের খুলে বলো, ছোটকা।'

'আগে কেনাকাটা সেরে নে, তারপর যেতে-যেতে বলছি।'

কেনাকাটা সেরে রাস্তায় বেরোনোর সময় একটা লম্বা রোবট ঝামেলাকে লক্ষ করে মন্তব্য করল, 'ন্যাড়া খোকা।'

সেটা শুনে ঝামেলা তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে উঠে তেড়ে গেল লম্বা রোবটটার দিকে। বলল, 'টুডে তোর ওয়ান ডে কি আমার ওয়ান ডে!'

ঝালা-পালা কোনওরকমে ঝামেলাকে টেনে ধরে সামাল দিল।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ও কী বলল একটু ঝুঝিয়ে দে তো!'

চন্দ্র বলল, 'ঝামেলা বলল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।'

ইন্দ্র বলল, 'ওসব বাদ দাও। তুমি আগে ব্যাগের মিস্ট্রিটা বলো দেখি।'

ছোটকা বলল, 'শোন তা হলে বলছি। ব্যাপারটা বিজ্ঞানের খুব জটপাকানো ব্যাপার, তোরা সহজে বুঝবি না—তবুও সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করছি—।

'আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি সেটা হল ত্রিমাত্রিক দুনিয়া বা থ্রি ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ড। সেইজন্যেই আমাদের তিনটে মাপ আছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। এইবার কল্পনা কর যে, একটা দ্বিমাত্রিক দুনিয়া, মানে টু ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ড আছে। সেখানকার প্রাণীদের শুধু দুটো মাপ থাকবে—দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ। অর্থাৎ, প্রাণীগুলো হবে চিড়েচ্যাপটা চেহারার, আর ওরা দ্বিমাত্রিক কোনও সমতলে লেপটে চলাফেরা করবে। শুধু কি তাই! ওদের দেখার কাজটাও হবে ওই দ্বিমাত্রিক সমতল বরাবর। ফলে ওদের জগতে—মানে, ওই সমতলে—যদি একটা ফুটো করে দেওয়া যায় তা হলে ওরা সেটাকে একটা অন্ধকার গর্ত হিসেবে দেখবে। কারণ, ওদের দেখার অভ্যেসটা সমতল বরাবর—তাই ওরা ফুটো দিয়ে কিছু দেখতে পাবে না। আর দেখতে না পাওয়া মানেই অন্ধকার। একটা কাগজের পৃষ্ঠা নিয়ে তাতে একটা ফুটো করে ব্যাপারটা ভাবলে অনেক সহজে বোঝা যাবে।'

'তা হলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? ওই ফুটোটা হল দ্বিমাত্রিক জগৎ আর ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে যাতায়াতের একটা পথ—মানে, টানেল। দ্বিমাত্রিক জগৎ থেকে যা কিছু ওই ফুটো দিয়ে ঢুকবে তা সরাসরি চলে যাবে ত্রিমাত্রিক দুনিয়ায়। ফলে দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণীরা দেখবে জিনিসগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কাগজের পৃষ্ঠায় একটা ব্যাগের ছবি এঁকে তার মধ্যে একটা ফুটো করে নিলে ব্যাপারটা আরও সহজে বোঝা যাবে। দ্বিমাত্রিক প্রাণীরা ভাববে ব্যাগটার কোনও শেষ নেই। ঠিক আমার হাতের ব্যাগটার মতো।' কথাটা বলে রূপালির কাছ থেকে নেওয়া

ব্যাগটা ছোটকা ওদের দেখাল। তারপর বলল, 'এইবার ত্রিমাত্রিক আর চতুর্মাত্রিক দুনিয়ার মধ্যে ঠিক একইরকম জিনিস কল্পনা করে দ্যাখ। রূপালির ব্যাগটার মধ্যে কেউ হয়তো এমন একটা ফুটো করে দিয়েছে যাতে ব্যাগের মুখটা ত্রিমাত্রিক আর চতুর্মাত্রিক দুনিয়ার মধ্যে একটা টানেল তৈরি করে ফেলেছে। ওই ফুটো দিয়ে যা কিছু ঢোকানো হচ্ছে তা সরাসরি চলে যাচ্ছে ফোর ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ডে।'

'কিন্তু ফুটোটা তৈরি হল কীভাবে?' চন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

হাতের ব্যাগটার দিকে একবার তাকিয়ে চিন্তিত মুখে ছোটকা বলল, 'সেটাই তো তখন থেকে ভাবছি। দেখি, অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা জানাই। তারপর আমাদের রিলেটিভিটি ল্যাবরেটরিতে ব্যাগটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে।'

ঝামেলা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'সবই সম্পূর্ণরূপে বুঝিলাম। তবে কিছু সামথিং ঝাপসা রয়ে গেল।'

ঝালা-পালা হেসে জবাব দিল, 'তোমার কাছে ঝাপসা থাকাই ভালো। তুমি বেশি বুঝে গেলে আর এক বিপদ হবে। এখন চুপচাপ বাড়ি চলো, নইলে তোমাকে ওই টানেলে ঢুকিয়ে ফোর ডাইমেনশন্যাল ওয়ার্ল্ডে পাচার করে দেব।'

ঝামেলা মাথা নেড়ে বলল, 'সে যা-ই বলো, আজ আমার জন্যেই তস্করং ধৃতং হস্তনস্ত।'

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'শেষের কথাগুলোর মানে?'

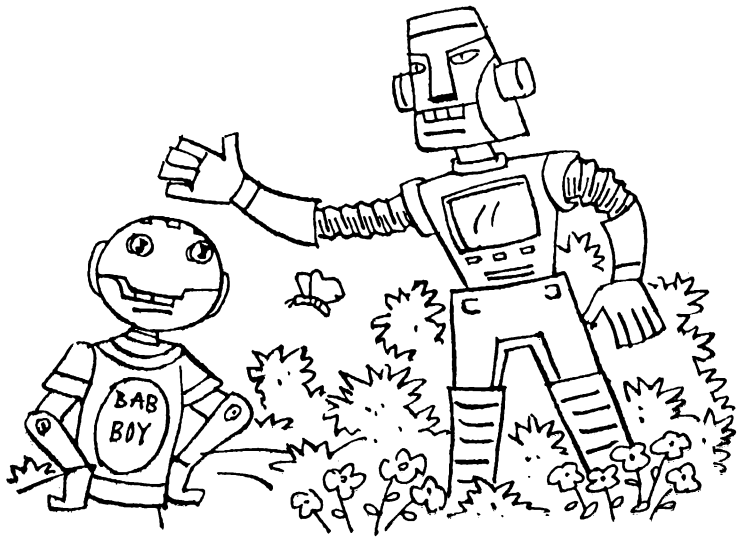
ঝামেলা বলল, 'ওগুলো হল মডার্ন সংস্কৃত—তোমরা বুঝবে না। সেই কোন আদিম যুগে পড়ে আছ! তস্করং ধৃতং মানে চোর ধরা পড়ল।'

'আর হস্তনস্ত মানে?' ইন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।

ছোটকা হেসে জবাব দিল, 'হস্তনস্ত মানে বোধহয় হাতেনাতে। কী রে, ঝামেলা, ঠিক বলিনি?'

ঝামেলা মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' সেই সঙ্গে ওর কপালের লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল।





ঝামেলা ও লম্ফমান ফুটবল

খেলতে-খেলতেই ঘটে গিয়েছিল আশ্চর্য ব্যাপারটা।

কলকাতা শহরে তখন চাঁদি-ফাটা ঝাঁ-ঝাঁ গরম। মাঠে-মাঠে ফুটবল, আর ঘরে-ঘরে টিভি-তে ক্রিকেট। খেলা নিয়ে তুমুল হইচই নানা জায়গায়, সকলের মুখে শুধু খেলার কথা। এমনকী বাচ্চা রোবট ঝামেলাও খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে।

একদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে বসে ভারত-পাকিস্তানের একটা ওয়ান-ডে ম্যাচ দেখছিল যমজ দু-ভাই চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত--যাদের ডাকনাম ঝালা-পালা। ওদের সবসময়ের সাথি তিনফুট হাইটের পিকিউলিয়ার রোবট ঝামেলা দু-ভাইয়ের গা ঘেঁষে বসে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। শচীন তখন একটা ঝোড়ো ইনিংস খেলছিল। কোনও বলকে তোয়াক্কা না করে শুধু চৌকো আর ছক্কা লাগাচ্ছিল। ঝালা-পালা বারবার খুশিতে চিৎকার করে উঠে হাততালি দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই ঝামেলা ওর মিহি গলায় মন্তব্য করল, 'এই সাহসী ছেলেটা তোমাদিগের তুলনায় যারপরনাই উন্নত প্রাণী। বিবর্তনের পথে তিরবেগে ছুটে অস্বাভাবিক অগ্রসর হইয়াছে। আর কিঞ্চিৎ সুযোগ পেলে আমার ন্যায় সুপারম্যানকেও হয়তো বা স্পর্শ করিয়া ফেলিবে।'

ঝামেলার এই এক দোষ। যখন-তখন জ্ঞান দিতে শুরু করে। ওর ধারণা,

বানর থেকে এসেছে মানুষ—আর মানুষ থেকে বিবর্তন হয়ে এসেছে রোবট। তাই ও নিজে হল সুপারম্যান। সেইজন্যই ও মাঝে-মাঝে ঝালা-পালাকে শুনিয়ে দেয়, 'কোন আদ্যিকালে তোমরা পড়ে আছ ভাবিলে বড় সরো হয়। সরো মানে যে দুঃখ সেই তথ্যটি অবগত আছে তো!'

ঝামেলার ভাষা ভারী অদ্ভুত। কথ্য ভাষা, সাধু ভাষা, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত মিশিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ভুলভাল যা খুশি বলে যায়। আবার উচ্চারণ কঠিন হলে আটকেও যায়।

ঝামেলার জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য শুনে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'অতই যখন নিজেকে বড় ভাবো, তা হলে শচীনের বদলে ইন্ডিয়া টিমে ঢুকে পড়লেই পারো!'

ঝামেলা এ-কথায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমি ব্যাট ধরিলে ক্রিকেট হিস্টিরিয়া নূতন করিয়া লিখতে হবে।'

'ও বোধহয় হিস্ট্রি বলতে চাইছে।' ইন্দ্রকান্ত বলল।

ঝামেলা রিনরিনে গলায় হেসে উঠল, তারপর চন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদিগকে লইয়া যে কী করি! এই সহজ ওয়ার্ডটিরও মানে জানো না!'

ইন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঝামেলা স্ট্যাচু!'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলা যেন পাথরের স্ট্যাচু হয়ে গেল।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল, 'এ চিজকে ট্রেনিং দেওয়া কি সহজ কথা!'

ঝামেলাকে জটিল প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করেছে ঝালা-পালার ছোটকা প্রসেনজিৎ চৌধুরী। ইলেকট্রনিক্সবিদ্যায় ছোটকার জুড়ি নেই। ছোটকা চাকরি করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। নানান কাজে ওকে সবসময়েই দেশে-বিদেশে উড়ে বেড়াতে হয়। এখন, কিছুদিন হল, কলকাতার অফিসে আছে।

ঝালা-পালা ছোটবেলায় ভীষণ কান্নাকাটি চেঁচামেচি করত, সকলের কান একেবারে ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা আদর করে ওদের নাম দিয়েছে ঝালা-পালা। আর উপহার দিয়েছে এই বাচ্চা রোবট ঝামেলা। ছোটকা বলেছে, 'তোরা রোবটটাকে ভালো করে ট্রেনিং দে।' কিন্তু ট্রেনিং ওরা দেবে কী, উলটে ঝামেলার কাছেই ওদের ট্রেনিং নেওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েকদিনেই ঝামেলা কী করে যেন খেলা-পাগল হয়ে উঠেছে। ঝালা-পালা যখন বিকেলে মাঠে খেলতে বেরোয় তখন ঝামেলা বরাবরই হেলেদুলে ওদের সঙ্গ নেয়। কিন্তু কোনওদিনও 'খেলব' বলে বায়না ধরেনি। আজ বিকেলে দু-ভাই যখন কেড্‌স জুতো পরে ফুটবল খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখনই ঝামেলার আবদার শুরু হল।

'আমিও ফুটবল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করব। ছোটকাকে বলে আজকেই

আমাকে তোমাদিগের ন্যায় কম্বলের জুতা কিনিয়া দাও।'

ঝামেলার ভাষায় 'আজকে' মানে 'এখনই'। আর কম্বলের জুতো মানে যে কেড্‌স জুতো সেটা ঝালা-পালা স্পষ্ট বুঝতে পারল। ওরা ঝামেলাকে অনেক করে বোঝাল যে, ফুটবলের মতো বাজে খেলা আর হয় না। ফুটবল খেলায় বিপদের অনেক ঝুঁকি। যে-কোনও সময় হাত-পা ভাঙতে পারে।

এতসব ভয়ঙ্কর কথা শোনার পরেও ঝামেলার সেই এক গোঁ ঃ 'পেলে যদি নির্ভয়ে খেলিস্যান্তি তা হলে আমিও পারন্তি।' অর্থাৎ, 'পেলে যখন নির্ভয়ে খেলতে পেরেছে তখন আমিও পারব।'

'ঠিক আছে, ছোটকা অফিস থেকে বাড়ি ফিরুক, তখন একটা ব্যবস্থা করব।' ইন্দ্রকান্ত ঝামেলার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল।

চন্দ্রকান্ত ওকে ক্যাডবেরি খাওয়াবে বলে আশ্বাস দিল।

অনেক 'বাবা-বাছা' করার পর ওরা ঝামেলাকে রাজি করিয়ে রাস্তায় বেরোল। ওদের সঙ্গে হেলেদুলে যেতে যেতে ঝামেলা বারবারই জিগ্যেস করতে লাগল, 'ছোটকাবাবু কব আয়েগা? তাঁহাকে অফিসে টেলিফোন করিয়া দাও।'

যখন ওরা ফুটবল খেলার মাঠের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে তখন ঝামেলা হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে উঠল। ওর কপালের লাল-নীল-হলুদ বাতিগুলো জ্বলতে নিভতে শুরু করল। ও হাততালি দেওয়ার চেষ্টা করে মিহি গলায় উল্লাসের সুরে বলতে লাগল, 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা! ব্রায়ান লারা একটি ফোর আঘাত করিয়াছে!'

ঝালা-পালা বুঝতে পারল লারা এইমাত্র একটা বাউন্ডারি মেরেছেন। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান-ডে খেলা। টিভিতে তারই লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। আশেপাশের কোনও বাড়ির টিভির ধারাবিবরণী নিশ্চয়ই ঝামেলার কানে এসে পৌঁছেছে। ওর কান এমনভাবে তৈরি যে, বহুদূরের শব্দ ও স্পষ্ট শুনতে পায়, আর আলট্রাসনিক শব্দও ওর কান এড়িয়ে যেতে পারে না। এ ছাড়া ওর চোখ দুটো পুঞ্জাক্ষি—দেখে মনে হয় কাচের তৈরি টেনিসবল—ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। অনেক জটিল লেন্স জুড়ে তৈরি এই চোখ দিয়ে ও প্রায় একমাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পায়।

ঝামেলার এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে দু-ভাই হিংসে করে। একদিন ইন্দ্রকান্ত ছোটকাকে বলেছিল ওদের কান আর চোখ ঝামেলার মতো পাওয়ার ফুল করে দিতে। তাতে ছোটকা হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, বলেছিল, 'তা কখনও হয়! তোরা হলি মানুষ, আর ঝামেলা হল মেশিন। তা ছাড়া তোদের ওইরকম কান আর

চোখ করে দিলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে।'

মাঠে পৌঁছে ঝালা-পালা দেখল খেলা শুরু হয়ে গেছে। ওদের বন্ধুর দল একটা ফুলবল নিয়ে দিব্যি পেটাপিটি করছে আর নিজেদের মধ্যে হইচই চিৎকার করছে।

মাঠের একপাশে সুন্দর ফুলের গাছ। তার গা ঘেঁষে সরু পিচের রাস্তা। অনেকে সেখানে পায়চারি করছে। কেউ-কেউ বসে আছে ঘাসের ওপরে। বেশ কয়েকজন তাদের পোষা রোবট সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে বলল, 'তুমি অন্য রোবটদের সঙ্গে খেলা করো। দেখো, আবার যেন কোনও ঝামেলা পাকিয়ো না।'

ঝামেলা তৎক্ষণাৎ হেলেদুলে হাঁটতে শুরু করল। সামনেই একটা লম্বা রোবট ঝুঁকে পড়ে ফুলের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঝামেলা অবাক হয়ে তার মাথার দিকে তাকিয়ে রইল। কী লম্বা রোবটরে বাবা! মনে-মনে ভাবল ঝামেলা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ঝামেলা লম্বা রোবটটাকে প্রশ্ন করল, 'তুই এত লং কেন রে?'

রোবটটা তার ধাতব ঠোঁট চওড়া করে বোধহয় হাসতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'আমার বাড়ি শিলং, তাই—। কিন্তু তুই এরকম ন্যাড়া কেন?'

ঝামেলাকে কেউ ন্যাড়া বললে ও ভীষণ চটে যায়। ও খেপে গিয়ে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই ফুটবল খেলার মাঠের দিক থেকে একটা প্রচণ্ড হইহই শোনা গেল।

ঝামেলার সব ব্যাপারেই কৌতূহল বড় বেশি। সুতরাং ঝগড়া মুলতুবি রেখে ও হেলেদুলে রওনা হল ঝালা-পালার দলবলের দিকে।

মাঠে তখন একটা বিচিত্র কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝালা-পালাদের ফুটবলটা মাঠে একনাগাড়ে ড্রপ খেয়ে চলেছে।

ফুটবল যে শূন্যে উঠলে আবার মাটিতে পড়বে, ড্রপ খেয়ে আবার শূন্যে লাফিয়ে উঠবে, এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু নেই। আর এটাই স্বাভাবিক যে, ফুটবলটার লাফ ক্রমশ কমে আসবে এবং একসময় তার লাফালাফি একেবারে থেমে যাবে।

কিন্তু ঝালা-পালাদের ফুটবলটার বেলায় সেরকম কিছু হচ্ছে না। ফুটবলটা ঠিক যতটা উঁচু থেকে নীচে এসে পড়ছে, ড্রপ খেয়ে আবার ঠিক ততটাই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

ঝামেলা অবাক হয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগল।

লাফানো বলটাকে ঘিরে তখন ভিড় জমে গেছে। খেলতে আসা ছেলের

দল তো বটেই, এ ছাড়া রয়েছে নানানবয়েসি লোকজন--সবাই একজোট হয়ে হাঁ করে বলটার কীর্তিকলাপ দেখছে। কয়েকটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে কীসব বলাবলি করছে। বোধহয় বলটাকে নিয়েই আলোচনা করছে।

চারপাশের চিৎকার, গুঞ্জন, হাসাহাসি মিলেমিশে এক জটপাকানো কোলাহল তৈরি হয়েছে বলটাকে ঘিরে।

ওই ডামাডোলের মধ্যে চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত কী করে যে ঝামেলাকে খুঁজে বের করল কে জানে! ওদের ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েই ঝামেলা দ্যাখে দু-ভাই ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে।

ওদের কাছেই পুরো ব্যাপারটা শুনল ঝামেলা।

দিব্যি নাকি ফুটবল খেলা চলছিল। হঠাৎই ওদের এক বন্ধু বুবু জোরে একটা স্কাই শট মারে। তাতে বলটা প্রায় তিনতলার সমান শূন্যে উঠে যায়। বলটা মাটিতে নেমে আসার সময় ওদের আর একজন বন্ধু অপু ছুটে যায় বলটাকে শট মারতে। কিন্তু কীভাবে যেন ওর শট ফসকে যায়। তখন সবাই অবাক হয়ে দ্যাখে যে, বলটা আবার তিনতলার সমান উঁচুতে উঠে গেছে। এই ব্যাপার দেখে সবাই বেশ ভয় পেয়ে যায়। কে একজন বলে যে, বছর পনেরো আগে একজন ফুটবল খেলোয়াড় মাঠের ধারের একটা বকুলগাছে গলায় দড়ি দিয়েছিল। এ নাকি তারই প্রেতাত্মার কারসাজি। এ-কথা শুনে সবাই সরে যায়, আর বলটা আপনমনে তিনতলার সমান লাফাতে থাকে। এখন কী করা হবে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

সব কথা শোনার পর বুকে হাত ঠুকে ঝামেলা বলল, 'একটি লম্ফমান ফুটবলকে ভয় পাওয়ার যে কী কারণ থাকিতে পারে তাহা কিছু বুঝতে পারছি না। রবিঠাকুর বলে গেছেন, বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা। তোমরা কি তাহা জানো না?'

ইন্দ্রকান্ত ঝামেলার 'রণং দেহি' ভাবসাব দেখে বলল, 'তুমি কি জানো, কে যেন বলে গেছেন, হাতি-ঘোড়া গেল তল/মশা বলে কত জল?'

'আমাকে ব্যঙ্গ করিয়া কোনও প্রফিট হইবে না।' ঝামেলা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল এবং হাঁটা দিল লম্ফমান ফুটবলের দিকে।

হাঁটতে-হাঁটতেই পিছন ফিরে ও চন্দ্র-ইন্দ্রকে বলল, 'দেশের কাজে যাচ্ছি। দয়া করে যেন ''ঝামেলা, স্ট্যাচু'' বলে আমাকে বাধা দিয়ো না। তোমাদিগকে ভরসা করা বড়ই কঠিন।'

এই কথা বলে এঁচোড়ে পাকা রোবট রওনা দিল বলের দিকে, আর ঝালা-পালা ওকে অনুসরণ করল। এই অদ্ভুত বিপদে কী করবে ওরা কিছুতেই ভেবে

পাচ্ছিল না। এই সময় ছোটকা থাকলে খুব ভালো হত! ওরা মনে-মনে ভাবল।

ভিড় ঠেলে চক্রব্যূহের ভেতরে ঢোকার সময় লোকজনের নানান মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল।

'মনে হচ্ছে কোনও ফুটবল প্লেয়ারের প্রেতাত্মা ফুটবলটার ওপরে ভর করেছে।'

'বলটার ভেতরে কোনও স্প্রিং ফিট করা নেই তো!'

'বলটার ভেতরে মনে হয় কোনও বাচ্চা ক্যাঙারু ঢুকে পড়েছে।'

ওরা তিনজনে মাঝের গোল ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। ঝামেলা লক্ষ করল, নানান মানুষজনের ভিড়ে বেশ কয়েকটা রোবটও দাঁড়িয়ে আছে। তারাও হাঁ করে লাফানো বলের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

হঠাৎই ষোলো-সতেরো বছরের একটা মোটাসোটা ছেলে ছুটে গেল বলটার দিকে। বলটা তখন নীচে নেমে আসছিল। বলটা ড্রপ খাওয়ামাত্রই ছেলেটা একটা চিৎকার করে বলটাকে জাপটে ধরল।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল।

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েই বলটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। আগের মতোই তিনতলার সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেল অনায়াসে।

মাঠের কৌতূহলী দর্শকরা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার ছাপিয়ে কে যেন ডেকে বলল, 'পল্টু, ভয় পাস না। বলটাকে চেপে ধরে রাখ।'

পল্টু আকাশ থেকে এই পরামর্শ শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। তবে স্পষ্ট দেখা গেল, ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। আর ও প্রাণপণে বলটাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

এইবার বলটার নেমে আসার পালা।

পল্টুসমেত বলটা নেমে আসতে লাগল।

অত উঁচু থেকে মাটিতে এসে পড়লে পল্টু যে আর আস্ত থাকবে না সেটা সকলেই বুঝতে পারল। এমনকী ঝামেলাও। তাই বাচ্চা রোবটটা কখন যেন এগিয়ে গেছে লাফিয়ে ওঠা বলটার ঠিক নীচে। তারপর বল এবং পল্টু যখন নেমে এল তখন পঞ্চাশ কেজি ওজনের ঝামেলা ওর ইস্পাতের লিকলিকে হাত পেতে ক্যাচ লোফার মতো লুফে নিল পল্টুকে।

চারপাশ থেকে এমন চিৎকারের রোল উঠল যেন শচীন তেন্ডুলকর শোয়েব আখতারের ছ'বলে ছ'টা ছক্কা হাঁকিয়েছে।

ঝামেলা পল্টুকে বাঁচাল বটে কিন্তু বলটাকে ধরে রাখতে পারল না। বল ওর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে আবার উঠে গেছে শূন্যে।

ছ'-সাতজন ছেলে ছুটে গেল পল্টুর কাছে। ও তখন মাটিতে অসাড় হয়ে

শুয়ে আছে—বোধহয় এত ভয় আর টেনশনে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ঝামেলা শূন্যে লাফানো বলটাকে কয়েকপলক দেখল। তারপর হেলেদুলে ফিরে এল ঝালা-পালার কাছে। ন্যাড়ামাথা এপাশ-ওপাশ নেড়ে মিহি গলায় বলল, 'কেস একেবারে নটবর। কিচ্ছু করার নেই। ছোটকাবাবুকে দ্রুত অফিসে ফোন করিয়া দাও। আমি লম্ফমান বলের নিকটে হার মানিলাম।'

ঝালা-পালাও বুঝল গতিক সুবিধের নয়। তাই ওরা ঝামেলাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ছুটল ছোটকাকে ফোন করতে।

একটা পেল্লায় মাপের জিপে চড়ে ছোটকা যখন 'অকুস্থলে' এসে হাজির হল তখন বিকেলের আলো মরে এসেছে। কিন্তু লম্ফমান ফুটবল তার গুরুত্বপূর্ণ কাজে এতটুকুও ক্ষান্তি দেয়নি।

ছোটকার সঙ্গে নানান যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। কালো রোগা চেহারার ছোটখাটো মানুষ। ছোটকা তাকে 'বর্মন' বলে ডাকছিল।

চন্দ্র আর ইন্দ্র টেলিফোনেই গোটা ব্যাপারটা ছোটকাকে জানিয়েছিল। ছোটকা সব শুনে ওদের সাবধান করে দিয়ে বলেছে, 'তোরা সবাই চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থাক। বলটাকে মোটেই ডিসটার্ব করবি না। আমি অফিস থেকে লোকজন আর যন্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা খুব পিকিউলিয়ার ফেনোমেনন।'

ছোটকাকে লটবহর নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে ভিড় করে থাকা লোকজন গলা ফাটিয়ে হইহই করে উঠল।

ঝামেলা 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে হেলেদুলে লাফাতে লাগল। ওর কপালের লাল-নীল-হলুদ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলতে-নিভতে লাগল। খুব খুশি হলে অথবা উত্তেজিত হলে ঝামেলা এইরকম করে। জাপানের আগ্নেয়গেরির সঙ্গে ওর উল্লাসের যে কী সম্পর্ক তা ও-ই জানে!

ছোটকার নানান সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চলতে লাগল। সকলে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ছোটকার কার্যকলাপ খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল।

ছোটকা একটা যন্ত্র চোখে দিয়ে বলটাকে ভালো করে দেখল। সবুজ রঙের কী একটা রশ্মি ফেলল বলটার গায়ে। তারপর সেটাকে লক্ষ্য করে খুদে-খুদে এক ঝাঁক মিসাইলের মতো কী যেন ছুড়ে দিল।

কিন্তু কোনওটাতেই কোনও ফল হল না। বলটা একরোখাভাবে লাফাতেই লাগল।

ঝামেলা ভেবেছিল ছোটকা বলটাকে থামাতে পারবে। কিন্তু ছোটকাকে ব্যর্থ

হতে দেখে সে 'ফোঁসফোঁস' করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসগুলি যথেষ্ট সুদীর্ঘ হইতেছে না।'

ধীরে-ধীরে সন্ধের ছায়া নেমে এল মাঠে।

ছোটকা বর্মনকে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে জিপে উঠতে বলল। তারপর জমায়েত মানুষজনকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনারা যে যার বাড়ি চলে যান। এ-লাফানি সহজে থামবে না। নিজে থেকেই যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, দেখবেন, নিজে থেকেই হঠাৎ থেমে যাবে।'

'তা বলে সারা রাত ধরে বলটা একা-একা অমন লাফাবে?' ইন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

'তাতে তোর কী!' ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ছোটকা।

ওরা যখন দল বেঁধে বেরিয়ে আসছিল তখন মাঠের চারপাশে নানা জায়গায় লাগানো ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে।

সেই মলিন আলোয় ফুটবলটা দিব্যি একমনে লাফিয়ে চলেছে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছোটকাকে ভীষণ আনমনা দেখাচ্ছিল। বোধহয় বল লাফানোর রহস্যের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ঝামেলা হঠাৎই ছোটকার দিকে মুখ তুলে বলল, 'বল উল্ল—উল্ল—উল্ল—।'

'উল্লম্ফন।' ছোটকা ওকে ধরিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, বল উল্লম্ফনের পশ্চাতে প্রেতাত্মার কোনওরূপ ইয়ে নাই তো?'

এ-প্রশ্নে ছোটকা হাসল না। বরং বেশ সিরিয়াস মুখে বলল, 'এইভাবে লাফানোর একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে...।'

'কী কারণ?' ঝালা-পালা একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'কোথাও থেকে এনার্জি এসে ঢুকে পড়ছে বলটার ভেতরে। তোরা তো জানিস, একটা বল লাফাতে শুরু করলে ক্রমশ তার লাফের মাপ কমতে থাকে। এইভাবে লাফানোর উচ্চতা কমে যাওয়ার অনেক কারণ আছে ঃ যেমন, ঘর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, বাতাসের বাধা। ফলে, শুরুতে যে-শক্তি নিয়ে বলটা লাফাতে শুরু করে, এইভাবে শক্তি খরচের জন্যে ক্রমেই তার লাফানোর শক্তি কমতে থাকে। যদি বাইরে থেকে কোনওভাবে ক্ষয়ে যাওয়া শক্তিটুকু সাপ্লাই করা যায়, তা হলে বলটার লাফের উচ্চতা আর একটুও বদলাবে না। শুধু ওটার কাইনেটিক এনার্জি পালটে যাবে পোটেনশিয়াল এনার্জিতে, আবার পোটেনশিয়াল এনার্জি পালটে যাবে কাইনেটিক এনার্জিতে। এইভাবে গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তির

রূপবদল হয়। তবে লাফানোর সময় যে-কোনও পজিশনে বলটার গতিশক্তি আর স্থিতিশক্তির যোগফল একই থাকে।'

'বলটাকে ক্ষয়ে যাওয়া এনার্জির জোগান দিচ্ছে কে?' চন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।

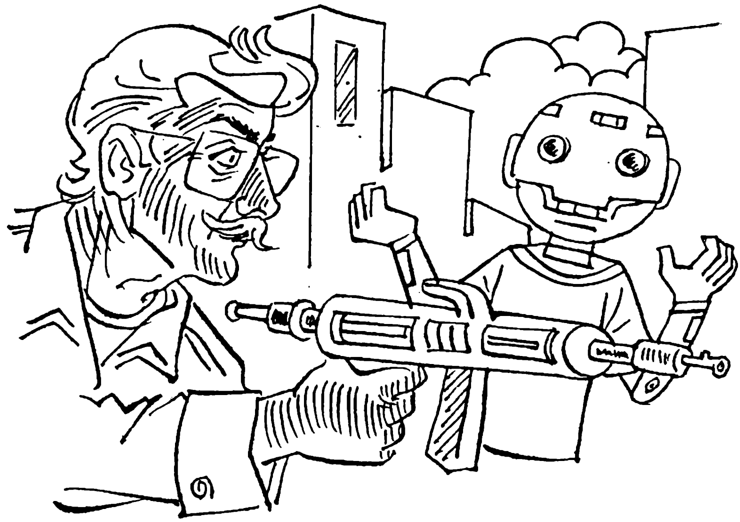
ছোটকা খানিকটা আনমনাভাবে বলল, 'ফানেল দিয়ে যেমন তেল ঢালে, সেইরকমভাবে বলটার মধ্যেও কেউ এনার্জি ঢেলে দিচ্ছে। যেহেতু ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেহেতু মনে হচ্ছে, ফোর্থ ডায়মেনশনের কোনও একটা বিন্দু থেকে আমাদের থ্রি ডায়মেনশনের দুনিয়ায় একটা এনার্জি টানেল তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজের মতো—ব্ল্যাক হোল আর হোয়াইট হোলকে যে-ব্রিজ জুড়ে দেয়। যাক গে, বাদ দে—ওসব বিজ্ঞানের কচকচি তোরা বুঝবি না। শুধু এটুকু বুঝে নে, সেই অদৃশ্য এনার্জি টানেলের একমাথায় আছে একটা উৎস, আর এই মাথায় রয়েছে এই ফুটবলটা। বলটা ফোর্থ ডায়মেনশন থেকে এনার্জি সাপ্লাই পেয়ে চলেছে। তবে টানেলের এ-প্রান্তে বলটা যে কী করে হঠাৎ জুড়ে গেল তা বলতে পারব না। যখন টানেলটা আবার বল থেকে সরে যাবে, তখন এনার্জি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—তা হলেই বলটা স্বাভাবিক নিয়ম মেনে থামবে। তার আগে নয়।'

'ওঃ ব্বাবা! একটা বল লাফানোর পেছনে এত কাণ্ড!' ইন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বলল।

ছোটকা গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'সত্যি-সত্যি এত কাণ্ড আছে কি না জানি না। আমি শুধু সায়েন্সের দিক থেকে একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।'

ঠিক তখনই ঝামেলা মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এইমাত্র একটি চারের সাহায্যে ব্রায়ান লারার সেঞ্চুরি পূর্ণ হইল। ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'





ঝামেলাকে নিয়ে ঝামেলা

মানতেই হবে এ-অন্যায়টা একটু অন্যরকমের। সাধারণ চুরি, ছিনতাই, কেপমারি বা রাহাজানি যেরকমটা হয়ে থাকে, ঠিক সেরকম নয়। বরং হাই-টেক যুগের সঙ্গে মানানসই এক হাই-টেক ক্রিমিনালের অভিনব কুকীর্তি।

কোটিপতি ব্যবসায়ী গণপতি শাসমল সকাল দশটা নাগাদ কাঁকুড়গাছির একটি 'এনিটাইম মানি ট্রান্সফার' বুথে ঢুকেছিলেন। এ.টি.এম.টি. বুথে ঢুকে কম্পিউটারের বোতাম টিপে কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্যান্য ব্যাঙ্কের নানান অ্যাকাউন্টে ইচ্ছেমতো টাকা ট্রান্সফার করতে পারেন—শুধু সেই অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলো জানলেই হল। কম্পিউটারাইজ্‌ড ব্যাঙ্কিং-এর যুগে এই সুবিধে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এয়ার-কন্ডিশন্‌ড বুথে ঢুকে গণপতি শাসমল মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন। মনিটরে নিজের অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স দেখছিলেন আর হাতে-ধরা একটি চিরকুটে লেখা হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন পাওনাদারের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করছিলেন।

হঠাৎই তাঁর ঠিক পিঠের কাছ থেকে কেউ স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'আমি একটা অ্যাকাউন্ট নম্বর বলছি। এক্ষুনি এই অ্যাকাউন্টে দু-লাখ টাকা ট্রান্সফার করুন। অ্যাকাউন্ট নম্বর 01204-0036795। যদি আপনি আমার কথা না শোনেন,

তা হলে এটাই আপনার শেষ এ.টি.এম.টি. ভিজিট। কারণ...'

গণপতি শাসমল চমকে পিছনে ফিরে তাকিয়েছেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। শব্দটা খুব চাপা, অনেকটা রেস্তোরাঁর মিউজিক সিস্টেমের মতো। কিন্তু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা কথাগুলো নিশির ডাকের মতো কিউবিক্‌ল-এর ভেতরে অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'...কারণ, আমার কথামতো কাজ না করে আপনি এই বুথ থেকে বেরোনোমাত্রই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হবে। তাতে এই বুথ এবং আপনি—দুজনেই "নেই" হয়ে যাবেন। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে বুথের দরজার লকের কাছটা ভালো করে দেখুন...।'

গণপতি শাসমল এসি বুথে দাঁড়িয়ে ঘামতে শুরু করলেন। তাঁর ভয়ার্ত চোখ তখনও খুঁজে চলেছে কথাগুলো কোথা থেকে আসছে। সত্যিই কি তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে দাড়িয়েছেন? এরপরই ফুলস্টপ!

'...লকের কাছটা ভালো করে দেখুন। দরজার পাল্লা আর ফ্রেমের মাঝে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের মোল্ড লাগানো আছে। আপনি বুথ থেকে বেরোনোর জন্যে যেই পাল্লাটা টেনে খুলবেন সঙ্গে-সঙ্গে ফিউজ উড়ে গিয়ে ফু স্ স্ স্...।'

শেষ শব্দটা বিস্ফোরণের শব্দের একটা মিনিয়েচার নকল বলা যেতে পারে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছার চেষ্টা করলেন গণপতি। একইসঙ্গে তাঁর চোখ গেল দরজার লকের দিকে। কী যেন লাগানো রয়েছে জোড়ের কাছটায়! গণপতির শিরদাঁড়া বেয়ে একটা লাউডগা সাপ হাঁটতে শুরু করল।

'অ্যাকাউন্ট নম্বরটা আবার বলছি ঃ 01204-0036795। এবার তাড়াতাড়ি ট্রান্‌জ্যাকশন কমপ্লিট করুন। কুইক।'

গণপতি কি লোকটার কথা শুনবেন, নাকি বেঁচে থাকার তাগিদে আজীবন এই বুথের ভেতরেই বসে থাকবেন?

'পাঁচমিনিটের মধ্যে ট্রান্‌জ্যাকশন কমপ্লিট করুন, নইলে বুথ উড়িয়ে দেব।'

গণপতি আর ভরসা পেলেন না। পটাপট কম্পিউটারের বোতাম টিপতে শুরু করলেন।

একটু পরে আবার সেই নেশা ধরানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ 'দু-লাখের কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তা হলে আমাকে আরও খারাপ কাজ করতে হবে। আর...কাউকে এই ঘটনার কথা বলবেন না। পুলিশকে তো নয়ই।'

দু-লাখ টাকা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার পর গণপতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ততক্ষণে কম্পিউটারের মনিটরে ব্যাঙ্কের হেড-অফিসের সুদৃশ্য বিল্ডিং-এর রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে লেখা ঃ 'এ.টি.এম.টি. ব্যবহার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের গ্রাহকদের ব্যাঙ্কিং সুরক্ষায় আমরা সবসময় পাশে আছি।'

লেখায় ধন্যবাদের পর কথায় ধন্যবাদ পাওয়া গেল। অচেনা কণ্ঠস্বর আলতো করে বলল, 'ধন্যবাদ। এবার আপনি নিরাপদে বুথ থেকে বেরোতে পারেন। আমি এক্সপ্লোসিভের ফিউজটা ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি।'

বুথের ঠান্ডা থেকে রাস্তার গরমে বেরিয়ে গণপতি শাসমল দারুণ আরাম পেলেন। বুকভরে শ্বাস টেনে তিনি টের পেলেন যে, এতক্ষণ তাঁর ঠিকমতো শ্বাস নেওয়া হয়নি।

গণপতি শাসমল থেকে ঘটনার শুরু। তারপর, একমাসের মধ্যে, এরকম আরও তিনটি ঘটনা ঘটে গেল। একটি এসপ্লানেডে, একটি ভবানীপুরে, আর একটি সল্টলেকে। তিনটি ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক-গ্রাহকরা ভয় পেয়ে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়ে গেল শহরে। টিভি, ইন্টারনেট আর খবরের কাগজ ব্যাপারটা নিয়ে মস্ত শোরগোল শুরু করে দিল। পুলিশমহলে চলতে লাগল ঘন-ঘন মিটিং। একরাশ আতঙ্ক নিয়ে মানুষ এ.টি.এম.টি. বুথ ব্যবহার করতে লাগল। কারণ, পেপারলেস ব্যাঙ্কিং-এর যুগে এ.টি.এম.টি. ব্যবহার না করে উপায় নেই।

এদিকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা একজোট হয়ে বারবার আলোচনায় বসতে লাগলেন। আজ কলকাতা শহরে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়েছে—কাল যে মুম্বই, দিল্লি এবং অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়বে না তার গ্যারান্টি কী! শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবসা লাটে না ওঠে!

এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে সারা শহর যখন টগবগ করে ফুটছে তখন কীভাবে যেন পুলিশমহল আর ভারত সরকারের ওপরমহলের যোগাযোগে ঝালা-পালার ছোটকা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল।

দুই যমজ ভাই চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত তখন গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়ার জন্য তৈরি। ছোটবেলায় ওরা দুজনে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত বলে ছোটকা ওদের নাম রেখেছে 'ঝালা-পালা'। এ.টি.এম.টি. বুথের রহস্যটা হাতে আসতেই ছোটকা ওদের ডেকে বলল, 'ঝালা-পালা, শোন। এ.টি.এম.টি. থেকে অদ্ভুত কায়দায় ডাকাতির ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। কিন্তু তোরা তো আজ রাতেই ট্রেন ধরবি। ভীষণ মিস করবি...কিন্তু কিছু তো করার নেই!'

ইন্দ্রকান্ত বেজার মুখে বলল, 'ছোটকা, দার্জিলিং যেতে আর ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে তোমার সঙ্গে থাকলে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হত।'

চন্দ্রকান্ত তখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি কোনটা বেশি অ্যাট্রাক্টিভ—দার্জিলিং না এ.টি.এম.টি. মিস্ট্রি। তাই ও পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ পয়সার কয়েন বের করল টস করার জন্য।

ছোটকা ওদের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন আর কোনও উপায় নেই রে। দাদা, বউদি রেগে ফায়ারবল হয়ে যাবে। বরং তোরা

ফিরে এসে গল্প শুনিস।'

ঝালা-পালার ছোটকা ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে কাজ করে। আর ইলেকট্রনিক্স-এ দুদান্ত এক্সপার্ট। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই নানান অটোমেটিক জিনিস তৈরি করত। বছরদুয়েক আগে পঞ্চাশ কেজি ওজনের একটা বাচ্চা-রোবট তৈরি করে ছোটকা ঝালা-পালাকে প্রেজেন্ট করেছে। বাচ্চা-রোবটটা সবসময় ঝামেলা করে বলে ছোটকাই ওর নাম রেখেছে ঝামেলা।

ছোটকা বলল, 'ঝামেলা আমার কাছে থাক। আমার কাজে একটু-আধটু হেল্প হতে পারে। তোরা ঝামেলাকে ছেড়ে সাতটা দিন থাকতে পারবি না?'

ঝালা-পালা একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ পারব।'

এমন সময় ওরা ঝামেলার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঠং-ঠং করে পা ফেলে এদিকেই আসছে।

হাফপ্যান্ট পরা তিনফুট হাইটের রোবটটা হেলেদুলো ঘরে এসে ঢুকল। মাথাটা পাঁচনম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড—রুপোর মতো ঝকঝক করছে। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। গায়ে একটা রংচঙে হাফশার্ট। ওর চোখ দুটো দেখতে টেনিসবলের মাপের কাচের গুলি—ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। আসলে ও-দুটো পুঞ্জাক্ষি, যেমনটা মাছির থাকে। অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি এই পুঞ্জাক্ষি দিয়ে ঝামেলা প্রায় একমাইল দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়।

বলের মতো চোখ দুটো ঘুরিয়ে মিহি ধাতব স্বরে ঝামেলা ঝালা-পালাকে বলল, 'স্বার্থপরতা মানবধর্ম। আমাকে ফেলে রেখে দিব্যি দার্জিলিং গয়ং গচ্ছতি। রোবটরা এমন স্বার্থপর নহে। তাহারা ফ্যান্ট্যাসটিক উদার।'

ছোটকা হেসে বলল, 'ঝামেলা দেখছি ডায়ালগে হেভি উন্নতি করেছে! বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি পাঞ্চ করে কথা বলছে! ঝালা-পালা, তোরা তো দারুণ ট্রেনিং দিয়েছিস রোবটটাকে!'

ঝামেলার শিক্ষানবিশি এখনও চলছে। কথা বলার সময় ও সবকিছু কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। কোনও-কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। তার সঙ্গে আছে গুরুচণ্ডালীর সমস্যা।

ইন্দ্রকান্ত ঝামেলাকে বলল, 'দার্জিলিং যেতে পারছ না বটে, তবে তার বদলে একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে ছোটকার সঙ্গে থাকতে পারছ। তুমি ভীষণ লাকি।'

ঝামেলা পিছনে হাত রেখে গম্ভীর সুরে বলল, 'ঠিক আছে। যাচ্ছ যাও—তবে ওখানে গিয়ে বেশি হুটোপাটি করিয়ো না। তোমরা যা দুরন্ত প্রকৃতির বালক! তোমাদিগকে নিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তা হয়!'

ছোটকা ঝামেলার মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'রোবটটাতো বড় এঁচোড়ে পাকা হয়ে গেছে দেখছি!'

ঝামেলা হঠাৎই ছোটকাকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল। ওর কপালে বসানো ছোট-ছোট লাল-নীল বাতিগুলো এলোমেলোভাবে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

ঝামেলার কখন যে কী মতিগতি হয় সে ও-ই জানে!

ছোটকা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না এ.টি.এম.টি.-র মাধ্যমে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করিয়ে ওই ইলেকট্রনিক ডাকাতটা শেষ পর্যন্ত টাকাটা হাতে পাচ্ছে কেমন করে।

এ-ব্যাপারে তদন্তে নেমে পুলিশের কাছ থেকে ভারী অদ্ভুত রিপোর্ট পেল ছোটকা। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বসে স্পেশাল মিটিং-এ আলোচনার সময় অফিসার-ইন-চার্জ যোগিন্দার শুক্লা বললেন, 'আমরা ব্যাঙ্কের কম্পিউটার ডেটাবেস ঘেঁটে যে চারটে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে তার নম্বরগুলো পেয়েছি। শুনলে আপনারা অবাক হবেন, চারটে অ্যাকাউন্ট নাম্বার চাররকম। এবং তার মালিকরা জানেন না এই টাকা কেন হঠাৎ তার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

'তা হলে ক্রিমিনালটার লাভ কী?' ছোটকা জানতে চাইল।

এবার উত্তর দিলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার রিমিন গুপ্ত ঃ 'মিস্টার চৌধুরী, লাভটা গতকালই জানা গেছে। আমরা শহরের সবকটা এ.টি.এম.টি. বুথে ওয়াচ রাখছিলাম। তা ছাড়া ওই চারটে অ্যাকাউন্টের টাকা লেনদেনের ওপরেও নজর রাখছিলাম। ওই হাইটেক ক্রিমিনালটা কী করেছে জানেন?' হাসলেন রিমিন। মেটাল ফ্রেমের চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে বললেন, 'ওই চারটে অ্যাকাউন্ট থেকে আবার নতুন চারটে অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছে। তারপর তারই একটা অ্যাকাউন্টকে টার্গেট করে সেই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে দিয়ে ক্যাশ উইথড্র করিয়েছে।'

'মাই গুড্‌নেস!' ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'সেই ভদ্রলোক কি ব্যাপারটা আপনাদের কাছে রিপোর্ট করেছেন?'

'হ্যাঁ। ওঁর নাম সঞ্জীব মিত্র—মিলেনিয়াম হাই স্কুলের টিচার। ওঁকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছি। বাইরের ঘরে উনি অপেক্ষা করছেন। এ ছাড়া আরও চারজন রয়েছেন—ওঁরা সবাই বোমার ভয়ে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করেছেন। আমরা অলরেডি কথা বলেছি। আপনি ইচ্ছে করলে ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

ছোটকা মনে-মনে হিসেব করছিল। ক্রিমিনালটা মোট ন'জনকে এ.টি.এম.টি. বুথে অদ্ভুত কায়দায় পাকড়াও করেছে। তারপর নানান অ্যাকাউন্টে টাকা চালাচালি করে শেষ পর্যন্ত ক্যাশ টাকা হাতিয়েছে। এটা তো সে প্রথমেই করতে পারত। করেনি তার কারণ পুলিশকে সে ঘোল খাওয়াতে চেয়েছে।

এই কেসের ফাইলটা ছোটকা এতবার পড়েছে যে, প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। তা ছাড়া কেসের ইম্‌পর্ট্যান্ট পয়েন্টগুলো ছোটকা ঝামেলাকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিয়েছে। যখন খুশি ওকে নির্দেশ দিলেই ও গড়গড় করে হুবহু সব উগরে দিতে পারবে।

মিটিং রুমের এক কোণে ঝামেলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ছোটকা ওর চলাফেরা আর কথা বলার সার্কিট দুটো অফ করে রেখেছিল। শুধু চোখ আর কান অ্যাক্টিভ ছিল। ঝামেলার কান বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু নেই—তার জায়গায় আছে দুটো ফুটো। কিন্তু ওর শ্রবণক্ষমতা পশুপাখিকেও হার মানায়। সূক্ষ্ম আলট্রাসনিক শব্দও ওর ওই 'কানে' ধরা পড়ে।

ছোটকা চলাফেরা আর কথা বলার সার্কিট দুটো অন করে দিতেই ঝামেলা বলল, 'বাব্বাঃ, এতক্ষণ নিশ্চুপ করিয়া থাকার কী যে কেষ্ট তাহা বোনে-বোনে বুঝিতে পারলাম।'

ছোটকা অনুমান করতে পারল 'কেষ্ট'টা 'কষ্ট' হবে। কিন্তু 'বোনে-বোনে' মানেটা কী! ঝামেলার তো কোনও বোন নেই!

'বোনে-বোনে মানেটা কী বলো তো? ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ঝামেলা হাত-পা নেড়ে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'বোনে-বোনে মানে হাড়ে-হাড়ে। কী যে তব বুদ্ধি!'

ছোটকা এ-নিয়ে আর কথা বাড়াল না। সত্যি, ঝামেলাটা বড্ড জ্যাঠা হয়ে উঠেছে।

বাইরের ঘরের দিকে যেতে-যেতে ছোটকা চাপা গলায় বলল, 'শোনো, এখন আমি কয়েকজন লোকের সঙ্গে এই কেসের ব্যাপারে কথা বলব। তুমি চুপচাপ সব রেকর্ড করে নেবে।'

'তথাস্তু।' ঝামেলা বলল।

কাচের দরজা ঠেলে ওরা বাইরের ঘরটায় এল।

বিশাল ঘর। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তিনদিকে কাচের দেওয়াল। ফ্লুওরেসেন্ট বাতির নরম সাদা আলো সারা ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। একটা ডোমেস্টিক-রোবট ট্রে-তে করে সবাইকে চা-কফি সার্ভ করছে। ঘরের তিনটে দরজার কাছে তিনটে সিকিওরিটি রোবট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দরজা দিয়ে যারাই আসা-যাওয়া করছে ওরা তাদের আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার জেনে রেকর্ড করে নিচ্ছে। রোবটগুলোর চেহারা বেশ দশাসই আর লম্বা।

রিমিন গুপ্ত ছোটকা আর ঝামেলার পিছন-পিছন হেঁটে আসছিলেন। ঘরে ঢোকার সময় সিকিওরিটি রোবট ওঁদের আই.ডি. নম্বর জানতে চাইল। ওঁরা নম্বর বলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ঝামেলা হেলেদুলে সিকিওরিটি রোবটটাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় ওটা চাপা

ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, 'আমি লম্বা, তুই বেঁটে।'

ঝামেলা ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমি স্বাধীন, তুই চাকর।' তারপর তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছোটকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল—পাছে লম্বা রোবটটা তেড়ে আসে।

একটা বৃত্তাকার সোফায় সঞ্জীব মিত্র ও অন্যান্যরা বসেছিলেন। রিমিন ওঁদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমরা আর-একবার কথা বলব। সঞ্জীববাবু, আপনি প্রথমে আসুন...।'

একটা প্রকাণ্ড কাচের টেবিলের কাছে ছোটকা আর ঝামেলাকে নিয়ে গেলেন রিমিন ঃ 'মিস্টার চৌধুরী, এখানে বসেই আপনি ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিন। কী, কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

'না, না, বরং সুবিধেই হবে।'

ছোটকা আর রিমিন গুপ্ত টেবিলের একদিকে বসে পড়লেন। ঝামেলা বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেয়ারগুলো কাচের তৈরি বলে কী ভেবে আর বসল না—চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সঞ্জীব মিত্র ছোটকাদের মুখোমুখি বসলেন।

তারপর শোনালেন ওঁর কাহিনি।

সঞ্জীব মিত্রের কাহিনিটা গণপতি শাসমলের মতোই। শুধু অন্য কোনও অ্যাকাউন্ট নম্বরে টাকা ট্রান্সফার করার বদলে ওঁকে মেশিন থেকে ক্যাশ উইথড্র করতে বলা হয়েছে।

সঞ্জীব মিত্র মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে লালচে আভা। বাঁ চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ভদ্রলোক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

'...দেখুন, ওই দু-লাখ টাকা আমার নয়। কে আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে জানি না। তাই ওরকম ভূতুড়ে আদেশ পাওয়ামাত্রই আমি ভয় পেয়ে দু-লাখ টাকা ক্যাশ উইথড্র করে নিই...।'

'উইথড্র করে টাকাটা কী করলেন?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

'লোকটা যেমন অর্ডার দিল তাই করলাম। টাকাটা মেশিন থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই ওটা গোছা ধরে মেশিনের পাশ ঘেঁষে এক কোণে গুঁজে রাখলাম। তারপর বুথ থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিয়েছি—আর পেছন ফিরে তাকাইনি।'

রিমিন বললেন, 'আপনি চলে যাওয়ার পরই ওই ক্রিমিনালটা নিশ্চয়ই ওই বুথে গিয়ে ঢুকেছে। এবং টাকাটা তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।'

ছোটকা বলল, 'সেটাই ওব্‌ভিয়াস'।

সঞ্জীব ইতস্তত করে বললেন, 'দেখুন...আমার হয়তো অতটা ভয় পাওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ শুনে আর ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি। অবশ্য

লোকটা ধাপ্পা দিয়েও থাকতে পারে।'

রিমিন মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, 'না, ধাপ্পা নয়। আমরা এ.টি.এম.টি. বুথগুলোর ফোরেনসিক অ্যানালিসিস করেছি। তাতে আমরা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ট্রেস পেয়েছি। আর সামান্য লেড অ্যাজাইডও পাওয়া গেছে। লেড অ্যাজাইড এক্সপ্লোসিভের প্রাইমার মেটিরিয়াল।'

সঞ্জীব মিত্রকে ছেড়ে দিয়ে ছোটকা রিমিনকে বলল, 'আরও তিনজনের কাছ থেকে ক্যাশ টাকা হাতানো বাকি রয়েছে। এ.টি.এম.টি. বুথগুলোর ওপরে আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে।'

রিমিন বললেন, 'আমরা তো কনস্ট্যান্ট ওয়াচ রেখেছি—।'

'না, ঠিক ওরকম নয়—আমার এই স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাচ্চা-রোবটটা স্পেশাল ওয়াচ রাখবে।'

রিমিন ঝামেলার দিকে তাকালেন, বোধহয় ওর স্পেশালিটি খুঁজতে চাইলেন।

ঝামেলা মাথা ঝুঁকিয়ে রিমিনকে কুর্নিশ করল।

সঞ্জীব মিত্রের পর বাকি চারজনের সঙ্গেও কথা বলল ছোটকা।

মোটাসোটা গণপতি শাসমল ঘন-ঘন শ্বাস নিয়ে ওঁর গল্পটা বললেন, তারপর অবাক হয়ে বললেন, 'ক্রিমিনালটা বুথের ভেতরে কেমন করে কথা বলছিল বলুন তো!'

ছোটকা হেসে বলল, 'সিম্প্‌ল। একটা কর্ডলেস মাইক্রোস্পিকার লোকটা বুথের ভেতরে ফিট করে দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে বোধহয় একটা মিনিয়েচার ভিডিয়ো ক্যামেরাও লাগিয়েছিল...সেটা দিয়ে এ.টি.এম.টি. মেশিনের মনিটর আর আপনাকে লক্ষ রাখছিল।'

'তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলে ওগুলো আবার খুলে নিয়ে গেছে।' রিমিন ছোটকার কথার পিঠে যোগ করলেন।

গণপতির পর ছোটকা কথা বলল মেঘা দাশগুপ্তের সঙ্গে।

মেয়েটি রোগা, ফরসা। চোখে ছোট-ছোট কাচের বিদেশি চশমা। ঠোঁটে ক্যাডবেরি লিপস্টিক। ইকো, জিও, ম্যাথ নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। হাবভাবে একটা বিশ্রী বড়লোক-বড়লোক গন্ধ ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ছোটকার প্রশ্নের উত্তরে মেঘা বলল, 'লুক, আমার পাঁচ-ছ'টা এ.টি.এম.টি কার্ড আছে। আই ডোন্ট রিমেমবার হুইচ ওয়ান আই ওয়জ ইউজিং দ্যাট ডে। পসিব্‌লি আমেরিকান এক্সপ্রেস। এনিওয়ে...সাডেন্‌লি কে যেন খুব কাছ থেকে কথা বলে উঠল। আমি তো চমকে উঠেছি। তারপর...।'

সেই এক গল্প। নতুন কোনও সূত্র পেল না ছোটকা।

মেঘা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেই চলল,...'ক্যালকাটা পুলিশের তো ভীষণ নামডাক শুনি...অবশ্য মিডিয়াগুলো আজকাল তেমন রিলায়েব্‌ল নয়। নইলে ক্যালকাটা

পুলিশ এই হরিব্‌ল ক্রিমিনালটাকে অ্যারেস্ট করে ফাঁসিতে লটকাতে পারছে না! বলে কি না বুথ এক্সপ্লোড করে উড়িয়ে দেবে! ক্যান য়ু ইম্যাজিন দ্য লেভেল অফ অডাসিটি! মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা! পুলিশ কিছু করতে পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আজকাল হাই আই. কিউ.-র ক্যান্ডিডেটরা মোটেই পুলিশে চাকরি করতে আসছে না। আর ওল্ড ব্রেন যেসব পুলিশে আছে সেগুলোয় সব রাস্ট পড়ে গেছে।'

ছোটকা মুচকি হেসে মন্তব্য করল, 'ম্যাডাম, উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেঘা। পোশাকটা ঠিক করে নিয়ে বলল, 'আমি ড্যাডিকে ব্যাপারটা একটু দেখতে বলব। বলব, য়ু ক্যানট ডিপেন্ড আপন দ্য হোপলেস কপ্‌স।'

মেঘার উত্তেজনা আর বিরক্তি দেখে ছোটকা বেশ মজাই পাচ্ছিল। আড়চোখে রিমিন গুপ্তের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। সন্দেহ নেই মেঘা বড়লোকের আদরে আর পয়সায় বখে যাওয়া মেয়ে।

'আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ব্লাডি টু ল্যাক্‌স। কারণ, টাকাটা বড় কথা নয়—সেফটিটাই আসল...।' মেঘা একটানা বকেই যাচ্ছিল।

রিমিন ওর জঙ্গি কথার স্রোতকে বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার ড্যাডি কী করেন? পুলিশে চাকরি করেন?'

'চাকরি! হোয়াট ডু য়ু মিন? আমার ড্যাডির নাম অরিন্দম দাশগুপ্ত—দ্য ফেমাস বিজনেস টাইকুন...।'

রিমিন হেসে বললেন, 'হি মাস্ট বি আ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান। আপনি এবার আসতে পারেন।'

মেঘা ব্যঙ্গের খোঁচাটা বুঝতে পারল। কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তারপর গটগট করে হাঁটা দিল।

মেঘার পর সর্বেশ্বর সরকার।

ছোট ব্যবসায়ী। বয়েস হয়েছে। তাই বোধহয় একটু বেশিই ভীতু।

সর্বেশ্বর মাথার চুলে বেশ কয়েকবার হাত বোলালেন। চোখে বসানো মেটাল ফ্রেমের চশমা বারকয়েক খুললেন, পরলেন। তারপর বললেন, 'আর বলবেন না, মশাই! ওটা এ.টি.এম.টি. বুথ, না ডেথ চেম্বার? আমি তো ঠিক করেছি নেক্সট থ্রি মান্থস্‌ ওইসব বুথ-ফুথে ঢুকব না।'

'কেন? তিনমাস কেন?' রিমিন জিগ্যেস করলেন।

'তিনমাসের মধ্যে আপনারা ক্রিমিনালটাকে পাকড়াও করতে পরবেন না? সেইজন্যেই তিনমাস বলেছি। না, মশাই—গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনাদের ফেস-টেস দেখে মনে হচ্ছে, আরও টাইম লাগবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন সর্বেশ্বর। তারপর বললেন, 'তা হলে স্ট্রেটকাট বলি। যদ্দিন

না আপনারা ওই শয়তানটাকে ধরতে পারছেন তদ্দিন আমি ওই ডেথ চেম্বারগুলোর দিকে এগোচ্ছি না। বলে কি না বুথ উড়িয়ে দেবে! ভাবা যায়, দীনবন্ধু...।'

ছোটকা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'দীনবন্ধু মানে?'

হাসলেন সর্বেশ্বর ঃ 'দীনবন্ধু বলে ভগবানকে ডাকাডাকি করলাম। রাখলে উনিই রাখবেন...।'

'আর মারলে উনিই মারবেন।' হেসে যোগ করল ছোটকা।

রিমিন বললেন, 'আপনার কোনও চিন্তা নেই, মিস্টার সরকার। তিনমাস অনেক সময়—তার আগেই আমরা ক্রিমিনালটাকে অ্যারেস্ট করে ফেলব।'

'দীনবন্ধু ভরসা।' বলে বিদায় নিলেন সর্বেশ্বর।

সবশেষে জুবিন প্রধান। বছর তিরিশ-বত্রিশের স্বাস্থ্যবান তরুণ। সে সরাসরি বলেই বসল, এই ক্রিমিনালকে পাকড়াও করা পুলিশের কর্ম নয়। কারণ টেকনোলজিতে কলকাতা পুলিশ এই লোকটার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে।

ছোটকা জুবিনের গল্পটা শুনল। মোটামুটি একই গল্প। তবে জুবিন একটা বাড়তি তথ্য দিল, বলল, 'আমার মনে হয়, ক্রিমিনাল একজন ওল্ড ম্যান।'

'কেন?'

'কারণ, আমি বুথ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর একজন ফিটফাট বৃদ্ধ মানুষকে সেটায় ঢুকতে দেখেছি।'

এই তথ্য পেয়ে ছোটকা এবং রিমিন গুপ্ত নড়েচড়ে বসলেন। ছোটকা আরও অনেক প্রশ্ন করল জুবিনকে। কিন্তু বাড়তি আর কোনও খবর পাওয়া গেল না। জুবিন বলল, ও ভয় পেয়ে যাওয়াতে বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ায়নি।

বৃদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে জুবিন জানাল, সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথায় সাদা চুল, চোখে বোধহয় চশমা ছিল। পুলিশের ইন্টারোগেশানের সময় জুবিনের খেয়াল না থাকায় এই তথ্য জানাতে পারেনি।

রিমিন গুপ্ত বললেন, 'আপনি কেন ওই বৃদ্ধকে সন্দেহ করছেন, মিস্টার প্রধান? উনি তো একজন অর্ডিনারি এ.টি.এম.টি. কাস্টমারও হতে পারেন?'

'হতে পারে...তবে...' কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল জুবিন। তারপর ঃ 'তবে ওই বৃদ্ধের গতিবিধি খুব পিকিউলিয়ার ছিল—সন্দেহ করার মতো।'

'যেমন?' জানতে চাইল ছোটকা।

'লোকটার হাতে একটা বাক্সমতন কী যেন ছিল। তা ছাড়া বারবার চোরাচাউনিতে এদিক-ওদিক দেখছিল।'

ছোটকা টেবিলে আঙুলের ডগা ঠুকল। ছোট্ট করে বারদুয়েক 'হুঁ' বলল, জুবিন যা বলছে তার মধ্যে সারবস্তু কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু একজন বৃদ্ধ কি তা হলে শখে এইরকম হাই-টেক ডাকাতি করছেন?

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল।

রিমিনের সঙ্গে কথা শেষ করে ছোটকা ঝামেলাকে নিয়ে রওনা হল।

হেড কোয়ার্টারের বাইরে এসে একটা সরু চুরুট ধরাল ছোটকা। বলল, 'এসি অফিসে বসে এতক্ষণ চুরুট না খেয়ে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি।'

উত্তরে ঝামেলা কোনও কথা বলল না। শুধু পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল।

পরদিন থেকে ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ছোটকার এ.টি.এম.টি. বুথে নজরদারি শুরু হল।

ব্যাঙ্কের বড়কর্তাদের কাছ থেকে একটা এ.টি.এম.টি. মাস্টারকার্ড নিয়েছে ছোটকা। এই কার্ড দিয়ে যে-কোনও এ.টি.এম.টি. বুথে ঢোকা যায়। ছোটকা একটা বুথে ঢুকে টাকা লেনদেনের ভান করে। আর প্রায় আট-নশো মিটার দূর থেকে ঝামেলা সেই বুথটার ওপরে নজর রাখে। তারপর ছোটকা চলে যায় আর-একটা বুথে। তারপর আর-একটায়।

এইভাবে একটানা বাইশদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঘটনাটা আচমকাই ঘটে গেল।

ছোটকা তখন শ্যামবাজার অঞ্চলের একটা এ.টি.এম.টি. বুথে ঢুকেছে। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল ঘোষণা ঃ 'আমি একটা অ্যাকাউন্ট নম্বর বলছি। এক্ষুনি এই অ্যাকাউন্টে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ঝামেলার কোড নম্বর ডায়াল করল ছোটকা। এই কোড ডায়াল করলেই ঝামেলার শরীরে বসানো ইনবিল্ট টেলিফোন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে।

ছোটকা ফোনে কথা বলল, 'ঝামেলা, ক্রিমিনালের গলা শুনতে পেয়েছি! তোমার অ্যাকশান শুরু করে দাও!'

ঝামেলা বহুদূরে দাঁড়িয়ে একটা পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎই ওর কানে সিগনাল বেজে উঠল। তারপর ছোটকার কথা।

ছোটকার কথা শোনামাত্রই ও চোখের নিমেষে চনমনে হয়ে উঠল। বলল, 'ওকে বস।' তারপর ওর পুঞ্জাক্ষি এক বৃদ্ধের খোঁজ করে চলল।

ছোটকা বুথের কাচ ভেদ করে বাইরে নজর চালাচ্ছিল। গাড়ি-ঘোড়া আর লোকজনের ভিড়ে আলাদা করে কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে। ছোটকার পক্ষে এ.টি.এম.টি-র বোতাম টিপে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়। তা হলে দেরি দেখে ক্রিমিনালটা হয়তো রেগে গিয়ে বুথটাকেই উড়িয়ে দেবে!

ঠিক তখনই ঝামেলার গলা শোনা গেল স্পিকারে ঃ 'বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখতে পাইয়াছি। চক্ষে টেলিস্কোপ। হস্তে একটি কালো বাক্স। মস্তকে সাদা চুল। বক্ষে লাল ফুল।'

'জলদি লোকটাকে ঠেকাও—নইলে এই বুথ উড়িয়ে দেবে! কুইক!'

ঝামেলা মোটেই ছুটতে পারে না। চেষ্টা করলে বড়জোর তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে। ও সেভাবেই এগিয়ে চলল বৃদ্ধ লোকটির দিকে।

জুবিন প্রধান ঠিকই বলেছিল। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথায় সাদা চুল, চোখে চশমা, আর বাড়তির মধ্যে জামার বুকপকেটে একটা লাল রঙের ফুল আঁকা রয়েছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা মিনি টেলিস্কোপ তাক করে বুড়ো লোকটা বোধহয় ছোটকার ওপরে নজর রাখছিল।

লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে ঝামেলা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল।

লোকটার কানের নীচে চোয়ালের কাছটায় কেমন সরু কালো দাগ। অনেকটা কথা-বলা পুতুলের জোড়া দেওয়া চোয়ালের মতো।

লোকটা মাইক্রোফোনে ছোটকাকে হুমকি দিচ্ছিল ঃ '...এই বুথ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করলেই সাংঘাতিক এক বিস্ফোরণ হবে। জলদি টাকাটা ট্রান্সফার করুন...।'

ছোটকা তখন মরিয়া হয়ে ঝামেলাকে বলছে, 'ঝামেলা, অ্যাকশান! কুইক! আর সময় নেই!'

ঝামেলা বলল, 'অপরাধীর চোয়ালের নিকটে—অর্থাৎ, মস্তকের গ্রাউন্ড ফ্লোরে—একটি জোড়ার দাগ দেখিতে পাইতেছি। বড় আশ্চর্য!'

ঝামেলাকে নিয়ে এই হল এক ঝামেলা। বাচ্চা-রোবট বলে ওর কৌতূহল বড় বেশি। আসল কাজ ছেড়ে...।

ছোটকা আর ভরসা পেল না।

পকেট থেকে ডায়মন্ড কাটার বের করে এ.টি.এম.টি. বুথের কাচের দেওয়াল কাটতে শুরু করল। কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই বুথের একপাশের দেওয়ালের কাচ কেটে ছোটকা বাইরে বেরিয়ে এল।

কাচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন শব্দে। আর ছোটকা তিরবেগে ছুটতে শুরু করল।

ঠিক তখনই বুড়ো লোকটা হাতে-ধরা কালো বাক্সটার কী একটা বোতাম চাপ দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল এক বিস্ফোরণ। এ.টি.এম.টি. বুথটা চৌচির হয়ে ছিটকে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। তার সঙ্গে আগুন আর কালো ধোঁয়া।

রাস্তার লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগল। ছুটন্ত গাড়ি কর্কশ শব্দে ব্রেক কষল। সব মিলিয়ে এক প্রকাণ্ড ডামাডোল শুরু হয়ে গেল।

বৃদ্ধ লোকটির পিছনে দাঁড়িয়ে ঝামেলা বলে উঠল 'চোয়ালে জোড়াতালি দেওয়া বৃদ্ধ! ছোটকাকে তুমি অ্যাটাক করলে! তোমার আস্পর্ধা তো স্মল নয়!'

বুড়ো লোকটা যুবকের ক্ষিপ্রতায় ঝামেলার দিকে ঘুরে তাকাল। কোথা থেকে সে যেন একটা লেজার গান বের করে ফেলেছে।

ঝামেলা হাসল। হাসিটা অনেকটা পেন্ডুলামের জলতরঙ্গ বাজনার মতো শোনাল। ও আঙুল তুলে বৃদ্ধের পায়ের কাছে কী একটা দেখিয়ে বলল, 'জবকল্পহরিনামপটহস্ত...।'

ঝামেলা অনেক সময় এরকম অর্থহীন শব্দ বলে বাংলা উচ্চারণ প্র্যাকটিস করে।

ওর অদ্ভুত কথায় 'জোড়াতালি দেওয়া' বৃদ্ধ মাথা নীচু করে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। এবং চোখের পলকে ঝামেলার ধাতব ডানহাত বৃদ্ধের ব্রহ্মতালুতে আছড়ে পড়ল। টুঁ শব্দটি না করে বৃদ্ধ ক্রিমিনাল তৎক্ষণাৎ খসে পড়ল মাটিতে।

ঝামেলা তখন উত্তেজনায় 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচাচ্ছে। আর ওর কপালের বাল্‌বগুলো জ্বলছে-নিভছে।

উত্তেজিত হলে বা খুশি হলে বাচ্চা-রোবটটা কেন যে 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচায় তা ঝালা-পালা বা ছোটকা কেউই জানে না।

ছোটকা ছুটতে-ছুটতে যখন অজ্ঞান-বৃদ্ধের কাছে এসে হাজির হল তখন ঝামেলা ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধের টিকোলো নাক ধরে টানছে।

ছোটকা হাঁফাতে-হাঁফাতে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বৃদ্ধের নাকটা লম্বা হয়ে ছিটকে চলে এসেছে ঝামেলার হাতে। সেই সঙ্গে মুখের আদলের একটা পলিমারের মুখোশ।

ওরা দুজনেই চমকে উঠল।

বৃদ্ধের মুখটা আসলে মুখোশ!

মুখোশের আড়ালে যে-মুখটা দেখা গেল সেটা ছোটকার চেনা।

ওদের পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে জুবিন প্রধান।

ছোটকা মোবাইল ফোনে রিমিন গুপ্তকে খবর দিল। দশমিনিটের মধ্যেই ওঁরা দলবল নিয়ে হাজির। তখন ছোটকা ঝামেলাকে বলল, 'আজকের মতো ঢের হয়েছে! এবার বাড়ি চলো।'

বাড়ি যাওয়ার পথে ছোটকা বলল, 'জুবিন প্রধানের একটা কথায় খটকা লেগেছিল। ও বলেছে, ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল—অথচ বৃদ্ধ লোকটিকে দেখার জন্যে ও সেখানে অপেক্ষা করছিল। আসলে ও পুলিশকে মিসগাইড করতে চেয়েছিল। তাই হাই-টেক ডাকাতের ভিকটিম সেজে থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। অবশ্য তুই তো রোবট, এতসব কী আর বুঝতে পারবি!'

ঝামেলা ঠং-ঠং শব্দে লাফাতে-লাফাতে বলল, 'তোমার কী নিদারুণ বুদ্ধি! আমি বুঝিতে পারি আর না পারি মাথা নাড়িতে দোষ কী! ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!'





শব্দের নাম বিষ

অফিসে বেরোবার আগে খবর শোনাটা সীতানাথের বরাবরের অভ্যেস। তাই আজও টিভি চালিয়ে তারপর খাওয়ার টেবিলে বসেছেন। এক চামচ ভিটামিন 'এ', দু-চামচ ভিটামিন 'সি' ও চার চামচ প্রোটিন সাধারণত তিনি খেয়ে থাকেন। ঊর্মিলা জানে তাঁর অভ্যেস। তাই প্লেটে করে সেইটুকু গুঁড়ো খাবারই সাজিয়ে দিয়েছে। টাইয়ের নটটা ঠিক করে নিয়ে প্রথম চামচ ভিটামিন মুখে তুলতেই টিভিতে খবর শুরু হল। প্রথম খবরটা একটা দুর্ঘটনার, একটা জেট প্লেন কোনও এক অজানা কারণে এক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয় খবরটা শুরু হওয়ার মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল সুমন—সীতানাথের একমাত্র ছেলে। বছর বারো বয়েস। প্রথমে বাবার দিকে দেখল সুমন, তারপর তাকাল টিভির দিকে। গম্ভীর মুখে বলল, 'বাবা, টিভির ভলিয়ুমটা একটু আস্তে করে দিচ্ছি। তুমি বড্ড জোরে চালিয়েছ। কম করে নব্বই ডেসিবেল তো হবেই—' তারপর একটু থেমে বলল, 'এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে—।'

সীতানাথের ভিটামিন 'সি' সমেত চামচ মাঝপথেই থেমে গেল। মুখ পর্যন্ত পৌঁছোল না। কোনও উত্তর তিনি ভেবে পেলেন না। দেখলেন, সুমন পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে টিভির ভলিয়ুমটা কমিয়ে দিল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যেতে-যেতে বলে গেল, 'আর ভয় নেই। এখন ষাট ডেসিবেলের নীচেই আছে—।'

সীতানাথ নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। সত্যি, সুমনটা ভারি অদ্ভুত হয়ে উঠছে দিনকে দিন। মাস কয়েক হল এই 'শব্দ' ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকেছে। দোষটা অবশ্য সীতানাথেরই। তিনিই প্রথম ওকে 'শব্দকল্প' নামে একটা বই কিনে দেন, সুমনের জন্মদিনের উপহার। সে-বইতে শব্দের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকের কথা লেখা ছিল। বইটা সুমনের প্রচণ্ড মনে ধরে যায়। তখন থেকেই ও ইস্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দিনরাত্তির শব্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। ওর কাছেই সীতানাথ প্রথম শিখেছেন, জিনিসপত্র যেমন ওজন করে মাপে ঃ এক কেজি, দু-কেজি, তেমনি শব্দ মাপে 'ডেসিবেল' দিয়ে ঃ পাঁচ ডেসিবেল, দশ ডেসিবেল...। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, একদিন অফিসে বেরোবার ঠিক আগে সুমন এসে ঘরে ঢুকল। বলল, 'বাবা, তোমার অফিসে যাওয়ার পথে রাস্তায় ভীষণ হই-হট্টগোল হয়, না?'

ব্যাপারটা সীতানাথ আগে কখনও চিন্তা করে দেখেননি। সাধারণত পাতাল রেলে করেই তিনি অফিসে যান; খুব বেশি দেরি হয়ে গেলে তবেই হেলিকপ্টার ট্যাক্সি। সুতরাং, অফিস যাওয়ার পথে বিরক্তিকর শব্দ যে বেশ কিছু শুনতে হয় তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য অফিসে পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। তুখোড় হিসাবশাস্ত্রবিদ সীতানাথ সেন এইট্‌থ্ জেনারেশন কম্পিউটার নিয়ে বসে যান কোম্পানির লাভ-ক্ষতির খতিয়ান কষতে। সেখানে সবকিছু শান্ত, চুপচাপ— কোনও গোলমাল নেই।

সুতরাং বারো বছরের ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, গোলমাল-হট্টগোল একটু হয়। টিউব রেলের শব্দ, হেলিকপ্টারের শব্দ, জেট প্লেনের শব্দ...।'

'তুমি তা হলে এক কাজ করবে,' উৎসাহ ভরা চোখে সুমন বলেছে, 'খুব জোরে কোনও শব্দ হলেই কানে হাত চাপা দেবে। বিজ্ঞানীরা বলেন এর চেয়ে ভালো ওষুধ নাকি নেই—' কী ভেবে সুমন আবার বলেছে, 'ঠিক আছে, দাঁড়াও, তোমার জন্যে আমি একটা 'ইয়ার প্রোটেক্টর' বানিয়ে দেব। তাহলে যতই শব্দ হোক, তোমার কানে কিচ্ছু হবে না।'

সীতানাথ আর পারেননি, হেসে উঠেছেন। বলেছেন, 'ঠিক আছে, দিয়ো। এখন যাও, পড়তে বোসো গিয়ে।'

তখন ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব দেননি সীতানাথ। সুমনের ছেলেমানুষি ভেবেছেন। কিন্তু ক্রমে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিতে লাগল। ওর শোওয়ার ঘরটাকে এক অদ্ভুত ঘরে পরিণত করল সুমন। স্টিরিয়ো, স্টিরিয়ো রেডিয়ো, অ্যাম্পলিফায়ার, অসিলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ঘরটাকে ভরিয়ে ফেলল। এ-সবই নাকি শব্দ তৈরির যন্ত্র। বিভিন্ন ধরনের শব্দ নিয়ে এসব যন্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো যায়। মাথায় হেডফোন লাগিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সুমন ওই ঘরে পড়ে থাকতে লাগল।

পড়াশোনা উঠল শিকেয়।

প্রথম-প্রথম ঊর্মিলা অনুযোগ করত, সুমন একটুও লেখাপড়া করছে না। কিন্তু সীতানাথকে নির্বিকার দেখে সে-ও চুপ করে গেছে। তবে ঘটনা কিছুই সীতানাথের নজর এড়ায়নি। তাই একদিন অফিস থেকে ফিরে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড সল্যুশন দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় সুমনকে তিনি ডাকলেন। সুমন এল। সীতানাথ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মা বলছিল, তুমি নাকি একটুও পড়াশোনা করো না?'

'করি তো—' মাথা নীচু করে জবাব দিল সুমন।

'শব্দ নিয়ে আজকাল তুমি এসব কী শুরু করেছ?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইলেন সীতানাথ।

'শব্দ' কথাটা শুনে সুমনের মুখ-চোখ ঝকমক করে উঠল। বলল, 'বাবা, তুমি যে শব্দের বইটা জন্মদিনে কিনে দিয়েছ, ওটা দারুণ চমৎকার। জানো, সব থেকে কম যে শব্দ আমরা কানে শুনতে পাই—মানে জিরো ডেসিবেল—তাতে আমাদের কানের পরদা কতটুকু কাঁপে? এক সেন্টিমিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। দুটো ঘাসের শিষ ডগায়-ডগায় ঠেকালেও ওইরকম শব্দ পাওয়া যায়।'

'আমি তোমার কাছ থেকে এসব শুনতে চাইনি।' গম্ভীর হয়ে বললেন সীতানাথ, 'এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করার বয়েস—তাই করো। তোমার ঘরের ওই সব ছাইপাঁশ আমি সমস্ত ধরে মেটাল ইভাপোরেটর-এ ফেলে দেব!'

'বাবা, এই যে তুমি এখন রেগে যাচ্ছ, তার কারণ কী জানো? সারাদিন ধরে তুমি এত বিরক্তিকর শব্দ শোনো—একশো, একশো কুড়ি ডেসিবেলের শব্দ তো হবেই; আর, সেইজন্যে অল্পতেই সবার ওপরে বিরক্ত হয়ে ওঠো। জানো, একশো পঞ্চাশ ডেসিবেলের শব্দ শুনলে মানুষ কালা পর্যন্ত হয়ে যায়?'

আর সহ্য করতে পারেননি সীতানাথ। সজোরে এক চড় কষিয়ে দিলেন ছেলের গালে। চিৎকার করে উঠলেন একই সঙ্গে, 'অসভ্য, ইতর ছেলে কোথাকার! ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত বলতে শেখোনি? তোমাকে এই শেষবারের মতো—।'

সীতানাথের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঊর্মিলা বেরিয়ে এসেছে পাশের ঘর থেকে।

'কী হল, তুমি আবার হঠাৎ রেগে উঠলে কেন? সুমন, যা শিগগির তোর ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বোস!'

সুমন চলে গেলে নীচু গলায় ঊর্মিলা বলল, 'তুমি অল্পতে এত রাগ কোরো না। সুমন কাল বলছিল, বেশি বাজে শব্দ কানে গেলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়,

হার্ট খারাপ হয়। তোমার তো আবার দুটোরই দোষ আছে।'

সীতানাথ নিশ্চুপ হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর সটান গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অসহ্য। ভাবলেন তিনি।

ঊর্মিলা ঘরে ঢুকতেই চমক ভাঙল সীতানাথের। ভিটামিন 'সি'র চামচ এখনও তাঁর মুখের সামনে ধরা। সুমনটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। নইলে দিনের পর দিন যেভাবে বেয়াড়া হয়ে উঠছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো হাতের বাইরে চলে যাবে। সীতানাথের দুশ্চিন্তা ঘন হয়ে ওঠে।

'সে কী, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? অফিসের যে দেরি হয়ে যাবে।' কথাগুলো বলে সীতানাথকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে ঊর্মিলা। শেষে ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পারল। বলল, 'সুমনের ওপর আজকাল তুমি কথায়-কথায় রাগ করো। এমনকী আমাকেও রেহাই দাও না। তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

স্ত্রীর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন সীতানাথ। সুইচ ঘুরিয়ে টিভি সেট অফ করে দিলেন। অফিসে বেরোবার সময়তেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলেন তিনি।

'সুমন আজকাল আমাদের 'লাকি'কে নিয়ে কীসব পরীক্ষা করছে।' নরম গলায় বলল ঊর্মিলা। প্লেট-চামচ সব গোছাতে শুরু করল অভ্যস্ত হাতে।

লাকি সীতানাথের পোষা অ্যালসেশিয়ান। অত্যন্ত প্রিয়। জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে ভুরু কুঁচকে তাকালেন সীতানাথ। প্রশ্ন করলেন, 'কী পরীক্ষা?'

ঊর্মিলা বিরক্তিভরে বলল, 'ওর ঘরের সব যন্ত্রপাতির একটা সুইচ বসিয়েছে ঘরের বাইরে। ওই লাকিকে ঘরে বন্দি করে বাইরে থেকে ওই সুইচটা টিপে দেয়। তারপর মিনিট পাঁচেক বাদে কুকুরটাকে বের করে আনে। আমি বারণ করতে গেলে শোনে না। বলে, ''এক্সপেরিমেন্ট করছি। শব্দের হাত থেকে এই পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। জানো, মা, প্রতি বছরে বিরক্তিকর শব্দের জোর এখানে এক ডেসিবেল করে বাড়ছে! তাহলে ভাবো তো, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, দু-হাজার একাত্তর সালে, কী অবস্থাটাই না হবে! কেউ আর কানে শুনতে পাবে না!'' ' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে ঊর্মিলা বলল, 'আমি বাবা বিজ্ঞানের অত মারপ্যাঁচ বুঝি না; তবে ক'দিন ধরে দেখছি লাকি তেমন করে খাওয়া-দাওয়া করে না, সবসময়েই বসে-বসে ঝিমোয়।'

সীতানাথ কোনও উত্তর দিলেন না। অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে পা দিতেই বাড়ি-ফাটানো এক বিরক্তিকর শব্দ সীতানাথের কানে আছড়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদে তিনি আজ হেলিকপ্টার ট্যাক্সিতে ফিরেছেন। সুতরাং হেলিকপ্টারের একঘেয়ে গোঁ-গোঁ শব্দের পর এই গোলমাল তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করল। চেঁচিয়ে ঊর্মিলাকে ডাকলেন তিনি। ঊর্মিলা

আসতেই ফেটে পড়লেন সীতানাথ, 'কী হচ্ছে এসব? সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়িতে ফিরেও কি এতটুকু স্বস্তি পাওয়া যাবে না?'

এতক্ষণ রান্নাঘরে আধুনিক রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত ছিল ঊর্মিলা। সে-ও উঁচু গলায় জবাব দিল, 'তা আমি কী করব? তোমার আদরের ছেলে, তুমিই বলো। আমার কথা শুনলে তো হতই!'

এমন সময় হট্টগোল থামল। তার একটু পরেই ঘরে ঢুকল সুমন। পিছন-পিছন লাকি। কুকুরটা কেমন নির্জীবভাবে টলতে-টলতে হাঁটছে—যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে কাত হয়ে।

হঠাৎই প্রচণ্ড চিৎকার করে সীতানাথ বলে উঠলেন, 'লাকিকে নিয়ে কী শুরু করেছ তুমি?'

'এক্সপেরিমেন্ট।' শান্ত স্বরে উত্তর দিল সুমন।

আরও রেগে গেলেন সীতানাথ। বললেন, 'তোমাকে কতদিন বারণ করেছি যে—।'

বাবাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল সুমন, 'তুমি যে সামান্য কারণে রেগে উঠছ, তার কারণ তোমার সারাদিন শোনা গোলমালের শব্দ। এই যে তুমি আমাকে বুঝতে চাও না, আমি তোমাকে বুঝতে পারি না—এরও কারণ ওই একই। আর তুমি যে আজকাল মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া করো, তাও একই কারণে—বিজ্ঞানীরা তাই বলেন।'

যেন ভিসুভিয়াস ফেটে পড়ল ঘরের মধ্যে। ছেলেকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি হাত-পা চালাতে লাগলেন সীতানাথ। সুমনের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে চললেন ওর ঘরে। কিল-চড় মারতে-মারতে বললেন, 'লাকিকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা! চলো, আমিও তোমার ওপর এক্সপেরিমেন্ট করব। মুখে যা আসে তুমি তাই বলবে! এতদূর সাহস!'

সুমনকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিলেন সীতানাথ। তারপর দরজার পাশে বসানো যন্ত্রপাতির সুইচটা 'অন' করে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরে শুরু হল শব্দের তাণ্ডব। সুমনের চিৎকার ও ঊর্মিলার চিৎকারে সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেল সীতানাথের। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সংবিত ফিরতেই দেখলেন, সুইচ 'অফ' করে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে ঊর্মিলা। 'সুমন! সুমন!' বলে ডাকছে। হাজার হলেও মায়ের মন তো!

আচ্ছন্ন পায়ে টলতে-টলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সুমন। দু-চোখে অর্থহীন শূন্য দৃষ্টি। হঠাৎই ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, তারপর হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। আর সামনে দাঁড়ানো সীতানাথ ও ঊর্মিলাকে বারবার করে বলতে লাগল, 'তোমরা কে? আমার মাকে আর বাবাকে একটু ডেকে দেবে?

দাও না ডেকে! ওরা জানে না, গোলমালের শব্দ থেকে পৃথিবীর কী ক্ষতি হতে চলেছে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। যে করে হোক...।' আবার হাসতে শুরু করল সুমন।

ঊর্মিলা ডুকরে কেঁদে উঠল। সীতানাথ অনড়-অচল। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা ফিরে পেলেন তিনি। ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সুমনকে। রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন, 'সুমন! সুমন রে! এ আমি কী করলাম? তোর কথাই ঠিক। শব্দের মধ্যে বিষ লুকিয়ে আছে। এ-বিষ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে, সবাইকে বাঁচাতে হবে।'

সীতানাথ হতবুদ্ধি ছেলেকে আকুলভাবে আদর করছিলেন। যে করেই হোক সুমনকে তিনি সুস্থ করে তুলবেন। হিসাবশাস্ত্রবিদ সীতানাথ সেনের সমস্ত হিসেব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।





ভাঁজ

চরণ প্রসাদের কাছে আমি এগিয়ে গেলাম। ওঁর দু-কাঁধে হাত রেখে আগুন চোখে তাকালাম। এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রসাদের শরীরের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'বলুন, অমিতেশ কোথায়? কোথায় উধাও করলেন ওকে?'

চরণ প্রসাদ এতটুকু বিচলিত হলেন না। স্মিত হেসে আলতো করে আমার হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, 'আপনার বন্ধু অমিতেশ সান্যাল হাইপারস্পেস-এ মিলিয়ে গেছে।'

হাইপারস্পেস! অতি-দেশ! আমি মনে-মনে ভাবলাম। আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতের বাইরে যে-দেশ তারই নাম হাইপারস্পেস। যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না, স্পর্শ করতে পারে না, এমনকী কল্পনাও করতে পারে না—সেই রহস্যময় হাইপারস্পেস।

আমি চরণ প্রসাদের শীর্ণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর ভেদী ধুরন্ধর চোখ দুটো যেন এক চাপা আনন্দে ঝকঝক করছে। আমার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার দিকে এক পলক দেখে নিয়ে প্রসাদ বললেন, 'ডক্টর বোস, এবার আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে? শোনা এক কথা, আর চোখে দেখে বিশ্বাস করা এক কথা।' চাপা হাসি হাসলেন তিনি।

হ্যাঁ, ভুলটা আমরাই করেছি। আমি আর অমিতেশ। আমরা দুজনেই ভারত সরকারের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করি। সাম্প্রতিক গ্রহান্তরে যাত্রার বিষয়ে প্রতিভাবান অমিতেশের বেশ কিছু মৌলিক গবেষণাও রয়েছে। আর ছেলেটা ভীষণ অনুসন্ধানী—বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়ে। ফলে এই অদ্ভুত চেহারার অপবিজ্ঞানী চরণ প্রসাদের হাতে আমাদের এই দুরবস্থা।

খবরটা প্রথম যোগাড় করেছিল অমিতেশ। একদিন ও আমাকে এসে বলল, 'উৎপল, একটা দারুণ খবর পেয়েছি।'

'কী খবর?' আমি সাগ্রহে জানতে চাইলাম।

'চরণ প্রসাদ নামে একজন বিজ্ঞানীর সন্ধান পেয়েছি। লোকটার খুব উঁচু কোনও ডিগ্রি নেই, তবে হাতে-কলমে কাজ করে আর নিজে-নিজে পড়াশোনা করে বেশ কিছু গোপন আবিষ্কার করেছে। সরকার-বিরোধী গবেষণার জন্যে একবার ওর জেলও হয়। তারপর থেকেই লোকটা ভীষণ লুকিয়ে তলে-তলে সব উদ্ভট গবেষণা করে।' একটু থেমে অমিতেশ খুব স্পষ্ট করে বলল, 'উৎপল, সম্প্রতি লোকটা একটা অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করেছে!'

'কী যন্ত্র? পলকে নেপচুন-এ পৌঁছে দেওয়ার যন্ত্র?' খানিকটা ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়েই আমি বললাম।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে অমিতেশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। ওঁর যন্ত্রটা অনেকটা টাইম মেশিনের মতো। তবে কিছুটা জটিল। চরণ প্রসাদ যন্ত্রটার নাম দিয়েছেন স্পেস অ্যান্ড টাইম ফোল্ডিং মেশিন—অর্থাৎ, দেশ ও কালে ভাঁজ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। এই যে সময় ও শূন্য—তাতে এই যন্ত্র দিয়ে যে-কোনও মাপের ভাঁজ সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনেকটা কাগজ দু-ভাঁজ করার মতো...।'

আরও অনেক কথা বলছিল অমিতেশ, তবে আমি সবটা পরিষ্কার বুঝিনি। এইচ. জি. ওয়েলস-এর টাইম মেশিন ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কার্ভেচার অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম—অর্থাৎ, দেশ ও কালের বক্রতা—ইত্যাদি থিয়োরিকে কাজে লাগিয়ে নানান কাণ্ড করে এই অপবিজ্ঞানী চরণ প্রসাদ তাঁর যন্ত্রটি তৈরি করেছেন—অমিতেশের কথায় মোটামুটি এটুকু বুঝতে পেরেছি।

তারপর ওরই পীড়াপীড়িতে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা দুজনে রওনা হয়েছি চরণ প্রসাদের গবেষণাগার লক্ষ্য করে। পথে যেতে-যেতে অমিতেশ বলেছে, 'এই যন্ত্রটা পেলে কত সুবিধে হবে জানো? বিভিন্ন গ্রহে আমরা পৌঁছে যাব চোখের নিমেষে।'

এই কথায় আমার হতবুদ্ধি ভাবটা অমিতেশের নজর এড়ায়নি। ও বলল, 'উৎপল, একটা সাদা কাগজের দু-প্রান্তে তুমি দুটো কালির ফুটকি দাও। ফুটকি দুটোর দূরত্ব ধরো একফুট। এবারে যদি কাগজটা তুমি মাঝামাঝি ভাঁজ করে ফ্যালো,

তা হলে ফুটকি দুটো গায়ে-গায়ে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ, এই ভাঁজের ফলে ওদের মধ্যেকার দূরত্ব একফুট থেকে সোজাসুজি শূন্য হয়ে যাবে।'

আমি ওর কথার তাৎপর্য এবারে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বললাম, 'অমিতেশ, তুমি কাগজ ভাঁজ করার মতো শূন্যকে ভাঁজ করতে চাও? অর্থাৎ, পৃথিবী ও নেপচুন হল কাগজের ওপরে দুটো কালির ফুটকি—ভাঁজ করলেই খুব কাছে এসে পড়বে। ফলে যে-কোনও গ্রহে আমরা নিমেষে পৌঁছে যাব?'

'ঠিক তাই।' অমিতেশ আমাকে সমর্থন জানাল। তারপর সাবধানে পা ফেলে পথ চলতে লাগল।

একটু আগেই ক'পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথে কাদা-জল মাখামাখি। তার ওপর ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ঝিঁঝির ডাক। অমিতেশ টর্চের আলো ফেলে পথ দেখিয়ে চলেছে। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। ঠিক তক্ষুনি অন্ধকার জঙ্গলের বুক চিরে হলদে আলোর রেশ আমাদের চোখে পড়ল।

'চরণ প্রসাদের গবেষণাগার!' চাপা স্বরে উত্তেজিতভাবে বলল অমিতেশ।

গবেষণাগারের দরজায় পৌঁছে সাংকেতিক নিয়মে নক্ করতেই এলোমেলো পোশাক পরা একটি লোক দরজা খুলে দিল। অমিতেশের কথা শুনে বুঝলাম ইনিই চরণ প্রসাদ। আপ্যায়িত হয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল গবেষণাগারে তিনি সম্পূর্ণ একলা মানুষ।

নিয়মমাফিক পরিচয় পর্ব ও আতিথেয়তার পাট শেষ হলে চরণ প্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলুন, যন্ত্রটা দেখবেন চলুন।'

আধো-আঁধারি অলিন্দ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। আমাদের সামনে বিচিত্র ভঙ্গিতে হেলেদুলে হেঁটে চলেছেন শীর্ণকায় অপবিজ্ঞানী চরণ প্রসাদ। আর ওঁর পিছনে আমরা দুজনে। চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছি অমিতেশের আগ্রহ আমার চেয়ে শতগুণ বেশি।

যেতে-যেতে অদ্ভুত খসখসে গলায় চরণ প্রসাদ বলে চললেন, 'এই যন্ত্রের সমস্ত তত্ত্ব এইচ. জি. ওয়েল্স্ ও আইনস্টাইনের কাছ থেকে ধার করা। আমি শুধু যন্ত্রটা তৈরি করেছি মাত্র। ওয়েল্স্সাহেবের টাইম-ট্রাভেলার পৃথিবীর যেখানে-সেখানে, অতীতে বা ভবিষ্যতে, যেতে পারত। আমি ভেবে দেখেছি, একমাত্র সময় ও শূন্যকে ভাঁজ করা ছাড়া এই ভ্রমণ সম্ভব নয়। ধরুন, আপনি ৫০০০ খ্রিস্টাব্দের আমেরিকায় যেতে চান। তা হলে আপনাকে দুটো জিনিস ভাঁজ করতে হবে ঃ এই ১৯৮২ থেকে ৫০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের যে দূরত্ব, সেটাকে; আর, এখান থেকে আকাশপথে আমেরিকার যে দূরত্ব, সেই শূন্যকে ভাঁজ করতে হবে; একমাত্র তখনই আপনার পক্ষে ৫০০০ সালের আমেরিকায় যাওয়া সম্ভব। যদি শুধু সময়

ভাঁজ করেন, তাহলে ৫০০০ সালে পৌঁছোবেন ঠিক, তবে এই ভারতবর্ষেই আপনাকে বসে থাকতে হবে। আর যদি শুধু শূন্যকে ভাঁজ করেন, তাহলে আমেরিকায় অবশ্যই পৌঁছোবেন, কিন্তু সালটা হবে ১৯৮২—পাঁচ হাজার নয়।'

আমার মনে পড়ল অমিতেশের উদাহরণের কথা। কাগজের ওপরে কালির ফুটকি। এখানে সেইরকম দু-জোড়া ফুটকি। একজোড়া ফুটকি সময়ের, আর-একজোড়া দূরত্বের ফুটকি। সে কথা চরণ প্রসাদকে বললাম।

মিথ্যে বলব না, এই অপবিজ্ঞানীটির প্রতি আমার মনে কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম আসল ঘরে। ঘরের আকার বিশাল। ছাদটা প্রায় পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু। আর ঘরের মেঝেটা যেন ফুটবল খেলার মাঠ। গোটা ঘরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং অজস্র উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। অবাক হয়ে ভাবলাম, এই বনে-বাদাড়ে চরণ প্রসাদ বিদ্যুৎ পেলেন কোথা থেকে? চরণ প্রসাদ হয়তো এই প্রশ্নটাই আশা করছিলেন, তাই প্রশ্ন না করতেই উত্তর দিলেন, 'আমার নিজস্ব পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। ওই যে।' উনি আঙুল তুলে ঘরের একপ্রান্তের দিকে দেখালেন। বাইরে থেকে শুধু সীসেয় মোড়া একটা প্রকাণ্ড ঘর চোখে পড়ল। আর শোনা যাচ্ছে গম্ভীর গুঞ্জনের শব্দ।

এতসব দেখে আমি অমিতেশের কানে-কানে বললাম, 'নিশ্চয়ই এর পিছনে শত্রু-রাষ্ট্রের টাকা আছে!'

অমিতেশ কিছু বলল না। শুধু হাসল। তারপর মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ঘরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বসানো কুড়ি ফুট উঁচু যন্ত্রটার দিকে। বুঝলাম, এটাই সেই স্পেস অ্যান্ড টাইম ফোল্ডিং মেশিন!

যন্ত্রটার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ কয়েক হাজার যন্ত্রাংশ অত্যন্ত জটিলভাবে জুড়ে যদি অসংখ্য ইলেকট্রিকের তার যন্ত্রের সর্বাঙ্গে ঘিরে দেওয়া হয়, তা হলে হয়তো চরণ প্রসাদের যন্ত্রের কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। বিচিত্র তার আকৃতি। প্রকৃতি হয়তো আরও বিচিত্র।

চরণ প্রসাদ একটা সুইচ টিপে দিয়ে যন্ত্রটা চালু করলেন। বললেন, 'অ্যাটমিক পাওয়ার।' যন্ত্রের গায়ে হাজার-হাজার রঙিন আলো জ্বলতে-নিবতে লাগল। অমিতেশ নেশাগ্রস্তের মতো যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে গেল। তক্ষুনি চরণ প্রসাদ চিৎকার করে উঠলেন, 'সাবধান, ডক্টর সান্যাল। হাত দেবেন না। যদি ভুল করে সময়ে বা দূরত্বে ভাঁজ পড়ে যায় তাহলে আপনার হাত হাইপারস্পেস-এ মিলিয়ে যাবে!'

অমিতেশ চমকে হাত টেনে নিল। চরণ প্রসাদ এগিয়ে এসে যন্ত্রটার কার্যকলাপ ওকে বুঝিয়ে দিলেন। সবশেষে বললেন, 'ডক্টর সান্যাল, কাগজ ভাঁজ করার উদাহরণটা দিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। ব্যাপারটা বোঝার খুব সুবিধে। তবে তার একটা ছোট্ট তফাত রয়েছে এই যন্ত্রের কাজের সঙ্গে।' একটু থেমে আমার

দিকে এক পলক দেখে নিলেন চরণ প্রসাদ। তারপর বললেন, 'কাগজটা আপনি ভাঁজ করছেন আমাদের খুব চেনা দুনিয়ায়—অর্থাৎ, থ্রি ডাইমেনশন্যাল স্পেস বা ত্রিমাত্রিক শূন্যে। কারণ দ্বিমাত্রিক তলে এই ভাঁজ সম্ভব নয়। তেমনি, আমার এই যন্ত্রও সময় এবং শূন্যকে ভাঁজ করে হাইপার স্পেস বা চতুর্মাত্রিক শূন্যে। কারণ, ভাঁজ করার জন্যে আমাদের অতিরিক্ত একটা জায়গা দরকার হয়—যা থ্রি ডাইমেনশন্যাল স্পেস-এ সম্ভব নয়...।'

অমিতেশ হঠাৎই বলে উঠল, 'আমি আপনার যন্ত্রে চড়ে হাতেনাতে সব পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

ব্যস! চরণ প্রসাদ সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। অমিতেশকে যন্ত্রে বসিয়ে উনি কীসব কলকবজা টিপলেন। কিছু শব্দ হল। কয়েক হাজার আলো জ্বলল, নিবল। তারপর যন্ত্রটা ছেড়ে অমিতেশ একা উধাও হয়ে গেল।

আমার ঠোঁট চিরে একটা আতঙ্কের চিৎকার বেরিয়ে এল। বুঝতে পারছি, অভিব্যক্তিও হয়ে উঠেছে বিকৃত। সেটা লক্ষ করে চরণ প্রসাদ বললেন, 'ভয় পাবেন না, ডক্টর বোস, অমিতেশবাবুকে আমি দশ মিনিট আর একশো ফুট দূরত্বে পাঠিয়েছি। দশ মিনিট পরেই ওঁকে একশো ফুট দূরে ঘরের ওই কোণে দেখতে পাবেন।'

সুতরাং, উৎকণ্ঠায় থমথমে মুখ নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। ক্রমে দশ মিনিট থেকে বিশ মিনিট পার হয়ে গেল, কিন্তু অমিতেশের দেখা নেই। ভয় পেলাম। কী চায় এই অপবিজ্ঞানী? আমাদের ব্ল্যাকমেল করে মহাকাশ গবেষণার কোনও গোপন খবর আদায় করতে চায় না তো? অবশেষে যখন আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তখন আমি চরণ প্রসাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। তার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, বললাম, 'অমিতেশ কোথায়...?'

ধীরে-ধীরে আবার বর্তমানে ফিরে এলাম। হ্যাঁ, চরণ প্রসাদের যন্ত্রের ক্ষমতা আমি চোখে দেখে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু কী করব এখন? আমাদের আজকের এই গোপন অভিযানের কথা কেউই জানে না। অমিতেশ সবকিছু গোপন রেখেছে। এখন যদি আমি একা ফিরে যাই, তা হলে সবার কাছে কী জবাবদিহি করব? ভাবতে-ভাবতে মাথাটা আমার আগুন হয়ে উঠল। সময়ের ভাঁজে বা শূন্যের ভাঁজে এক ফুটকি থেকে আর-এক ফুটকিতে যাওয়ার সময় অমিতেশ কি অতি-শূন্যে হারিয়ে গেছে? কী করে এখন ফেরত পাব ওকে? ও কি দেখতে পাচ্ছে আমাদের? নিশ্চয়ই না।

হঠাৎই ভদ্রতা সভ্যতা ভুলে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম চরণ প্রসাদের ওপর। ওঁকে সহজেই ধরাশায়ী করে টুঁটি টিপে ধরলাম। গর্জন করে উঠলাম, 'চরণ প্রসাদ, যে করে হোক অমিতেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন! নইলে আপনার নিস্তার নেই! আমি আপনাকে শেষ করে দেব!' ওঁর গলার ওপর হাতের

চাপ ক্রমশ বাড়াতে লাগলাম।

চরণ প্রসাদ এবার ভয় পেল। গভীর ভয়। কাঁপা গলায় বলল, 'করছেন কী? ছাড়ুন। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

ওঁকে ছেড়ে দিলাম। হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠে জামা-কাপড় ঝেড়ে নিলেন চরণ প্রসাদ। আপনমনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'মাঝে-মাঝে মেশিনটার যে কী গণ্ডগোল হয়...!'

এবার উনি নিজেই উঠে বসলেন যন্ত্রে। আবার নানারকম কলকবজা টিপলেন। তারপর চেঁচিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ডক্টর বোস, আপনাকে আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া, অমিতেশবাবুকে ফেরত আনতে গেলে মেশিনটাকেও হাইপার স্পেস-এ নিয়ে যেতে হবে। মেশিনটা যে আপনার জিম্মায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে না তাতে আমি বেশ ভরসা পাচ্ছি।' চরণ প্রসাদ হাসলেন।

আমি উত্তরে গম্ভীরভাবে বললাম, 'অমিতেশকে আমি এই মুহূর্তে ফিরে পেতে চাই! এক্ষুনি!'

চরণ প্রসাদ শেষ বোতামটা টিপলেন এবং ওই প্রকাণ্ড মেশিন সমেত উধাও হয়ে গেলেন আমার চোখের সামনে থেকে।

এক মিনিট...দু-মিনিট...ওই তো অমিতেশ! ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে একটা নিওন লাইটের কাছে অমিতেশ আবির্ভূত হয়েছে। আচমকা ওর শরীরের আবির্ভাবের চাপে নিওন লাইটটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আর এক মুহূর্ত শূন্যে ভেসে থেকে পরক্ষণেই মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল অমিতেশ। আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে তুলে ধরলাম। ও ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ, ওর ভ্রমণের খুঁটিনাটি, উধাও হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, কিছুই ও টের পায়নি। ও জিগ্যেস করল, 'চরণ প্রসাদ কোথায়? ওঁর মেশিনটাই বা কোথায়?'

সংক্ষেপে অমিতেশকে সব খুলে বললাম। অবাক হয়ে দেখলাম, অমিতেশকে উদ্ধার করে কোনওরকমে ফেরত পাঠাতে পারলেও চরণ প্রসাদ নিজে এখনও হাইপার স্পেস-এর গোলকধাঁধায় ঘুরছেন। আর কোনও কথা না বলে অমিতেশকে হাত ধরে টান দিলাম। বললাম, 'শিগগির! এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে!' দুজনে ছুটতে শুরু করলাম দরজা লক্ষ করে। গবেষণাগারের বাইরে পা রাখার মুহূর্তে এক প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ আমাদের ছিটকে ফেলে দিল। চারপাশের দেওয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। চারিদিকে অসংখ্য আলোর ঝলসানি। কোনওরকমে উঠে আমরা প্রাণটুকু হাতে করে পৌঁছে গেলাম অন্ধকার জঙ্গলে। অমিতেশের টর্চ কোথায় হারিয়ে গেছে। ফলে জল-কাদা ঠেলে মরিয়া হয়ে ছুটে চললাম। পিছনে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে। রাতের আকাশটা যেন আতসবাজির আলোয় বারবার ধাঁধিয়ে উঠছে। বুঝলাম, চরণ প্রসাদের গবেষণাগার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর ক্লান্ত স্বরে অমিতেশকে প্রশ্ন করলাম, 'এসব বিস্ফোরণ কী করে হল বলো তো?'

ও একটু ভেবে বলল, 'চরণ প্রসাদ আমাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন ঘরের মেঝের বদলে নিওন লাইটের ওপর—দেওয়ালের গায়ে। মানে ভুল জায়গায়। হয়তো মেশিনের কোনও গোলমালের ফলেই দূরত্বের ভাঁজটা ভুল জায়গায় হয়েছিল। আর উনি নিজে যখন মেশিন সমেত হাইপার স্পেস থেকে ফিরে আসেন, তখন হয়তো ভুল করে ওই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে মেশিনসুদ্ধু গিয়ে হাজির হয়েছেন। ফলে এই বিধ্বংসী বিস্ফোরণ...' একটু থেমে অমিতেশ দুঃখের স্বরে বলল, 'একটা দরকারি যন্ত্রও একইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। কবে আবার মানুষ এই যন্ত্র তৈরি করতে পারবে কে জানে!'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।





নীলবর্ণ বিড়াল

রাকেশ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নীলবর্ণ শৃগালের স্বপ্ন দেখছিল। কাল রাতে সদ্য-সদ্য গল্পটা পড়েছে ও। আচমকা নীলের গামলায় পড়ে গিয়ে নীল রঙের চেহারা হয়ে গিয়েছিল বেচারা শেয়ালটির। তারপর যখন সে জঙ্গলে ফিরে গেল তখন সমস্ত পশু-পাখি তাকে জঙ্গলের রাজা বলে মেনে নিল। কারণ, নীল রঙের শেয়াল তো তারা জীবনে কখনও দেখেনি! অতএব সেই অদ্ভুত রঙের প্রাণীটিকেই তারা সকলে মেনে নিয়েছিল বনের রাজা বলে।

রাকেশ দেখছিল, একটা নীল রঙের শেয়াল ওকে এসে ডাকছে, 'রাকেশবাবু, আমি কিন্তু গল্পের শেয়াল নই। সত্যিকারের নীল রঙের শেয়াল।'

রাকেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস করল, 'সত্যি?'

শেয়ালটা বলল, 'সত্যি।'

আর তারপরই রাকেশকে হতভম্ব করে দিয়ে 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডেকে উঠল।

শেয়াল 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডাকছে! রাকেশ চমকে উঠল। আর তক্ষুনি ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙতেই দেখল বিছানায় ওর কোলের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছে একটা নীল রঙের বিড়াল। 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডাকছে। কাচের গুলির মতো নীল চোখজোড়া জুলজুল করে রাকেশেরই দিকে তাকিয়ে। সরু ঝাঁটার কাঠির মতো

নীল রঙের গোঁফ। গায়ের রং গাঢ় নীল। শুধু লেজের ডগায় খানিকটা কালো ছোপ।

রাকেশ ভাবল, ওর স্বপ্নের ঘোর বোধহয় এখনও কাটেনি। ভাবল, চিমটি কেটে একবার দেখি তো! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কিন্তু চিমটি কাটতে গিয়েই আবার অবাক। এ কী! ওর ধবধবে ফরসা গায়ের রং এরকম নীল হয়ে গেল কেমন করে! তারপরই বাকি দুর্ঘটনাগুলো একে-একে রাকেশের চোখে পড়ল।

ঘরের দেওয়াল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল-চেয়ার, ফ্যান, ঘরের মেঝে—সর্বত্র শুধু নীল আর নীল। কোনওটার রং উজ্জ্বল নীল, কোনওটা ঘোলাটে নীল, কোনওটার রং কালচে নীল, আবার কোনওটা স্রেফ কুচকুচে কালো।

বিছানার বেড়ালটা তখনও 'মিঁউ-মিঁউ' করে ডেকে চলেছে।

রাকেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। পাশে মা নেই। অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। এখন নিশ্চয়ই রান্নাঘরে। রাকেশের কান্না পেয়ে গেল। কোনওরকমে চিৎকার করে ও ডেকে উঠল, 'মা, মা!'

মা ছুটে এলেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

মা-কে দেখে রাকেশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল—কালচে নীল গায়ের রং। চোখের তারাটুকু শুধু কালো, বাকি অংশটা উজ্জ্বল নীল। ঝকঝকে দাঁতেরও একই দশা। অবশ্য মাথার চুলগুলো কুচকুচে কালো—যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

বিছানা থেকে নেমে একছুটে গিয়ে মা-কে জাপটে ধরল রাকেশ। শাড়ির ভাঁজে মুখ লুকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'এসব কী কাণ্ড, মা? আমি কি ভুল দেখছি?'

মা ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না রে, তোর চোখের ভুল নয়, আমরা সব্বাই ওই নীল রঙেরই সবকিছু দেখছি। সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি এই দশা। তবে ভয়ের কিছু নেই। একটু আগেই রেডিয়োতে আর টিভিতে বলেছে, সারা পৃথিবী জুড়েই নাকি একইরকম কাণ্ড হয়েছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মায়ের কথায় রাকেশ বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। ও বিছানায় বসা বেড়ালটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওই দ্যাখো—।'

মা হাসলেন, বললেন, 'ওটা তো তোর মিনু। রং পালটানোর ধাক্কায় ওর রঙও ওরকম নীল হয়ে গেছে। নে, এবার হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বোস দেখি—।'

মা-কে রোজকার মতো সহজ স্বাভাবিক দেখে রাকেশের বিস্ময় আর আতঙ্ক ধীরে-ধীরে কাটতে লাগল। মা ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে যেতেই ও টুথব্রাশে খানিকটা টুথপেস্ট লাগিয়ে নিল। টুথব্রাশের রং এমনিতেই নীল ছিল। অতএব ওটার রঙের তেমন রদবদল হয়নি। কিন্তু সাদা টুথপেস্ট একেবারে গাঢ় নীল রঙের হয়ে গেছে।

মুখ ধুতে বেসিনের কাছে গিয়ে রাকেশ যথারীতি আবিষ্কার করল সাদা ওয়াশ বেসিন ঘন নীল। এতক্ষণে ওর ভয়টা কেটে গিয়ে বেশ একটা মজা টগবগ করে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে ও এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল।

মা রান্না ছেড়ে টানা বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে পাশের বাড়ির টুকির মায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। হাসাহাসিও করছিলেন দুজনে।

রাকেশ শুনল, পাশের বাড়ির মাসিমা বলছেন, ‘দিদি, ভাতের আজ যা চেহারা হয়েছে, টুকির বাবা ভাত খেয়ে অফিস গেলে হয়!’

সত্যিই তো, নীল রঙের ভাত কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার! রাকেশ ভাবল।

মা তখন বলছেন, ‘আমারও তো একই অবস্থা, ভাই। ভাত, ডাল, হলুদ, লঙ্কা সব যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছে।’

টুকির মা-কে বেশ চিন্তিত মনে হল। উনি বললেন, ‘রাতারাতি এ কেমন ভোজবাজি হল বলুন তো, দিদি! আমার তো ব্যাপার-স্যাপার সুবিধের ঠেকছে না।’

মা বললেন, ‘একটু আগেই রেডিয়োতে বলেছে, বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। শিগগিরই এর সমাধান করে দিলেন বলে—।’

রাকেশ আর দাঁড়াল না। ছুট-পায়ে চলে এল রাস্তার দিকের ঝুলবারান্দায়।

ওমা! এ কী! আকাশে যে-সূর্যটা উঠেছে সেটার রংও যে ঘন নীল! আকাশের নীল রঙের সঙ্গে ওটা প্রায় মিশে গেছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে নীল রোদ্দুর। যে-ক'টা গাছপালা দেখা গেল সবই কালচে নীল। শুধু কালো রঙের কাকগুলো নীলরঙা টিভি-অ্যানটেনার ওপরে বসে একইরকমভাবে ‘কা-কা’ করে ডাকছে।

রাকেশ মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখতে লাগল।

একটু পরেই মা বারান্দায় এসে হাজির। হাতে একগ্লাস দুধ। ওকে ডেকে বললেন, ‘নে রাকা, চটপট খেয়ে নে দেখি। উনুন জ্বলে যাচ্ছে।’

রাকেশ ব্যাজার মুখে দুধের গ্লাস হাতে নিল। নীল রঙের দুধ! মায়ের দিকে মুখ তুলে আবদারের গলায় বলল, ‘তুমিই বলো না, এরকম দুধ কেউ খেতে পারে?’

মা ব্যস্তভাবে বললেন, 'পারে পারে, খুব পারে। যদি সবকিছুর রং এরকমটাই থেকে যায়, আর আগের মতো ফিরে না আসে, তা হলে অবস্থাটা কী হবে শুনি! নীল রঙের দুধ, ভাত, সবই তো খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, তাই না? মানুষ তো আর না খেয়ে থাকতে পারবে না। নে, তুই চটপট খেয়ে গ্লাসটা বেসিনের কাছে রেখে দিস, আমি যাই—।'

মা ব্যস্ত পায়ে চলে যাচ্ছিলেন, রাকেশ জিগ্যেস করল, 'বাবা এখনও আসেনি?'

মা বললেন, 'উঁহু। প্রায় একঘণ্টা তো হয়ে গেল বাজারে গেছে। মনে হয়, বাজারে আজ হইচই পড়ে গেছে। নে, দুধটা জলদি খেয়ে নে।'

মা হুউশ্ করে চলে গেলেন।

রাকেশ অতি সাবধানে দুধের গ্লাসে একটা চুমুক দিল। মাগো! কীরকম গা গুলোচ্ছে। কিন্তু দুধের স্বাদটা একইরকম আছে। শুধু রং পালটে গেলেই খাওয়ার ইচ্ছেটা পালটে যায় কেন কে জানে! নইলে রাকেশ তো দুধ খেতে ভালোই বাসে।

মিনু কখন যেন বিছানা ছেড়ে নেমে এসে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল আর ডাকছিল 'মিঁউ-মিঁউ' করে। বোধহয় দুধের গন্ধ পেয়েছে। ওকে খানিকটা দুধ দিয়েই দেখা যাক তো, খায় কি না। গ্লাস থেকে কিছুটা দুধ মেঝেতে ঢেলে দিল রাকেশ। ঠিক মিনুর সামনে। কিন্তু দেখল, বেড়ালটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

বাবার কাছেই রাকেশ শুনেছে কুকুর, বেড়াল, গরু, মানুষের মতো বর্ণালির সাত রং দেখতে পায় না। এমনকী লাল কাপড়ের টুকরো দেখিয়ে স্পেনে যে ষাঁড়ের লড়াই হয়, সেখানে ষাঁড় মোটেই লাল কাপড় দেখে খেপে ওঠে না। সে বেচারা কাপড়টাকে দেখে গাঢ় ছাই রঙের। আসলে কাপড়ের টুকরোটার দ্রুত নড়াচড়াতেই সে খেপে উঠে ওটাকে তাড়া করে।

সুতরাং হিসেবমতো মিনুও নিশ্চয়ই দুধটাকে এখন কালো রঙের দেখছে। কারণ, ওর পক্ষে তো আর নীল রং দেখা সম্ভব নয়। হয়তো সেইজন্যেই ও দুধটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

অবশেষে ঘ্রাণশক্তিরই জিত হল। গন্ধে-গন্ধে জিভ বাড়িয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা দুধের স্বাদ নিল মিনু। তারপর 'চক-চক' শব্দে গোটা দুধটাই চেটেপুটে সাফ।

মিনুর দেখাদেখি চোখ বুজে অতিকষ্টে গ্লাসের দুধ শেষ করল রাকেশ। তারপর একটু জল খেয়ে গ্লাস মায়ের কাছে রেখে এসে পড়ার বই নিয়ে বসল।

ইতিহাস বই খুলেই রাকেশ বুঝল, পড়াশোনা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ বইয়ের গাঢ় নীল রঙের পৃষ্ঠায় খুদে-খুদে কালো অক্ষরগুলো ভালো করে দেখতে পাওয়াই মুশকিল।

রাকেশ মনমরা হয়ে প্রত্যেকটা বই আর খাতার পৃষ্ঠা উলটে-উলটে দেখতে লাগল। দূর ছাই, স্কুলে গিয়ে তা হলে আর কী হবে! বই ছেড়ে উঠে বাবার টেবিল থেকে ট্রানজিস্টার রেডিয়োটা নিয়ে এল ও। সুইচ অন্ করে নব ঘুরিয়ে কান পাতল। সঙ্গে-সঙ্গেই শুনতে পেল বিশেষ ঘোষণা ঃ '...সেই কারণেই সবকিছু বিবেচনা করে রঙের অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে দ্রুত গবেষণা করছেন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্যে সরকার অনুরোধ জানিয়েছেন...।'

সুইচ টিপে রেডিয়ো অফ করে দিল রাকেশ। রঙের সামান্য রকমফেরের জন্যে এ কী কাণ্ড হল!

এমনসময় 'ফোঁস' করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। রাকেশকে বললেন, 'রাকা, তোমার ইস্কুল ছুটি।'

রাকেশ দেখল, বাবার পরনে নীল আদ্দির কাপড়ের পাঞ্জাবি, নীল ধুতি। গায়ের রং কালচে-নীল।

পাঞ্জাবি খুলে হ্যাঙারে টাঙিয়ে রাখতে-রাখতে বাবা আবার বললেন, 'বাজারে তো একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড। অদ্ভুত-অদ্ভুত রঙের সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে ঃ নীল ফুলকপি, নীল রজনীগন্ধা, আর মাছের বাজারে কালো-কালো পোনা মাছের টুকরো।'

'কেন, কালো রঙের কেন?' রাকেশ জানতে চাইল।

বাবা হেসে বললেন, 'হবে না! রক্তের রঙই যে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে! এ ছাড়া বাজারে শুনলাম, গাড়ি-ঘোড়া, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি সব নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ থাকবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। এইমাত্র রেডিয়োতে বলেছে।'

'কই, দেখি, রেডিয়োটা দে তো—।'

রাকেশ রেডিয়োটা বাবাকে দিল। তারপর বইপত্র গুছিয়ে রেখে আবার ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

উলটোদিকের বাড়ির ছাদে তিনটে গাঢ় নীল রঙের পায়রা বসেছিল। ও-বাড়ির তপনদা পায়রা পোষে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রাকেশ ভাবছিল ঃ সত্যি,

কী অদ্ভুত ব্যাপার! সূর্যের সাত রঙের ছ-ছ'টা রং উধাও হয়ে যাওয়ার জন্যে কী বিপত্তি! সারা পৃথিবীর জীবনযাত্রা একেবারে অচল। রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। চারদিকে শুধু নীল রং অথবা কালো রং। আর তা নইলে তাদের কমবেশি মিশেল দিয়ে তৈরি কোনও নীলচে রং। এই ধরনের পরিবেশে গাড়ি চালাতে গিয়ে অভ্যেস না থাকায় ড্রাইভাররা হয়তো অ্যাকসিডেন্টই করে বসবে। সেইজন্যেই রেডিয়োতে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।

সিনেমা হলগুলোও বন্ধ থাকবে নিশ্চয়ই। নীল ছাড়া বাকি সব রং উধাও হয়ে গেলে রঙিন ছবির আর বাকি থাকল কী! আবার সাদা-কালো সিনেমাতেও একই বিপদ! সাদা রং বলে কিছু থাকবে না। তার বদলে শুধু নীল আর নীল! ঠিক টিভির মতোই দশা!

যতদিন রংগুলো ছিল ততদিন বোঝা যায়নি সেগুলো কত জরুরি। বোঝা যায়নি, সেগুলো না থাকলে লাগাতার বন্‌ধ শুরু হয়ে যাবে মানুষের জীবনে। এখন দিনগুলো কাটবে কেমন করে সেই নিয়েই রাকেশের চিন্তা।

বিকেলবেলায় বাবার কাছে শুনল, কলকাতার সমস্ত রং কোম্পানি নতুন কোনও ব্যবসা খোলার কথা ভাবছে। নানান দোকানে তাদের যত রং ছিল সব ভোল পালটে নীল অথবা কালো হয়ে গেছে। এদিকে বুড়ো মানুষদের চুলদাড়ি সব নীল হয়ে গিয়ে তাদের ভারি চমৎকার লাগছে। সেই দেখে কালো চুল যাতে তাড়াতাড়ি পেকে গিয়ে নীল হয়ে যায় তার জন্য মানুষ কৃত্রিম উপায়ে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সেলুনে কালো চুল নীল করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

রাকেশ অবাক হয়ে বাবার কথা শুনছিল। এমনসময় রেডিয়োতে বলল, এ-পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হিমালয়ের বরফে ঢাকা চুড়ো আকাশের নীল রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় মোট সাতাশটি এরোপ্লেন এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙঘায় আছড়ে পড়েছে। ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা এই রং বদলের ঘটনায় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

এরকম চমকে দেওয়া আরও কতসব দুর্ঘটনা!

রাকেশের খুব মন খারাপ লাগছিল। ও পায়ে-পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সন্ধে ঘন হয়ে আঁধার নেমে এসেছে। কিন্তু আকাশে চাঁদ-তারা কই? গাঢ় পিচ রং আকাশে ঘোর নীল রঙের চাঁদ। ভালো করে ঠাহর করা যায় না। আর তারা? চোখে প্রায় পড়ে না বললেই চলে। ইস, এরকমভাবেই কাটবে প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত!

রাকেশ ঘরে ফিরে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। টিউব লাইট আর বাল্‌ব। দুটোর অবস্থাই একরকম। বাবা-মা চুপচাপ বসে। মায়ের মুখে সকালের ঠাট্টার

লেশমাত্র নেই এখন। বাবাও যেন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মুখ গম্ভীর। রেডিয়ো সামনে নিয়ে বসে আছেন। রেডিয়ো ছাড়া আর উপায় কী! গল্পের বই পড়া বন্ধ। খবরের কাগজ পড়া বন্ধ। টিভি দেখা বন্ধ। ঘরে বসে-বসে সকলেই বোধহয় এইরকম হাঁফিয়ে উঠেছে।

রেডিয়োতে গানের অনুষ্ঠান শুনছিলেন বাবা। হঠাৎই রাকেশের দিকে ফিরে বললেন, 'রাকা, খেয়াল করছিস, যারা খবর পড়ে শোনাচ্ছে তাদের মাঝে-মধ্যে কীরকম আটকে যাচ্ছে! নীল কাগজে কালো লেখা পড়তে গিয়ে খবর-পড়ুয়ারা একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।'

রাকেশ সামান্য হাসল।

মা বললেন, 'তবু রেডিয়ো ছাড়া আর উপায় কী বলো—।'

রাকেশ জিগ্যেস করল, 'খবরে কিছু বলেছে, বাবা?'

'হ্যাঁ, বলেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, সূর্যের মধ্যে কোনও একটা গোলমালের জন্যেই এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।'

মিনু রাকেশের পায়ে-পায়ে ঘুরছিল। রাকেশ ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর একটা কালো বল নিয়ে ওর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না।

এমনি করেই একসময় রাত দশটা বাজল। কোনওরকমে খাওয়াদাওয়া সেরে রাকেশ মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল। মিনুও শুয়ে পড়ল ওর কোল ঘেঁষে। বাবা পাশের ঘরে যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'রাকা, মন খারাপ করিস না। কাল সকালে উঠেই দেখবি স-ব ঠিক হয়ে গেছে।'

বাবার কথাটা যে এরকম হাতেনাতে ফলে যাবে সেটা রাকেশ কল্পনাও করতে পারেনি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ও অবাক। ধবধবে সাদা মিনু 'মিঁউ-মিঁউ' করছে কালকের মতোই। চোখের ভুল নয়তো! রাকেশ শুয়ে-শুয়েই দেখল চারপাশ। ঘরের দেওয়াল আবার সাদা হয়ে গেছে, ফরসা হয়ে গেছে ওর গায়ের রং, জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে সোনা রঙের ঝকঝকে রোদ। পাশে তাকিয়ে দেখল, মা নেই। আগেই উঠে পড়েছেন।

রাকেশ লাফিয়ে উঠে বসল। মনটা দারুণ খুশি হয়ে উঠল ওর। যাক, সবকিছু আবার তা হলে আগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেছে! কিন্তু হল কেমন করে?

রাকেশ বিছানা ছেড়ে ছুটল রান্নাঘরের দিকে—মায়ের সন্ধানে।

সেখানে পৌঁছে দ্যাখে বাবা হাত-পা নেড়ে মাকে কীসব যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। একহাতে বাজারের দুটো থলে। থলে দুটো উঁচু করে বাবা মাকে বলছেন,

'এই দ্যাখো, ধরো এটা হল সূর্য। সূর্য থেকেই তো সাদা আলো আসছে আমাদের পৃথিবীতে—।'

মা বাধা দিলেন, 'সাদা আলো কোথায়! ও তো হলদে আলো।'

বাবা একটা অদ্ভুত শব্দ করে ধৈর্য হারালেন। তারপর বললেন, 'দুর ছাই! তোমাকে বলে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং রাকাকে বলি!'

রাকেশ খুশি-খুশি মেজাজে বলে উঠল, 'সব রং আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে, বাবা। কিন্তু ওরকম ওলটপালট হয়েছিল কেমন করে? রেডিয়োতে কিছু বলেছে?'

'আরে সেটাই তো তোর মাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। রেডিয়োতে সংক্ষেপে যা বলল, তা হল এই ঃ গত পরশু রাতে—অর্থাৎ, ধরে নে, তিরিশ ঘণ্টা আগে, সূর্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তা এখনও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি। তবে বলেছেন, সেই বিস্ফোরণের ফলে সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিচিত্র এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। সেই বিকিরণ সূর্যের সাদা আলো থেকে ছ-ছ'টা রং একেবারে শুষে নিয়েছিল। তারা শুধু গেট-পাস দিয়েছিল নীল রংটাকে। ফলে সব জিনিসকেই নীল রঙের দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া, ওই বিকিরণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সূর্যের কাছের তিনটে গ্রহে—বুধ, শুক্র আর পৃথিবীতে। সেইজন্যে আমাদের এখানকার কৃত্রিম আলোগুলোও—মানে, টিউব লাইট, বাল্ব সব—নীল রঙের আলো ছড়াচ্ছিল...।'

'কিন্তু কালো রংটা?' ভাতের হাঁড়িতে হাতা নাড়তে-নাড়তে মা প্রশ্ন করলেন।

তার জবাব দিল রাকেশ, 'কালোটা কোনও রং নয়, মা। বরং কোনও রং না থাকলে সেই জিনিসটাকে আমরা কালো দেখি।'

মায়ের মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল রাকেশের ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হয়নি।

সেটা অনুমান করে বাবা বললেন, 'যাই হোক, ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ সূর্যকে ঘিরে-থাকা ওই বিচিত্র বিকিরণ মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। ফলে বর্ণালির বাকি ছ'টা রং আজ সকাল থেকেই আবার ফিরে পাওয়া গেছে। আর পৃথিবীর ওপর থেকেও কেটে গেছে ওই বিকিরণের প্রভাব। সুতরাং রাতের আলোতেও আর কোনও গোলমাল থাকবে না। সিনেমা টিভিও দেখা যাবে আগের মতোই।'

বাবা বাজারের থলে দুটো বগলদাবা করে রাকেশকে লক্ষ্য করে গলা নামিয়ে বললেন, 'রাকা, এবারে রঙের ব্যাপারটা ছোট্ট করে তোর মাকে বুঝিয়ে দিই, কী বলিস?'

রাকেশ মজা পেয়ে ঘাড় কাত করল। মা রান্নায় মগ্ন হলেও এদিকে যে কান পেতে আছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

গলাখাঁকারি দিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, 'শোনো, সূর্যের যে সাদা আলো—মানে, তোমার মতে হলদে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ওটাই সাদা আলো—ওই সাদা আলো ভাঙলে দেখা যাবে ওর ভেতরে সাতটা রং মিশে আছে। আকাশে রামধনু উঠলে বর্ণালির সেই সাতটা রং আমরা আলাদা করে দেখতে পাই। দিনেরবেলা সব জিনিসের ওপরেই সাদা আলো পড়ে, কিন্তু তবুও বিভিন্ন জিনিসকে আমরা বিভিন্ন রঙের দেখি। এরকমটা কেন হয়? ধরো, এই যে তুমি লাল রঙের শাড়ি পরে আছ, এই শাড়িটাকে লাল দেখানোর কারণ এটা বর্ণালির লাল রং ছাড়া আর সব ক'টা রংই শুষে নিয়েছে। শুধু গেট-পাস দিয়েছে লাল রংটাকে। যেমন ওই বিকিরণ নীল রংটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। যে-জিনিস সব রং শুষে নেয় তাকে আমরা কালো দেখি। আর যে-জিনিস বর্ণালির সব ক'টা রংকেই ফিরিয়ে দেয়—মানে, ছেড়ে দেয়—তাকে আমরা দেখি সাদা রঙের। যেমন আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবি, হাঁড়ির ওই ভাত। এবার তো বুঝলে?'

মা হাতা নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'ঢের বুঝেছি। এখন চটপট বাজারটা করে আনো দেখি। কাল তো নীল ভাত খেতেই পারোনি, আজ ভালো করে দুটো সাদা ভাত খেয়ে অফিসে যেয়ো।'

বাবা চলে গেলেন। যেতে-যেতে বললেন, 'কাল খবরের কাগজ পড়তে পারিনি। আজ দেখি কোনও টেলিগ্রাম বেরোল কি না—।'

মা রাকেশকে বললেন, 'কী হল, রাকা, যাও, পড়তে বোসো গিয়ে—।'

রাকেশ পড়ার টেবিলে ফিরে এল। মিনু টেবিলের নীচে চুপটি করে বসে।

জানলা দিয়ে বাইরের রোদ দেখতে রাকেশের খুব ভালো লাগছিল। ও উঠে গিয়ে গরাদে মুখ ঠেকিয়ে চোখ তুলে তাকাল সূর্যের দিকে। আজ সূর্যটাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে! কই, এতদিন তো এরকম মনে হয়নি! বরং সূর্যটা যেন সকলের কাছে বেশ পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। অথচ আজ একেবারে ঝকঝকে নতুন!





সবুজের কান্না

অশোক পত্রনবিশ আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে বলল, 'স্যার, একটা কথা বলার আছে।'

অশোক এমনিতে খুব হাসিখুশি যুবক, তা ছাড়া বুদ্ধিমানও বটে। বেশিরভাগ সময়েই সে নিজের অদ্ভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং তার এখনকার হাবভাব যে একটু বেমানান তাতে সন্দেহ নেই।

'বলো, কী বলতে চাও।' কৌতূহলী চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

'স্যার...একটা গাছকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে। যন্ত্রণায় সেটা চিৎকার করছে, ছটফট করছে। আমার যন্ত্রে সব ধরা পড়েছে।' অশোক পত্রনবীশের কণ্ঠস্বর আবেগে থমথম করছে।

আমি অর্ধেক অবিশ্বাস ও অর্ধেক সংশয় নিয়ে চুপ করে রইলাম। বিপদগ্রস্ত গাছকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে আমাদের সরকারি সংগঠন—'সবুজ সংরক্ষণ সংস্থা'। আমি এই সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর।

সবুজ নিয়ে সংকট প্রথম দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। কলকারখানা, যানবাহন, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ইত্যাদির প্রকোপে সজীব গাছপালা ক্রমশ নির্জীব

হয়ে পড়তে থাকে। তার ওপরে ছিল আমাদের এই সভ্যতার দুরন্ত গতিবিস্তার। ফলে লক্ষ-লক্ষ অক্সিজেনদায়ী গাছ ধরাশায়ী করা হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। যখন মানুষ বুঝতে পারল গাছ তাদের একান্ত বন্ধু, যাকে ছাড়া তাদের সভ্যতা শেষও হয়ে যেতে পারে, তখন তারা উঠে-পড়ে উদ্যোগী হল সবুজ সংরক্ষণে। সরকারের তরফ থেকে জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হতে লাগল, তারা যেন সুযোগ পেলেই 'বৃক্ষরোপণে উৎসাহী' হয়। সে-যুগের একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, একটা গাছ সারা জীবনে মানব সভ্যতার যে-উপকার করে, তার দাম বেশ কয়েক লাখ টাকা। এরকম নানান প্রচেষ্টায় জনসাধারণের কিছু অংশকে সচেতন করা গেলেও বিপদের বড় অংশটা থেকে গেল। মানুষ খুশিমতো গাছ কাটছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফুল ছিঁড়ছে। এর ওপর সমস্যা পরিবেশ দূষণের। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হল 'সবুজ সংরক্ষণ সংস্থা'। শহর ও শহরতলির প্রতিটি এলাকায় এর অফিস রয়েছে। আর সঙ্গে রয়েছে নতুন মহাকাশ-যুগের নতুন-নতুন সব যন্ত্রপাতি। ফলে কেউ সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোনও গাছের ক্ষতি করছে, এ-খবর পেলেই আমরা সরাসরি সেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। নতুন সবুজ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিজের বাগানের গাছেরও কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং আমরা যথাসম্ভব নিজেদের কর্তব্য করে যাচ্ছিলাম। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস—প্রতিদিন অন্তত বারচারেক অতি সূক্ষ্মভাবে মেপে, বা বাতাসের গতিবিধির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আমরা আঁচ করার চেষ্টা করি, সবুজের ক্ষতি করে সরকারি আইন কেউ লঙ্ঘন করছে কি না। এরই মধ্যে এক নতুন অফিসার যোগ দিয়েছে আমাদের সংস্থায়। নাম তার অশোক পত্রনবিশ। সে নাকি গাছপালার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে একাই গবেষণা করে। গাছের কথা শোনার জন্যে, গাছের অভিব্যক্তি ও আচরণ বোঝার জন্য সে নানান পদ্ধতিতে চেষ্টা করছে। কখনও ইলেকট্রনিক পদ্ধতি, কখনও বা টেলিপ্যাথি। এই মুহূর্তে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাইছে, একটা গাছের আর্তনাদ তার যন্ত্রে ধরা পড়েছে। তবু ভালো যে টেলিপ্যাথিতে ধরা পড়েনি, কারণ টেলিপ্যাথি জিনিসটাই আমার মতে ডাহা বুজরুকি—তার ওপর আবার গাছের সঙ্গে!

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমি অশোককে প্রশ্ন করলাম, 'গাছটা কোন জায়গায় আছে বুঝতে পেরেছ?'

আমার প্রশ্নে অশোক উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'উত্তর-পূর্ব দিকে দু-তিন মাইলের মধ্যে, স্যার। আমার টেলিপলিগ্রাফ যন্ত্রে যেটুকু ধরা পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে গাছটা ব্যথা পাচ্ছে, তার কষ্ট হচ্ছে। গ্রাফে সংকেতের কাঁপা-কাঁপা ছবি দেখে যা বুঝেছি, তাতে গতকাল ভোর থেকে কেউ সেটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে—দিনে

প্রায় সাত-আটবার করে।'

এ আবার কেমন লোক যে গাছকে ইচ্ছে করে যন্ত্রণা দেয়, যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পায়! অশোক পত্রনবিশ কি পারবে এই অত্যাচারীকে খুঁজে বের করতে?

একটু চিন্তিতভাবেই বললাম, 'তা তুমি এখন কী করবে ঠিক করেছ?'

অশোক বলল, 'একটা মানিপ্ল্যান্ট আর আমার টেলিপলিগ্রাফ নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ব—।'

'মানিপ্ল্যান্ট! মানিপ্ল্যান্ট দিয়ে কী হবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

অশোক ছোট্ট করে হাসল, বলল, 'স্যার, মানিপ্ল্যান্ট জাতীয় বড়-বড় পাতাওয়ালা কোনও লতানো গাছ আমার টেলিপলিগ্রাফের অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করতে পারে। আহত গাছটার যন্ত্রণা-তরঙ্গ প্রথমে ধরা পড়ে মানিপ্ল্যান্টের ভেতর। তখন ওই লতানে গাছটা নিজেই ছড়িয়ে দেয় এক সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া তরঙ্গ। সেটা আমার টেলিপলিগ্রাফ তার রেকর্ডারের চার্টে এঁকে ফেলে।'

আমি ক্রমশ যে অবাক হচ্ছিলাম সেটা বোধহয় অশোকের চোখে ধরা পড়ল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'অন্য কোনও মানুষের যন্ত্রণার চিৎকার শুনলে আমাদের মনে যেমন সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, এটাও অনেকটা সেই ধরনের, স্যার। ...যাই হোক, যতই আমরা গাড়ি নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোব, টেলিপলিগ্রাফের সিগন্যাল ততই জোরদার হয়ে উঠবে।'

গাছের অনুভূতি আছে। এটা গত শতাব্দীর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করে গেছেন। সেই কারণেই কি অশোক গাছকে অনুভূতিশীল প্রাণী বলে সম্মান করে? গাড়িতে তার সঙ্গী থাকবে মানিপ্ল্যান্ট। সেইজন্যই কি সে বলল, '...যতই আমরা গাড়ি নিয়ে এগোব...।'

টেবিলে বারকয়েক টোকা মেরে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাও। কাল তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলব।'

অশোক সামান্য হতাশ হয়ে চলে গেল। আমি বসে-বসে ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়। পত্রনবিশের কাজে আমি খুব একটা বাধা দিই না, কারণ ছেলেটির প্রতিভা আছে। কিন্তু এইমাত্র যা শুনলাম সেটা যে বিশ্বাস করা শক্ত। সে সরাসরি কারও দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলবে, 'নমস্কার, আপনি কি কোনও গাছের ওপর অত্যাচার করছেন?' এটা ভাবতেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে। কারণ, অপরাধ প্রমাণ করতে না পারলে সেই লোক আমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারে।

ভাবনাচিন্তায় কতক্ষণ সময় কেটেছে জানি না, হঠাৎই ভিডিয়োফোনে স্থানীয়

নিরাপত্তা বিভাগের ক্যাপ্টেনের ছবি ফুটে উঠল। তিনি জানালেন, এক ভদ্রমহিলা সিকিওরিটি বিভাগে এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছেন। তাঁর প্রতিবেশীর বাগান থেকে নাকি গাছের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। গাছটা যন্ত্রণায় কাঁদছে, প্রাণপণ আর্তনাদ করছে। মহিলার পক্ষে ঘরে বাস করাই দায় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, চিৎকারটা দেবদারু গাছের কান্না। স্বভাবতই নিরাপত্তা বিভাগ তদন্তে রাজি হয়নি। তারা এই কেস তুলে দিচ্ছে সবুজ সংরক্ষণ সংস্থার হাতে—অর্থাৎ, আমাদের হাতে।

খবরটা পেয়ে মনে-মনে হাসিই পেল আমার। এই মামলাটা হাতে পেলে অশোক নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। একটু আগে সে তো এই ধরনেরই একটা অভিযোগ এনেছিল আমার কাছে। মনে হল, ওই ভদ্রমহিলার মেজাজের সঙ্গে অশোক পত্রনবিশের মেজাজ বেশ খাপ খাবে। সুতরাং তক্ষুনি তাকে ডেকে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। সে মোবাইল ইউনিট নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

অফিস বন্ধ হওয়ার সময়, সন্ধে সাতটা নাগাদ, অশোক পত্রনবিশ ফিরে এল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার মুখ লালচে দেখাচ্ছে। টেলিপলিগ্রাফের সাদা চার্টটা সে আমার চোখের সামনে মেলে ধরল। তাতে শুধু একটা আঁকাবাঁকা রেখা, মাঝে-মাঝে ওপরে নীচে লম্বা-লম্বা খোঁচা রয়েছে। গাছের যন্ত্রণার তরঙ্গ।

চার্টটা দেখিয়েই পত্রনবিশ একেবারে ফেটে পড়ল, 'স্যার, লোকটার নাম হরিচরণ চক্রবর্তী। একটা আস্ত দাগি শয়তান! দেখেছেন চার্টটা, গাছটাকে নিয়ে কী অত্যাচার সে করছে! যে করে হোক লোকটাকে জেলে পুরতেই হবে!'

আমি একটু ক্লান্তভাবেই বলতে গেলাম যে, এখন থাক, আগামীকাল বিস্তারিত কথা হবে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা বা অভিব্যক্তিকে একটুও আমল না দিয়ে অশোক এক নিশ্বাসে বলে চলল, 'এখন মনে পড়ছে, এই লোকটা কয়েক সপ্তাহ আগে আমার ল্যাবরেটরি দেখতে এসেছিল। তখন আমাকে পনেরো মিনিট ধরে নানান প্রশ্ন করেছিল। বিশেষ করে জানতে চেয়েছিল, কী করে গাছের প্রতিক্রিয়ার সাইকো-সিগন্যাল মাপা যায়। এখন সেইসব তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সে নিজের বিকৃত উল্লাস মেটাচ্ছে। আর বেচারা দেবদারু গাছটার কী করুণ অবস্থা!'

দেবদারু গাছের করুণ অবস্থা! বেশ বুঝতে পারছি গাছের সঙ্গে অশোকের একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে।

হাতের চার্টটা আবার তুলে ধরল অশোক। বলল, 'এই রেকর্ডিং চার্টটা আমি তৈরি করেছি ওই ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে। এই যে লম্বা-লম্বা খোঁচাগুলো দেখছেন, এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে হরিচরণ কখন-কখন গাছটার ওপরে অত্যাচার করেছে। ঘণ্টাদুয়েক আমি সেখানে ছিলাম। তার মধ্যে সে একবার গাছের ছাল তুলেছে ছুরি দিয়ে। গাছের পাতা অ্যাসিডে ডুবিয়ে পুড়িয়েছে। আর সবশেষে—

এই যে, সবচেয়ে লম্বা যে-খোঁচাটা, এটা রেকর্ড করেছি যখন হরিচরণ গরম লোহার শিক চেপে ধরেছে গাছের গুঁড়িতে। লোকটা নির্ঘাত এক ভয়ঙ্কর পাগল!'

নানান তথ্যে দিশেহারা হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু অশোক, ভদ্রমহিলা তো রিপোর্ট করেছিলেন যে, তিনি গাছের কান্না শুনেছেন!'

'এসব ওই শয়তান হরিচরণের কীর্তি।' অশোক ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'গাছের পাতার সঙ্গে ইলেকট্রনিক পিক-আপ লাগিয়ে আমি যেমন টেলিপলিগ্রাফ যন্ত্রে সিগন্যাল রেকর্ড করি, সেও অনেকটা তাই করেছে। শুধু টেলিপলিগ্রাফের বদলে একটা অ্যাম্পলিফায়ার আর স্পিকার লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর হরেক কারিকুরি করে এমন করেছে যাতে আহত হলেও গাছের অনুভূতি মানুষের কান্নার মতো শব্দের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।'

'কিন্তু কী করে হরিচরণকে শায়েস্তা করা যায়? যদি আমরা তার বাড়িতে হানা দিই তা হলে সে তো সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে ফেলবে—।'

আমার কথায় অশোক কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'আমি একটা পথ ভেবেছি, স্যার। আজ রাতটা অফিসের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে পারলে ভালো হয়। কাল সকালে হরিচরণ চক্রবর্তীর ব্যবস্থা করছি।'

আমি হেসে বললাম, 'স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো। আমার কোনও আপত্তি নেই। আশা করি, তুমি হরিচরণকে এমন শায়েস্তা করবে যাতে সারাজীবন সে গাছের গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত ভয় পায়।'

এ-কথা বলে আমি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন বিকেলে অশোক পত্রনবিশ আমার কাছে এল। চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে। খুশি আমিও। কারণ, একটু আগেই নিরাপত্তা বিভাগ থেকে খবর পেয়েছি। সুতরাং অশোক কিছু বলে ওঠার আগে আমিই তাকে সুখবরটা শোনালাম। বললাম, 'অশোক, এইমাত্র খবর পেলাম আমাদের হরিচরণ চক্রবর্তী সটান নিরাপত্তা বিভাগে গিয়ে হাজির হয়েছে। কাঁদতে-কাঁদতে তাদের জানিয়েছে সে গাছের ভয়ে পালাচ্ছে। একটা দেবদারু গাছ নাকি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তাকে তাড়া করেছে। সে নিরাপত্তা বিভাগে আশ্রয় চায়। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড কী জানো! হরিচরণ বলেছে, গাছটা তাকে মানুষের ভাষায় কথা বলে শাসিয়েছে। এখন তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্যে হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। ওঃ, আমাদের ঝামেলা তা হলে মিটল।'

আমি থামতেই অশোক হেসে বলল, 'স্যার, আমার পরীক্ষা বেশ ভালোই কাজ দিয়েছে। আসলে, ঠিক যে-কম্পাঙ্কে হরিচরণ গাছের কান্না শুনছিল সেই কম্পাঙ্কটা আমি পরীক্ষা করে বের করি। তারপর একটা ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ওই দেবদারু গাছের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। আজ সকালে হরিচরণ যেই

একরাশ উইপোকা গাছটার গুঁড়ির ওপর ছেড়ে দিয়েছে, অমনই আমি ট্রান্সমিটারে কথা বলি। গাছের চিৎকারের স্বরের সঙ্গে মিল রেখে ওকে ভয় দেখাই। বলেছি, মাথায় ভেঙে পড়ে ওকে শেষ করে দেব। গাছের রস থেকে তার ক্যান্সার হতে পারে। তা ছাড়া, প্রতি মুহূর্তে আমি ওকে তাড়া করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। প্রথমত, দেবদারু গাছের কাছ থেকে মানুষের ভাষায় কথা শুনেই হরিচরণ দারুণ ভয় পেয়ে যায়। তার ওপর যখন ওইসব ভয় দেখিয়েছি তখন আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সোজা গিয়ে সারেন্ডার করেছে।'

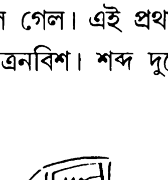
অশোকের কথা শেষ হতে আমি বললাম, 'হরিচরণ চক্রবর্তী লোকটা শয়তান হলেও তার প্রতিভা ছিল। আচ্ছা, অশোক, সত্যিই কি কোনও গাছ মানুষের ওপরে প্রতিশোধ নিতে পারে?'

অশোক উত্তর দিল, 'না, স্যার। আমাদের ব্রেনের মতো গাছের কোনও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল সিস্টেম নেই। ওদের একটা কোষ থেকে আর একটা কোষে খবর আদানপ্রদান হয় ঠিকই, কিন্তু ওরা চিন্তা করতে পারে না, বা ডালপালা ইচ্ছেমতো নাড়াতে পারে না।'

অশোক পত্রনবিশের বুদ্ধি ও প্রতিভা আমাকে সবসময়েই অবাক করে, এখনও করল। কিন্তু একটা প্রশ্ন বরাবর আমার মনে খোঁচা দিয়ে চলেছে যার উত্তর আমি এখনও পাইনি। সুতরাং সুযোগ পেয়ে সেই প্রশ্নটা করলাম অশোককে, 'অশোক, একটা কথার জবাব দাও তো। নিরাপত্তা বিভাগের খবর আসার আগেই তুমি কেমন করে ওই দেবদারু গাছের কান্নার খবর পেলে?'

অশোক নরম সুরে বলল, 'স্যার, আগেই তো বলেছি, গাছেরা পরস্পরের মধ্যে অনুভূতি আদানপ্রদান করতে পারে। তবে আহত গাছের খুব কাছাকাছি যেসব গাছ থাকে তারাই সহানুভূতিবশত প্রতিক্রিয়া দেখায় বেশি। বড়-বড় পাতাওয়ালা লতানে গাছ এসব ক্ষেত্রে খুব ভালো অ্যান্টেনার কাজ করতে পারে। আপনি তো জানেন, স্যার, আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট বাগান আছে। সেখানে লতানে লাউ গাছের পাতাই আমাকে দেবদারু গাছের বিপদের কথা প্রথম জানিয়ে দেয়।'

অশোক বিদায় নিয়ে চলে গেল। এই প্রথম আমি ওর নামটা ভালো করে খতিয়ে দেখলাম ঃ অশোক পত্রনবিশ। শব্দ দুটো যেন গাছের সঙ্গে তার ঘন আত্মীয়তার ইঙ্গিত দেয়।





সংঘর্ষ যদি হয়

'কার জন্যে এসব লিখে যাচ্ছি জানি না। জানি না, আমার হাতে আর কত দিন, কত ঘণ্টা, কতটুকু সময় আছে। কে জানে কবে শেষদিন! এই শহরের অলিগলিতে, আনাচেকানাচে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে । তাকে দেখতে হুবহু আমারই মতো। তবে মিল শুধু বাইরের চেহারাতেই। ভেতরের চেহারাটা আমার ঠিক উলটো। সেই লোকটার নামও জানি আমি। শরেন। আমার নাম ''নরেশ''-কে উলটে নিয়ে এই নাম রেখেছে প্রভাস। শরেনকে নিয়ে ওর অহঙ্কার কম নয়! ও বলে, শরেনের কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী নাকি চমকে যাবে...।'

হাতের লেখাটা চিনে ফেলতে শোন্তার কোনও অসুবিধে হল না। বাবার লেখা। কিন্তু এইসব অদ্ভুত কথা বাবা লিখেছেন কেন? বইয়ের তাকে বাবার কয়েকটা দরকারি বইয়ের ফাঁকে গুঁজে রাখা ছিল কাগজগুলো। অবন ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' বইটা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎই কাগজগুলো বেরিয়ে পড়েছে। কাল রাতে শোওয়ার সময়ে বইটা পড়ছিল শোন্তা। পড়তে-পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে! ব্যস, তারপর আজ সকালে ঘুম ভেঙেই দেখে বই উধাও। মা বইটাকে যথারীতি লুকিয়ে ফেলেছেন। মায়ের ধারণা, একটু-আধটু গল্পের বই পড়লে নাকি পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। সবসময় খালি বলেন,

'এই গল্পের বই পড়ে-পড়েই ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে—।' ক্লাস টেস্টে কুড়িতে পনেরো পেলেও মা বলেন, রেজাল্ট খারাপ। তারপর কেমন একটা সুর করে বলেন, 'দ্যাখো তো, অর্পিতা কেমন কুড়িতে আঠেরো পেয়েছে।'

অর্পিতা তিনটে সেকশান মিলিয়ে ফার্স্ট হয়। কিন্তু মা তো আর জানেন না, অর্পিতাও গল্পের বই পড়ে। 'বুড়ো আংলা' বইটা ওর কাছ থেকেই শোন্তা নিয়ে এসেছে।

সেই বইটা খুঁজতে গিয়েই কাগজগুলো দেখতে পেয়েছে শোন্তা। তারপর বিছানায় বসে পড়তে শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার। ওর স্কুল ছুটি। কিন্তু বাবা অফিসে গেছেন। আর মা রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। দেওয়ালে টাঙানো কোয়ার্টজ ঘড়ির দিকে তাকাল ও। প্রায় পৌনে বারোটা বাজে। শোন্তা জানে, রান্না শেষ করে মা স্নান করতে ঢুকবেন। তারপর স্নান করে বেরোতে-বেরোতে সাড়ে বারোটা। ততক্ষণ ও একা। ওর সঙ্গী বলতে সামনের ঝুলবারান্দার এক চিলতে মেঘলা রোদ, আর বারান্দার রেলিঙে ছড়ানো কয়েকটা জামাকাপড়। নিস্তব্ধ দুপুরে একটা কাক কোথাও ক্লান্তভাবে ডাকছে। যেন বলতে চাইছে, আমার আর কেউ নেই।

বাবাকেও ক'দিন ধরে ওর কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়েছে। আর কেমন যেন হয়ে গেছেন ধীরে-ধীরে। সবে ক্লাস সেভেনে উঠলে কী হবে, শোন্তা বুঝতে পারে অনেক কিছু। বরং ও যে বুঝতে পারে, সেটা বাবা-মা-ই বুঝতে পারেন না সবসময়।

যেমন, গত কয়েক মাসে বাবাকে বেশ পালটে যেতে দেখেছে শোন্তা। এমনিতে বাবার মেজাজ ছিল বেশ খিটখিটে, সবসময় দুশ্চিন্তা করতেন, অফিসের কাজের চাপে কাহিল হয়ে পড়তেন, বাড়িতেও কথাবার্তা কম বলতেন, কেমন একটা রাশভারী মুখ করে বসে থাকতেন। ফলে মায়ের মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। আর শোন্তারও ভীষণ খারাপ লাগত। মনে হত, বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যায়। অর্পিতার বাবা-মাকে ও স্কুলে পেরেন্টস ডে-তে দেখেছে। ওঁরা সবসময় কেমন হাসছিলেন। ওদের দেখে অর্পিতাকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয়েছিল। অথচ বেশি নম্বর পাওয়া নিয়ে শোন্তা কখনও অর্পিতাকে হিংসে করেনি।

হঠাৎই একদিন বাবা বদলে গেলেন। কোথায় গেল সেই দুশ্চিন্তামাখা রাশভারী মানুষটা! খিটখিটে মেজাজটাও কোথায় উধাও হয়ে গেল। আর ক্লান্তি? ক্লান্তি শব্দটাই যেন কেউ মুছে দিল বাবার জীবনের ডিকশনারি থেকে। সারাটা দিন বাবা তাজা শক্তি আর স্ফূর্তিতে টগবগ করতে লাগলেন। যেন টাইম মেশিনে চাপিয়ে কেউ ঝট করে অন্তত পনেরোটা বছর কমিয়ে দিয়েছে

বাবার জীবন থেকে।

তারপর থেকে তিনটে মাস কী যে আনন্দে কেটেছে!

অফিস থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়েই বাবা শোন্তার সঙ্গে খেলতে বসে যেতেন। প্রথম দিন শোন্তা তো ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ও ভুল দেখছে না তো! যে-বাবা খেলার কথা বললেই সবসময় বলেন, 'এখন যাও তো, শুধু-শুধু বিরক্ত কোরো না—', সেই বাবা ওকে হাসিমুখে আদর করে ডেকে নিয়ে বলছেন, 'কীরে, খেলবি নাকি—আয়। তোর ওই মুরগি-খেলনাটা নিয়ে আয় তো—যেটা বোতাম টিপলেই কঁক-কঁক করে ডিম পাড়ে।'

অবাক ভাবটা কেটে যেতেই শোন্তা মুরগি-খেলনাটা বের করে নিয়ে সোজা বাবার কাছে গিয়ে হাজির। মা রান্নাঘরে চায়ের জোগাড় করছিলেন। শোন্তা লক্ষ করেছে, মায়ের চোখেমুখে আনন্দ, অবাক হয়ে বাবাকে দেখছেন।

সেইদিন থেকেই অবাক হওয়ার শুরু। খেলা, হই-হুল্লোড়, গাড়ি চালিয়ে বেড়াতে যাওয়া, আর দরকার মতো বই নিয়ে শোন্তাকে ক্লাসের পড়া বুঝিয়ে দেওয়া— কী না করেছেন বাবা!

দেখতে-দেখতে কেটে গেছে তিনটে মাস। কিন্তু তারপর...শোন্তার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন ও বারান্দায় বসানো টবের ফুলগাছগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিল, বাবা হঠাৎই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে দুশ্চিন্তা, ভয়। আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছেন। শোন্তা 'বাবা' বলে ডাকতেই একটা অচেনা মানুষ ওর দিকে তাকিয়েছিল।

'দ্যাখো, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে এই গাছটায়!' শোন্তা বাবার মন ভালো করার চেষ্টা করছিল।

'ফুল...' চিন্তার ঘোর কাটিয়ে অস্পষ্টভাবে কী যেন বললেন বাবা। তারপর কথার শেষটুকু আবার শোনা গেল, 'যদি একটা ফুল জানত অনেকদিন সে ফুটে থাকবে...অথচ একদিন পরেই তাকে টুপ করে ঝরে পড়তে হত, তা হলে ফুলটার খুব কষ্ট হত...না রে?'

শোন্তা কী বলবে বুঝতে পারছিল না! আর ঠিক তখনই মা চায়ের কাপ নিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়।

সেইদিন থেকে ধীরে-ধীরে পালটাতে শুরু করেছিলেন বাবা।

শোন্তা লেখাটা আবার পড়তে শুরু করল।

'...ও বলে, শরেনের কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী নাকি চমকে যাবে। বলা যায় না, হয়তো নোবেল প্রাইজ-টাইজও জুটে যেতে পারে ওর কপালে।

'মাস চারেক আগে প্রভাসের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল অফিসপাড়ায়, পার্ক স্ট্রিটে। অফিসের লাঞ্চের সময় বাইরে বেরিয়ে একটা পানের

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাতে সিগারেট ছিল। কিন্তু সিগারেটের কথাটা আমার বোধহয় খেয়াল ছিল না। কীসব উলটো-পালটা ভাবছিলাম। মাথার ভেতরে ভীষণ টেনশান ছিল। হঠাৎ আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে উঠে সিগারেটটা ফেলে দিলাম, আর তখনই কে যেন আমাকে চেনা গলায় নাম ধরে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, প্রভাস। সেই কোনকালে আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। কসবায় থাকত, বেশ ডানপিটে আর বেপরোয়া ছিল। খেলাধুলো, আড্ডা, সিনেমা—কোনওটাই বাদ দিত না। কিন্তু কী করে যে ভালো রেজাল্ট করত কে জানে। সেই প্রভাস, বাইশ বছর পর, আমার সামনে।

'চিনতে পারামাত্রই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম আমি। কোথায় হারিয়ে গেল একটু আগের টেনশান আর ক্লান্তি। তারপর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই শুরু হয়ে গেল আমাদের গল্প। কত পুরোনো কথা, কত ভুলে যাওয়া ঘটনা, কত হারিয়ে যাওয়া সুখের স্মৃতি। কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম আমি। প্রভাস আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ধরে রীতিমতো টানাটানি শুরু করে দিল। ও এমন যে, ওকে কখনও ''না'' বলা যায় না। অগত্যা অফিস থেকে ছুটি করিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। অফিসের পার্কিং স্পেসে আমার পুরোনো আমলের ফিয়াট গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল। ওটা আমি নিজেই চালাই। মাঝে-মাঝে নমিতা আর শোন্তাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়ায় বা আউটরাম ঘাটে বেড়াতে যাই। সেটা প্রভাসকে বলতেই ও ওর ড্রাইভারকে বলে দিল ওর মারুতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্যে। আমি একটু হেসে ওকে বললাম, ''আমার ছ্যাকরাগাড়ি চড়তে তোর কষ্ট হবে না তো?'' উত্তরে ও যেটা বলল সেটা আর লেখা যাবে না।

'সল্ট লেকে প্রভাসের বাড়ি দেখে যেমন তাজ্জব হয়ে গেলাম, তেমনই অবাক হয়ে গেলাম ওর ল্যাবরেটরি দেখে। বড়লোক ওরা বরাবরই, তবে প্রভাস যে-মাপের ল্যাবরেটরি করেছে তার জন্যে লক্ষ-লক্ষ টাকা দরকার। আমাকে ল্যাব দেখাতে-দেখাতে নানা কথা বলছিল প্রভাস। ও সাতটা কোম্পানির টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার। গবেষণার জন্যে সরকারি টাকাও পায়, আর সংসার করেনি গবেষণা করবে বলে। কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝেই দরাজ গলায় হেসে উঠছিল ও। একটা সুখী মানুষের প্রাণখোলা হাসি। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওর তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

'রাতের খাওয়াদাওয়া প্রভাসের বাড়িতেই করতে হল। তখন আমি নিজের কথা বলছিলাম। শোন্তার কথা, নমিতার কথাও বলেছি। শেষে বলেছি আমার দুশ্চিন্তা, টেনশান আর ক্লান্তির কথা। আমি জানি, অফিসে আড়ালে অনেকেই আমাকে বদমেজাজি, খিটখিটে বলে। না, কথাগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু

আমি তো সাধ করে ওরকম হইনি। আমার মাথার ভেতরটা সবসময় যেন কেমন করে।

'পরে বুঝেছি, প্রভাসকে ওই কথাগুলো বলেই আমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছি। প্রভাস সিগারেট ধরিয়েছিল। ফুরফুর করে ধোঁয়া ছেড়ে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, ''নরেশ, তোর এই প্রবলেম আমি এক্ষুনি সল্‌ভ করে দিতে পারি—।'

'আমি অবাক হয়ে বলেছি, ''সত্যি!''

'তখন প্রভাস আমাকে বলতে শুরু করল।

''যখন আমাদের দুশ্চিন্তা, টেনশান, বদমেজাজ এসব হয়, তখন আমাদের শরীরের ভেতরে কারেন্ট বইতে থাকে। আসলে বায়োকারেন্ট থাকে সবসময়েই, কিন্তু সেটা এত কম যে, হিসেবের মধ্যেই আসে না। দুশ্চিন্তা, টেনশান এসব হলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, হার্ট বিট বেড়ে যায়, পাল্‌স রেটও যায় বেড়ে। এসবের মূলে হচ্ছে অটোনোমিক নার্ভস আর অটোনোমিক অরগ্যানিক স্টেট। তো এই অবস্থায় এক অদ্ভুত ধরনের বায়োরেডিয়েশান লক্ষ করেছি আমি। সেই রেডিয়েশান আর বায়োকারেন্ট—এই দুটোকে ব্যবহার করে তোর সব প্রবলেম সল্‌ভ করে দেওয়া যায়।''

'প্রভাস ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়েছিল। পরে আরও বহু ডিগ্রি কুড়িয়ে খ্যাতি পেয়েছে। ওর কাছেই শুনেছি, গত পাঁচ-সাত বছর ধরে ওর গবেষণা বায়ো-পার্টিকল্‌স-এর স্ট্রাকচার, ফিল্ড আর রেডিয়েশান নিয়ে। ও আমাকে আরও কীসব বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। বোঝার কথাও নয়। কোনওরকমে পাস কোর্সে বিএসসি পাশ করার পর আমি কস্ট অ্যাকাউনট্যান্সি পড়েছি। এখন বলতে গেলে শুধু জমা-খরচের হিসেব নিয়েই নাড়াচাড়া করি। সুতরাং প্রভাস খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে অনেক কিছু বললেও তার বেশিরভাগটাই বেনা বনে মুক্তো ছড়ানো হচ্ছিল।

'প্রভাস তখন বলছে, ''শোন, তোর একটা অ্যান্টি-বায়ো-মডেল তৈরি করে দেব আমি। তার মধ্যে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা থাকবে। অ্যান্টি-বায়োকারেন্ট, অ্যান্টি-বায়োরেডিয়েশান—এইসব। ফলে যখনই তোর কোনও টেনশান বা দুশ্চিন্তা হবে, তখন ওই অ্যান্টি-বায়ো-মডেল তোর সমস্ত রিঅ্যাকশন শান্ত করে দেবে। এক মুহূর্তের জন্যেও তুই অশান্ত হবি না, তোর মেজাজ খারাপ হবে না কখনও। আর বালিশে মাথা ঠেকলেই গভীর ঘুম। তুই বোধহয় আর কখনও স্বপ্নও দেখবি না।''

'প্রভাস এমনভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাত নেড়ে সব বোঝাচ্ছিল যেন ব্যাপারটা জলের মতোই সহজ। আমি শুনতে-শুনতে একেবারে বিভোর

হয়ে গিয়েছিলাম। বুকের ভেতর থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে যাচ্ছিল ক্রমশ। আর ঠিক তখনই প্রভাস বলল, ''নরেশ, বুঝতেই পারছিস, এতসব সুবিধে তো একেবারে বিনি পয়সায় পাওয়া যায় না...।''

'টাকার কথা বলতে চাইছে নাকি প্রভাস? টাকা যে আমার একেবারে নেই তা নয়, তবে যদি ও খুব বেশি কিছু চেয়ে বসে...। সুতরাং ওকে সরাসরি জিগ্যেস করলাম, ''ঠিক করে বল তো, কত টাকা লাগবে?''

'প্রভাস হেসে বলল, ''দূর, টাকার কথা কে বলছে! আমি বলতে চাইছি...মানে...তুই এতসব সুবিধে পাবি ঠিকই, তবে তার জন্যে তোকে ছোট্ট একটু ঝামেলাও ঘাড়ে নিতে হবে।''

'আমার গলাটা হঠাৎ কেমন শুকিয়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, ''কী ঝামেলা?''

''বলছি—'' বলে প্রভাস হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নতুন আর একটা ধরাল। বলল, ''মানে...তোকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। নইলে বিপদ হতে পারে।''

'বিপদ! প্রভাস বলে কী!'

ঠিক এমনসময় মায়ের হাতের চুড়ির শব্দ শুনতে পেল শোন্তা। মায়ের স্নান শেষ। মা গুনগুন করে গান করছেন। পায়ে-পায়ে এদিকেই আসছেন বোধহয়। একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। কাগজগুলো আবার আগের মতো ভাঁজ করে রেখে দিল বাবার দরকারি বইয়ের ফাঁকে। তারপর ভূগোল বইটা খুলে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে।

মা ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জিগ্যেস করলেন 'কীরে, কী পড়ছিস?'

'ভূগোল—'শোন্তা বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই জবাব দিল। ওর মাথায় তখন বিপদের কথা ঘুরছিল। কীসের বিপদ হতে পারে বাবার?

প্রায় তিনটে দিন ছটফট করে কেটেছে শোন্তার। ও কিছুতেই বাবার লেখা কাগজগুলো আর পড়তে পারেনি। বাবাকে কিছু বলতেও পারেনি। শুধু চুপচাপ মানুষটাকে লক্ষ করেছে।

অবশেষে সুযোগ এল রবিবার বিকেলে। বাবা বললেন, আজ বেড়াতে বেরোবেন না। গাড়িটা কোনও মিস্ত্রিভাইয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে ভেতরটা প্লাস্টিক দিয়ে নাকি মুড়ে নেবেন। মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এ আবার কী খেয়াল?'

বাবা অস্পষ্টভাবে কী একটা বলে বেরিয়ে গেলেন।

আর তার একটু পরেই সুযোগ পেল শোন্তা। স্কুলের পড়া তৈরি করতে

একগাদা বইখাতা নিয়ে ছড়িয়ে বসল ও। তারপর বাবার লেখা কাগজগুলো খুলে আবার লুকিয়ে পড়তে শুরু করল। মাকে নিয়ে এখন আর ভাবনা নেই। মা টিভির সামনে সিনেমা দেখতে বসে গেছেন।

'...বিপদ! প্রভাস বলে কী!

'আমি সাহস দেখিয়ে বললাম, ''কীসের বিপদ? খুলে বল তো শুনি—''

'প্রভাস আমার কথার জবাব না দিয়ে জোরে হেসে উঠল। ওর বিশাল বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে সে-হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল যেন। একটু পরে হাসি থামলে প্রভাস বলল, ''নরেশ আমি দেড়বছর ধরে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্যে অপেক্ষা করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এর অঙ্ক-টঙ্ক সব আমার আগেই কষা হয়ে গেছে। এখন শুধু হাতেনাতে পরখ করে দেখা বাকি। এমনই কপাল দ্যাখ, হঠাৎই আজ তোকে পেয়ে গেলাম। চল, ল্যাবে চল—।''

'প্রভাস উঠে দাঁড়াল। আমাকে একরকম হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ল্যাবের দিকে। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওকে অনুসরণ করলাম। দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের লোভ আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আমার ব্যবহারে শোভা কিংবা নমিতা এরপর আর কখনও ব্যথা পাবে না। তবুও প্রভাসের বিশাল ল্যাবরেটরিতে পা রাখার সময় কোনওরকমে বললাম, ''একটু দাঁড়া। তুই যে কী একটা বিপদের কথা বলছিলি...।''

'প্রভাস আমার কথায় আমল না দিয়ে বলল, ''ও কিছু নয়। একটু সামলে থাকলেই হবে। আগে চল তো, কাজ শেষ করি—তারপর তোকে সব বুঝিয়ে দেব। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, একদম সিম্প্‌ল।''

'ল্যাবের একটা জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল প্রভাস। নানারকম বোতাম-টোতাম টিপে বেশ কয়েকটা রঙিন আলো জ্বেলে দিল। হঠাৎই দেখি আমাকে ঘিরে মেঝে ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেল চকচকে চারটে দেওয়াল। দেওয়ালের বাইরে থেকে প্রভাস চেঁচিয়ে বলল, ''দেওয়ালগুলো নন্‌ম্যাগনেটিক—অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি।'' তারপর ও কয়েকটা পাওয়ার সুইচ অন করে দিল। ফলে হাই পাওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ড চালু হয়ে গেল, আরও কী-কী যেন হল। ক্রিকেট খেলার কমেন্ট্রির মতো চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সব বলে যাচ্ছিল প্রভাস। ধীরে-ধীরে ওর গলার স্বর যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। তারপর একসময় আমার আর কিছু মনে নেই।

'যখন আবার সব টের পেলাম, তখন প্রভাসের বসবার ঘরে সোফায় বসে আছি। আর প্রভাস আমার পিঠ চাপড়ে বলছে, ''...সেরকমভাবেই চলবি। তোর আর কোনও চিন্তা নেই, নরেশ। এবার সত্যিই তুই নরেশ—মানে, রাজা।

এই দুনিয়ায় তুই-ই সবচেয়ে সুখী। তবে ছোট্ট একটা ব্যাপারে তুই একটু খেয়াল রাখিস...।" প্রভাসের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। একটু থেমে-থেমে ও বলল, "তুই নিশ্চয়ই এটুকু বুঝতে পারছিস যে, তোর অ্যান্টি-বায়ো-মডেলটা অ্যান্টিম্যাটার দিয়ে তৈরি। ম্যাটারে যেমন ইলেকট্রন কণা থাকে, অ্যান্টিম্যাটারে তেমনই থাকে পজিট্রন। আর সাধারণ পদার্থের প্রোটনের জায়গায় অ্যান্টিম্যাটারে থাকে অ্যান্টিপ্রোটন। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরকে স্পর্শ করলেই সর্বনাশ। সাংঘাতিক বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে বিকিরিত হবে অ্যানিহিলেশন রেডিয়েশান। আর তৎক্ষণাৎ ম্যাটার আর অ্যান্টিম্যাটার—দুটোরই অস্তিত্ব শেষ। মানে তোর আর তোর মডেলের সংঘর্ষ যদি হয় তা হলে তোরা দুজনেই শেষ। তুইও থাকবি না, আর শরেনও থাকবে না—।"

'আশ্চর্য! প্রভাসের কথা শুনে আমার এতটুকু দুশ্চিন্তা হল না। বরং ওর শেষ কথাটায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "শরেন মানে?"

'ও হো-হো করে হাসল। তারপর বলল, "বুঝলি না? তোর অ্যান্টি-বায়ো-মডেলের আমি নাম রেখেছি শরেন—নরেশের ঠিক উলটো। শরেনকে দেখতে হুবহু তোর মতো—শুধু ওর দেহটা খানিকটা স্বচ্ছ...মানে অনেকটা ঘষা কাচের মতো। তবে ওর ভেতরটা তোর একেবারে উলটো—ম্যাটার, অ্যান্টিম্যাটার।" আবার হেসে উঠল প্রভাস। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ওর চোখেমুখে অহঙ্কার টগবগ করে ফুটে বেরোচ্ছে। ওর ঘরের দেওয়ালে নানা বিজ্ঞানীর ফটোগ্রাফ বাঁধানো। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাকের ফটোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল প্রভাস। আবেগভরা গলায় বলল, "অ্যান্টিপার্টিক্‌লের ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন পল ডিরাক ১৯৩০ সালে। তখন তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু দু-বছর পরেই মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল ডেভিড অ্যান্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করেন। তারপর ১৯৩৩-এ ডিরাক নোবেল পুরস্কার পান।" আমার দিকে ফিরে তাকাল প্রভাস ঃ "আমার পরীক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হল শরেন। ওর কথা সবাই যখন জানবে তখন তাজ্জব হয়ে যাবে—কী বলিস? কে বলতে পারে, হয়তো নোবেল প্রাইজও জুটে যেতে পারে আমার কপালে।"

'হঠাৎ করেই আমার মনে হল প্রভাসের বোধহয় মাথার ঠিক নেই। ঝোঁকের মাথায় এ-কোন ফাঁদে পা দিলাম আমি! এখন কি আর ফেরার পথ আছে? কিন্তু প্রভাসের পরীক্ষায় কোনও ভুল হয়নি। ওর মুখে এরকম বিপদের কথা শুনেও কেমন শান্ত, স্থির রয়েছি আমি। সত্যিই দুশ্চিন্তা আর টেনশান একেবারে নেই। ভীষণ হালকা লাগছে। শুধু মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। প্রভাসকে সেটা বলতেই ও বলেছে, ওটা হাই-ইনটেনসিটি ফিল্ডের জন্যে। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ওকে জিগ্যেস

করলাম, ''শরেন, মানে, ওই মডেলটা এখন কোথায়? সেই বুঝে আমাকে তো চলাফেরা করতে হবে।''

'প্রভাস বলল, 'নরেশ, সত্যি বলছি, শরেন কোথায় আছে আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, যে-মুহূর্তে আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে শরেনের জন্ম হয়েছে। আমার থিয়োরি বলছে, এই অ্যান্টি-বায়োমডেলটা তোর ঠিক দুশো কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে থাকবে। আর তোর বায়োফিল্ডের টানে ওটা তোর কাছে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। অন্য কোনও মানুষ বা অন্য কোনও জিনিসের দিকে শরেনের কোনও টান থাকবে না। এক্সপেরিমেন্টের পর ঠিক কোন কো-অর্ডিনেটে শরেন অ্যাপিয়ার করবে, এটা আমার জানা নেই। থিয়োরির ওই জায়গাটা একটু ঝাপসা রয়ে গেছে। সবই স্পেস-টাইম আর ফিল্ড-রেডিয়েশানের ব্যাপার। সে যাকগে, দুশো কিলোমিটার দূরত্ব মানে প্রায় একত্রিশ হাজার চারশো বর্গকিলোমিটার এলাকা শরেনকে খুঁজতে হবে। ফলে ও চট করে তোকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তোর রেডিয়েশানের সিগন্যাল ওর অ্যানটেনায় সবসময় ধরা পড়বে।''

'শোন্তার কথা মনে পড়ল আমার। নমিতার কথা মনে পড়ল। কেমন একটা ব্যথা টের পেলাম বুকের ভেতরে। শরেন যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পায়! ওকে ঠেকানোর কি কোনও উপায় নেই? সে-কথা প্রভাসকে জিগ্যেস করতেই ও কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে তারপর বলল, ''একটা জিনিস দিয়ে শরেনকে হয়তো আটকানো যায়—তবে আমি কখনও পরীক্ষা করে দেখিনি।''

''কী জিনিস?'' অনেক আশা নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

''আয়োনাইজ্ড পলিমার—মানে, আয়োনাইজ্ড প্লাস্টিকও হতে পারে। কিন্তু বললাম যে, ওতে কতটা কাজ হবে ঠিক জানি না।''

'আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেমন একটা নেশার মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা সময় কেটে গেছে আমার। কোথা থেকে কী হয়ে গেল! দুশ্চিন্তা, টেনশান, ক্লান্তি, খিটখিটে রুক্ষ স্বভাব হয়তো আমার আর থাকবে না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মনের মধ্যে এক অসহায় ভয় বাসা বেঁধেছে। আর বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত কষ্ট। নমিতা যদি এসব জানত! আমার ক্লাস সেভেনে পড়া ছোট্ট মেয়েটা যদি এসব জানত! তা হলে ওরা বোধহয় আগের খিটখিটে মানুষটাকেই মেনে নিত।

'প্রভাসের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ও বলল, ''তোর দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন সুখের হোক।''

'আমি কোনও জবাব দিলাম না, পেছন ফিরেও তাকালাম না। গাড়ি নিয়ে

রওনা হয়ে পড়লাম বাড়ির দিকে।

'ফেরার পথে একটা মানুষকে আমার চোখ খুঁজে বেড়াল। শরেন, তুই কোথায়?'

পড়তে-পড়তে শোন্তা থামল। বাবার লেখা ও সবটা যে বুঝতে পারছে তা নয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের জায়গাগুলো বেশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলেও বাবার কষ্ট বুঝতে ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এখন ও বুঝতে পারছে, কেন বাবা গাড়িটাকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়তে চাইছেন। ওই প্লাস্টিকটা নিশ্চয়ই আয়োনাইজ্‌ড প্লাস্টিক।

এর পরের লেখাগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া। স্কুলের পড়া ভুলে সেই লেখাগুলো পড়তে লাগল শোন্তা।

...'শরেনকে আমি দেখতে পেয়েছি! গত পরশু সন্ধেবেলা রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে একটা বস্তিতে ঢোকার মুখে হঠাৎই শরেনকে দেখতে পেলাম। একটা অশথ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্বিকার হবে না কেন? ওর যে শুধু একটাই কাজ—আমাকে খুঁজে বের করা।

'বাথরুমের কলটা সারানোর জন্যে কলের মিস্ত্রিকে খবর দিতেই ওই বস্তিটায় ঢুকেছিলাম আমি। আর প্রভাসের এক্সপেরিমেন্ট, শরেন, অ্যান্টি-বায়োমডেল—এসবের কথা ভাবছিলাম। এমন সময় ওকে দেখতে পেলাম।

'প্রভাস ঠিকই বলেছিল, ওকে হুবহু আমারই মতো দেখতে। গায়ে কালো জামা আর কালো প্যান্ট। আধো-অন্ধকারে অন্তত তাই মনে হল। আর সবচেয়ে ভয় পাইয়ে দেয় ওর মুখ। সে-মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। যেন পাথর কেটে তৈরি এক মরা মানুষের মুখ। বরফের মতো ঠান্ডা।

'আমাকে দেখতে পেয়েই শরেনের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল বলে মনে হল। ও পা বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল আমার দিকে। লাইটপোস্টের আলোয় ওর হাসিটা ব্যঙ্গের অথবা তাচ্ছিল্যের হাসি বলে চিনতে পারলাম। আর তারপরই আমি প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে-ছুটতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি শরেনও এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওর মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন হয়নি! এখনও পাথর আর বরফ। আমি ভাবছি...।'

'...শরেনকে আবার দেখলাম। রবিবার, সন্ধের মুখে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছে। নমিতা আর শোন্তাকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম।

হঠাৎ দেখি ছুটে যাওয়া গাড়িঘোড়ার মধ্যে দিয়েই রাস্তা পার হয়ে শরেন আমার দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। সামান্য যেটুকু সময় ওর দিকে তাকিয়েছি তাতেই লক্ষ করেছি, প্রভাস মিথ্যে বলেনি। শরেনের শরীর খানিকটা স্বচ্ছ। কারণ, ওর ঠিক পিছনে দাঁড়ানো একটা লোককে আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি চট করে নমিতা আর শোন্তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইলাম। ওরা অবাক হয়ে আমাকে অনেক কথা জিগ্যেস করছিল, কিন্তু আমি কোনও জবাব না দিয়ে সংক্ষেপে শুধু বলেছি, পরে বলব। তারপর তাড়াতাড়ি সরে পড়েছি সেখান থেকে। আমার বুকের ভেতরে হাপর টানার শব্দ হচ্ছিল।'

শোন্তার স্পষ্ট মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র দু-সপ্তাহ আগে, রবিবারেই হয়েছিল এই ব্যাপারটা। কেনাকাটা শেষ না করে আচমকা চলে আসার জন্য মা কম ঝগড়া করেননি বাবার সঙ্গে। আর শোন্তাও রাগ করে পুরো একটা দিন বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। সোমবার রাতে বিছানায় শুয়ে বাবা বড় একটা শ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'একদিন তোরা সব বুঝতে পারবি।'—আজ সেই কারণটা জানতে পেরে শোন্তার কষ্ট হল। আর রাগ হল বাবার বন্ধুর ওপর।

ও খাপছাড়া লেখাগুলো আবার পড়তে শুরু করল।

'...প্রভাসের কাছে আমি অনেকবার ছুটে গেছি মুক্তির আশায়, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ও শুধু বলেছে, "একবার যদি তুই শরেনের চোখে ধুলো দিতে পারিস, তা হলে ওর পুরোনো স্মৃতি সব মুছে যাবে। ও আবার নতুন করে একতিরিশ হাজার চারশো বর্গকিলোমিটার এলাকায় তোকে খুঁজতে শুরু করবে। তবে চিন্তা করিস না। আমি অ্যান্টিম্যাটার নিয়ে নতুন একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করছি। ওটা সাকসেসফুল হলে বোধহয় তোর একটা ব্যবস্থা করতে পারব—" আমার কেমন মনে হচ্ছিল, প্রভাস আমার কাছে সব সত্যি কথা খুলে বলছে না।

'তারপর থেকে আর মিথ্যে আশা নিয়ে প্রভাসের কাছে ছুটে যাইনি। শরেনের দেখা পেলেই ওর চোখে ধুলো দিয়ে শুধু নিজের আয়ু বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এভাবে আর কতদিন! প্রভাস বলেছিল আয়োনাইজ্ড প্লাস্টিকের কথা। সেটা জোগাড় করার জন্যেও কম চেষ্টা করিনি, কিন্তু কোনও খোঁজ পাইনি।

'শোন্তাকে, শোন্তার মাকে, আমি এত ভালোবাসি যে, ওদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে...।'

শোন্তাকে ছোটবেলায় বাবা প্রায়ই জিগ্যেস করতেন, 'আমাকে তুই কতটা ভালোবাসিস রে?'

উত্তরে শোন্তা ওর ছোট-ছোট দুটো হাত দুপাশে টান-টান করে বলত, 'এই এত্তখানি।'এখন, এই মুহূর্তে ওর মনে হল, ওর হাত দুটো খুব ছোট। বাবাকে ও এত ভালোবাসে যে, ওই দুটো হাত টান-টান লম্বা করেও সেই ভালোবাসার এতটুকুও বোঝানো সম্ভব নয়। ওর হাত দুটো যদি ভগবানের হাতের মতো লম্বা হত!

'অনেক কষ্টে আয়োনাইজ্ড প্লাস্টিকের সন্ধান পেয়েছি। একজন মেকানিককে ধরেছি, সে প্লাস্টিক দিয়ে গাড়ির ভেতরটা মুড়ে দেবে। তারপর কোনও টেলারিং-এর দোকান থেকে ওই প্লাস্টিকের একটা জামা-প্যান্ট তৈরি করে নেব।

'দেখি, পারলে কালই গাড়িটা নিয়ে যাব মেকানিকের কাছে...।'

বাবার লেখা এখানেই শেষ। মানুষটার কষ্ট, মানুষটার বারবার পালটে যাওয়া—সবকিছু এখন বুঝতে পারছিল শোন্তা। কিন্তু কী করবে ও এখন? বলবে মাকে? নাকি...।

ক্রি রি রিং, ক্রি রি রিং...।

টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের ভেতরে।

শোন্তা চমকে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। মা ও-ঘরে টিভি দেখছেন। নিশ্চয়ই ফোনের বাজনা শুনতে পাননি।

'হ্যালো—।'

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর নেই।

তারপর ও-প্রান্ত থেকে ভাঙা-ভাঙা গলায় কেউ জিগ্যেস করল, 'এটা নরেশ দত্তর বাড়ি?'

শোন্তা চটপট জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বলুন—।'

'নরেশবাবু বাড়ি আছেন?'

'না, উনি একটু বেরিয়েছেন। আপনি কে কথা বলছেন?' বাবা বাড়িতে থাকলে শোন্তা কখনও এ-প্রশ্ন করে না। সেটা নাকি অভদ্রতা।

'তুমি কে বলছ?' ও-প্রান্তের আড়ষ্ট গলা পালটা প্রশ্ন করল।

শোন্তার খুব রাগ হল। কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি ওনার মেয়ে। আপনি কে বলছেন?'

আবার পালটা প্রশ্ন ঃ 'তোমার বাবা কখন বাড়ি ফিরবেন?'

শোন্তা কোনওরকমে বিরক্তি চেপে বলল, 'ঘণ্টাখানেক পরে ফিরতে পারেন।'

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর যেন আপনমনেই বিড়বিড় করল, 'তা হলে তো অনেক সময়...।'

'উনি ফিরলে কি কিছু বলতে হবে?' শোন্তা জিগ্যেস করল।

'নাঃ, তার দরকার নেই, আমি দেখা করে নেব।'

'কিন্তু আপনার নাম বললে ভালো হত। বাবা ফিরলেই খবরটা দিতাম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর বলল, 'শুধু বোলো, শরেন দত্ত ফোন করেছিল। এটা বললেই তোমার বাবা সব বুঝতে পারবেন।'

ফোনের লাইন কেটে গেল।

শোন্তার হাত কাঁপতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল। লোকটা বলেছে, "...আমি দেখা করে নেব।"

রিসিভার রেখে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগল।

মা ছুটে এলেন টিভি ছেড়ে। শোন্তা মাকে নিয়ে দৌড়ে গেল বারান্দায়। তাকাল রাস্তার মোড়ের দিকে। ওই পথ ধরেই গাড়ি নিয়ে ফিরবেন বাবা। ফিরবেন তো?

কয়েক মিনিট পরেই বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দটা ওরা বারান্দা থেকেই শুনতে পেল। আগুন আর কালো ধোঁয়ার মেঘও দেখা গেল। ঝুলবারান্দা কেঁপে উঠল থরথর করে।

আয়োনাইজ্‌ড প্লাস্টিক শরেনকে আটকাতে পারেনি।





মোনালিসার নতুন বন্ধু

আজ একজন নতুন বন্ধু মোনালিসার বাড়িতে এসেছে। এই নতুন বন্ধুটা খুব ভালো। কখ্খনও ঝগড়া করে না, আড়ি করে না। এরকম একটা ভালোমানুষ নতুন বন্ধুই তো চেয়েছিল মোনালিসা। এরকম বন্ধু আর কারও নেই। শানু, তোতা, রুবি, বাবাই কারও নেই।

ছাদের কোণে বসে মোনালিসা ওর নতুন বন্ধুর সঙ্গে রান্নাবাটি খেলছিল আর নানান গল্প করছিল। তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। ছাদের পাশেই উঁকি মারছে তিনটে তালগাছ। মোনালিসার রান্নাবাটি খেলা দেখছে। গাছের পাতার জাফরির ফাঁক দিয়ে সূর্যের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। তাই সূয্যিমামাও খেলাধুলোর পাট সেরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তারপরই বইখাতা নিয়ে পড়তে বসবে হয়তো।

মোনালিসার নতুন বন্ধুর নাম রবি। কী ফুটফুটে দেখতে! কী ভালো-ভালো কথা বলে! আবার কান পেতে মনোযোগ দিয়ে মোনালিসার সব কথা শোনে। রবি খুব ভালো। কখ্খনও ঝগড়া করে না। তাই ওকে নিয়েই পড়াশোনা করতে বসে মোনালিসা। মাকে বলেছে, ‘রবির সঙ্গেই আমাকে খেতে দেবে। আর ও আমার কাছেই ঘুমোবে।’

সত্যি, রবি আসার পর মা আর বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নইলে

রোজই তো শুনতে হয় মেয়ের নালিশ : 'বাপি, তোতা ওর বলটা আমাকে খেলতে দিচ্ছে না। ওকে বকে দাও না।' অথবা কখনও এসে বলে, 'মা, মা, জানো বাবাইটা কী খারাপ ছেলে! আমি একটা কী চমৎকার রাখি ওকে দিয়েছি, আর বলে কিনা পচা রাখি! আমি ওর সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি।'

মা আর কী বলবেন! বাবা আড়ালে মুখ টিপে হাসেন। সাত বছরের এইটুকু মেয়ের এত ঝগড়া এত নালিশ! মায়ের আর ভালো লাগে না। বাবাকে বলেন, 'কী করবে করো। দেখবে, তোমার মেয়ে বড় হয়ে ভীষণ ঝগড়ুটে হবে।'

বাবা তাতে আরও হাসেন। হাসতে-হাসতে চোখের চশমা খুলে যেতে চায়।

মা যখন পুঁচকে মেয়েটাকে বকুনি দিয়ে বলেন, 'কী রে, তুই সবার সঙ্গে রোজ-রোজ ঝগড়া করিস কেন রে!'

মোনালিসা হাত-পা নেড়ে চোখ পাকিয়ে বলে, 'বা রে, আমি ঝগড়া করি নাকি! শানু, তোতা, ওরাই তো ঝগড়া করে। বারবার আড়ি করে, ঝগড়া করে।'

মা গালফোলা মেয়েটাকে দেখেন। চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন অভিমানী মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন মা। চুমু দেন মাথায়। বলেন, 'তুই রোজ বিকেলে খেলতেও বেরোবি, আবার এসে নালিশও করবি। কী যে করি!'

তখন মোনালিসা বলেছে, 'আমি আর খেলতে বেরোব না, বাড়িতে বসে একা-একা খেলব।'

সত্যি তাই করল মেয়েটা। পরপর দুটো দিন একদম বেরোল না বাড়ি ছেড়ে। তাই দেখে মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বাবাকে বললেন, 'কিছু একটা করো। মেয়েটা যে ঘরকুনো হয়ে গেল। বাড়িতে বসে একা-একা কখনও খেলতে পারে!'

'এই ব্যাপার?' বাবা আবার হেসেছেন। তারপর বলেছেন, 'তা হলে দ্যাখো এবার কী করি!'

ব্যস। পরদিন বাবা কোথা থেকে যেন কিনে এনেছেন রবিকে। বাচ্চাদের খেলার সাথি বাচ্চা রোবট। যন্ত্রের খেলনা, কিন্তু দেখতে অবিকল মানুষের মতন। মাথায় চকচকে কালো চুল। টকটক করে কথা বলে। বড়-বড় চোখে এদিকে-ওদিকে তাকায়। কী সুন্দর করে হাসে! নাম রবি।

এইভাবেই ওদের বাড়িতে এসেছে রবি। তারপর এক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেছে মোনালিসার নতুন বন্ধু।

নতুন বন্ধুর সঙ্গে মোনালিসার কোনও ঝগড়া নেই, কোনও আড়ি নেই। কারণ রবি কখ্খনও মোনালিসার সঙ্গে তর্ক করে না, ওর কাছ থেকে কোনও

খেলনা কেড়ে নেয় না, ওর নামে নালিশও করে না। ওরা দুজনে ঘরে, কিংবা বারান্দায়, অথবা ছাদে খেলা করে। ছুটোছুটি করে, লুকোচুরি খেলে, এক্কা-দোক্কা বা ইকড়িমিকড়ি খেলে।

ওদের মিল দেখে বাবা-মা খুব খুশি। বাবা মাকে বলেন, 'দেখলে তো, কেমন ম্যাজিক দেখিয়ে দিলাম!'

মা হেসে উত্তর দেন, 'সত্যি, এরকম মিল! না দেখলে বিশ্বাসই হত না কখনও।'

এইভাবেই দিন যাচ্ছিল বেশ। হঠাৎ একদিন বাবা দেখলেন, মোনালিসা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আর রবি একটু দূরে বসে লুডোর ছক পেতে বন্ধুকে ডাকছে, 'কী হল মোনালিসা, খেলবে এসো।'

বাবা চলে এলেন মেয়ের কাছে। জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, কী হয়েছে?'

মোনালিসা বাবার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'রবির সঙ্গে আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না, বাপি।'

'কেন রে? রবি ঝগড়া করেছে?'

'না। ও কখ্খনও ঝগড়া করে না।' মোনালিসা গম্ভীরভাবে বলল।

'ও, তা হলে বুঝি আড়ি করে দিয়েছে তোর সঙ্গে?'

'না, ও কখ্খনও আড়ি করে না।'

বাবা এবারে হেসে ফেললেন, বললেন, 'তা হলে ভালোই তো । মন খারাপের কী হল?'

মোনালিসা বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'আমি শানু, বাবাই, তোতা ওদের সঙ্গে খেলব, বাপি। রবির সঙ্গে খেলতে আমার বিচ্ছিরি লাগে—।'

এমন সময় মা এসে পড়েছিলেন বারান্দায়। শুনতে পেয়েছেন মেয়ের শেষ কথাটা। আর ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন। রবির সঙ্গে খেলতে ভালো লাগছে না!

মা আর বাবা অবাক হয়ে মেয়েকে দেখছিলেন। গায়ে ফুটফুটে লাল ফ্রক, মাথার চুলে জোড়া বিনুনি, তাতে লাল ফিতের ফুল। শুধু ফরসা মুখটা হাসিখুশি হলেই বেশ মানাত।

সন্ধে এখনও নামেনি। নীচের গলিতে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে কুমিরডাঙা খেলছে। পশ্চিমের আকাশ লালে লাল। আর তার সঙ্গে আরও নানান রং। কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। সবই ভালো, শুধু মোনালিসার মুখে হাসি নেই।

মা এবার বললেন, 'রবি তো কখনও তোর সঙ্গে ঝগড়া করে না, আড়ি করে না! তা হলে ওর সঙ্গে খেলতে তোর বিচ্ছিরি লাগছে কেন!'

মোনালিসা আর থাকতে পারল না। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে দিল। চাপা গলায়

বলল, 'রবি ঝগড়া করে না, আড়ি করে না। তাই কখনও ভাবও করে না আমার সঙ্গে। তুমিই বলো মা, আড়ি না হলে ভাব হবে কেমন করে? আর ঝগড়া না হলে আড়ি হবে কেমন করে? আমি শানু, বাবাইদের সঙ্গে খেলব কাল থেকে।'

মা হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের মাথায়। তারপর তাকালেন বাবার দিকে। বাবা হেসে বললেন, 'ও ঠিকই বলেছে, বুঝলে। আড়ি না হলে কি কেউ বুঝতে পারে ভাব করতে কী দারুণ ভালো লাগে!'

মা বললেন, 'তুমি রবিকে কালই দোকানে ফেরত দিয়ে এসো। ভাব করতে জানে না এমন বন্ধু আমাদের দরকার নেই।'

সত্যিই তো, যে-বন্ধু ভাব করতে জানে না সে আবার বন্ধু কীসের!





শিলাবৃষ্টির শরবত

ভর দুপুর। বাইরের গনগনে রোদ্দুর থেকে ঘরে ঢুকেই বিশ্বকাকু হাঁক ছাড়ল : 'বাবান-মৌ, শিগগির এক গেলাস শরবত নিয়ে আয়!' বলেই বসবার ঘরের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ল।

ইস্কুলের পরীক্ষা শেষ, গরমের ছুটি পড়ে গেছে। তাই বাবান-মৌ দুজনেরই পুরোপুরি ছুটি এখন। বাবান দিনরাত ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে শ্যাডো-প্র্যাকটিস করছে, আর মৌ গল্পের বইয়ে মুখ গুঁজে চব্বিশ ঘণ্টা। শুধু টিভি-তে ভালো কিছু থাকলে দুজনে সেই ইলেকট্রনিক বাক্সের সামনে স্ট্যাচু।

মা পাশের ঘরে শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। সেখান থেকেই বলল, 'এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে কোথায় বেরিয়েছিলে, ঠাকুরপো?'

বিশ্বকাকু লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী করব, বউদি, আমার কি আর ছুটি আছে! বেরিয়েছিলাম গরম মাপতে—।'

মা অবাক হয়ে বলল, 'গরম মাপতে! সে আবার কেমন করে মাপে?'

এমন সময় বাবান-মৌ দুজনেই ঘরে এসে ঢুকল। মৌ-এর হাতে আধখোলা গল্পের বই, আর বাবানের হাতে একগ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ। ঠান্ডা গ্লাসের গায়ে বাষ্প জমে রয়েছে।

'কাকু, তুমি গরম মাপার কথা কী বলছিলে?' বাবানের কানে এড়ায়নি

কথাটা। এবারে ও ক্লাস সেভেনে উঠেছে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির হাতেখড়ি হবে নতুন ক্লাসে, গরমের ছুটির পরে! আর মৌ উঠল সবে ফাইভে। কিন্তু এর মধ্যেই এনিড ব্লাইটন আর অ্যালফ্রেড হিচককের বইয়ের পোকা। বিশ্বকাকুর কথাটা দুজনকেই কৌতূহলী করেছে। ওরা দেখল, সামনের ঘরে মা-ও উঠে বসেছে বিছানায়, হাত ঘুরিয়ে এলোখোঁপা বেঁধে নিচ্ছে। খবরের কাগজ রেখে দিয়ে এখন এদিকেই তাকিয়ে।

বিশ্বকাকু যখন-তখন হুটহাট করে এসে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব গল্প শোনায় বাবান-মৌকে। সেগুলো সত্যি কি মিথ্যে কে জানে! কখনও বলে 'সাইলেন্ট ভ্যালি থেকে ঘুরে এলাম।' আবার কখনও শোনায় 'কালাহারির রিসার্চ ক্যাম্প থেকে আমাকে কল করেছে গরম মাপার জন্যে।'

মৌ জিগ্যেস করল, 'কাকু, গরম মাপে কেমন করে?'

বিশ্বকাকু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'গরম মাপে শিলাবৃষ্টির শিল দিয়ে।'

বাবান অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! কেমন করে?'

বিশ্বকাকু হাতের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল, 'শিলগুলোকে খুব সাবধানে ভ্যাকুয়াম প্যাক করে প্রথমে প্রিজার্ভ করতে হয়, বুঝলি? তারপর গরম মাপার সময়ে সেগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে, প্যাকেট ছিঁড়ে, প্লেটে করে রেখে দিতে হয় ছায়াতে। সরাসরি রোদ্দুর লাগলে কিন্তু মাপে ভুল হয়ে যাবে। বরফের শিলগুলো গলে জল হতে যে সময় লাগে, সেটাই হল গরমের মাপকাঠি।'

মা অবাক হয়ে বলল, 'এরকম তো কখনও শুনিনি?'

বিশ্বকাকু হেসে বলল, 'দুনিয়ার সব জিনিস সবাইকে সবসময় শুনতেই হবে এমন কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, বউদি! তুমি কি ক্যাঙটার্কটিকা নামে অ্যান্টার্কটিকার একরকম ক্যাঙারুর নাম শুনেছ? জানো, প্রজাপতিরা সাবসনিক শিস দিতে পারে? উপনিষদে বংশনির্বংশ নামে একরকম পারমাণবিক বোমার উল্লেখ আছে, তা আগে কখনও শুনেছ?'

এসব কথায় মা কীরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বাবান-মৌ একবার বিশ্বকাকু আর একবার মা-কে দেখছিল।

স্কোয়াশের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বিশ্বকাকু আবার বলতে শুরু করল, 'এখন কলকাতায় গরম মাত্র চার মিনিট। অবশ্য শিলগুলো ভালো করে প্রিজার্ভ করার টেকনিক এখানকার সায়েনটিস্টরা এখনও রপ্ত করতে পারেনি।'

মৌ বলল, 'কাকু ক'দিন আগে দেখেছ, কাগজে দিয়েছিল চায়নায় সাঙঘাতিক শিলাবৃষ্টি হয়েছে! এক-একটা শিলের ওজন প্রায় পাঁচ কেজি! বেশ কয়েকজন লোকও মারা গিয়েছে শিলের ঘায়ে।'

বিশ্বকাকু গম্ভীর গলায় বলল, 'দেখেছি। তবে যারা মারা গেছে তাদের ডেথ

ততটা পেইনফুল হয়নি। চোখের নিমেষে মর্ত্য থেকে স্বর্গে চলে গেছে। শিলের ঠ্যালায় আমার যা একবার অবস্থা হয়েছিল! জানিস, এইরকম এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেতে গিয়েই একেবারে যমরাজকে কল করে বসেছিলাম। সোজা সাহারার বুকে সমাধি হয়ে যেত। আমাকে কি আজকে আর দেখতে পেতিস!'

মায়ের চোখ কপালে। বাবান-মৌয়েরও তাই। সাহারার বুকে সমাধি? কাকু বলে কী! শিল, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, পেইনফুল ডেথ—ওদের সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

একটু চেপে ধরতেই বিশ্বকাকু রহস্য খোলসা করে বলতে শুরু করল। মাঝে-মাঝে চলতে লাগল শরবতে চুমুক।

'সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ারের ঠিক পরের বছরের ঘটনা। একটা স্পেশালিস্ট টিম নিয়ে সাহারায় গরম মাপতে গেছি। উদ্দেশ্য, গোটা সাহারার গরমের একটা ম্যাপ তৈরি করা। তারপর সেখানে কৃত্রিম আবহাওয়া-পরিবেশ তৈরি করে চাষবাসের সম্ভাবনা চেক করে দেখা। আমাদের সঙ্গে ছিল কয়েক শো ভ্যাকুয়াম প্যাকেট ভরতি শিল—নুন আর বরফের মিক্সচারে ঠেসে প্যাক করে রেখেছিলাম। নুন আর বরফ মেশালে মিক্সচারের মেলটিং পয়েন্ট মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায় জানিস তো! যাই হোক, দলবল মালপত্র নিয়ে আমরা আলজিরিয়া দিয়ে সাহারায় ঢুকে পড়লাম।

'কিছুদিন আগেই আলজিরিয়াতে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। একমাস দারুণ গুমোট চলার পর হঠাৎই একদিন বজ্রবিদ্যুৎ এবং শিলাবৃষ্টি। মাত্র পাঁচ মিনিট সেই বৃষ্টি চলেছিল—তারপরেই ঝপ করে শেষ। আকাশ থেকে যে-শিলগুলো পড়েছিল সেগুলো চিন দেশের মতো অত প্রকাণ্ড তো নয়ই, বরং সাধারণ মাপের চেয়েও ছোট। ঠিক মটরদানার সাইজ। আলজিরিয়ায় ওই সময়ে যে শিলাবৃষ্টি হবে, সে-প্রেডিকশান আগে থেকেই ছিল। সুতরাং আমরা তৈরি ছিলাম। বৃষ্টি শুরু হতেই আমাদের শিল কালেকশান স্টার্ট হয়ে গেল। আর তার সঙ্গে বিদ্যুৎগতির ভ্যাকুয়াম প্যাকিং। দশ মিনিটেই কাজ শেষ। তারপর সাতদিন রেস্ট এবং প্রিপারেশান নিয়ে অভিযান শুরু। চলো সাহারা—।

'সাহারায় গরম মাপার কাজ নির্বিঘ্নে চলতে লাগল—।'

বাবান বাধা দিয়ে বলল, 'গরম মাপতে তো ছায়া লাগে বললে। সাহারা মরুভূমিতে ছায়া পেলে কোথায়, কাকু?'

বিশ্বকাকু আদর করে ওর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, 'তুই একেবারে চাইল্ডিশ প্রশ্ন করলি। মহেন্দ্র দত্তের ছাতার নাম শুনিসনি!'

'দাদাটা কিচ্ছু জানে না।' মৌ মন্তব্য করল।

মা আগ্রহ ভরা সুরে বলল, 'তারপর কী হল, ঠাকুরপো?'

'তা আমি তো গরম মেপে চলেছি। টিমের চিফ যেমন যেমন বলছেন

অক্ষরে-অক্ষরে তাঁর কথা পালন করে যাচ্ছি। এসব এক্সপিডিশানে ডিসিপ্লিনই হচ্ছে আসল, বুঝলি? কিন্তু শেষপর্যন্ত চিফের কথা অমান্য করেই আমার হল বিপদ—।'

'কীসের বিপদ কাকু?' বাবান-মৌ একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'শরবত খাওয়ার বিপদ!' বলে বিশ্বকাকু শরবতের গ্লাসটা এক লম্বা চুমুকে খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল। তারপর আবার শুরু করল ঃ 'একদিন কাজের সময় প্রচণ্ড তেষ্টা পেল, বুঝলি। কোমরের ওয়াটার বট্‌ল-এ ঝাঁকুনি মেরে দেখি জল অল্প রয়েছে। আমাদের সঙ্গে ভিটামিন মেশানো অরেঞ্জ স্কোয়াশ ট্যাবলেট থাকত। এক গেলাস জলে একটা ট্যাবলেট দিয়ে পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করলেই শরবত তৈরি। সেইরকম একটা ট্যাবলেট হ্যাভারস্যাক থেকে বের করে ওয়াটার বট্‌ল-এর জলে ফেলে দিলাম। জল তখন ভীষণ গরম। কারণ সাহারায় সে সময়ে আট সেকেন্ড গরম চলছে। শরবত তৈরি হওয়ার পর মাথায় কী দুর্বুদ্ধি চাপল, ফ্রিজিং মিক্সচার থেকে দু-প্যাকেট শিল খুলে নিয়ে চুপি-চুপি ঢেলে দিলাম জলের বোতলে।

'আমাদের টিমের চিফ খুব কড়া। তাঁর স্ট্রিক্ট অর্ডার ছিল শিল কিংবা শিল গলা জল কেউ যেন কখনও না খায়। কারণ সমস্ত এক্সপেরিমেন্টের জিনিস। তবে কারও প্রাণসংশয় হলে অন্য কথা।'

'কিন্তু কাকু, গরম মাপার পর প্লেটে যে-জল পড়ে থাকে সেটা তো তুমি খেতে পারতে—।' মৌ বলল কথাটা।

বিশ্বকাকু হাসল ঃ 'গরম তো মাপিসনি কখনও, কী করে জানবি? গরম মাপার সময়ে প্লেটের শিল একটুখানি গলে জল হওয়ামাত্রই আমরা সেই জলটুকু ফেলে দিতাম বালিতে। তা না হলে জল আর বরফ মিশে গিয়ে শেষ দিকে কারেক্ট টাইম মাপায় গোলমাল হয়ে যাবে যে! সে যাই হোক, জলের বোতলে বারকয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে চিফকে লুকিয়ে সেই শরবত ঢেলে দিলাম মুখে। আর প্রাণ জুড়োবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ ফুরোবার জোগাড়!'

'কেন? কেন?' বাবান তড়িঘড়ি প্রশ্ন করল।

বিশ্বকাকু করুণ মুখ করে বলল, 'শরবতের সঙ্গে কয়েকটা বরফের কুচিও যেন মুখে টের পেয়েছিলাম। আনন্দে যেই না তাতে কামড় বসিয়েছি অমনি ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কিরমির করে উঠেছে। দুটো দাঁত পড়ে গেছে তৎক্ষণাৎ। আর যন্ত্রণায় সাহারায় সর্ষে ফুল দেখে একেবারে সেন্সলেস হয়ে গেলাম। সে যে কী পেইনফুল, কী বলব! তার তুলনায় চিনের শিলাবৃষ্টি তো সুইট ডেথ।

'জ্ঞান ফিরতেই দেখি দলের তিন-চার জন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওদেরই কেউ হয়তো আমার মুখে চোখে জল দিয়েছে। হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে আর একজন। চিফ বললেন, ''বিশ্ব, কী ব্যাপার?'' আমি কোনওরকমে

উঠে বসলাম। আমার মুখে তখনও কয়েকটা বরফের কুচি খোঁচা মারছে। কোনও জবাব না দিয়ে মুখ থেকে তিনটে কুচি বের করলাম। সর্ষের মতো ছোট্ট তিনটে দানা আমার হাতের তালুর ওপরে হিরের মতো ঝকঝক করতে লাগল।

'আমাদের দলে একজন মণিরত্ন বিশেষজ্ঞ ছিল। তার কেমন সন্দেহ হতেই আতসকাচ নিয়ে চট করে ঝুঁকে পড়ল আমার হাতের ওপর। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সে চিৎকার করে উঠল, ''ও মাই গুডনেস! ডায়মন্ড! রিয়েল ডায়মন্ড!'' চিফসমেত দলের বাকি সবাই তো হতভম্ব। আর আমি স্রেফ হাঁ হয়ে বসে আছি। হিরে! শিলের মধ্যে হিরে এল কোত্থেকে?

'চিফ প্রশ্ন করতেই কিচ্ছু না লুকিয়ে সমস্ত খুলে বললাম। বললাম শিলাবৃষ্টির শরবতের কথা। তখন তিনি গম্ভীরভাবে নিজের মাথায় কয়েকটা টোকা মারলেন। বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ''শিলের মধ্যে ডায়মন্ড পার্টিক্‌ল্‌... আলজিরিয়া... পলিউশান...কার্বন পার্টিক্‌ল্‌...বজ্র-বিদ্যুৎ...হাই টেম্পারেচার...তারপর হঠাৎ ঠান্ডা...হুঁ, বুঝেছি।''

'আপনমনে কথা বলা শেষ করে চিফ আমার হাত থেকে হিরের টুকরোগুলো নিয়ে একটা খামে সিল করলেন। তারপর বললেন, ''প্যাক আপ। আমরা আলজিরিয়ায় ফিরে যাব। এরকম একটা যুগান্তকারী ঘটনা নিয়ে সেখানে এখুনি সরকারি মিটিংয়ে বসতে হবে। আর শিলের প্যাকেটগুলো খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। একটিও যেন না হারায়। কপাল যদি ভালো হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে এখন লক্ষ-লক্ষ টাকার হিরে রয়েছে।''

'ব্যস। আমরা এক্সপিডিশান ছেড়ে ফিরে এলাম।' বিশ্বকাকু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছি সে-যাত্রায়।'

বিশ্বকাকুকে চুপ করে যেতে দেখে বাবান আর থাকতে পারল না। বলল, 'কী করে হিরের দানাগুলো তৈরি হয়েছিল, কাকু?'

মা জিগ্যেস করল, 'আলজিরিয়ায় এসে শিলগুলো ভেঙে আর হিরে পেয়েছিলে তোমরা?'

বিশ্বকাকু হাত নেড়ে বলল, 'বলছি, সব বলছি। ...না বউদি, আর একটি কণাও হিরে পাইনি আমরা। তবে ওই তিনটে হিরের কুচি আলজিরিয়ার মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল আমার ফটো—ছিল কেন, আজও আছে।' এবার বাবানের দিকে ফিরল বিশ্বকাকু ঃ 'ওই হিরেগুলো তৈরি হয়েছিল কেমন করে জানিস? ময়সাঁ মেথডে—।'

'ময়সাঁ মেথড?' বাবান অবাক হয়ে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, ফরাসি রসায়নবিদ ফার্দিনান্দ ফ্রেদরিক অ'রি ময়সাঁ। ময়সাঁ বুঝতে পেরেছিলেন কাঠকয়লা বা কয়লার কণাকে খুব হাই টেম্পারেচারে গরম করে প্রচণ্ড চাপ দিলে হিরে পাওয়া সম্ভব। তাঁর চেষ্টার বাষট্টি বছর পরে আমেরিকার

পদার্থবিজ্ঞানী পার্সি উইলিয়ামস ব্রিজম্যান নকল হিরে তৈরি করার ব্যাপারে সাকসেসফুল হন। ব্রিজম্যান নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। তা আলজিরিয়ায় কী হয়েছিল শোন। ওখানে তখন নতুন কিছু ফ্যাক্টরি বসেছিল। সেখান থেকে খুব কালো ধোঁয়া বেরোত। এয়ার পলিউশান আর কী! জানিস তো, কালো ধোঁয়ার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম কার্বন পার্টিক্‌ল্‌ থাকে। সেগুলো ভেসে-ভেসে উড়ে গিয়েছিল আলজিরিয়ার আকাশে। সেখানে বজ্র-বিদ্যুতের পাল্লায় পড়ে সেগুলো পৌঁছে গিয়েছিল হাই টেম্পারেচারে। তারপর জলদ মেঘে ঢুকে পড়ে। সেখানে হঠাৎ চাপ কমে গিয়ে পরিবেশ খুব ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন ওই হাই টেম্পারেচার থেকে কার্বন পার্টিক্‌ল্‌গুলো হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে পড়ায় ওদের শরীরে সঙ্কোচনের জন্যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে তৈরি হয়ে যায় হিরের দানা। আর তাদের ঘিরে মেঘের জলকণা হঠাৎ জমে গিয়ে সোজা বরফের শিল। যেমন করে শিলাবৃষ্টি হয় আর কী! তারপর...যাকগে, অতশত টেকনিক্যাল ব্যাপার তোরা বুঝবি না।'

গল্প শেষ করে বিশ্বকাকু হাঁফ ছাড়ল। তারপর বলল, 'মৌ, ঝটপট আর এক গেলাস স্কোয়াশ। গরমে ছাতি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। চিফের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। নতুন একটা এক্সপিডিশান সামনের মাসে শুরু হবে, আমাকেও নিতে চায়। চিফ এখন নামজাদা লোক। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ডাক পাওয়াটাই রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার।'

মৌ উঠল শরবত নিয়ে আসতে। বাবান গালে হাত দিয়ে বসে। মা জিগ্যেস করল, 'ঠাকুরপো, তোমার ওই নামজাদা চিফের নাম জানতে পারি?'

বিশ্বকাকু গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি নন-টেকনিক্যাল লোক বউদি, নাম শুনলে কি চিনতে পারবে! চিফের ভালো নাম ঘনশ্যাম দাস, আমি ঘনাদা বলে ডাকি।'





বাবা-মা-তুতু

এই সাদা ধবধবে বিছানাটায় শুয়ে কতদিন কেটে গেল জানি না। ঘরের এক কোণে বিছানা, আর বাকিটা জুড়ে হিজিবিজি যন্ত্র। সেখান থেকে যখন-তখন সরু-সরু তার টেনে নিয়ে গুঁজে দেয় আমার মাথায়, গলায়। তারপর কীসব করলেই যন্ত্রের কাঁটাগুলো নড়ে ওঠে। সাদা পোশাক পরা লোকজন তখন যন্ত্রগুলো দেখে, কী সব টুকে নেয় নোটবইতে। দিন-রাত ওরা ঘরে যাওয়া-আসা করে। মাঝে-মাঝে আমাকে নানা কথা জিগ্যেস করে, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারি না। জটপাকানো জড়ানো সব কথা।

ঘরে একটা জানলা আছে। তা দিয়ে আকাশ দেখা যায়, পাখি দেখা যায়, আর দূরের বাগানের গাছ দেখা যায়। কাল বিকেলে আমাকে চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে জানলার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তখন ফুল দেখেছি, আর বাগানে ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। তবে জানলাটা কাচে ঢাকা। একফোঁটা হাওয়া ঢুকতে পারে না। আর যতই রোদের তেজ বাড়ে জানলার কাচের রংটা ততই কালচে হয়ে যায়। একজন নার্স বলছিল, এটা নাকি পোলারয়েড কাচ। প্রথমে কথাটা আমি বুঝতে পারিনি। তখন সে লিখে আমাকে দেখাল। সেটাও অনেক কষ্ট করে আমাকে বুঝতে হল। কারণ এদের সবারই লেখার ধরন একেবারে উলটো।

শুধু কি লেখার ধরন! কথাবার্তাও তাই। বাবা আর মা যেদিন প্রথম আমাকে

দেখতে এল সেদিন ওদের একটা কথাও আমি বুঝতে পারিনি। আর আমার কথাও যে ওরা একটুও বুঝতে পারছিল না সেটা ওদের মুখের চেহারা দেখেই টের পেয়েছি। শেষে মা যখন কান্নাকাটি শুরু করল তখন পাকা-চুল এক ডাক্তারবাবু পাশে দাঁড়ানো নার্সের কানে-কানে কী একটা বুদ্ধি দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কোথা থেকে একটা টেপরেকর্ডার আর একটা কম্পিউটার নিয়ে এল। একটা মাইক্রোফোন আমার মুখে ধরে অনেকগুলো প্লাগ জুড়ে কীসব সুইচ অন করে দিল। তারপর আবার আমাকে কথা বলতে বলল। আমি বললাম। ওরা সব টেপ করে নিল। তার একটু পরেই আবার টেপ চালিয়ে দিল। আর কী অবাক কাণ্ড! আমার সমস্ত কথাগুলো কেমন হিজিবিজি শোনাচ্ছিল আমার কাছে। অথচ দেখলাম বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর কম্পিউটারের টিভি পরদায় কথাগুলো সব ফুটে উঠল পরপর। লেখাগুলো আমার বুঝতে কষ্ট হলেও দেখলাম আর সবাই দিব্যি সেগুলো পড়তে পারছে।

বাবা ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করল, তুতুর কথাবার্তা এরকম ওলট-পালট জট পাকিয়ে গেছে কেন? ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, এ-এক আশ্চর্য ঘটনা, মিস্টার রক্ষিত। এ আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আপনার ছেলের ক্রেনিয়াল নার্ভের কিছু-কিছু জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ট্রিজেমিনাল, অ্যাকাউস্টিক আর হাইপোগ্লসাল অঞ্চলে।

আমি ওদের কথা বুঝতে পারছিলাম। হয়তো চালু টেপরেকর্ডার আর কম্পিউটার মিলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দেখলাম, ডাক্তারবাবুর কথায় বাবা কেমন হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছে। তখন ডাক্তারবাবু আবার বললেন, ওসব শক্ত কথা বাদ দিন। আসলে আপনার ছেলে এখন কথা বলছে উলটোভাবে, লিখছেও উলটোভাবে, আর শুনছেও উলটোভাবে। অর্থাৎ যেসব শব্দ পরপর জুড়ে একটা কথা তৈরি হয়, যার একটা অর্থ আছে—আপনার ছেলে সেই শব্দের টুকরোগুলো পরপর জুড়ছে ঠিক উলটোভাবে। আমাদের কাছে সেই কথার কোনও অর্থ নেই, কিন্তু ওর কাছে আছে—অন্তত এই অ্যাক্সিডেন্টটার পর। লেখার বেলাতেও ঠিক তাই। অক্ষর, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির সিকোয়েন্স গেছে উলটে। ফলে সেইরকম উলটোভাবে কোনও কথা না বললে এখন তুতু আর বুঝতে পারবে না। যার জন্যে এই টেপরেকর্ডার আর কম্পিউটার জুড়ে কথার শব্দগুলো ওলটানোর ব্যবস্থা করেছি।

দেখলাম, মায়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাবাও চুপ। ওদের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। অ্যাক্সিডেন্টটার কথা আমার বেশ মনে আছে। মাত্র সাতদিন আগের ঘটনা। আমার বাবা গভর্নমেন্টের অর্ডন্যান্স ডিভিশনে কাজ করে। তাই আমাদের বেশ সতর্ক থাকতে হয়। বাড়ির যে-ঘরটা বাবা অফিসের কাজের জন্যে ব্যবহার করে তার চারদিকে একটা ফোর্স ফিল্ড চালু করা থাকে। ভীষণ দরকারি

আর গোপন নথিপত্রের নিরাপত্তার জন্যেই ওই ব্যবস্থা। সেদিন রাত্রিবেলা ফোর্স ফিল্ড চালু করার সময়ে তার বৈদ্যুতিক মেরু দুটো উলটে গিয়েছিল। আর আমি ফোর্স ফিল্ড এলাকা থেকে সরে আসার আগেই কী করে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যস। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন এই নার্সিংহোমে শুয়ে।

আমি ডাক্তারবাবুর কথাগুলো ভাবছিলাম। কী অদ্ভুত! একই শব্দের টুকরো একভাবে পরপর জোড়া দিয়ে গেলে অর্থ পাওয়া যায়, অথচ সেগুলো উলটো করে পরপর জোড়া দিলে কোনও মানে নেই! তার মানে সাজানোটাই আসল। আমাদের মস্তিষ্ক সেই সাজানো সারি থেকেই অর্থ খুঁজে বের করতে অভ্যস্ত। তাহলে ওই ফোর্স ফিল্ড কি আমার মস্তিষ্কের অভ্যেসকে পালটে দিয়েছে? ওই ট্রিজেমিনাল, অ্যাকাউস্টিক আর হাইপোগ্লসাল নার্ভগুলোর কাজের ধারাকে দিয়েছে উলটে? মনে আছে, মুখ গম্ভীর করে মা আর বাবা চলে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। চোখে জলের ফোঁটা। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না। মিস্টার রক্ষিত, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।'

এখন বেলা পড়ে এসেছে। জানলার পোলারয়েড কাচের রং ফিকে। আকাশের গায়ে সূর্যের লালচে রং দেখা যাচ্ছে। এমন সময়ে ঘরে এল সবাই। ডাক্তারবাবু, নার্স, আর তাদের পিছনে বাবা। সকলেরই মুখ থমথমে, গম্ভীর।

ডাক্তারবাবুর ইশারায় নার্স টেপরেকর্ডার ও কম্পিউটারের পুরোনো ব্যবস্থাটা চালু করে দিল। তারপর ডাক্তারবাবু আমাকে মামুলি কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিলাম। ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বারকয়েক মাথা নাড়লেন। তারপর বাবাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমাদের সামনে আর একটা পথই খোলা আছে...।' বাবা জিগ্যেস করল, 'কী সেটা?' ডাক্তারবাবু চোখ নামিয়ে বললেন, 'ওকে ওই ফোর্স ফিল্ডে রেখে সুইচ অন করে দিয়ে দেখা—যদি ক্রেনিয়াল নার্ভগুলোর কাজের ধারা আবার আগের মতো হয়ে যায়। আমাদের একটা চান্স নিতে হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

বাবার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। অথচ আমার কাছে ডাক্তারবাবুর প্রস্তাব বেশ কাজের বলেই মনে হচ্ছিল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, একটা ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে এত ক্ষমতা! কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাবা বলল, 'কিন্তু ডক্টর, ফোর্স ফিল্ড যে কীরকম বিপজ্জনক তা তো আপনি জানেন। তুতুর বয়েসের একটা ছেলে ওই ফিল্ডের মধ্যে পড়লে শুধু পাগল কেন একেবারে শেষও হয়ে যেতে পারে, শেষ! বাবাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'মিস্টার রক্ষিত, বিজ্ঞানের স্বার্থে আমার প্রস্তাবে আপনার রাজি হওয়া উচিত। আপনার ছেলের চেয়ে বিজ্ঞান অনেক বড়। বিজ্ঞানের কাছে এটুকু ঝুঁকি কিছুই নয়। এ ছাড়া এই উলটোপুরাণ ছেলেটাকে নিয়ে আপনি

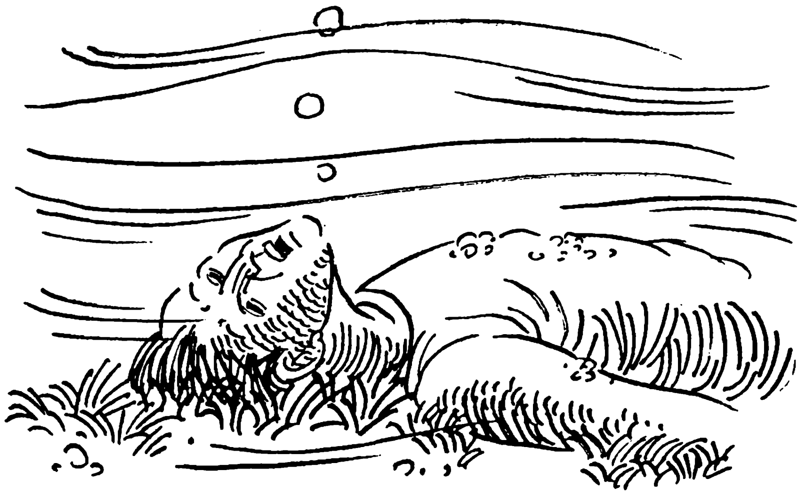
করবেন কী? ও আপনার কোনও কাজেই আসবে না।'

এ-কথা শুনে বাবা এক অদ্ভুত চিৎকার করে উঠল।

তখন ডাক্তারবাবু হঠাৎই খেয়াল করলেন যে, আমি ওঁদের সব কথা শুনতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। উনি নার্সকে ইশারা করলেন। নার্স কম্পিউটার ও টেপরেকর্ডারের কানেকশান খুলে দিল। বাবা ও ডাক্তারবাবুর কথাবার্তা আমার কাছে আবার জট-পাকানো হিজিবিজি। শুধু দেখলাম, বাবা হাত-পা ছুড়ছে, দেওয়াল চাপড়াচ্ছে, আর ডাক্তারবাবু দু-হাত নেড়ে তাকে কীসব বোঝাতে চেষ্টা করছেন। লক্ষ করলাম বাবার চোখে জল। এমনসময় ডাক্তারবাবু ঘরের দরজার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে কী যেন বললেন। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো জোয়ান লোক ঘরে এসে ঢুকল। ওদের গায়ে সাদা পোশাক। ওরা এসে বাবার হাত চেপে ধরল। বাবা জোর করে আমার কাছে এগিয়ে এসে ডুকরে উঠল, 'তুতু!' আমি বললাম, 'বাবা!'

ডাক্তারবাবু আর নার্স আমাদের কথায় একটু চমকে গেল। কারণ টেপরেকর্ডার আর কম্পিউটারের ব্যবস্থা ছাড়াই আমরা একে অন্যের কথা বুঝতে পেরেছি। চোখে জল নিয়েও বাবা হাসল। আমিও। আমাদের চোখে-চোখে কথা হল। টের পেলাম, বাবা, মা, তুতু, এই শব্দের টুকরোগুলো উলটোভাবে সাজালেও তাদের অর্থ একই থাকে। আমার শরীরে যেন কাঁটা দিল। পৃথিবীতে এমন কতকগুলো ডাক আছে যেগুলোকে হাজার শক্তিশালী কোনও ফোর্স ফিল্ডও ওলটাতে পারে না। হিজিবিজি করে দিতে পারে না। বাবা—মা—তুতু। তুতু—মা—বাবা। বাবা কি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে, মরতে আমি আর একটুও ভয় পাই না! একটুও না!





জলের তলায়

জি টি রোডের ধারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ চোখে পড়তেই সুশীল মাঝি বললেন, 'ওই গাছতলায় গাড়ি থামান।' আমি তাঁর কথামতো কাজ করলাম। টার্বো-প্রপ জিপটাকে ম্যাগনেটিক ব্রেক কষে চোখের পলকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। তারপর জিপ থেকে নেমে সাইরেন অফ করে দিলাম। ড্যাশবোর্ডের মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে কোড নম্বর বলে কম্পিউটার-লক করে দিলাম গাড়িটাকে।

সুশীল মাঝিও নামলেন গাড়ি থেকে। পরনের ধুতিটা সামলে নিয়ে বললেন, 'আসুন, রত্নেশ্বরবাবু, ওই বাঁশবনটা পেরোলেই সেই পুকুর।'

আমি পকেট থেকে কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের একটা পৃষ্ঠা বের করলাম। এই রিপোর্টটাই গতকাল এসেছে আমার কাছে। বড় রহস্যময় ঘটনা। জলের তলায় কী এমন ঘটনা ঘটল যাতে...।

সুশীলবাবু আচমকা বললেন, 'রত্নেশ্বরবাবু, এই সেই মরণ-পুকুর, প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো।'

বড় রাস্তা ছেড়ে ঘাসে-ছাওয়া উঁচু-নীচু ঢিবি পেরিয়ে আমরা বেশ কিছুটা পথ এসেছি। চারদিকে নানান গাছপালা—বাঁশবন, আগাছার ঝোপ, আর কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে। তারই ফাঁক দিয়ে ছোট-ছোট পায়ে চলা

পথ। সেরকমই দুটো পথ মাটির ঢাল বেয়ে নেমে গেছে বহু প্রাচীন ভাঙাচোরা ঘাটের দিকে।

পুকুরটা খুব বেশি বড় নয়। বড়জোর বিঘেখানেক হবে। চেহারাটা না-গোল, না-চৌকো। এই গরমের সময় জল যতটা শুকিয়ে যাওয়ার কথা ততটা শুকোয়নি। জলের রং সবুজ। আর চারদিকেই আগাছার ঝাড় নেমে গেছে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত। এককথায় নোংরা ডোবাও বলা চলে।

পুকুরের একটাই মাত্র ঘাট। ঘাট বলতে কতকগুলো কাত হয়ে পড়া ইটের চাঙড়। সেখানে একজন মহিলা বসে কাপড় কাচছেন। আর একজন পুরুষ ঘাটে বসে মগ দিয়ে জল তুলে স্নান করছেন।

ঘাট যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে ঢালের মুখে বাঁ-দিকে একটা প্রকাণ্ড কাকতাড়ুয়া। তার বুকে একটুকরো জং-ধরা টিনের পাতের ওপরে কাঁচা হাতে লেখা ঃ বিপদ।

আমাদের দেখে পুরুষমানুষটি স্নান থামিয়ে নমস্কার করলেন সুশীলবাবুকে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ সুশীল মাঝি এখানকার অঞ্চল-প্রধান। আর মহিলাটি তাড়াহুড়ো করে কাচাকাচি সেরে উঠে চলে গেলেন।

প্রথম মানুষটি গামছা দিয়ে গা মুছতে-মুছতে ওপরে উঠে এলেন। আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। সুশীলবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে আমি একটা আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বের করে আগন্তুককে দেখালাম। বললাম, 'আমার নাম রত্নেশ্বর রায়। গভর্নমেন্টের প্যারানরমাল ফেনোমেনা অ্যানালিসিস উইং থেকে আসছি। গতকালের ঘটনা নিশ্চয়ই জানেন? তার রিপোর্ট পৌঁছেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। আমি সেটাই তলিয়ে দেখতে এসেছি।'

ভদ্রলোক আমার কথা শেষপর্যন্ত শুনলেন না। সুশীলবাবুর দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ওসব তদন্তে-ফদন্তে কিস্যু হবে না, সুশীলদা। এ-পুকুরের জলের তলায় অপদেবতা আছে, অভিশাপ আছে।'

সুশীলবাবু তাঁকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'আহা, নৃপেন, তুমি থামো। ওঁকে ঠিকমতো কাজ করতে দাও।'

নৃপেনবাবু একবার আমার দিকে দেখলেন, তারপর আবার তাকালেন সুশীল মাঝির দিকে। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'এই পুকুর আমার বাপকে খেয়েছিল। সে-ঘটনা যারা স্বচক্ষে দেখেছিল তারা বলেছে জলের তলা থেকে কোনও দানো বাপের গা ধরে টেনে নিয়েছিল। কালকের ব্যাপারটাও তাই।'

এ-কথা বলে নৃপেনবাবু কীসব বিড়বিড় করতে-করতে চলে গেলেন। তাঁকে আমি কী করে বোঝাব, এই একবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনার কোনও স্থান নেই। আর জনসাধারণের মন থেকে মিথ্যে ভয় ও কুসংস্কার তাড়ানোর জন্যেই সরকার তৈরি করেছে 'প্যারানরমাল ফেনোমেনা অ্যানালিসিস উইং'। কোনওরকম

'অলৌকিক' ঘটনার হদিস পেলেই আমাদের দফতর সেখানে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে দেয়। তারপর তন্ন-তন্ন করে তদন্ত করে বের করে সেই ঘটনার 'অলৌকিকত্বের' কারণ। এ-বিষয়ে আবার নানান বিভাগ আছে। যেমন, জল, যানবাহন, বাড়ি, মাঠ, আকাশ—এই সব। অর্থাৎ, 'অলৌকিক' ঘটনা কোথায় ঘটছে সেই বুঝে উপযুক্ত বিভাগের লোক পাঠানো হয়। আমি জল বিভাগের লোক। এবং বিশেষজ্ঞ।

রিপোর্টটা আমার হাতেই ছিল। সেটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। নৃপেনবাবুর বাবা যখন মারা যান, তখন কোনও শোরগোল হয়নি। আমাদের ডিপার্টমেন্টেও কোনও খবর পৌঁছোয়নি। কিন্তু গতকালের ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। গতকাল এই পুকুরে ডুবে মারা গেছেন বিখ্যাত সাঁতারু চিরদীপ দাস। গত ২০০৪ সালের ওলিম্পিকে সাঁতারে যিনি দু-দুটো সোনা জিতেছেন—একটা ১০০ মিটারে, আর-একটা ২০০ মিটারে। সাঁতারে ভারতের একমাত্র সোনা-বিজয়ী।

রিপোর্ট ছাড়া বাকি গল্পটুকু আমি জিপে আসতে-আসতে সুশীলবাবুর মুখেই শুনেছি। এই গাঁয়ে চিরদীপ দাসের আদি বাড়ি। গত বিশ বছর ধরে এখানে ওঁরা কেউই থাকতেন না। তবে মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ গাঁয়ের বাতাস গায়ে মাখতে আসতেন। যেমন, গত পরশু চিরদীপ একা এসেছিলেন। কোন ছোটবেলায় গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই তাঁর প্রথম আসা। এবং এই শেষ।

বেশ বুঝতে পারছি ঘটনাটা কী ঘটেছিল। গাঁয়ে এসে এই পুকুরের অভিশাপের গল্প নিশ্চয়ই চিরদীপের কানে গিয়েছিল। তখন অলিম্পিক সাঁতারু চিরদীপ সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অভিশাপের ব্যাপারটা যে ভিত্তিহীন, উদ্ভট কল্পনা, সেটা প্রমাণ করতে চিরদীপ এই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটা দেখার জন্যে প্রচুর লোক পুকুরপাড়ে জড়ো হয়েছিল। আর তাদের চোখের সামনেই খাবি খেতে-খেতে তলিয়ে গেছেন ওলিম্পিকে সোনা-বিজয়ী সাঁতারু চিরদীপ দাস। সুশীলবাবুও নিজের চোখেই দেখেছেন চিরদীপের মৃত্যু।

আমি বুঝতে পারলাম, সুশীলবাবু আমাকে লক্ষ করছেন। বোধহয় উনি আঁচ করেছেন আমি কী ভাবছি। একটু পরেই ওঁর কথায় তার প্রমাণ পেলাম।

আমাদের গায়ে চড়া রোদ লাগছিল। সুশীলবাবু আমাকে আলতো করে একটা গাছের ছায়ায় টেনে নিলেন। হাত বুলিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'চিরদীপকে নিয়ে এ-পর্যন্ত মোট পাঁচজন হল। মানে আমার জীবনে। তার আগে আরও কত গেছে কে জানে! সকলকে সাবধান করার জন্যে এই বিপদের নোটিস আজ প্রায় বারো বছর ধরে লাগানো আছে। আমরা কি এ-পুকুরে স্নান করি না? করি। তবে ওই ঘাটে বসে মগ, বালতি, কি বাটি দিয়ে। ওই নৃপেনকে যেমন দেখলেন।'

আমি পুকুরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সুশীল মাঝিকে দেখলাম। বললাম, 'চিরদীপবাবুকে তো আপনি মরতে দেখেছেন। আপনার কি মনে হয়েছিল যে,

তাঁকে কেউ জলের তলা থেকে টেনে নিচ্ছে?'

সুশীলবাবু মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত চালালেন। বারদুয়েক গাল চুলকে বললেন, 'হতে পারে। ভালো করে বুঝতে পারিনি। তবে চিরদীপ ভীষণ আঁকুপাঁকু করে হাত-পা ছুড়ছিল। চিৎকারও করছিল ''বাঁচাও, বাঁচাও'' বলে। কিন্তু কে বাঁচাবে বলুন!'

সুশীলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, 'দেখুন, আপনি যদি এর একটা সমাধান করতে পারেন। অতগুলো লোকের চোখের সামনে জোয়ান ছেলেটা মারা গেল, অথচ আমরা কিছু করতে পারলাম না—।'

পুকুরের পাড় ঘেঁষে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে বেশ কয়েকটা হাঁস ঘুরঘুর করছিল। লক্ষ করলাম, ওরা মোটেই জলে নামছে না। বরং ডাঙা থেকে ঠোঁট বাড়িয়ে জলের কিনারা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এ-পুকুরে হাঁস নামে না?'

সুশীল মাঝি বললেন, 'নাঃ। ওরা তো আর আমাদের মতো নয়। ওরা বিপদের গন্ধ পায়।'

আমি অবাক হয়ে পুকুরের সবুজ জল দেখতে লাগলাম। রোদের ছোঁয়া লেগে জল ঝিকমিক করছে। এলোমেলো বাতাসে জলে ছোট-ছোট ঢেউয়ের শিরা ফুটে উঠছে। দেখে কে বলবে, এই পুকুর অন্তত পাঁচজনের প্রাণ নিয়েছে!

রিপোর্টটা পকেটে রেখে আমি একটা বড়সড়ো মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিলাম। কিছু না ভেবেই ছুড়ে মারলাম পুকুরের শান্ত জলে। ঝুপ করে একটা শব্দ হল। তারপর ঢেউ উঠল। গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

আমি পকেট থেকে দুটো স্টেরিলাইজড পলিথিন ব্যাগ বের করলাম। জলের নমুনা নিতে হবে এতে। তারপর নিয়মমাফিক বিশ্লেষণ করতে হবে ল্যাবরেটরিতে। কিছু পাওয়া যাক আর না যাক, এটাই তদন্তের প্রাথমিক নিয়ম।

ভাঙা ঘাটে নেমে ঝুঁকে পড়ে জল সংগ্রহ করতে লাগলাম। সুশীলবাবুও আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। উনি যে রীতিমতো কৌতূহল নিয়ে আমার কাজকর্ম লক্ষ করছেন তা বেশ বুঝতে পারছি। জল নেওয়া হয়ে গেলে ব্যাগ দুটো এক বিশেষ ধরনের আঠা 'ইনস্ট্যাফিক্স' দিয়ে সিল করলাম। এই আঠা সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ে দেয়। জোড়ায় কোনও ফাঁক থাকে না। সুশীলবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'আগের চারজনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তো?'

সুশীলবাবু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় চার-পাঁচ দিন পরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল।'

চার-পাঁচ দিন! একটু অবাক হলাম। সময়টা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু কেন? জলের তলার অপদেবতা কি লাশ আগলে বসে থাকে? হাসি পেল আমার। তবে সেটা বাইরে প্রকাশ না করে আবার প্রশ্ন করলাম, 'লাশ পরীক্ষা

করে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি?'

'না। শুধু কয়েকটা ঘা-এর মতো দেখা গিয়েছিল। নৃপেনের বাবার লাশ তো পুলিশ-মর্গে নিয়ে কাটাছেঁড়াও করেছিল, কিন্তু রিপোর্টে কিছু পাওয়া যায়নি বলেই শুনেছি।'

আমি মনে-মনে একটা হিসেব কষছিলাম। দেড়শো বছরের পুরোনো পুকুর। জলজ আগাছায় ভরতি। হাঁস এই পুকুরে নামে না। লাশ ভেসে ওঠে অনেক দেরিতে। তা হলে কি...?

'আচ্ছা, সুশীলবাবু, এ-পুকুরে মাছ-টাছ নেই?' সুশীল মাঝিকে প্রশ্নটা করে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। আমার হিসেব যদি এককণাও সত্যি হয়, তাহলে উত্তরটা বোধহয় আমি জানি।

সুশীলবাবু বললেন, 'আছে খুব সামান্যই। তবে বেশিরভাগ কই, মাগুর, শোল, এইসব মাছ।'

বুঝলাম, উনি ঠিকই বলেছেন। এইসব মাছের দুটো শ্বাস-অঙ্গ আছে। বেঁচে থাকার জন্যে বাতাস থেকেও এরা অক্সিজেন নেয়। শুধু জলের ওপরে নির্ভর করে এইসব মাছ বাঁচতে পারে না।

আমি ঘড়ি দেখলাম। ডিপার্টমেন্টাল টিমের আসার সময় হয়ে গেছে। আমার বুক-পকেটে রাখা খুদে ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের বিপার বেজে উঠল। ওটা বের করে নিয়ে কথা বললাম। ওরা আর বিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। ওরা এসে পড়লেই এখানে তুলকালাম শুরু হবে। জলে জাল ফেলবে। চিরদীপ দাসের লাশ উদ্ধার করবে। তখন কি একইসঙ্গে পাওয়া যাবে কোনও আশ্চর্য জলচর প্রাণী? মনে হয় না। ওরা হয়তো জলে ডুবুরি নামাবে। তারপর রকমারি যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপজোখের পরীক্ষা শুরু করবে।

কিন্তু ওরা এসে পুকুর তোলপাড় করার আগে একটা ঝুঁকি কি আমি নিতে পারি না? সেটাই হবে আমার চরম পরীক্ষা। আর তার ফলাফল হবে চরম প্রমাণ। কেমন একটা জেদ চেপে বসল মাথায়। পলিথিন ব্যাগ দুটো নিয়ে জিপের দিকে রওনা হলাম। সুশীলবাবুকে বললাম, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

জলের নমুনা রেখে আমি যখন ফিরে এলাম সুশীলবাবু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার রত্নেশ্বরবাবু?'

ওঁর অবাক হওয়ারই কথা। কারণ এখন আমার পরনে সাঁতারের পোশাক। চোখে ডুবুরি-চশমা। কোমরে ইস্পাতের আংটার সঙ্গে লাগানো নাইলন দড়ি। আর তার পাশেই ফিতেয় বাঁধা খাটো ছুরি।

নাইলন দড়ির খোলা দিকটা সুশীলবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, 'শক্ত করে ধরে রাখুন। আমি পুকুরে নামছি। যদি কোনও বিপদ হয় চিৎকার করে উঠব। আর সঙ্গে-সঙ্গে আপনি দড়ি টেনে আমাকে ঘাটে তুলবেন। কী, পারবেন তো?'

সুশীলবাবুর বয়স্ক মুখে একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, 'পারব মানে, আমাকে পারতেই হবে!'

আমরা দুজনে ঘাটের কাছে নেমে গেলাম। সুশীলবাবু দড়িটা হাতে কয়েক পাক পেঁচিয়ে একটা ইটের চাঙড়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। আর আমি 'কোনও ভয় নেই' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মরণ-পুকুরের সবুজ জলে।

ওলিম্পিকে সোনা পাইনি বটে, তবে সাঁতারে আমি ছেলেমানুষ নই। কিন্তু জলে পড়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে আমি চমকে গেলাম। কিছুতেই শরীরটাকে আমি ভাসিয়ে রাখতে পারছি না। শুধু হাত-পা ছোড়াছুড়িই সার। আমাকে ঘিরে মরণ-পুকুরের জল ছিটকে উঠছে চারদিকে। ভালো করে ঠাহর করে দেখলাম। না, আমার পা ধরে কেউ টানছে না। তবুও আমি তলিয়ে যাচ্ছি।

সুশীলবাবু চিৎকার করে উঠলেন। দূরে টার্বো-প্রপ জিপের শব্দ শোনা গেল। দলবল এসে গেছে। কিন্তু আমি চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বের করতে পারছি না। শুধু প্রাণপণে বাতাস টানতে চাইছি। সুশীলবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন। টের পেলাম নাইলন দড়িটা উনি প্রাণপণে টানছেন। আমার চোখের সামনে অসংখ্য জলের কুচি রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠছে। ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে কেউ যেন হাপর চালাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি অনেকগুলো মুখ আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে। সুশীলবাবু ছাড়া অন্যান্য মুখগুলোকে চিনতে পারলাম। ওরা আমার ডিপার্টমেন্টের লোক। আমি উঠে বসলাম। সুশীলবাবু বললেন, 'কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?'

আমি কষ্ট করে হেসে তাঁকে বললাম, 'না, ঠিক আছি।'

তারপর আমাদের দলের ফার্স্ট অফিসার শর্মাকে লক্ষ করে নির্দেশ দিলাম, 'রুটিন ইনভেস্টিগেশান আর অ্যানালিসিসগুলো করে ফেলুন। তবে মনে হয় ব্যাপারটা আমি ধরতে পেরেছি। আপনি ইন্স্ট্রুমেন্ট বক্স থেকে ডিজিটাল ডেন্‌সিমিটারটা শুধু আমাকে দিন।'

শর্মা সকলকে কাজে লেগে পড়তে বলল। তারপর চটপট উঠে গেল জিপ থেকে যন্ত্রটা নিয়ে আসতে।

আমি সুশীলবাবুকে ধন্যবাদ জানালাম। উনি দড়ি টেনে ঘাটে না তুললে আমার অবস্থাও হত চিরদীপ দাসের মতো। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগোলাম। যেতে-যেতে বললাম, 'সুশীলবাবু দেড়শো বছরের পুরোনো এই পুকুরের তলায় কোনও প্রাণীও নেই, কোনও অপদেবতাও নেই। আর অভিশাপের ব্যাপারটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।'

উনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে?'

শর্মা মিনিয়েচার ডেন্‌সিমিটারটা আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি ওকে বললাম, 'পনেরো মিনিট পর-পর আমাকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেবেন, হেডকোয়ার্টার্সে

ট্রান্সমিট করব। আমি গাড়িতেই আছি।'

পুকুর নিয়ে আমার আর কৌতূহল নেই। কারণ উত্তরটা আমার নিশ্চিতভাবে জানা হয়ে গেছে। ডেন্‌সিমিটারের পরীক্ষাটা শুধু অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার জন্যে।

জিপের কাছে গিয়ে একটা পলিথিন ব্যাগ খুলে খানিকটা জল ডিজিটাল ডেন্‌সিমিটারের ভলিয়্যুম চেম্বারে ঢেলে দিলাম। তারপর সুইচ অন করতেই ডিসপ্লে প্যানেলে একটা সংখ্যা ফুটে উঠল ঃ ০৮০।

অকাট্য প্রমাণ। আমি হেসে উঠলাম। সুশীলবাবু ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখতে লাগলেন। আমি মিটারের সুইচ অফ করে তাঁকে বললাম, 'সুশীলবাবু, এই পুকুরের জলের ঘনত্ব স্বাভাবিক জলের ঘনত্বের চেয়ে অনেক কম। তাই...।'

আমাকে বাধা দিয়ে সুশীল মাঝি বললেন, 'ঘনত্ব মানে?'

আমি এক সেকেন্ড ভেবে বললাম, 'মানে বলতে পারেন, স্বাভাবিক জলের চেয়ে এই পুকুরের জল পাতলা। যেমন ধরুন, অনেকটা কেরোসিন তেলের মতো। তাই এই জলে সাঁতার কেটে ভেসে থাকা অসম্ভব। এমনকী, হাঁসেরাও পারে না। সেইজন্যেই ওরা এই পুকুরের জলে নামে না। আর মানুষের মৃতদেহও ভেসে ওঠে অনেক দেরিতে—অনেক বেশি ফুলে-ফেঁপে ওঠার পর। চিরদীপ দাস একই কারণে এই পুকুরে তলিয়ে গেছে। যেমন আমিও তলিয়ে যাচ্ছিলাম।'

কতগুলো রহস্যময় দুর্ঘটনার কী সহজ এবং নিষ্ঠুর উত্তর! ঘনত্বের শতকরা কুড়ি ভাগ তফাত কী অদ্ভুতভাবেই না বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে!

সুশীল মাঝি জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু জলটা পাতলা হল কেমন করে, রত্নেশ্বরবাবু?'

আমি চুপ করে রইলাম। সেটা তো আমারও প্রশ্ন। জিওল মাছ ছাড়া অন্য কোনও মাছ এ-পুকুরে বিশেষ নেই। হয়তো দেড়শো বছরের এই জলের সঙ্গে মিশে গেছে এমন কোনও জৈব রাসায়নিক তরল যার ঘনত্ব জলের চেয়ে অনেক কম। বলা যায় না, এই পুকুরের জলে হয়তো রয়েছে এমন সব জলজ উদ্ভিদ, যা পচে গলে তৈরি হয়েছে কোনও হাইড্রোকার্বন যৌগ। তারপর তা থেকে এসেছে কোনও জৈব রাসায়নিক—ক্রমাগত জলে মিশে গিয়ে সেই রাসায়নিকই হয়তো কমিয়ে দিয়েছে এই পুকুরের জলের ঘনত্ব। আর একইসঙ্গে জিওল মাছ ছাড়া অন্যান্য মাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এত সব সম্ভাবনার কথা না বলে সুশীলবাবুকে জবাব দিলাম, 'পুকুরের জলের নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করলেই সেই কারণটি হয়তো জানা যাবে।'

এমনসময় পুকুরের দিক থেকে একটা হইচই কানে এল। বোধহয় চিরদীপ দাসের মৃতদেহটা ওরা খুঁজে পেয়েছে।



মশক, মূষিক ও মার্জার

বিশ্বকাকু প্লেটের শেষতম রসগোল্লাটা মুখে পুরে দিয়ে চোখ দুটো সামান্য বড় করে চোয়াল নাড়িয়ে মিষ্টিটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছিল, হঠাৎই তার চোখ পড়ল বাবান টিভির নীচে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে একটা বই পড়ছে, আর মৌ পাশেই সোফায় বসে ওয়ার্ক এডুকেশানের একটা হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। বিশ্বকাকু টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল শেষ করে প্রথম কথা বলতে পারল, 'আঃ, এতক্ষণে বডিটা একটু জুত হল। জানিস তো, যারা নামকরা বডি বিল্ডার তারা রসগোল্লা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে। অবশ্য মিষ্টি সবাই সহ্য করতে পারে না, তাই তার বদলে দুধ আর ছানা খায়।'

বাবান-মৌ বিশ্বকাকুর কথায় কান দিয়েছে বলে মনে হল না। বিশ্বকাকু যখন-তখন ওদের বাড়িতে আসে যায়, খাবারদাবার খায়, তাদের সঙ্গে মজা করে, আর সত্যি ঘটনা বলে নানান উদ্ভট গল্প শোনায়।

বিশ্বকাকু সোফায় বসে বসেই হাঁক পাড়ল, 'বউদি, বউদি—। চায়ের কথাটা আবার ভুলে যেয়ো না যেন।'

রান্নাঘর থেকে বাবান-মৌয়ের মা, অর্থাৎ বিশ্বকাকুর বউদি চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'ভুলিনি, ভুলিনি।'

বিশ্বকাকু এবারে সোফায় পা তুলে বসে হাত দুটোকে ব্যায়াম করার ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করে গম্ভীরভাবে বলল, 'বাবান, তোদের টিভির তলায় সাদা বলের মতো ওটা কী পড়ে আছে রে?'

বাবান বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'ফেলিস ক্যাটাস—গৌতম।'

বিশ্বকাকু হাঁ করে বাবানের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে ছোঁ মেরে ওর বইটা কেড়ে নিল।

বাবানের উত্তর শুনে মৌ হেসে ফেলেছিল। এবারে হাতের কাজ রেখে ঘুরে বসল কাকুর দিকে।

বিশ্বকাকু বাবানের বইটা টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, 'ছিঃ, ছিঃ! তুই গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস?'

বাবান হেসে বলল, 'সে কী, কাকু, তুমি ফেলিস ক্যাটাস মানে জানো না! বেড়াল, বেড়াল—মার্জার!'

বিশ্বকাকু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'সে আর জানি না, জুওলজির বিজ্ঞানীরা গৃহপালিত বেড়ালকে ফেলিস ক্যাটাস বলে! তা গৌতম না কী একটা বললি যেন—।'

মৌ এবারে বলল, 'দাদা বেড়ালটার নাম দিয়েছে গৌতম। দাদার ইস্কুলের এক বন্ধু আছে, নাম গৌতম। খুব ভালো ক্যারাম খেলে বলে খুব অহঙ্কার। দাদাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ক্যারামে। বলেছিল, ''যদি আমাকে গেম দিতে পারিস তাহলে আমার নামে বেড়াল পুষিস।'' দাদা ওকে হারিয়ে একেবারে ভূত করে দিয়েছে। তারপর কোত্থেকে একটা বেড়ালছানা জুটিয়ে নাম রেখেছে গৌতম।'

বাবান বলল, 'কাকু, এবারে বইটা দাও। গল্পটা দারুণ ইন্টারেস্টিং—।'

বিশ্বকাকু আপনমনেই বিড়বিড় করতে লাগল, 'বেড়াল...ফেলিস ক্যাটাস... বেড়াল...ফেলিস ক্যাটাস...বেড়াল...।'

তারপর হঠাৎই চিৎকার করে উঠল, 'মনে পড়েছে! মশক, মূষিক ও মার্জার।'

বাবান-মৌ ফ্যালফ্যাল করে বিশ্বকাকুর দিকে তাকাতেই ওদের মা চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে পড়ল, বলল, 'ছোড়দা, তুমি কি সংস্কৃত আওড়াচ্ছিলে?'

বিশ্বকাকু চায়ের কাপে তেজি চুমুক দিয়ে বলল, 'সে অনেক ব্যাপার, বউদি। আফ্রিকার একটা ঘটনা। দারুণ ইন্টারেস্টিং।'

'তোমার গল্প তুমি ওদের শোনাও। আমার রান্না পুড়ছে।' বলে মা চলে যেতেই বাবান-মৌ দুজনেই চেপে ধরল বিশ্বকাকুকে। বলল, 'কুইক, স্টার্ট, ওয়ান, টু-থ্রি...

বিশ্বকাকু চোখ বুজে চায়ের কাপে পরপর তিনবার আমেজ করে চুমুক

দিল। তারপর বলল, 'ঘটনাটা আফ্রিকার কঙ্গোর। আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। কঙ্গো না বলে অবশ্য জায়ার বলাই ভালো, কারণ ১৯৭১ সাল থেকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর নাম পালটে জায়ার রাখা হয়েছে। কঙ্গো নদীর নাম শুনেছিস তো? জায়ার হচ্ছে কঙ্গো নদীর খুব পুরোনো নাম। সেই থেকেই চলে এল দেশের নাম। তা এই দেশটার ওপর দিয়ে বিষুবরেখা চলে গেছে—একেবারে কঙ্গো নদীর ওপর দিয়ে, দু-জায়গায় নদীটাকে ভেদ করে। আর এইখানেই যত সব ভয়ঙ্কর ঘন জঙ্গল। চিরহরিৎ অরণ্য। বছরে বৃষ্টিপাত প্রায় একশো ইঞ্চি।'

বিশ্বকাকু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। মৌ বলল, 'কঙ্গোর সঙ্গে বেড়াল আসছে কোত্থেকে?'

বিশ্বকাকু বলল, 'একটু ধৈর্য ধর, বাবা, এক্ষুনি বুঝতে পারবি।'

টিভির নীচ থেকে গৌতম মিয়াঁও-মিয়াঁও করে ডেকে উঠল। তারপর আড়মোড়া ভেঙে লেজটা পতাকার মতো সোজা ঊর্ধ্বমুখী করে পায়ে-পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিশ্বকাকু আবার বলতে শুরু করল, 'এই রকমই একটা বেড়ালের বাজিমাতের ব্যাপার! জানিস তো, জায়ার হিরের জন্যে খুব বিখ্যাত। আমরা জায়ারের জঙ্গলে গিয়েছিলাম হিরেরই খোঁজে। বান্টুদের একটা গ্রাম থেকে খবরটা প্রথম ছড়াতে শুরু করেছিল। ওই গ্রামের কোনও একটা আদিবাসী নাকি কঙ্গো নদীর বিষুব অঞ্চলের কাছাকাছি একটা বড় হিরে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ব্যস, ওই গুজবের ভিত্তিতে পশ্চিমের এক বড়লোক কোম্পানি বহু টাকা খরচ করে আমাদের চারজনের একটা অভিযাত্রী দলকে পাঠিয়ে দিল হিরের সন্ধানে। আমরা তো লোকলশকর নিয়ে রওনা হলাম। কখনও হেঁটে, কখনও ট্রেনে চড়ে, কখনও নৌকো ভাসিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ক্রমে-ক্রমে আমরা পৌঁছে গেলাম লোমেলা নদীর কাছে। সেখানে গ্রামে আমরা বিশ্রাম নিলাম কয়েকদিন। এরপর থেকেই শুরু হবে আমাদের আসল অভিযান।

'বাঁশের বাঁখারির তৈরি দেওয়াল আর বড়-বড় পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরে আমাদের রাত কাটাতে দেওয়া হল। আর খাবার বলতে পেলাম আগুনে সেঁকা শুয়োরের মাংস। সেখানেই আবার এক বন্ধু জুটে গেল। যাকে তোরা বলিস ফেলিস ক্যাটাস, অনেকটা তাই। এর নাম হল ফেলিস ক্যাপেন্সিস বা সহজে সার্ভাল। লম্বা-লম্বা পা, খাটো লেজ, মাথার ঠিক ওপরে মুকুটের মতো এক জোড়া কান। চেহারায় দারুণ—ঝকঝকে হলদে রঙের ওপরে কালো-কালো ছোপ, আর প্রায় সাড়ে তিনফুট লম্বা হবে। বেড়ালটা কারও পোষা নয়। বনবেড়াল। খেয়ালখুশি মতো গাঁয়ে আসে, নয়তো জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়—

খরগোশ, ইঁদুর, হরিণছানা ধরে মেরে খায়। আর বেড়ালটা দেখলাম লাফাতে পারে দারুণ, এমনকী গাছেও চড়তে পারে। আমি বেড়ালটার নাম দিলাম ক্যাঙ্গো—মানে ক্যাট অফ কঙ্গোর শর্টকাট।

'তোরা তো জানিস, পশুপাখিরা আমাকে দেখলে কেমন বশ হয়ে যায়। তা এই বেড়ালটাও কী করে যেন আমার বন্ধু হয়ে গেল। আমার থেকে মাংস-টাংস খেতে লাগল, আর কেমন ওয়াঁও-ওয়াঁও করে ডাকতে লাগল। সে যাই হোক, রাতে তো একফোঁটা ঘুমোতে পারলাম না ঃ কারণ মশা। কঙ্গোর মশা যে কী জিনিস—যে কামড় না খেয়েছে সে কিছুতেই বুঝবে না—পারলে চাটাই থেকে আমাদের লাশগুলো তুলে নিয়ে যায় জঙ্গলে। কোনওরকমে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন সকালেই ঠিক করলাম, আগে এর একটা বিহিত করতে হবে। হিরের খোঁজ হবে পরে।

'দিনের বেলা রোদ উঠল চড়া। দেখি, দূরে একটা বিশাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্যাঙ্গো একটা মেঠো ইঁদুরের ঘাড় মটকে খাচ্ছে। আর এদিকে বান্টুরাও তাদের রান্নার আয়োজন শুরু করে দিয়েছে। ওদের তো রান্না বলতে হয় সেদ্ধ, না হয় পোড়া। সুতরাং সেরকমই গন্ধ ভাসছে বাতাসে। আমি খোলা জমিতে দাঁড়িয়ে এক্সাইজ করছিলাম—।'

মৌ ফিক করে হেসে বলল, 'কাকু, এক্সাইজ নয়—এক্সারসাইজ।'

বিশ্বকাকু হাত নেড়ে মৌয়ের কথা একরকম উড়িয়ে দিয়েই বলল, 'এক্সাইজ কথাটাও এমন মারাত্মক কিছু ভুল নয়, বহু লোকে বলে। যাকগে, তারপর কী হল বলি। আমি তো ব্যায়াম করছি, হঠাৎ দেখি একটা বেঁটে আদিবাসী চারটে মেঠো ইঁদুর লেজ ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একেবারে জ্যান্ত ইঁদুর! তক্ষুনি আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। জলদি আমাদের ইন্টাপিটার, মানে দোভাষীকে ডাকলাম...।'

বাবান গম্ভীরভাবে বলল, 'ইন্টাপিটার নয়, ইন্টারপ্রিটার—।'

'আবার তুই গুরুজনের ভুল ধরছিস?' বিশ্বকাকু চোখ বড় করে তাকাল।

বাবান কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'কী করব, কাকু, গুরুজনে বললেই কি ভুলটা ঠিক হয়ে যাবে? এই হয়েছে ছোটদের বিপদ!'

বিশ্বকাকু বলল, 'তোর ওসব পাকা-পাকা কথা বাদ দে তো। এখন কাজের কথা শোন। আমার মাথায় তক্ষুনি যে-আইডিয়াটা এল তা একেবারে নোবেলজয়ী আইডিয়া। দোভাষী ছুটতে-ছুটতে এল আমার কাছে। তখন তাকে আমি বললাম যে, ওইরকম জ্যান্ত মেঠো ইঁদুর আমার অন্তত একডজন চাই। দোভাষী বলল, এ আর বেশি কথা কী! ওদের কেউ-কেউ ইঁদুরের রোস্ট পছন্দ করে, তাই ইঁদুর প্রায়ই ওদের ধরতে হয়। সে যাই হোক, লোকটা সব ব্যবস্থা করে দিতেই

আমার কাজ শুরু হল, ভিমরুল সাইজের মশাগুলো যথারীতি ভনভন আওয়াজ তুলে ঘুরছে আর কটাস-কটাস করে কামড়াচ্ছে। আমি মনে-মনে বললাম, জায়ারের মশা যদি নির্বংশ করতে না পারি তো আমারও নাম নেই। কলকাতার বাঙালির সঙ্গে টক্কর দেবে আফ্রিকার জংলি মচ্ছর!

'আমার দলের লোকজন সব তো অবাক হয়ে গেল। ভাবল, লোকটা ঘরের ভেতরে উনুন তৈরি করে দিনরাত্তির করছে কী? এমনকী ক্যাঙ্গোও আমার পরীক্ষাগারের বাইরে লাগাতার ঘুরঘুর করতে লাগল আর কালোয়াতি ডাক ছাড়তে লাগল। কিন্তু আমি নট নড়নচড়ন—একেবারে স্টেডি রিসার্চ। ছোটবেলা থেকে যত কেমিস্ট্রি পড়েছিলাম সব লড়িয়ে দিলাম মশক নিধন সাধনায়। অ্যারোম্যাটিক কম্পাউন্ডের নাম শুনেছিস? সেইসব বিদ্যেও খুব কাজে লেগে গেল। এইভাবে সাতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফল পাওয়া গেল। সাকসেসফুল হলাম। দলের অভিযাত্রীদের বললাম, "ভায়া, হিরে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কিন্তু হিরে তোলার আগেই মশা যদি আমাদের পটল তুলতে বাধ্য করে তাহলে আর অভিযানে এগিয়ে লাভ কী? কঙ্গো নদী পেরোনোর বদলে সোজা বৈতরণী পেরিয়ে গুডবাই করে দিতে হবে সবাইকে। এই দ্যাখো, আমার এই রিসার্চ পৃথিবী থেকে মশা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তখন একটা বাচ্চা ছেলেও আফ্রিকা-অভিযানে নির্ভয়ে এগোতে পারবে। সুতরাং, আগে মসকুইটো, পিছে ডায়মন্ড।"

'অভিনব রিসার্চের যুগান্তকারী ফল প্রয়োগ করলাম আটদিনের মাথায়। ব্যস, অ্যাপ্লিকেশন করা মাত্রই অ্যাকশন হাতেনাতে। এই দ্যাখ—।'

বলে বিশ্বকাকু জামার আস্তিন গুটিয়ে কয়েকটা পুরোনো কাটা দাগ দেখাল। এই দাগগুলো বাবান-মৌ আগেও দেখেছে। কখনও ছুরিধারী গুণ্ডার আক্রমণে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, কখনও এর কারণ ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমার স্প্লিন্টার, আর কখনও বা ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখ দিয়ে দড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে এই কাটাছেঁড়ার দাগ তৈরি হয়েছে।

বাবান বলল, 'মশা তাড়ানোর রিসার্চের সঙ্গে তোমার হাত কাটার কী সম্পর্ক?'

বিশ্বকাকু বিজ্ঞের মতো হাত নেড়ে বলল, 'আছে, আছে। ওখানে শুধু আমার নয়, সকলেরই কমবেশি চোট লেগেছিল। আর ওই হুলস্থুল কাণ্ডকারখানার জন্যেই তো শেষ পর্যন্ত হিরে উঠল মাথায়, আর চাচা আপন প্রাণ বাঁচা বলে আমরাও নৌকো বেয়ে পগারপার।'

মৌ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কিন্তু এই যে বললে রিসার্চ! সাকসেসফুল হয়েছিল—।'

বিশ্বকাকু ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছিল রে, বড্ড বেশি সাকসেসফুল হয়ে গিয়েছিল আমার রিসার্চ। যাকগে, শোন। আটদিনের মাথায় আমার যুগান্তকারী ওষুধ স্প্রে করে প্রয়োগ করলাম ওই গাঁয়ে। তারপরই সবাই লক্ষ করল, কোথা থেকে যেন তিরের বেগে ছুটে এল ক্যাঙ্গো। আর এসেই ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ভিমরুল সাইজের মশাগুলোর ওপরে, আর কপাকপ ধরে গিলতে লাগল। তারপর দেখতে-দেখতে ওখানে এসে হাজির হয়ে গেল অন্তত আট-ন'টা ক্যাঙ্গোর মতো সার্ভাল। আর ওরা সবাই মিলে যাবতীয় মশা কপাকপ গিলে ফেলতে লাগল। সব মিলিয়ে সে এক হইহই দৃশ্য।'

'তখন গাঁয়ের সবাই তো মহাখুশি। মশার কামড়ে আর কাউকে কষ্ট পেতে হবে না। এমন সময় আমাদের দলের এক ইয়াং তেলুগু ছোকরা আমাকে এসে একেবারে ধরে পড়ল। বলল, "দাদা, এই মন্ত্রগুপ্তি আমাকে বাতলে দিতেই হবে। এই ওষুধে আমাদের রাজ্যে একেবারে তোলপাড় হয়ে যাবে।" বেচারার কষ্ট দেখে নিমরাজি হলাম। হয়ে ওকে ফর্মুলা বাতলে দিলাম।'

বাবান একেবারে মুখিয়ে ছিল, বলল, 'কী সেই ফর্মুলা, কাকু?'

বিশ্বকাকু হেসে বলল, 'মূষিক তৈল, বুঝলি! ওই যে একডজন মেঠো ইঁদুর আমাকে দিয়েছিল, ওগুলোর বডি থেকে ইঁদুরের গন্ধের একটা তেল তৈরি করেছিলাম আমি। কার্বন আর হাইড্রোজেনের তৈরি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা অ্যারোম্যাটিক কম্পাউন্ড। অর্থাৎ, সোজা কথায় একটা স্পেশাল সেন্ট—আমি তার নাম দিয়েছিলাম মূষিকসুবাস। তার ফর্মুলাটা বড় জটিল—তোরা কি বুঝতে পারবি? কার্বন আর হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একেবারে কিলবিল করছে। তো, সেই ইঁদুরের সেন্টে একেবারে লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল। ওই এলাকার মশা একেবারে বেড়ালের পেটে সাবাড়। কিন্তু শেষমেষ বিপদও হল একটা।'

'কী বিপদ?' মৌ জিগ্যেস করল।

'ওই সেই গন্ধের বিপদ। ক্যাঙ্গো যে কেন আমার পরীক্ষাগারের বাইরে সবসময় ঘুরঘুর করত এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। তা ক্যাঙ্গো আর তার দলবল তো মশার বংশ নির্বংশ করে দিল, কিন্তু তারপরই ওরা আমাদের আক্রমণ করল। ওই যে আমরা মশা মারার মূষিক তেল চারদিকে স্প্রে করেছিলাম সেটাই আমাদের কাল হল। সেন্টটা ছিল মারাত্মক রকমের পাওয়ারফুল।

'তার একটা অণু কোনও ফ্লাইং মশার বডিতে কোনওরকমে ল্যান্ড করলেই হল। ওই মশার গা থেকে টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা মেঠো ইঁদুরের ফ্লেভার বেরোবে। তখন ক্যাঙ্গো বা তার কোনও জাতভাই মশাটাকে একেবারে চিকেন বিরিয়ানির মতো সাবড়ে দেবে। তো হয়েছিল কি, স্প্রে করার সময় ওই সেন্টের বেশ কিছু অণু আমাদের গায়েও লেপটে গিয়েছিল। মশার দল খতম হয়ে যেতেই

বেড়ালগুলো আমাদের গা থেকে ওই একই সেন্টের গন্ধ টের পেতে লাগল। প্রথম-প্রথম আমাদের অ্যাটাক করতে ভয় পেলেও শেষের দিকে ওরা গন্ধে পাগল হয়ে উঠল। নিজেদের আর কন্ট্রোলে রাখতে পারল না। ইঁদুরের মনমাতানো গন্ধের টানে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আমাদের ওপরে। আঁচড়ে কামড়ে একেবারে প্রাণান্ত করে তুলল। তখন আমরা কোনওরকমে জান বাঁচিয়ে দিলাম পিঠটান।'

বিশ্বকাকু দম ছেড়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। বলল, 'এখনও শুঁকলে আমার গায়ে বোধহয় মূষিক সেন্টের গন্ধ পাবি। দেখলি না, তোদের গৌতম কেমন বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল।'

বাবান বলল, 'কাকু, ওই সেন্টের ফর্মুলাটা বলো না, আমি লিখে নেব।'

বিশ্বকাকু বলল, 'সে আমার ডায়েরিতে বোধহয় টোকা আছে। শুধু এটুকু মনে আছে, ওই সেন্টের এক-একটা অণুতে ছত্রিশটা করে কার্বন পরমাণু ছিল। আর কী পাওয়ারফুল! বারো বছরেও গন্ধ পুরোপুরি যায়নি।'

এ-কথা বলতে না বলতেই গৌতম কোত্থেকে ছুটে এসে এক লাফে বিশ্বকাকুর কোলে উঠে বসল। আর বিশ্বকাকু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'দেখলি, দেখলি, যা বললাম হাতে-নাতে প্রমাণ হল কি না!'





রহস্যময় পাখিরা

তৈরি হয়ে অফিসে বেরোচ্ছিলাম, রাকেশ ডাকল, 'বাবা, দশ মিনিট সময় দিতে হবে।' আমি ঘুরে তাকালাম। আমার বাঁ-কাঁধের পেশির নীচে ঘড়ি-ক্যাপসুল বসানো আছে। তার কোনও শব্দ নেই। বাইরে থেকে দেখাও যায় না। কিন্তু মগজের ভেতরে প্রতিটি মুহূর্তে সঠিক সময়টা পৌঁছে দেয়। চোখ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময় জানার বিরক্তিকর পদ্ধতি সেকেলে হয়ে গেছে। সুতরাং স্পষ্ট টের পেলাম, এখন সময় আটটা তিপ্পান্ন। ন'টায় অফিস। অফিস কমপ্লেক্স এই বাড়িরই সাতচল্লিশ তলা নীচে। সেখানে পৌঁছে দিতে সুপার-এলিভেটর দেড় মিনিট সময় নেয়। সুতরাং হিসেব কষে রাকেশকে বললাম, 'দশ মিনিট হবে না, সাড়ে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি। কী বলবে চটপট বলো।'

রাকেশ জানে, এখন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার যুগ। তাই একটুও মন খারাপ না করে হাসিমুখে বলল, 'বাবা, তুমি না সেদিন বলছিলে, বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে—'

আমি বললাম, 'উঁহু, তা বলিনি। বলেছি, বেশিরভাগ সমস্যার। কিন্তু তাতে হয়েছে কী?'

রাকেশ চোখ বড়-বড় করে বলল, 'কাল টিভিতে পৃথিবীর নানান রহস্য নিয়ে একটা পুরোনো প্রোগ্রাম দেখাচ্ছিল। তাতে বলল, বারমুডা ত্রিভুজ, পিরামিড

রহস্য, ঈস্টার দ্বীপ, এরকম সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেলেও জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। প্রায় দেড়শো বছর ধরে চেষ্টা করেও বিজ্ঞানীরা কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। কেন, বাবা?'

আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওর প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারছি। আজ সকালেই ওকে নতুন একটা খেলনা দিয়েছি, ইলেকট্রনিক পাখি। পাখিটা একটানা দশ সেকেন্ড উড়তে পারে, সুরেলা শিস দিয়ে ডাকতেও পারে। সারা সকাল রাকেশ ওটা নিয়ে খেলা করছিল। আর বিজ্ঞানী হিসেবে আমার পরিচয়টা যে নেহাত ছোটখাটো নয় সেটাও ও জানে। তাই বিজ্ঞানী এবং পাখি, দুটো মিলিয়েই হয়তো গতকালের টিভি প্রোগ্রামটার কথা ওর এই মুহূর্তে মনে পড়েছে।

রাকেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছিল। কোনও উত্তর আশা করছিল অবশ্যই। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যের কথা ভাবছিলাম।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ছোট্ট এক চিলতে পাহাড়ি গ্রাম জাটিঙ্গা। সেখানে ঘন কুয়াশার রাতে, বাতাস থাকলে আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি হলে, আলোর টানে উড়ে আসে পাখিরা। ঠিক শ্যামাপোকার মতো। জাটিঙ্গায় খাসিয়া উপজাতির বাস। আবহাওয়া ঠিকমতো শর্ত পূরণ করলে তারা হ্যাজাক লণ্ঠন কিংবা সার্চলাইট জ্বেলে বসে থাকে পাহাড়ের ঢালে, রাস্তায়, বাড়ির উঠোনে। তাদের হাতে থাকে লিকলিকে বাঁশের লাঠি। আলোর টানে ছুটে-আসা পাখিদের আঘাত করে তারা পেড়ে ফেলে মাটিতে। কোনও কোনও পাখি আবার নিজে থেকেই ধরা দেয়, যেন আচ্ছন্ন, সম্মোহিত।

রাতের গাঢ় অন্ধকারে দিশেহারা অন্ধ পাখিরা কেন যে আলোর টানে উড়ে আসে তা কেউই জানে না। আরও আশ্চর্য, জাটিঙ্গা গ্রাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি দেখা যায়নি। গত দেড়শো বছর ধরে মাথা ঘামিয়েও বিজ্ঞানীরা এর কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে।

একটু হেসে রাকেশের মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বললাম, 'পাখিদের এই রহস্যের উত্তর বোধহয় খুব সহজ নয়।'

রাকেশ এতক্ষণ পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই ইলেকট্রনিক পাখিসমেত একটা হাত সামনে নিয়ে এল। বোতাম টিপে দিতেই পাখিটা ডানা নাড়তে লাগল। শিস দিতে লাগল সুর করে।

রাকেশ পাখিটার পা-জোড়া ধরে রেখেছিল হাতে। ওটার নড়াচড়া দেখতে-দেখতে বলল, 'মানুষের কাছে যে-প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন, পাখিদের কাছে সেটা হয়তো খুবই সহজ!'

ওর কথায় চমকে উঠলাম। সত্যিই তো! মানুষের মস্তিষ্ক প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, তাই কোনও কিছু সহজভাবে আমরা ভাবতে পারি না।

রাকেশের বুদ্ধি খুব বেশি নয়। ওর আই কিউ মাত্র পঁচানব্বই।

এখনকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়স হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। তারপর আই কিউ'র ফল অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও পেশা ঠিক করে দেওয়া হয় সরকার থেকে। রাকেশের বেশি পড়াশোনা করার অধিকার নেই। ট্রাফিক কনট্রোল ডিপার্টমেন্টে ওকে সহজ-সাদামাটা কাজ নিতে হবে। ওকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়। ছোটবেলায় ছেলেটা মা'কে হারিয়েছে, ফলে মাতৃস্নেহ পায়নি। কে জানে, সেইজন্যেই হয়তো ওর বুদ্ধির বিকাশ কিছুটা বাধা পেয়েছে। এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা করছে।

রাকেশের জন্যে আমার দুশ্চিন্তা যেমন, তেমনি দুঃখও কম নয়। এই মুহূর্তে ওকে ভীষণ ভালো লাগল। কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে একটু চুমু খেলাম। বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ। বুদ্ধি বেশি হলে সহজভাবে কিছু ভাবা যায় না। তাই মাঝে-মাঝে তোমাকে আমার হিংসে হয়।'

ন'টা বাজতে আর পনেরো সেকেন্ড বাকি। সুতরাং ওকে বললাম, 'সময় হয়ে গেছে, এখন যাই—।'

রাকেশের হাতে পাখিটা থেমে গিয়েছিল। ও আবার বোতাম টিপে দিল। আমার পিছনে ফ্ল্যাটের অটোমেটিক ইলেকট্রনিক দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, পাখিটার শিসের শব্দ। তারই মধ্যে রাকেশের শেষ কথাটা আমার কানে এসে বিঁধল, 'পাখিদের কাছে তোমরা হেরে গেলে, বাবা!'

সুপার-এলিভেটর পুরোপুরি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটি খাঁচা! তার চেহারা অনেকটা দু-মুখ কাটা পেনসিলের মতো। চৌম্বকক্ষেত্রের কারিকুরিতে ওটা কোনওরকম অবলম্বন স্পর্শ না করেই দ্রুত ওঠানামা করতে পারে, অনেকটা পুরোনো দিনের ম্যাগলেভ ট্রেনের মতো।

একশো পঁচিশ তলা বাড়ির গা বেয়ে সুপার-এলিভেটর চলাচল করে। ফলে এখন বাইরের দুনিয়া দেখা যাচ্ছিল। আকাশ কালচে, ঘোলাটে। সেখানে কোনও পাখি নেই। যেদিকে চোখ যায়, শুধু আকাশছোঁয়া লিকলিকে বাড়ি। কোনওটা একশো, কোনওটা দুশো, কোনওটা বা তিনশো তলা উঁচু। জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বসবাস-সমস্যা মেটানোর জন্যেই এই আধুনিক ব্যবস্থা। তা ছাড়া সময়ের অপচয় বাঁচাতে প্রতিটি মানুষের অফিস ও বাড়ি একই বিল্ডিংয়ে। এর ওপরে বাধ্যতামূলক ঘড়ি-ক্যাপসুল তো আছেই। আঠারো বছর বয়সের পর সকলকেই ঘড়ি-ক্যাপসুল লাগিয়ে নিতে হয়।

অফিসে ঢুকলাম। আমি 'রোবোটিক্স ইনকরপোরেটেড' কোম্পানির টেকনিক্যাল ম্যানেজার। ইলেকট্রনিক খেলনা থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, সবকিছুই

তৈরি করি আমরা। সারা পৃথিবী জুড়েই আমাদের কোম্পানির খুব নাম-ডাক।

আমার ঘরে ঢুকেই দেখি, একজন অতিথি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। জাপানের 'সুমিটোমো ইলেকট্রিক' কোম্পানির চিফ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার টাকাহাসি। কতকগুলো নতুন প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা বলতে টাকাহাসি এসেছে জাপান থেকে। ওর সঙ্গে গত তিনদিন ধরেই আমাদের মিটিং চলছে। মিটিংয়ের ফলাফল বেশ ভালো।

সুমিটোমো ইলেকট্রিক বেশ বিখ্যাত কোম্পানি। প্রায় দুশো বছর ধরে ওরা পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। সেই কোন ১৯০৮-তেই ওরা ইলেকট্রনিক রোবট তৈরি করেছিল, যার চেহারা ছিল অনেকটা মানুষের মতো। রোবটটা অরগান বাজাতে পারত, পা দিয়ে অরগানের ফুটপেডাল ব্যবহার করতে পারত। মেমোরি কন্ট্রোল থেকে বা নোটেশান শিট দেখে সুরেলা বাজনা বাজাত রোবটটা। তার শরীরে পঞ্চাশটা জয়েন্ট ছিল। সতেরোটা সিক্সটিন বিট মাইক্রোপ্রসেসর তাকে কন্ট্রোল করত। ওই সময়ে এরকম উন্নত একটা যন্ত্রের কথা ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়। আমরাও অনেক এগিয়েছি, তবে সুমিটোমো এখনও সবার সেরা।

রাকেশের কথাটা আমার মাথায় ঘুরছিল। পাখিদের কাছে আমরা হেরে গেলাম? আচ্ছা, পাখি দিয়েই রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করলে কেমন হয়? তাই টাকাহাসির মুখোমুখি বসেই ওকে প্রস্তাবটা দিলাম। বললাম, 'তোমাদের সব প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে চেষ্টা করব, কিন্তু তার বদলে তোমাকে একটা উপকার করতে হবে।'

টাকাহাসির মুখে সর্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব। ও বলল, 'বলো, কী করতে হবে?'

আমি বললাম, 'আমার একটা খেলনা-পাখি চাই। যে-পাখি চেহারায় আর গঠনে হবে হুবহু আসল পাখির মতো। তার পালক থাকবে, অন্য পাখিদের সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে থাকলে নকল বলে যেন বোঝা না যায়!'

টাকাহাসি বলল, 'ইজি, ভেরি ইজি।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'শুধু ওতেই হবে না, আরও আছে, পাখিটার টানা একমাস ওড়ার ক্ষমতা থাকতে হবে। সে চোখ দিয়ে যা দেখবে, কান দিয়ে যা শুনবে তার ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্তত একমাসের মতো। আর ওই মিনিয়েচার ভিডিও ক্যাসেটটা এমন একটা ক্যাপসুলের মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কোনও দুর্যোগেই সেটা নষ্ট না হয়। আর সেটাকে সহজে খুঁজে পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা যেন থাকে, মানে—।'

এবারে টাকাহাসি আমাকে বাধা দিল, বলল, 'বুঝেছি, হারকিউলিস ক্যাপসুল। কিন্তু বললে না তো, পাখিটা দিনের পাখি না রাতের পাখি?'

আমি বললাম, 'দিনের পাখি।'

'আচ্ছা, ওটার চোখ আর কানের স্ট্রাকচার কীরকম হবে? কোন পাখির মতো?'

আমি বললাম, 'শুধু চোখ আর কান নয়, তার সবটাই হবে থ্রি টোড কিংফিশারের মতো।'

টাকাহাসিকে এই বিশেষ পাখিটার কথা বললাম, কারণ জাটিঙ্গায় কুয়াশার রাতে আলোর টানে থ্রি টোড কিংফিশার বা তিন আঙুলে মাছরাঙা প্রচুর আসে। শহরে এ-পাখি জোগাড় করা যাবে না। শুধু এ-পাখি কেন? শহরে এখন কোনও বাড়তি গাছপালা নেই, পশু নেই, পাখি নেই, পোকামাকড়ও নেই। সবই রাখা আছে দেশের বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট জায়গায়, তাদের নিজস্ব পালনকেন্দ্রে। সেখান থেকেই একটা জ্যান্ত পাখি আনিয়ে টাকাহাসিকে দিয়ে দেব।

ভেতরে-ভেতরে টাকাহাসির বোধহয় কৌতূহল হচ্ছিল। ভাবছিল, এরকম গুণধর একটা খেলনা-পাখি আমার কেন দরকার। ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'এত সব কাজ খুব একটা তাড়াতাড়ি সারা যাবে না। আমাকে অন্তত তিরিশ দিন সময় দেবে তো?'

আমি বললাম, 'তা না হয় দিলাম। কিন্তু খরচ কীরকম পড়বে?'

টাকাহাসি হাসল, বলল, 'আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে পাখিটা তোমাকে আমরা উপহার দেব। পাখিটার শুধু একটাই গলদ থাকবে, ওর শরীরে কোনও হজমের ব্যবস্থা থাকবে না। থ্রি টোড কিংফিশাররা যেমন খায়, সেরকম ওটাও খাবে ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পরে-পরে সেই খাওয়াগুলোই ওর শরীর থেকে আবার বেরিয়ে যাবে। আর তোমার জন্যে উপহার বলেই তার মধ্যে অন্তত পাঁচশো জয়েন্ট আর একশোটা ব্রেন ফাংশান রাখার চেষ্টা করব। তা ছাড়া সুমিটোমোর সুনামটাও তো রাখতে হবে! এখন তুমি আমাকে একটা আসল পাখি জোগাড় করে দাও দেখি।'

আমি টেবিলে রাখা ট্রান্সিভারে কয়েকটা কথা বললাম। তারপর টাকাহাসিকে বললাম, 'পরশু তুমি দেশে রওনা হচ্ছ, তার আগেই পাখি তোমার হাতে পৌঁছে যাবে।'

টাকাহাসি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা করমর্দন করলাম। ওকে সব কথা খুলে বলতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছিল। কিন্তু উপায় কী! যাই হোক, জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যের এতদিনে হয়তো একটা সমাধান হবে।

কাজের শেষে সুপার-এলিভেটরে করে ঘরে ফেরার সময়ে একই কথা মাথায় ঘুরছিল ঃ রাকেশ, টাকাহাসির পাখি, জাটিঙ্গার রহস্য।

দেশের সমস্ত অঞ্চল এখন এমন হিসেব করে ভাগ করা হয়ে গেছে যে,

নির্দিষ্ট জিনিস নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া পাওয়া যায় না। সবই বৈজ্ঞানিক চাহিদা অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরোনো দিনের স্মৃতি হিসেবে যে-কয়েকটা জায়গা আগের মতোই রেখে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে জাটিঙ্গা উল্লেখযোগ্য। পাখি-রহস্যের গবেষণার সুবিধের জন্যেই সেখানকার পরিবেশকে আধুনিক করে তোলা হয়নি। গাছপালা, পশু-পাখি, মানুষজন, সব দেড়শো বছর আগে যেমন ছিল তেমনই আছে।

ঠিক করলাম, টাকাহাসির পাঠানো পাখিটা পেলেই বিজ্ঞানীদের একটা ছোট দল নিয়ে চলে যাব জাটিঙ্গায়। কুয়াশার রাতে সেখানে ছেড়ে দেব পাখিটাকে। তারপর তার শরীরে ভিডিও ক্যাসেটটা প্লে-ব্যাক করে দেখার অপেক্ষা। কিন্তু টাকাহাসি পাখিটা ঠিকমতো তৈরি করতে পারবে তো?

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পৌঁছোতেই ইলেকট্রনিক চোখ আমার মুখের ছবি পরীক্ষা করে মিলিয়ে দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

রাকেশ ভিডিও ক্যাসেট চালিয়ে নানারকম পাখির ছবি দেখছিল। আধুনিক শহুরে জীবনে পাখি চোখেই পড়ে না। সুতরাং আমাদের মনের বা চোখের চাহিদা মেটাতে ভিডিয়ো ক্যাসেটই সম্বল। এ-ধরনের বহু ভিডিও ক্যাসেট সরকার থেকে বাজারে ছাড়া হয়েছে। যেখানে যেটা দুষ্প্রাপ্য সেখানে সেই জিনিস দেখতে ইচ্ছে করলে সরকারি ক্যাসেটই একমাত্র মুশকিল আসান। রাকেশের সংগ্রহে প্রকৃতি আর বন্য প্রাণীর বিষয়েই বেশি ক্যাসেট রয়েছে। তা ছাড়া, আর একটা ক্যাসেট ওর খুব প্রিয়, তাতে রয়েছে ওর মায়ের ছবি, আমিই একসময় তুলেছিলাম। মাঝে-মাঝেই ওর মা'কে ও ছবিতে দেখে, তখন আমিও দেখি। কষ্ট হয়। অথচ গোপন রাখতে হয়। কষ্ট প্রকাশ করা এক ধরনের দুর্বলতা।

রাকেশকে বললাম টাকাহাসির পাখির কথা। শুনে ও খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠল। বলল, 'জাটিঙ্গায় আমাকে নিয়ে যাবে, বাবা?'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'দেখি।'

এমনিতেই আমি অফিসে গেলে ছেলেটা প্রায় সারাদিন একা-একা থাকে। হয় কম্পিউটার টিচারের সামনে বসে পড়াশোনা করে, না হয় খেলা করে, নয়তো টিভি বা ভিডিও দেখে। আমি চার-পাঁচদিনের জন্যে ওকে ছেড়ে গেলে ও কি একা-একা থাকতে পারবে? ঠিক করলাম, টাকাহাসির পাখিটা আগে হাতে পাই, তারপর রাকেশকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাছে বিশেষ অনুমতি চাইব। উনি নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। কারণ, আমার এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয় তাহলে 'রোবোটিক্স ইনকরপোরেটেড'-এর নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য সুমিটোমো ইলেকট্রিকও সেই সুনামের ভাগ পাবে। তখন টাকাহাসি একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

আমি ভীষণ অধীর হয়ে পড়ছিলাম। রাকেশের ইলেকট্রনিক পাখিটা হাতে

নিয়ে বোতাম টিপে দিলাম। ওটা ডানা নেড়ে শিস দিয়ে উঠল। আমার চোখের সামনে একটা কুয়াশার রাত ভেসে উঠছিল। সেখানে হ্যাজাকের আলোর চারপাশে একটা ছোট্ট মাছরাঙা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। আর কতকগুলো লিকলিকে বাঁশের লাঠি শাঁই-শাঁই শব্দে ওটাকে আঘাত করার চেষ্টা করছিল।

টাকাহাসির পাখি চল্লিশ দিন পরে হাতে পেলাম। চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ছোট্ট পাখি। লাল ঠোঁট। গায়ে বেগুনি, নীল, লাল, কালো, অনেকরকম রং। পায়ে তিনটে করে আঙুল। ও পাখিটার নাম দিয়েছে 'অরনিথো মার্ক ওয়ান' বা সংক্ষেপে ও. এম. ওয়ান। আমি যেমন চেয়েছিলাম তারচেয়েও অন্তত দশগুণ উন্নত পাখি তৈরি করে পাঠিয়েছে টাকাহাসি। আসল-নকলে তফাত বোঝার কোনও উপায় নেই। আমার কথামতো হারকিউলিস ক্যাপসুলও বসিয়ে দিয়েছে ও। সেই ক্যাপসুল থেকে প্রতি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে একটা বিশেষ বেতার-তরঙ্গ। ক্যাপসুলটা যেখানেই হারিয়ে যাক না কেন, ওই বেতার-তরঙ্গের সূত্র ধরে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবেই। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে টাকাহাসিকে একটা ভিডিও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। এবং পরদিনই সুপার-ক্র্যাফটে চড়ে আমরা চারজন বিজ্ঞানী রওনা হয়ে গেলাম জাটিঙ্গার উদ্দেশে। বিশেষ অনুমতি পেয়ে যাওয়ায় রাকেশকেও সঙ্গে নিতে কোনও অসুবিধে হল না।

জাটিঙ্গায় পৌঁছে একটা বার্ড ওয়াচিং টাওয়ারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। যন্ত্রপাতি গোছগাছের পর ওএম ওয়ানকে আমরা ছেড়ে দিলাম। পাখিটা দিব্যি উড়ে গিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল। রাকেশ মুগ্ধ হয়ে জঙ্গল-পাহাড়-গাছপালা দেখছিল। বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। হঠাৎই বলল, 'বাবা, জায়গাটা কী সুন্দর! আমাদের ঘরবাড়ি যদি এখানে হত!'

অন্য বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে রাকেশের দিকে তাকাল। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কিছু মনে করবেন না, ওর বুদ্ধি কম, তাই এরকম উদ্ভট কথা বলে।'

তারপর রাকেশকে কাছে টেনে নিয়ে ওর পিঠে হাত রাখলাম। দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। ও মুগ্ধ হয়ে সেদিকে দেখছে। ধীরে-ধীরে ভেসে আসছে ভিজে কুয়াশা, ক্রমশ ঢেকে ফেলছে জাটিঙ্গা গ্রামকে। আজ রাতে আলোর টানে হয়তো পাখিরা আসবে।

কিন্তু না। ঘটনা ঘটল চারদিন পর। আবহাওয়ার শর্ত ঠিক-ঠিক পূরণ হল সেদিন। ফলে রাত বারোটা নাগাদ সত্যিই পাখিরা এল। অন্ধকার কুয়াশায় তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়তে লাগল। এর মধ্যে ওএম ওয়ান আছে কি না কে জানে!

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সুপার-ক্র্যাফটে চড়ে আমরা আকাশে ভেসে পড়লাম। আধুনিক এই যন্ত্রযান একেবারে নিঃশব্দে উড়ে চলে। ফলে নির্বিঘ্নে পরিদর্শনের কাজ সেরে ফেলা গেল। তবে মাঝে-মাঝে আমাদের অবলোহিত রশ্মি

ও উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করতে হল।

আমি আগে অনেকবার জাটিঙ্গায় এসেছি। আর রাকেশ এসেছে এই প্রথম। তাই অবাক চোখে ও নীচের গ্রামটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ছোট্ট পাহাড়ি ঢিবির ওপরে বহু জায়গাতেই হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে পাখিরা উড়ছে। লাঠি চালানোর শব্দ হচ্ছে বাতাসে।

যখন আমরা পর্যবেক্ষণ শেষ করে নেমে আসছি ঠিক তখনই আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়ল, ওএম ওয়ানকে কেউ আঘাত করেছে! তাহলে নিশ্চয়ই টাকাহাসির পাখিটা হ্যাজাকের আলোর টানে গ্রামে গিয়ে পড়েছে! সুতরাং তড়িঘড়ি সুপার-ক্র্যাফট ল্যান্ড করানোর নির্দেশ দিলাম।

তাড়াহুড়ো করে সুপার-ক্র্যাফট থেকে আমরা নেমে এলাম। তারপর রাকেশকে টাওয়ারে অপেক্ষা করতে বলে আমরা চারজনই সাজসরঞ্জাম নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। যে করে হোক, হারকিউলিস ক্যাপসুল আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কিন্তু সে-রাতে সমস্ত খোঁজাখুঁজিই ব্যর্থ হল।

ক্যাপসুলটা খুঁজে পেলাম পরদিন সকালে। পাহাড়ি ঢালের ওপরে একটা ঝোপের পাশে পড়ে ছিল টাকাহাসির পাখির ধ্বংসাবশেষ। রঙিন পালকগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে চারপাশে। শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতি ছত্রখান। পাশেই দুটো খাটো পাথরের মাঝে পোড়া কাঠকুটো, ছাই, আর অন্য কয়েকটা পাখির পালক চোখে পড়ছে।

একটু খুঁজতেই কালো ক্যাপসুলটা পাওয়া গেল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আমরা টাওয়ারে ফিরে চললাম। উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করছে। এই ছোট্ট ক্যাপসুলটার মধ্যেই হয়তো রয়েছে দেড়শো বছরের পুরোনো প্রশ্নের উত্তর। এক্ষুনি হেডঅফিসে ফিরতে হবে আমাদের। তারপর...।

কোম্পানির অন্ধকার প্রোজেকশান রুমে বসে আছি আমরা ছ'জন মানুষ। আমাদের একাগ্র চোখ সামনের ছোট পরদায়। হারকিউলিস ক্যাপসুলের ভেতর থেকে পাওয়া ভিডিও ক্যাসেটের শব্দ ও ছবি ফুটে উঠছে সেখানে। এক দুর্লভ চলচ্চিত্র হাতে পেয়েছি আমরা। পাখির চোখ দিয়ে দেখা রহস্যের ছবি, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে গোপন চাবিকাঠি।

ঘরে আমরা চারজন ছাড়া আর যে-দুজন রয়েছেন, তাঁরা হলেন রোবোটিক্স ইনকরপোরেটেড কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ন্যাশন্যাল টেকনিক্যাল কমিটির ডিরেক্টর। জাটিঙ্গার পাখি-রহস্য নিয়ে ওঁদের আগ্রহও নিতান্ত কম নয়।

প্রথমে প্রকৃতির নানা ছবি ভেসে উঠল পরদায়। গাছপালা, আকাশ, পাহাড়, সবকিছুই আমাদের চোখে চেনা, তবে তাদের রংগুলো যেন অন্যরকম। কিছু রং চেনা, কিছু রং অচেনা। আবার একাধিক রঙের বিচিত্র মিশ্রণও চোখে পড়ল।

আমাদের দলের কালার টেকনোলজিস্ট ভদ্রলোক বললেন, আমরা যে-সাতটা রং দেখি, পাখিরা কেউ-কেউ তার কম দেখে, কেউ বা তার বেশি দেখে। থ্রি টোড কিংফিশারের ব্যাপারটা আমাদের ঠিক জানা নেই, তবে মনে হচ্ছে ওই কারণেই রঙের চেহারাগুলো অন্যরকম লাগছে।

এরপর পরদা অন্ধকার হয়ে গেল। রাত নেমেছে নিশ্চয়ই। আর তার অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল এক আশ্চর্য ছবি।

জ্যামিতির গঠনের অসংখ্য ত্রিমাত্রিক ফুলের ছবি ফুটে উঠল পরদায়। ঠিক ক্যালিডোস্কোপের নকশার মতো। অদ্ভুত তাদের বর্ণ, অদ্ভুত তাদের সুষম আকার। ছোট-বড় নানান আলোর ফুল ভেসে বেড়াচ্ছে পরদায়। এরকম রং আমরা কখনও দেখিনি, এরকম ফুলও নয়। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম।

চেয়ারম্যান জিগ্যেস করলেন, 'এ কী! এরকম আশ্চর্য ফুল এল কোথা থেকে?'

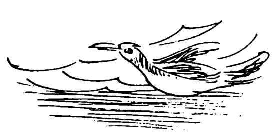
অন্ধকারে আমার পিছন থেকে কে যেন জবাব দিল, 'জানি না। তবে হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো কুয়াশার কণার মধ্যে দিয়ে পাখিদের চোখে যখন আসে তখনই হয়তো এরকম বিচিত্র ফুলের বর্ণালি তৈরি হয়। জাটিঙ্গার কুয়াশায় হয়তো এমন কিছু আছে যাতে...।'

আমি বললাম, 'ওখানকার চৌম্বকক্ষেত্রের খাপছাড়া ধরনটা আগেই বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছিল। তা ছাড়া ওই অঞ্চলে অনেকবার ভূমিকম্প হয়েছে, অল্প তেজস্ক্রিয়তারও সন্ধান পাওয়া গেছে। তার ওপরে মহাজাগতিক কণার অস্বাভাবিক স্রোত ধরা পড়েছে ওখানকার আবহাওয়ায়। এইসব মিলেমিশে যদি জাটিঙ্গার কুয়াশা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

আমাদের চোখের সামনে তখনও অসংখ্য বিচিত্র ফুলের ফুলঝুরি ফুটছিল। এই অদ্ভুত জিনিস দেখেই তাহলে অন্ধকার ভেদ করে আলোর কাছে ছুটে যায় রহস্যময় পাখিরা? এত সহজ, এত সরল ওদের আকর্ষণ!

সুন্দরের প্রতি আমাদের টান দিন-দিন কত কমে গেছে। কিন্তু পাখিরা? গত দেড়শো বছর ধরেও ওদের সেই টান এতটুকু কমেনি। আজও সুন্দরের টানে ছুটে গিয়ে প্রাণ দিতে ওরা ভয় পায় না।

অন্ধকার ঘরে বসে পরদার বিচিত্র রঙের ত্রিমাত্রিক ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা ছ'জন বুদ্ধিমান মানুষ হয়তো একই কথা ভাবছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে রাকেশের কথাটা ভেসে এল আমার কানে ঃ 'পাখিদের কাছে তোমরা হেরে গেলে, বাবা?'





হারিয়ে যাওয়া

প্রথমে গিয়েছিল বিক্রম শর্মা আর রণবীর সেন।

তার দু-মাস পরে সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। কিন্তু ওরা কেউই ফিরে আসেনি ওই রহস্যে-ঢাকা প্রাচীন জঙ্গল ফরেস্ট-এক্স থেকে! গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্যপ্রকৃতির বুকে খুশিমতো বেড়ে উঠে ঘন হয়েছে ওই রহস্যময় জঙ্গল।

গবেষণার প্রয়োজনে ওটাকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল, প্রতি একশো বছর অন্তর-অন্তর অভিযান চালানো হবে ওই জঙ্গলের অভ্যন্তরে। খতিয়ে দেখা হবে তার গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর বিবর্তনের নানা লক্ষণ। পর্যবেক্ষণ করা হবে তাদের আচার-আচরণ-প্রকৃতি।

আর সেইমতোই শুরু হয়েছিল প্রথম অভিযান।

তারপর...।

'সেন্ট্রাল কন্ট্রোল'-এর চিফ ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী টেবিলে রাখা কম্পিউটার টার্মিনালের বোতাম টিপলেন। ভিডিয়ো পরদায় ফুটে ওঠা সবুজ লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ ছোট হল।

আমি টেবিলের এ-প্রান্তে বসে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। কাজ ছাড়া আমার মন বসে না। অলস থাকলে আমার অ্যালার্জি হয়। অবশ্য শুধু আমার

নয়। অপারেশান ডিভিশনের সকলেরই এই একই অভ্যেস। মনোবিজ্ঞানের নানান পরীক্ষার মাধ্যমে অপারেশান ডিভিশনের লোক বাছাই করা হয়। তার মধ্যে দুটি প্রধান শর্ত হল ঃ প্রার্থীকে কাজ-পাগল হতে হবে এবং তার মধ্যে কল্পনার ছিটে-ফোঁটাও থাকবে না। ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী কম্পিউটার ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'দাস, আপনাকে সংক্ষেপে ওদের হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। তবে কম্পিউটারের মেমোরিতে এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য রয়েছে। আপনাকে তার একটা কপি করে দিচ্ছি। সময়মতো দেখে নেবেন।'

ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। একটা লুকোনো সুইচ টিপতেই টেবিল ফুঁড়ে দু-গ্লাস শরবত উঠে এল। ব্রিগেডিয়ার ইশারা করতেই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটা গ্লাস তুলে নিলাম। এই শরবতই আমাদের সেন্ট্রাল কন্ট্রোল অফিসের একমাত্র সুষম পানীয়। এর সমস্ত উপাদান বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক করেছেন। এই শরবত কর্মঠ লোকেদের কাজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ব্রিগেডিয়ার ধীরে-ধীরে কথা বলছিলেন, 'দাস, আপনি হয়তো জানেন, প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে গত আড়াইশো বছর ধরে আমরা বিচ্ছিন্ন। সারা পৃথিবীতে এমন সিনথেটিক ঘেরাটোপে ঢাকা চল্লিশ হাজার দুশো শহর রয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচার জন্যে এই ঘেরাটোপের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া, ঘেরাটোপের মধ্যে আমরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—খুশিমতো। ঘেরাটোপের এই কৃত্রিম অথচ আরামের পরিবেশে স্বস্তির মধ্যে বেড়ে উঠেছি আমরা। ফলে বাইরের প্রকৃতিতে পা রাখিনি। আমাদের মধ্যে যারা বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চায় তাদের এই অভ্যেস করানো হয় ছোটবেলা থেকেই।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'জানি, স্যার।'

কারণ আমাকেও এই অভ্যেস করানো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। এখানকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়েস হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। এ-ছাড়া, তাদের নিয়ে অন্যান্য দৈহিক এবং মানসিক পরীক্ষাও চালানো হয়। এইসব পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সরকার থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা ও পেশা। এইসব পরীক্ষার রেজাল্ট দেখেই আমাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের জন্যে। তারপর আট বছর পরে আবার একদফা পরীক্ষা নিয়ে তবেই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনে।

সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে বাইরের পরিবেশে রপ্ত করানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে সোশ্যাল লাইসেন্স। এরকম লাইসেন্স ওদেরও ছিল। ওই হারিয়ে

যাওয়া চারজনের ঃ বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। সুতরাং বাইরের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তা-ছাড়া, ওদের সঙ্গে ছিল অভিযানের উপযুক্ত আত্মরক্ষার আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র, আর প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও...।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী শরবতের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চিন্তাজড়ানো গলায় বললেন, 'দাস, বাইরের পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তবে ফরেস্ট-এক্স, আমাদের সংরক্ষিত ওই জঙ্গল, ওদের কাছে নতুন। শর্মা আর সেন যখন রওনা হয় তখন আমরা ঠিক করেছিলাম, অভিযান শেষ করতে হবে দশদিনের মধ্যে। কিন্তু দু-মাস পরেও যখন ওরা ফিরল না, তখন পাঠালাম সিং আর মহান্তিকে। বুঝতেই পারছেন, ওরা পুরোপুরি আর্মড ছিল। ওদের সঙ্গে যে-ব্লাস্টার ছিল তা দিয়ে ফরেস্ট-এক্সকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যে-কোনও হিংস্র জন্তু ওই ব্লাস্টারের আক্রমণে স্রেফ ধুলো হয়ে যাবে। অথচ তা সত্ত্বেও ওই চারজনের কেউই ফিরে এল না। ব্যাস, অভিযান মাথায় থাক, এখন দুশ্চিন্তায় গোটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ভেঙে পড়েছে। গভর্নমেন্ট নানা সন্দেহ করছে। যেখানে গত দুশো বছরে সারা পৃথিবীতে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র দশ হাজার মানুষ, সেখানে তিন মাসের মধ্যে চার-চারজন স্পেশ্যালিস্ট নিরুদ্দেশ! আনথিংকেবল, দাস। সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি।'

আমার শরবত শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার আবার লুকোনো বোতামটি টিপলেন। খালি গ্লাস দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল টেবিলের গহ্বরে। টেবিল আবার যথারীতি মসৃণ। জানি, আমাদের চোখের আড়ালে ওই গ্লাস দুটো পরিষ্কার ও স্টেরিলাইজড হয়ে অপেক্ষা করবে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহারের জন্যে।

ব্রিগেডিয়ারের আঙুল আবার চলে গেল কম্পিউটারের কি-বোর্ডে। দ্রুত নড়াচড়া করল বোতামের ওপরে। ভিডিও পরদায় জটিল রঙিন ছবি ফুটে উঠল। ব্রিগেডিয়ার আপনমনেই বললেন, 'ফরেস্ট-এক্স-এর টোপোলজিক্যাল ম্যাপ।' বলে একটি বোতাম টিপে ম্যাপের একটা ছাপা কপি বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর পরদায় ফুটিয়ে তুললেন হারিয়ে-যাওয়া বিজ্ঞানীদের রুট-ম্যাপ। বের করে নিলেন সেটারও হার্ড কপি। আর সবশেষে অনেক পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিয়ে আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'এতে অভিযান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দিলাম। এ-ছাড়া পাবেন ফরেস্ট-এক্স-এর বিষয়ে সমস্ত খবর—সেখানে আবহাওয়া কীরকম, কোন-কোন ধরনের প্রাণী ওখানে আছে বলে এ পর্যন্ত জানা গেছে। অবশ্য এসবই একশো বছরের পুরোনো। তবু যদি আপনার কোনও কাজে লাগে।'

কম্পিউটার টার্মিনাল ছেড়ে ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারের বায়ুচাপ সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারটা ইঞ্চি-চারেক উঁচু হল। তখন তিনি কম্পিউটারের প্রিন্ট আউটের পুরো গোছাটা পলিথিন কভারে মুড়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে আমার

হাতে দিলেন। তারপর চেয়ারটাকে আবার ঠিক করে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। শেষে বললেন, 'মনে করুন ফরেস্ট-এক্স-এ গিয়ে আপনি দেখলেন...।'

ব্রিগেডিয়ার বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না। ভাবছিলাম, প্রায় চার বছর পরে আমি আবার 'বাইরে' যাব। আর এবারের যাওয়াটা অন্যান্য বারের মতো নয়। অন্যান্য বারে আমি বাইরে থেকেছি বড় জোর বারো ঘণ্টার জন্যে। সে নতুন কাউকে বাইরের আবহাওয়ায় অভ্যেসের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে, নয়তো কোনও অটো-টানেল পরীক্ষা করার জন্যে, অথবা কোনও মহাকাশযান রওনা হওয়াকালীন নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু এবারের অপারেশান অন্যরকম।

'...হঠাৎ করে যদি এইরকম কোনও ঘটনা হয়, তখন আপনি কী করবেন, দাস?'

আমার খেয়াল হল, ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে দেখছেন। আমার জবাবের অপেক্ষা করছেন। তিনি আবার বললেন, 'বলুন দাস, তখন আপনি কী করবেন?'

আমি হাসলাম। বুকের কাছে লুকোনো আধুনিক জেনারেটর গানটা একবার অনুভব করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার কথা আমি কিছুই শুনিনি, স্যার...।'

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর মুখ লালচে হতে লাগল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, 'শুনিনি, কারণ ধরি, মনে করি, যদি, হয়তো, সম্ভবত, এইসব শব্দ দিয়ে কোনও কথা শুরু হলে আমি বাকিটা আর শুনি না। কল্পনার ওপরে আমার কোনও আস্থা নেই, স্যার।'

ব্রিগেডিয়ার যে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি ওঁকে অপমান করতে চাইনি। কারণ, এটাই আমার বরাবরের অভ্যেস। শুধু আমার কেন, আমাদের অপারেশান ডিভিশনের প্রত্যেকেরই। আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী আমার সম্পর্কে পুরো খোঁজখবর না নিয়ে আমাকে ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারে ডেকেছেন, তা আমি মনে করি না। উনি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্রতিটি মানুষের পার্সোনাল কম্পিউটার কোড জানেন এবং টার্মিনালের বোতামে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে যে-কোনও সময়ে পড়ে ফেলতে পারেন আমাদের আগাপাশতলা ইতিহাস। তাহলে এই মুহূর্তের অপমানিত ভাবটুকু কি ব্রিগেডিয়ারের অভিনয়?

ঠিক সেই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের ডানদিকে রাখা একটা ছোট্ট টিভির পরদায় একটা সবুজ সঙ্কেত ফুটে উঠল। দু-বার বিপ-বিপ শব্দ শোনা গেল। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার পরদার দিকে তাকালেন। ততক্ষণে সেখানে একজন লোকের রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে এবং সেই অতিথি ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

টিভির সামনে রাখা মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী একটা কোড নম্বর বললেন। পরক্ষণেই পালটা একটা নম্বর শোনা গেল স্পিকারে।

ব্রিগেডিয়ার হাসলেন। বললেন, 'প্লিজ কাম ইন।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু সুরেশ চোপরা। আট বছর ধরে মিশিগানে ছিল। মহাকাশযানের কঠিন জ্বালানি নিয়ে গবেষণা করছিল। এখন চলে আসছে জাপানে। সেই ফাঁকে একমাস ভারতে থাকবে। আজ আমাদের সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারটা...।'

আমি নির্লিপ্তভাবে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর কথাগুলো শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, সুরেশ চোপরার জীবনী জেনে আমার লাভ কী। আর ফরেস্ট-এক্স-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কী?

ইতিমধ্যে সুরেশ চোপরা ঘরে ঢুকে পড়েছেন এবং ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে করমর্দনের পর একটা বাতাস-চেয়ারে বসেও পড়েছেন। আমি ভাবছিলাম, এবারে বিদায় নিলে হয়, কিন্তু চিফ না নির্দেশ দিলে সেটা ভালো দেখায় না। সুতরাং চুপচাপ বসে রইলাম।

সুরেশ চোপরা ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছিলেন—পুরোনো, নতুন, নানা কথা। আর ওঁরা দুজনেই খুব হাসছিলেন। কথায়-কথায় সময় কাটতে লাগল। একসময় একগ্লাস শরবত টেবিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সুরেশ চোপরার জন্যে। তিনি তখন মিশিগানের নানা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। কথা থামিয়ে শরবতে চুমুক দিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

একহাতে শরবতের গ্লাস ছিল। অন্য হাতে ব্লাস্টারটা বের করে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাক করে ধরলেন সুরেশ চোপরা। তাঁর মুখের হাসি, শরবতের গ্লাস ধরে রাখার ভঙ্গি, এমনকী, ব্লাস্টার বের করে আনার কাজটিও এত স্বাভাবিক যে, চট করে তা নজর কাড়ে না।

কিন্তু আমার নজর কাড়ল।

স্লো মোশনে আমি সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম। ব্রিগেডিয়ারের মুখে একটা ফ্যাকাসে পরদা ছড়িয়ে গেল চকিতে। প্রযুক্তি এখন লক্ষ গুণে উন্নত হয়ে উঠলেও মানুষের কয়েকটি মৌলিক প্রতিক্রিয়া এখনও বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেইজন্যেই সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফও ভয় পেলেন—মৃত্যুভয়। আর তখন সুরেশ চোপরার একটু আগের হাসিখুশি ভাবটা খুব ধীরে পালটাচ্ছিল।

আমার কাছে এই সুরেশ চোপরা লোকটা একজন অচেনা আগন্তুক ছাড়া কিছু নয়। সে হঠাৎ করে চিফের ঘরে ঢুকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ব্লাস্টার তুলে ধরেছে। চুলোয় যাক মিশিগানের গবেষণার গল্প, আর চিফের সঙ্গে লোকটার পুরোনো বন্ধুত্বের কাহিনি। এসব নির্ভেজাল সত্যি কি না তার কোনও প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।

সুতরাং কয়েকশো মিলিসেকেন্ড ভাবনাচিন্তার পর আমি মেঝেতে ঝাঁপিয়ে

পড়লাম। আধ পাক গড়িয়ে চোপরার বাতাস-চেয়ারে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। এবং জেনারেটর গান তাক করে লো-লেভেল ফায়ার করলাম।

লাথির চোটে চোপরা টাল খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। তার ওপর লো-লেভেল ফায়ারে পলকে অসাড় হয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন।

ট্রিগারে চাপ দিলে জেনারেটর গান থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। এই আহিত কণার তীব্রতা তিন রকমের হয় ঃ লো-লেভেল, হাই-লেভেল, আর আলট্রা-হাই-লেভেল। লো-লেভেল ফায়ারে কোনও মানুষ ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে শুধু অসাড় হয়ে থাকে। হাই-লেভেলে তার চেতনা ফিরবে সাত দিন চিকিৎসার পরে। কেউ-কেউ আবার ওপরেও চলে যায়। আর আলট্রা-হাই ফায়ারিংয়ে সরাসরি নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। যেহেতু চিফের কথা সত্যি কিংবা মিথ্যে দুই-ই হতে পারে তাই চোপরাকে লো-লেভেল ট্রিটমেন্ট করেছি। সত্যি-সত্যি চিফ কোনও পুরোনো বন্ধু হারান তা আমি চাই না।

মেঝে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি ব্রিগেডিয়ার আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তাঁকে খানিকটা উদ্বিগ্নও মনে হল। সেটার কারণ আঁচ করতে পেরে আমি বললাম, 'লো-লেভেল ডোজ দিয়েছি, স্যার। কিন্তু সত্যিই কি উনি আপনার বন্ধু?'

চিফ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে আমি আসতে বলেছিলাম। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে। আর আমি চোপরা সম্পর্কে আপনাকে আগে থাকতেই সাজেশন দিয়েছিলাম যাতে আপনি ওকে নিরাপদ মনে করেন। সেই অবস্থায় দেখতে চাইছিলাম আপনি কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে পারেন।'

আমি সামান্য হেসে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি?'

চিফ বললেন, 'বসুন, দাস।'

আমি বসলাম।

'এই পরীক্ষা আমি করেছি আপনার কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যে নয়। শুধু এটা দেখতে যে, ফরেস্ট-এক্স থেকে আপনার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কি না।' ব্রিগেডিয়ারের গলার স্বর কিছুটা ভারী হল ঃ 'আমার ধারণা ওই গভীর জঙ্গলে এমন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে যাকে আমাদের আধুনিক কোনও অস্ত্র ঘায়েল করতে পারে না। আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি হয়তো প্রাণ দিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর আক্রমণে। আমাদের অজানা-অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। কিন্তু আমি চাই, আপনি ফিরে আসুন। ওদের জীবিত অথবা মৃত সঙ্গে নিয়ে—অথবা না নিয়ে। আপনাকে আমি ফেরত চাই, দাস। কারণ ফরেস্ট-এক্স-এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।'

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী।

গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন বোধহয়। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আপনি কাল ছ'টার সময়ে রওনা হয়ে পড়ুন। সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি রিপোর্ট ব্যাক না করেন তা হলে ব্যাপারটা রীতিমতো মারাত্মক হয়ে উঠবে। তখন হয়তো ওই বায়োরিজার্ভটাকে—মানে, ফরেস্ট-এক্সকে ডেস্ট্রয় করে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। এনিওয়ে, আই ওয়ান্ট য়ু ব্যাক, দাস—অ্যাট এনি কস্ট।'

'আমি তা হলে কাল ছ'টার সময় রওনা হচ্ছি, স্যার।'

'হ্যাঁ। উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।' ব্রিগেডিয়ার শুভেচ্ছা জানালেন আমাকে। তারপর আমি যেই উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি উনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'এ-ঘরের কথাবার্তা কারও সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে চোপরার ব্যাপারটা। আর অপারেশান ডিভিশনের চিফকে যেটুকু বলার আমি বলে দিছি।'

'ওকে, স্যার।' বলে সুরেশ চোপরার দিকে একবার দেখলাম। পাথর হয়ে শুয়ে আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবে মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে। দেড় ঘণ্টা হতে এখনও এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট দেরি!

অটো টানেলের স্বচ্ছ দেওয়াল ঘণ্টায় পাঁচশো কিলোমিটার বেগে পিছনে ছুটে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে গাড়িতে বসে আছি। কারণ অটো টানেলে যেসব গাড়ি চলে সবই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। .

ঘেরাটোপে ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে অটো স্টেশনে এসে আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নিজস্ব গাড়ি বেছে নিয়েছি। এই বেছে নেওয়ার কাজটা কম্পিউটার পরিচালিত। আইডেন্টিফিকেশান ও ভয়েস চেক পজিটিভ হলেই অটো টানেলের লক খুলবে। তারপর গাড়িতে উঠে ভ্রমণের সম্পূর্ণ মানচিত্র গাড়ির কম্পিউটারের বোতাম টিপে জানাতে হবে। তা হলেই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমান' গাড়ি যাত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। গাড়িগুলোতে দুজনের বসার জায়গা আছে। তবে আমি চলেছি একা।

আমাদের কাছাকাছি শহরগুলো সবই অটো টানেল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। আর দূরের যাত্রাপথে আমরা স্পেস-প্লেন ব্যবহার করি। এই প্লেন আবহাওয়ামণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে যায় মহাশূন্যে। তারপর মোট উড়ানের সিংহভাগটাই সম্পন্ন করে মহাশূন্যে। অবশেষে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে আবহাওয়ামণ্ডল কেটে নেমে আসে নির্দিষ্ট প্লেন-পোর্টে।

ফরেস্ট-এক্স-এ যাওয়ার জন্যে স্পেস-প্লেন আমি পছন্দ করিনি। কারণ তাতে জেট ল্যাগের জন্য শরীর ভারী হয়ে থাকে। আমার কাজ শুরু করতে অসুবিধে হবে। তাই অপেক্ষাকৃত আরামের অটো টানেল ভ্রমণই বেছে নিয়েছি। অটো

টানেলের গাড়ির কোনও চাকা নেই। ম্যাগনেটিক লেভিটেশানে টানেলের অটোলাইন থেকে কয়েক মিলিমিটার ওপর দিয়ে ভেসে চলে। সুতরাং ঝাঁকুনির কোনও ব্যাপার নেই। আর ইচ্ছে করলে গাড়ির গতিবেগ আমি ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত তুলতে পারি। কিন্তু আমার কোনও তাড়া নেই। বরং ধীরেসুস্থে সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় আমি ফরেস্ট-এক্স-এর সীমানায় পৌঁছোতে চাই। যে করে হোক—হারানো চারজনকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। যে করে হোক।

আমি চোখ খুললাম। সাপের মতো টানেল ধরে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। পাশের সিটে রাখা ব্রিগেডিয়ারের দেওয়া কম্পিউটার প্রিন্ট আউটগুলো তুলে নিলাম। এর আগে তিনবার এগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি ওই চারজনের মধ্যে কোথায়-কোথায় মিল রয়েছে, আর কোথায়ই বা অমিল। এ-ছাড়া, ফরেস্ট-এক্স-এর প্রাণীর তালিকাটাও দেখেছি বারবার। তাদের বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে ছবি। ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি কোন ভয়ঙ্কর জন্তু ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারিনি। তবু আর একবার ওগুলো পড়তে শুরু করলাম ঃ প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ...। তারপর নিজের মনেই বললাম, বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি,...তোমরা হারিয়ে গেলে কেন?

এমনসময় চোখ গেল কম্পিউটার ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে। ফরেস্ট-এক্স স্টেশনে পৌঁছোতে আর আধঘণ্টা বাকি। এই সময়টুকু দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

অটো টানেল স্টেশনের পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। মাথার ওপর থেকে গাড়ির স্বচ্ছ ছাদ সরে গেল। দরকারি একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে। ছাদ আবার জায়গামতো বসে গেল। পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করে রিকগ্‌নিশান লক করে দিলাম। আমি ছাড়া এই গাড়ি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ির কম্পিউটার-চোখ শুধুমাত্র আমাকে চিনতে পারলেই দরজা খুলবে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঘেরাটোপে ঢাকা স্টেশনের এক নির্জন কোণে কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হারিয়ে যাওয়া ওই চারজনকে নিয়ে যখন আমি ফিরে আসব তখন আমার জন্যে বাড়তি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে এই কম্পিউটার টার্মিনাল। এই স্টেশনটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অধীনে। সুতরাং এখন এখানে মানুষ বলতে একমাত্র আমি।

কম্পিউটার চালু করে টার্মিনালের বোতাম টিপে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ঠিকমতো স্টেশনে পৌঁছেছি এবং এক্ষুনি কাজে নামছি। তারপর প্যাকেট খুলে জারকোনিয়াম অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়া

বিশেষ ধরনের সিনথেটিক পোশাক বের করে পরে নিলাম। এই পোশাক আগুন, তাপ, জল ও জীবাণুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। জেনারেটর গান, লেসার ব্লাস্টার, বিপার ইত্যাদি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরীক্ষা করে পোশাকের নানা জায়গায় ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর ট্রান্সমিটার ও ঘন খাবারের টিন কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরোলে সবসময়েই দেখেছি শরীর ও মনের ওপরে একটা ধাক্কা লাগে। অথচ বাইরে আমি সব মিলিয়ে প্রায় দুশো ঘণ্টারও বেশি সময় থেকেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে বাইরের জগৎটাকে সবসময় নতুন বলে মনে হয় কে জানে!

মাঝ-বেলার সূর্যের কিরণ পিঠের ওপরে আছড়ে পড়ছে। বাতাস বইলেও সেটা পোশাকের জন্যে টের পাচ্ছি না। তবে দেখতে পাচ্ছি, লম্বা-লম্বা ঘাসের ঝোপ এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সামনে দূরে ছোট-বড় পাথুরে টিলা। আর অসমান জমিতে আগাছার জঙ্গল। বাইরের নির্জন বিশালতা আমাকে যেন একটু ভয় পাইয়ে দিল।

কিছুটা দূরেই চোখে পড়ছে ফরেস্ট-এক্স। ঘাসের ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল সেদিক পানে যতই এগিয়েছে ততই যেন ঘন হয়েছে, আর উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। তারপর শুরু হয়েছে সবুজ পাতায় ঢাকা মহীরুহের জটলা।

পকেট থেকে গ্রাফিক্স রুট-ম্যাপটা বের করে নিলাম। তারপর রওনা হলাম।

জঙ্গলের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। জঙ্গল আমি আগে যা দেখেছি সবই ছবিতে—কম্পিউটার সিমুলেশনে। কিন্তু সত্যিকারের একটা প্রাচীন জঙ্গলের মধ্যে কেমন এক বিচিত্র গন্ধও মিশে আছে। আর সেইসঙ্গে রয়েছে নানা শব্দ। তার কয়েকটি পাখির ডাক বলে আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু অন্য শব্দগুলো কীসের?

স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে পা ফেলতে বা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎই পায়ের কাছে সাপের মতো কী একটা নড়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ব্লাস্টার তাক করে ফায়ার করলাম। সাদা আর বাদামি ডোরাকাটা সরীসৃপটার মাথায় ছোট-ছোট দুটো শিংয়ের মতো কী রয়েছে। আর তার মাঝে একথোকা কালো চুল! ওটার শরীর মাঝখান থেকে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাণীটার কথা ব্রিগেডিয়ারের কম্পিউটার প্রিন্টআউটে পাইনি। এই রহস্যময় জঙ্গল হয়তো এরকম বহু অজানা-অচেনা প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে। আর তাদেরই কেউ হয়তো ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি।

তখনই চোখ পড়ল আরও দুটো অদ্ভুত প্রাণীর দিকে। চেহারায় ভোঁদড়ের মতো, তবে লম্বায় প্রায় দেড়গুণ। আর সামনের পায়ে ধারালো বিশাল নখ, গায়ের রং সবুজ, তার ওপরে কালচে ছোপ। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আগাছার ঝোপ চিরে

সরীসৃপটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সামনের নখে দুটো টুকরো দুজনে বিঁধিয়ে ছিটকে চলে গেল ঝোপের আড়ালে।

আমি এক পা পিছিয়ে এসে ব্লাস্টার তাক করেছিলাম, কিন্তু ফায়ার করিনি। মনে হয়েছিল, আমার এই পোশাক ভেদ করে চট করে কোনও ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

প্রাণী দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি সামনে পা বাড়ালাম। এগুলোর ছবি কম্পিউটার প্রিন্টআউটে দেখেছি। মার্কোনক্স। একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংসাশী। এরা খায় না এমন জিনিস নেই। তবে মৃত প্রাণীদের শরীরে দাঁত-নখ বসাতে এরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

ক্রমেই সূর্যের আলো গাছের অসংখ্য পাতায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা বড়-বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে নানারকমের পরজীবী লতা। তাদের কোনও কোনওটায় ফুটে রয়েছে বিচিত্র আকার এবং রঙের বাহারি ফুল। আর তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে রংবেরঙের একঝাঁক প্রজাপতি। এইসব প্রজাপতি ও ফুলের নিখুঁত ছবি আমি দেখেছি। তবে আসল জিনিসটা চোখের সামনে দেখে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। কী যে হল, জীবাণুর ভয় না করেই হাতের দস্তানা খুলে একটা গোলাপি ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। গোলাপি ফুলটার পাপড়িগুলো সুষম ছন্দে কাঁপতে লাগল, আর তার রং পালটাতে লাগল ধীরে-ধীরে। গোলাপি-লাল-বেগুনি-নীল-হলদে-গোলাপি...

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই ফুলটা হলদে রঙে তৃতীয়বার পৌঁছে তার রং-বদলের খেলা শেষ করল। রামধনু ফুল ফরেস্ট-এক্স-এর অলঙ্কার। আমি মুগ্ধ চোখে তখনও ফুলটাকে দেখছিলাম।

সেই কারণেই পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণকারীকে দেখতে পাইনি। সুতরাং প্রথম আঘাতের ধাক্কা আমাকে ছিটকে ফেলে দিল বুনো ঘাসে ছাওয়া ভেজা মাটিতে। মাথা ঠুকে গেল কোনও বিশাল গাছের শক্ত শেকড়ে। আর তখনই আক্রমণকারীকে চোখে পড়ল। বুলবোয়া! দু-পেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী। হাত বলে কিছু নেই, তবে দেহে অসম্ভব শক্তি। গায়ে একটুও লোম নেই। বড়-বড় লাল চোখ। লম্বা ধারালো দাঁত। পিছনে কুমিরের মতো কাঁটাওয়ালা মোটা লেজ।

অদ্ভুত গর্জন করে বুলবোয়াটা আমার ওপরে দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই আমি বাঁ-হাতে ব্লাস্টারের ট্রিগার টিপলাম। বুলবোয়ার বিশাল মাথাটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটার গর্দান থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ভারী বাতাসে। জমি কাঁপিয়ে শব্দ করে আছড়ে পড়ল জন্তুটার বিশাল দেহ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তাজ্জব করে দেওয়া ক্ষিপ্রতায় প্রায় একডজন মার্কোনক্স কোথা থেকে হাজির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতদেহটার ওপরে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক করে নিলাম। দস্তানাটা হাতে পরে নিয়ে আরও জোরে পা চালালাম। একটা জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল। মার্কোনক্সরা কেমন করে মৃতদেহের খোঁজ পায়? ওরা যেভাবে কোনও সদ্য-মৃত প্রাণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে মনে হয়, ওই নিখোঁজ চারজন যদি এই জঙ্গলে মারাও গিয়ে থাকে তবু তাদের কোনও চিহ্নই আমি পাব না। কিন্তু কোনও-না-কোনও সূত্র যে আমাকে পেতেই হবে! বেশ চিন্তিতভাবে আমি পথ চলতে শুরু করলাম আবার। মাথার পিছনটা অল্প-অল্প ব্যথা করছিল।

জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। বেলা পড়ে আসার ঢের আগেই চারদিক আঁধার হয়ে আসছে। রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুতরাং পুরোনো নিয়ম মেনে একটা জুতসই গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। কয়েকটা বড়-বড় ডালের জোড়ের কাছে গুছিয়ে বসলাম। তারপর পকেট থেকে টেপ-রেকর্ডার বের করে এখন পর্যন্ত যা যা হয়েছে সব বিবরণ বলে গেলাম। টেপ বন্ধ করে বিপারটা অন করে দিলাম। এই বিপারের সঙ্কেত সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের মেইনফ্রেম কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। তা থেকে ওরা জানতে পারবে আমি এখন জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় আছি।

সামান্য খাবার খেয়ে নিয়ে আমি শোওয়ার আয়োজন করলাম। আলো সরে গিয়ে আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কানে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ। তার মধ্যে কয়েকটা সুর বেশ মিষ্টি। রাতের কোনও পাখি জেগে উঠল নাকি?

একটু পরে যখন ঘুমে চোখ বুজে এল তখন রামধনু ফুলটার রং-বদলানো পাপড়ির কথা আমার মনে পড়ছিল।

সে-রাতে অনেক বছর পর আমি স্বপ্ন দেখলাম। আমাকে ঘিরে অসংখ্য রামধনু ফুলের দল পাগলের মতো তাদের পাপড়ির রং পালটে চলেছে।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির গানে। রেকর্ড করা এই গান আগে অনেক শুনেছি। আমাদের যে-কোনও শহরে বহু কৃত্রিম বাগিচা আছে যেখানে নকল ফুল ফোটে, যন্ত্রের পাখিরা উড়ে বেড়ায়, গান গায়। কিন্তু ঝকঝকে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে, অসংখ্য রঙিন ফুল ছুঁয়ে যে-গান এখন ভেসে আসছে তার আকর্ষণ ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। পাতার ফিশফিশ শব্দ আর পাখির সুর যেন একে অপরের যুগলবন্দি।

গাছ থেকে নেমে তৈরি হয়ে আবার শুরু করলাম পথ চলা। চলতে-চলতে টের পেলাম একটা খসখস শব্দ। না, একটা নয়, অনেক। আমাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে কারা যেন চলেছে আমার পাশাপাশি। আমি পথ চলা থামালে সেই শব্দগুলোও থেমে যাচ্ছে। কারা এভাবে লঘু পায়ে অনুসরণ

করছে আমাকে?

উত্তরটা জানা দরকার। তাই পকেট থেকে খুদে অস্ত্রসম্ভারের প্যাকেটটা বের করলাম, তা থেকে বেছে নিলাম একটা সাউন্ড ট্র্যাকার। তার ছুঁচোলো মুখে ঘুমের ওষুধ মাখানো একটা ছুঁচ লাগিয়ে আন্দাজে ভর করে ফায়ার করলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ কানে এল। আমি ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আগাছার ঝোপ আর লতাপাতার ঝাড় সরিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই চোখে পড়ল আমার অনুসরণকারীদের একজনকে। শব্দভেদী সাউন্ড ট্র্যাকার নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। একটা মার্কোনক্স।

বুঝলাম, মার্কোনক্সের দল আড়ালে থেকে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওরা বোধহয় আন্দাজ করেছে, আমার সঙ্গে পথ চললেই ওরা মৃতদেহ পাবে, ওদের খিদে মিটবে। তা সে-মৃতদেহ আমারই হোক বা অন্য কোনও প্রাণীর।

ঘুমন্ত মার্কোনক্সটার শরীর থেকে সাউন্ড ট্র্যাকারটা তুলে নিয়ে সরে আসা মাত্রই প্রায় হাফ ডজন মার্কোনক্স ওটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল ওদের নির্মম কাটাছেঁড়া। ওরা বোধহয় সাউন্ড ট্র্যাকারটা তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিচিত্র চেহারার সাউন্ড ট্র্যাকার একটা প্রাণীর শরীরে বিঁধে থাকা অবস্থায় ওরা ঠিক এগোতে সাহস পাচ্ছিল না।

আবার চলতে শুরু করলাম জঙ্গলের পথ ধরে। এবং টের পেলাম একই সঙ্গে মার্কোনক্সদের গোপন অনুসরণও শুরু হয়েছে। হোক। ওদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এভাবে কতদিন খোঁজ করব আমি? ফরেস্ট-এক্স-এর ঘন জঙ্গলে, অন্ধকারে, শত্রুসঙ্কুল পরিবেশে এরকম এলোমেলো খোঁজ করে কোনও ফল পাওয়া যাবে কি?

এইসব ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা ভারী কিছু আমার পিঠের ওপর পড়ে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্লাস্টার রেডি। কাঁটাওয়ালা একটা বিশাল সাপ। সারা গায়ে লাল আর রুপোলি ডোরা, আর তারই মাঝে শিরদাঁড়া বরাবর ধারালো সরু কাঁটা। চোখ দুটো নীল। আলো-আঁধারির মাঝে জ্বলছে দপদপ করে। না, এটার কথা রিপোর্টে নেই। কিন্তু প্রাণীটার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিবশ করে দিল। সাপটা বাতাস কেটে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ছোবল ছুড়ে দিল আমার পা লক্ষ্য করে, আর একইসঙ্গে লেজের কাঁটাওয়ালা দিকটা আছড়ে দিতে চাইল আমার গায়ে। ক্ষিপ্রতায় কোনও প্রাণীকে পরাস্ত করাটাই অপারেশান ডিভিশনের অপারেটারদের পেশা। সুতরাং ব্লাস্টার চালালাম। সাপটার শরীরের খানিকটা অংশ মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওটা আমার পায়ে ছোবল মেরেছিল, কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের পাতে মোড়া বিশেষ ধরনের জুতো সেই ছোবল ভোঁতা করে দিয়েছে।

যথারীতি মার্কোনক্সের দঙ্গল হামলে পড়ল সাপটার দেহের ওপরে। আমি

সেদিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই একটা সন্দেহজনক শব্দ আমার কানে এল—কারও পায়ের শব্দ। আমার পাশাপাশি চলেছে।

জঙ্গলের লতাপাতায় আমার হাত-পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছি। তখনই একটা গাছে আমার হাত লাগতেই খুব অস্পষ্টভাবে জলতরঙ্গের সুর বেজে উঠল। অদ্ভুত ঢিমে তালে বাজতে লাগল সেই বাজনা। আমার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। এ কোন ঘুমপাড়ানি গাছ! এর কথা তো রিপোর্টে নেই! বাজনার সুরটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। আমি ঘোর-লাগা মানুষের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের জন্যে পুরোপুরি ভুলে গেলাম নতুন পায়ের শব্দটার কথা। চেহারায় সাধারণ এই গাছ কোথা থেকে পেল স্বর্গীয় এই জলতরঙ্গের সুর?

সংবিৎ ফিরতেই চলা শুরু করলাম এবং নতুন পায়ের শব্দটা আবার শোনা গেল। এবার ফরেস্ট-এক্স-এর মোহময় নেশা কাটাতেই আমি রীতিমতো হিংস্রভাবে জেনারেটর গান বের করে নিলাম। তারপর শব্দ আন্দাজ করে একসঙ্গে পুরো এক মিনিট লো-লেভেল ফায়ার করলাম। আর্তনাদ অথবা গোঙানির মতো একটা শব্দ হল। দূরের একটা ঝোপে কেউ যেন নড়াচড়া করল। আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজে বের করলাম শিকারকে। লতাপাতার জালে জড়িয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ!

মানুষটার চেহারা ও পোশাক বড় অদ্ভুত।

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। কোমরে একটা নোংরা কাপড় জড়ানো। আর ডান হাতের কাছেই পড়ে রয়েছে কাঠের ছুঁচোলো ফলা লাগানো একটা বল্লম। এটা দিয়ে কি আমাকেই আক্রমণ করতে চাইছিল এই জংলিটা?

ফরেস্ট-এক্স-এ কোনও মানুষ আছে বলে জানতাম না। তাই একটু অবাক হলাম। অসাড় লোকটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তখনও ঝোপের আড়াল থেকে অল্পস্বল্প শব্দ পাচ্ছিলাম। বোধহয় মার্কোনক্সদের দল উশখুশ করছে। সুতরাং ঠিক করলাম, লোকটাকে সঙ্গে নেব। এর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখব কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।

ঝুঁকে পড়ে দেহটা তুলে নেওয়ামাত্রই বৃষ্টি শুরু হল। মুখ তুলে ওপর দিকে দেখলাম। এক টুকরো আকাশও চোখে পড়ছে না। শুধু ঘন পাতায় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। লক্ষ করলাম, গাছের ডাল বেয়ে সরসর করে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েক রকমের ছোট-বড় চিত্র-বিচিত্র সাপ। বৃষ্টির জল ওদের চঞ্চল করে তুলেছে।

আমি জংলি মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর পর লোকটাকে মাটিতে নামিয়ে দম নিচ্ছিলাম। হঠাৎই একসময়ে খেয়াল হল, জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘন কালো মেঘ

জমাট বেঁধে রয়েছে। বৃষ্টি তখনও ধরেনি।

এরপর খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। আর একই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ কানে আসছিল। গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়ে মাঝারি মাপের একটা পাহাড়ের অংশ চোখে পড়ল। তার একটু পরেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মন যেন একটা ধাক্কা খেল।

অসাড় দেহটাকে ভিজে মাটির ওপরে নামিয়ে রেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম সামনের দৃশ্য।

বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তবে ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি। ফলে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে অসুবিধে হল না। আমার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে একটা বিশাল হ্রদ। তার নীল জল চিকচিক করছে। হ্রদের কোল ঘেঁষে একটা পাহাড়। একটু আগে এই পাহাড়টাকেই আমি জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় আর একপাশে অনেক গাছ চোখে পড়ছে। তাদের মাথায় মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের নানা রঙের আলো। আর পাহাড়ের মাথায় লুকোনো কোনও স্রোতস্বিনী থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে নীচের হ্রদে। তারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা হ্রদের জলতলে পড়ে যেন খই ফুটছে। আর তারই গা থেকে ঠিকরে পড়ছে শেষ বিকেলের আলো। ঝরনার জলের ধারা থেকে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল শত-শত জলকণার রেণু। তাদের গায়ে ফুটে উঠেছে রামধনুর বর্ণালি। এতক্ষণ বাতাসের জোর বোঝা যায়নি। এখন তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

পায়ের কাছে একটা অচেতন দেহ ফেলে রেখে আমি সার্কাসের সঙের মতো মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টি আমি আগে দেখেছি। পাহাড়ও আমি দেখেছি। দেখেছি হ্রদ, ঝরনা, পড়ন্ত বিকেল, জঙ্গলের গাছপালা আর রঙিন ফুল। আমি জানি, এগুলোর নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এইসব জিনিস একসঙ্গে একই জায়গায় আমি কখনও দেখিনি। ফলে এখন টের পেলাম, প্রকৃতির এইসব টুকরো-টুকরো ছবি জোড়া লেগে গোটা ছবিটা তৈরি হলে পর তার আকর্ষণের কোনও তুলনা নেই।

এরই মধ্যে বৃষ্টি থামল। মেঘ সরে পরিষ্কার হল আকাশ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডুবে যাওয়া লাল সূর্যকে কিছুটা দেখা গেল। পিছনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল পাখির ডাক আর অচেনা কোনও প্রাণীর চিৎকার। প্রকৃতির মধ্যে ওরাও আছে, আমরাও আছি।

এমনসময় পায়ের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মানুষটা এক ঝটকায় উঠে বসে আমার পা ধরে এক টান মারল। আমি ঘোর লাগা অবস্থাতেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম ঘাস-জমিতে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ব্লাস্টার বের করে ফায়ার

করার জন্যে উঁচিয়ে ধরলাম।

আমাকে ঠিক না চিনতে পারলেও জংলিটা বোধহয় লেসার ব্লাস্টার চিনতে পারল। তাই দু-হাত মাথার ওপরে তুলে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, 'প্লিজ, ডোন্ট শুট! ডোন্ট শুট!..'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু-হাত মাথার ওপরে রেখে লোকটাও উঠে দাঁড়াল ধীরে-ধীরে। ওর সভ্য কথাবার্তা আমাকে চমকে দিয়েছিল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে রেখেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

লোকটা বলল, 'সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফ জুওলজিস্ট সত্যদেব সিং।'

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখতে লাগলাম। ফরসা শরীর রোদে-জলে কালচে, মুখে চুল-দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, পরনে বনবাসীর কৌপিন। আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের কী প্রাগৈতিহাসিক দশা! কিন্তু কেন? আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, রঘুনাথ মহান্তিই বা কোথায়? সে-কথাই জিগ্যেস করলাম সত্যদেব সিংকে। সেইসঙ্গে নিজের পরিচয়ও দিলাম! বললাম, কেন আমি এসেছি।

সত্যদেব বলল, 'চলুন, যেতে-যেতে সব কথা বলছি।'

সূর্য ডুবে গেলেও শেষ বিকেলের আলো রয়ে গেছে। ঝরনার রিমঝিম শব্দ অনেক জোরালো মনে হচ্ছে এখন। আমরা দুজন এগোলাম পাহাড়ের দিকে। কারণ সত্যদেব বলল, পাহাড়ের ও-পিঠেই নাকি সবকিছুর উত্তর রয়েছে।

একটু থেমে সত্যদেব আবার বলল, 'আজ আমাকে দেখে আপনি যেমন আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তেমনই বিক্রম শর্মাকে এখানে প্রথম যখন খুঁজে পাই তখন আমি আর রঘুনাথ মহান্তিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি, একজন আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী এরকম পালটে যেতে পারে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম শর্মা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম পাগল বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক নয়, শর্মা হয়ে গেছে প্রকৃতি-পাগল। ও আমাকে বলেছিল, সিং, একসঙ্গে এত সুন্দর জিনিস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এই ঝরনা, পাহাড়, হ্রদ, ফুল, পাখি, এসব দেখে আমিও বুঝেছিলাম, ওর কথা কী মর্মান্তিক সত্যি। শহরের ঘেরাটোপে বসে কম্পিউটারে আঁকা প্রকৃতির ছবি দেখে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় না।'

ফাঁকা জমি পেরিয়ে যখন আমরা এবড়ো-খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করছি তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সত্যদেব বলল, 'এখনও অনেকটা পথ বাকি। রাতটা এখানেই কোথাও পার করে দিলে ভালো হয়।' সুতরাং তাই করলাম।

একটা বড় মাপের টিলার ওপরে চড়ে বসলাম দুজনে। একটা ছোট গাছে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আমি আকাশ দেখতে লাগলাম। সত্যদেব বলতে শুরু করল আবার 'বিক্রম শর্মা আমাদের নিয়ে গেল রণবীর সেনের কাছে। কথা

বলে বুঝলাম তারও ওই একই অবস্থা। কৃত্রিম শহরগুলোয় সে আর ফিরে যেতে চায় না। ওখানে নাকি একটাও আসল জিনিস নেই। সবই মানুষের তৈরি, নকল। তারপর...।'

সত্যদেব সিং বলে যাচ্ছিল একটানা। আর আমার নেশা ধরে যাচ্ছিল—হারিয়ে যাওয়ার নেশা। আমি রং বদলানো রামধনু ফুলের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছি তরুলতার জলতরঙ্গ আর পাখির ডাক, আমার চোখের সামনে হ্রদের নীল জলে বৃষ্টির খই ফুটছে, গুঁড়ি-গুঁড়ি জলকণায় রামধনুর ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের কোলে অস্ত যাওয়া সূর্যের চোখ-জুড়োনো রং, আর আকাশে মেঘের দলে কোলাকুলি।

আমি ভুলে যাচ্ছিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, টেপ-রেকর্ডার, ব্লাস্টার, জেনারেটের গান আর কম্পিউটারের কথা। কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোল আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী।

এমনসময় সর্বনাশের মতো মাথার ওপরে কালো আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল।

ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। ঝরনার জলের রিমঝিম বাজনা এখন আরও মাতাল। তারই মধ্যে সত্যদেব কথা শেষ করে গুনগুন করে একটা গান ধরল। গানের কথা একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল যেন গানটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শেষবারের মতো দেখলাম, সত্যদেব মাটিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে গান গেয়ে চলেছে!

জঙ্গলের ভেতরে ভোর হয়েছিল একরকম ভাবে। আর এইখানে খোলা আকাশের নীচে সকাল হল একেবারে অন্যরকম।

পিছনে জঙ্গল থাকার জন্যে আমরা এখনও ছায়ায় ঢাকা। কিন্তু সকালের রোদ গিয়ে পড়েছে দূরের একটা পাহাড়ে, হ্রদের জলের মাঝামাঝি, আর বহতা স্রোতস্বিনীর ওপরে। নীচের ফাঁকা জমিটাকে এখান থেকে কিছুটা ছোট দেখাচ্ছে। বেশ কিছু নাম-না-জানা বড়সড়ো পাখি এসে ভিড় করেছে হ্রদের কিনারে। সেখানে কয়েকটা মার্কোনক্সকেও চোখে পড়ল। পাখির কিচিরমিচির শব্দ হয়তো নেহাতই কোলাহল—কিন্তু আমার বেশ লাগছিল।

সত্যদেব চিতপাত হয়ে ঘুমিয়েছিল। ওকে ঠেলা মেরে ডাকলাম। ও উঠে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, 'চলুন, এবারে আমরা এগোব। আট-দশ ঘণ্টার পথ।'

হাঁটতে-হাঁটতে দুপুরবেলা নাগাদ আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এখান

থেকে দেখা যাচ্ছে হ্রদের ওপরে কিছুটা জায়গা ছেড়ে আবার শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। সত্যদেব বলল, 'আপনাকে এতক্ষণ বলিনি। রণবীরের ভীষণ জ্বর হয়েছে। মনে হয় কোনও ইনফেকশান। আপনার সঙ্গে কোনও ওষুধপত্র আছে?'

আমি বললাম, 'আছে।'

বাকি পথটুকু ঢালু হওয়ায় আমরা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে এলাম। জায়গাটায় গাছগাছালি রয়েছে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। তারই মধ্যে দিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটিতে পা ফেলে আমরা এগোলাম।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম ওদের আস্তানায়। এবং আমার অবাক হওয়ার তখনও বোধহয় কিছুটা বাকি ছিল।

বিকেলের নরম আলোয় আমার চোখে পড়ল লতাপাতায় ছাওয়া এক মনোরম কুটির। তার চালে অসংখ্য রঙিন ফুল ফুটে আছে। আর সামনে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তার কিছুটা দূরে একটা ছোট পুকুর—তাতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। সূর্যের ছায়া পড়েছে সেখানে। আর কুটিরের গা ঘেঁষে বিশাল বাগান। তবে মানুষের হাতে তৈরি বাগান নয়, প্রকৃতির খামখেয়ালি বাগান। আশ্চর্য অমিত্রাক্ষর। এত সব রংবাহারি ফুল, তোরা কোথায় লুকিয়ে ছিলি?

সত্যদেব আমাকে কুটিরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। মেঝেতে শুকনো পাতার ওপরে রণবীর সেন শুয়ে রয়েছে। দু-চোখ বোজা। গায়ে কয়েকটা পাতার প্রলেপ। আর ওর মাথার পাশে বসে রয়েছে রঘুনাথ মহান্তি। সত্যদেব আমাকে বসতে বলল। পরিচয় করিয়ে দিল। মহান্তির সঙ্গে। রণবীর সেন কথাবার্তার শব্দ পেয়ে দুর্বল স্বরে কী যেন বলল, চোখ মেলে তাকাল।

রঘুনাথ বলল, 'বিক্রম শর্মা শিকারে গেছে।'

সত্যদেব ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে-গড়া একটা কলসি থেকে জল গড়িয়ে রণবীরকে দু-একঢোক খাওয়াল।

লক্ষ করলাম, ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। শুধু ছোট-বড় কয়েক টুকরো কাঠ আর শুকনো ঘাসপাতা।

রণবীরের কপালে হাত রাখলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পোশাকের পকেট হাতড়ে ওষুধের প্যাকেট বের করলাম। একটা ট্যাবলেট বেছে নিয়ে ওর মুখে দিলাম। রণবীর ম্লান হাসল, অস্পষ্টভাবে বলল, 'আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন?'

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। চার-চারজন সেরা বিজ্ঞানীর কী পরিণতি! ওদের ফেরানো আমার পক্ষে আর কি সম্ভব?

সত্যদেব বলল, 'দাস, আপনি রণবীরকে কোনওরকমে নিয়ে যান। এখানে থাকলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রিগেডিয়ারের কথা মনে পড়ছিল। উনি বলছিলেন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা। আমাদের অজানা অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। যে বুলবোয়ার চাইতেও শক্তিশালী, হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর। মোহিনী প্রকৃতি! এই চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে এই একটা জায়গাতেই দারুণ মিল ঃ প্রকৃতি ওদের টানে।

আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। এই প্রথম 'যদি, মনে করি, ধরা যাক' এইসব শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া একরাশ কাল্পনিক কথা আমার মাথার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনের কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী, সুশোভন দাস, কল্পনায় বারবার টলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

সত্যদেব আমাকে বাইরে নিয়ে এল। বাগানের কাছে গিয়ে আমরা বসলাম।

হঠাৎই সত্যদেব জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দাস, বলুন তো, ফুল আমাদের কী কাজে লাগে?'

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখলাম, মরা বিকেলের রোদ ওর মাথায়, দাড়িতে এসে পড়েছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার যুক্তি কার্যকারণ ইত্যাদি ক্রমশ তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সত্যদেব বলল, 'অনেক প্রশ্ন নিয়ে কখনও আমরা ভাবিনি। অবশ্য ওই কৃত্রিম শহরের ঘেরাটোপে বসে তা ভাবা সম্ভবও নয়। যেমন, প্রজাপতি আমাদের কী কাজে লাগে। কিংবা চাঁদ-তারা না দেখলে কি কোনও ক্ষতি হয়?'

আমার চোখের সামনে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর দূরে গাছের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আমার মনে হল, অস্ত-যাওয়া সূর্য না দেখতে পেলে কি কোনও ক্ষতি হয়?

আমি চুপচাপ বসে সত্যদেবকে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে দেখি কুটির থেকে রঘুনাথ ও রণবীর বেরিয়ে আসছে। রঘুনাথ দু-হাতে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসছে ওকে।

সত্যদেব তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওদের কাছে। রঘুনাথ বলল, 'কী করব, শুনছে না। বলছে, বাগানে নিয়ে যেতে।'

ওরা দুজনে রণবীরকে এনে বাগানের নরম ঘাস-জমিতে শুইয়ে দিল। রণবীর সেন, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নামজাদা এনটোমোলজিস্ট—পতঙ্গবিজ্ঞানী, তখন বিহ্বল চোখ মেলে ধূসর আকাশ, রঙিন ফুল, অস্তায়মান সূর্য আর প্রজাপতি দেখছে।

রঘুনাথ একটু উঁচু গলায় বলল, 'সেন, তুমি দাসের সঙ্গে শহরে ফিরে যাও। সেখানে তুমি সেরে উঠবে।'

রণবীর সেন প্রকৃতির দিক থেকে চোখ সরাল না। শুধু হাসল, বলল, 'মহান্তি, তোমার কি মনে হয় না শহরের একশোটা জীবনের চেয়ে এইখানে এইভাবে মারা যাওয়াটা অনেক বেশি দামি?'

সত্যদেবের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও আমার হাত চেপে ধরল।

এমনসময় দেখা গেল, বিক্রম শর্মা জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাতে ঝুলছে ছোটখাটো কোনও প্রাণীর মৃতদেহ।

কাছাকাছি এসেই মৃতদেহটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল বিক্রম। দৌড়ে এল আমাদের পাশে। একপলক আমাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ল রণবীরের ওপরে। রঘুনাথ রণবীরের কপালে হাত রাখল। সত্যদেব ধরল ওর কবজি। সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে। সিসের আস্তর দেওয়া অন্ধকার নামছে জঙ্গলে। প্রজাপতিরা বেশির ভাগই চলে গেছে, শুধু কয়েকটা আশ্চর্য নিশাচর প্রজাপতি বাগানে উড়ছে। ওদের ডানার রঙ আধো-আঁধারিতে প্রতিপ্রভ হয়ে জ্বলছে। ঠিক একইভাবে জ্বল-জ্বল করছে কয়েকটা রঙিন ফুলও।

রণবীর সেদিকে একবার দেখল। তারপর অস্ফুটস্বরে কী একটা বলে চোখ বুজল। আচমকাই ওর ঘাড়টা কাত হয়ে গেল একপাশে।

বাকি তিনজন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হল, কান্নার কি কোনও দাম আছে! কিন্তু টের পেলাম, আমার চোখ জ্বালা করছে।

সত্যদেব চোখ ঢেকে বসে ছিল। অন্ধকার থিতিয়ে বসছে। আগুনের কুণ্ডের লালচে আলো আমাদের মুখে-গায়ে। জঙ্গল থেকে পাখি ডাকছিল। আর শোনা যাচ্ছিল হিংস্র গর্জন। ঝরনার জলের কুলকুল শব্দ এখন আরও স্পষ্টভাবে কানে আসছে।

ঠিক সেই সময়ে আকাশের সন্ধ্যাতারা আমার চোখে পড়ল। আকাশের প্রথম চোখ। আমাদের দেখছে।

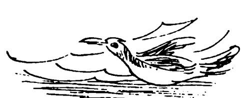
আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে এক অসহ্য জ্বালাপোড়া। ছটফট করতে-করতে সমস্ত পোশাক-আশাক-জুতো সব খুলে ফেললাম। ছুড়ে ফেলে দিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, ব্লাস্টার, জেনারেটর গান—সব। ওরা তিনজন এবারে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল।

আর আমি দেখছিলাম, অন্ধকার বাগানে ফুটে থাকা উজ্জ্বল রঙিন ফুল, নিশাচর রঙিন প্রজাপতি, সন্ধ্যাতারা। শুনছিলাম, ঝরনার শব্দ, রাতপাখির ডাক, পাতার ফিশফিশ।

জঙ্গলের দুরন্ত বাতাস আমার বুক-পিঠ, মুখ-চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রতি একশো বছর অন্তর বেশ কিছু মানুষ ফরেস্ট-এক্স-এর আকর্ষণে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

কোনও বাধাই সেই হারিয়ে যাওয়া রুখতে পারবে না।





চিকুর স্বপ্ন

ভোরবেলা বুড়ো লোকটাকে দেখতে পেল চিকু। গোলাপ বাগানের ভেতরে জবুথবু হয়ে বসেছিল সে। পরনে একটা পুরোনো আলখাল্লা। তাতে লাল, নীল, হলদে, সবুজ হরেক রঙের তালি মারা। আর হাতে সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা লাঠি।

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে চিকু বাগানে বেড়াতে আসে। মা-বাবা তখন ঘুমিয়ে থাকেন। বাড়ির লাগোয়া বিরাট এলাকা জুড়ে বাগান। বাগানে নানা ফুলের গাছ, নানা ফলের গাছ। ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় মৌমাছি। গাছের ডালে-ডালে পাখি খেলা করে। সুরেলা শিস দেয়। চিকু দ্যাখে। চিকুর খুব ভালো লাগে। ও বাগানে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করেই হঠাৎ বুড়ো মানুষটার মুখোমুখি হয়ে পড়ল চিকু। গোলাপ বাগানের লাল, হলদে, বেগুনি, নানারকম গোলাপের মাঝে আলখাল্লার লাল, নীল, হলদে রং যেন মিশে গিয়েছিল। তাই হঠাৎ সামনা-সামনি পড়ে গিয়ে চিকু চমকে উঠেছিল। মাথায় ধবধবে সাদা চুলের জঙ্গল। একইরকম গোঁফ-দাড়িতে মুখের অনেকটাই ঢেকে গেছে। চোখ কুঁচকে ছোট। তার চারিদিকে বলিরেখার আঁকিবুকি। গোটা মুখে একইরকম অসংখ্য দাগ। আলখাল্লার বাইরে বেরিয়ে থাকা হাত দুটোরও একই দশা। লাঠি আঁকড়ে ধরা ডানহাতটা অল্প-অল্প কাঁপছিল।

চিকু অবাক হয়ে গেল। এরকম বুড়োমানুষ সে কখনও দেখেনি। আর লোকটা বাগানে এলই বা কোথা থেকে!

কাছে এগিয়ে গেল চিকু। জিগ্যেস করল, 'তুমি কে?'

বুড়ো লোকটা চমকে উঠল। চোখ আরও ছোট করে চিকুকে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। আলখাল্লা মোড়া শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

চিকু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। কেন ভয় পাচ্ছে মানুষটা! ও আরও কাছে এগিয়ে গেল। একটা হাত রাখল বুড়ো লোকটার হাতের ওপর। চামড়া কোঁচকানো। পার্চমেন্ট কাগজের মতো খসখসে। চিকু আবার বলল, 'বলো না, তুমি কে?'

বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে চিকুকে দেখল। ভয় কেটে গিয়ে ভরসা ফিরে এল মুখে। সামান্য হাসতে চেষ্টা করল। তারপর পালটা প্রশ্ন করল ঘড়ঘড়ে গলায়, 'তুমি কে, খোকাবাবু?'

'আমি চিকু। ওই বাড়িতে থাকি।' চিকু আঙুল তুলে ওদের বাড়িটা দেখাল। তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করল, 'তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

বুড়ো মানুষটা কী একটা বলতে গিয়ে কাশতে শুরু করল। দম ফেটে যাওয়ার মতো কাশি। হিজিবিজি দাগকাটা ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। কাশি থামলে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলল, 'আমি এখানে লুকিয়ে আছি প্রাণের ভয়ে, খোকাবাবু। এই ক'দিন হল এসেছি। তুমি কাউকে আমার কথা বোলো না যেন—।'

চিকুর অদ্ভুত লাগল। প্রাণভয়ে এই বুড়ো মানুষটা লুকিয়ে রয়েছে কেন! কে ভয় দেখাচ্ছে ওকে!

বাগানে নানা পাখি মিষ্টি সুরে ডাকছিল। মাঝে-মাঝেই অমন ডাক শোনা যায়। শোনা যায় সুরেলা শিসের শব্দ। চিকুর ভালো লাগছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষটা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আক্ষেপের গলায় বলল, 'নকল! সব নকল গো, খোকাবাবু! চেহারা আছে, নড়ন-চড়ন আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।'

চিকু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ও অবাক চোখে বুড়ো লোকটার রংবেরঙের আলখাল্লা দেখছিল। দেখছিল আঁকাবাঁকা লাঠি, আর ধবধবে সাদা চুল-দাড়ি।

বুড়ো চিকুকে ডেকে তার পাশে বসাল। কাঁপা গলায় বলল, 'চিরটাকাল এমন ছিল না, খোকাবাবু। আমাদের সময়ে সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খেত সত্যিকারের মৌমাছি।'

একটা মৌমাছি একটা হলদে গোলাপের আশেপাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। গুনগুন শব্দ উঠছিল বাতাসে। চিকু সেদিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই তো মৌমাছি!'

'নকল মৌমাছি।' হতাশ সুরে বলল বুড়ো, 'এই যে বাগানের গাছপালা, ফুল, ফল, পাখি, কীটপতঙ্গ, স-ব নকল। সবই মানুষের তৈরি, ভগবানের নয়। ভগবানকে মানুষ ছুটি দিয়েছে। একটু আগে ওই যে পাখির শিস শোনা গেল, রোজ সকালে একই সময়ে হুবহু ওই একই সুরে শিস দেবে নকল পাখিটা। এই যে মৌমাছি ফুলকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে, রোজ একই ভঙ্গিতে ওই ফুলটাকে ঘিরেই সে উড়ে বেড়াবে।'

'কেন?'—চিকু বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটার কথাগুলো। কই, চিকুর মা কিংবা বাবা তো কোনওদিনও এ-সব কথা ওকে বলেননি!

লোকটা আবার কাশল। পাতলা ধোঁয়াশা বেড়াচ্ছে চারদিকে। রোজই এইরকম থাকে। কেমন মেঘলা ঘোলাটে পরিবেশ।

'খোকাবাবু, এই পাখি, মৌমাছি, সবই তোমাদের বিজ্ঞানীদের তৈরি। ওদের শরীরের কলকবজায় ঠিক যেরকম-যেরকম নির্দেশ দেওয়া আছে, ঠিক সেরকমভাবেই ওরা গুনগুন করে, শিস দেয়, উড়ে বেড়ায়। এই যে সব ফুল—এগুলো বিজ্ঞানীদের হিসেবমতো ফোটে আর ঝরে পড়ে। ফুলের গন্ধও তৈরি হয়েছে তোমাদের ল্যাবরেটরিতে। তারপর সেই নকল সুগন্ধি ভরে দেওয়া হয়েছে ফুলের ভেতরে। ওই যে গাছের ফল, ওগুলো তোমরা কি কখনও খেয়ে দেখেছ? দেখোনি নিশ্চয়ই!'

'না, মা-বাবা বারণ করেছেন। আমরা তো শুধু ভিটামিন খাই চামচে করে, আর কার্বোহাইড্রেট-প্রোটিন মেশানো ফুড ট্যাবলেট।'

হাসল বুড়ো। মাথা নাড়ল হতাশায়। লাঠিটা নামিয়ে রাখল পাশে। তারপর চিকুর পিঠে হাত রেখে বলল, খোকাবাবু, 'ওই ফল শুধু দেখবার জন্যে। আর নকল পাখিগুলো বিজ্ঞানীদের তৈরি করে দেওয়া রুটিনমাফিক ওই ফলগুলো মাঝে-মাঝে ঠোকরায়। এমনকী খাওয়ার ভানও করে। হায় রে! কী দিনকালই না এল!'

বুড়ো আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মুখ তুলে ওপরে আকাশের দিকে তাকাল। ভুরুর ওপরে হাত রেখে নজর করে দেখতে চেষ্টা করল আকাশটা। ঘোলাটে মেঘলা আকাশে অনেক আলো জ্বলছে। শক্তিশালী আকাশ-প্রদীপের মতো সাদা উজ্জ্বল আলোক-পিণ্ডগুলো আকাশে ভাসছে। আলো ছড়াতে চেষ্টা করছে আবছায়া পৃথিবীর বুকে।

চিকুর দিকে তাকিয়ে বুড়ো প্রশ্ন করল, 'তুমি কোনওদিন সূর্য দেখেছ, খোকাবাবু? সূয্যিমামা?'

'না।' মাথা নাড়ল চিকু। তবে সূর্যের কথা ও শুনেছে মা-বাবার কাছে। বছর কুড়ি আগেও নাকি সূর্য দেখা যেত পৃথিবীর আকাশে। পুবে উঠত, পশ্চিমে অস্ত যেত। দিন ছিল উজ্জ্বল আলোময়, রাত ছিল ঘন অন্ধকার। এখন দিন আর রাতের

তফাত বেশ কমে এসেছে। পরিবেশ গাঢ় হয়ে, ঘন হয়ে, সূর্য ঢেকে গেছে। বুদ্ধিমান মানুষ এখন নতুন ধরনের আলোর উৎস তৈরি করেছে। হাউইয়ের মতো আলোক-পিণ্ড ছুড়ে দিয়েছে আকাশে। সেগুলো ভারী বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে। আলো ছড়ায়। মাসখানেক পরে সেগুলোর জ্যোতি কমে আসে। নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তখন নতুন-নতুন আলোক পিণ্ড ছুড়ে দেয় মানুষ। আবার আলো হয়।

বিশাল আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা কাপড়ের ঝোলা বের করল বুড়ো। ঝোলাতেও আলখাল্লার মতো রংবেরঙের অজস্র তালি। হাতড়ে-হাতড়ে তার ভেতর থেকে একটা বিবর্ণ প্যাকেট বের করল। হলদেটে কাগজে মোড়া। কাগজ বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। চিকু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। কাঁপা হাতে প্যাকেট থেকে কয়েকটা রঙিন ফটো বের করল সে। বহুদিনের হাওয়ায় ফটোগুলোর রঙের জৌলুস অনেক ফিকে হয়ে গেছে। চিকুর বেশ কৌতূহল হল। এরকম ফটোগ্রাফের ব্যবহার আজকাল প্রায় নেই বললেই চলে। এখন শুধু মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রো-ভিডিয়ো, মাইক্রো-টিভি ক্যামেরা—এসবের যুগ।

প্রথম ছবিটা চিকুকে দেখাল বুড়ো। সূর্য উঠছে পূর্ব দিক থেকে। লাল। গোল বলের মতো। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। মেঘের কিনারে লাল রেখা। একপাশে কিছু সবুজ গাছপালা। তার পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে একপাল গরু নিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। খালি গা। হাতে লিকলিকে খাটো বেত।

'রাখাল ভোরবেলায় যাচ্ছে গরু চরাতে।' বুড়ো বিড়বিড় করে বলল। চিকু ছবিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। গরু শুধু ও মিউজিয়ামের ছবিতেই দেখেছে। গরু দেখতে সুন্দর নয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাই তাঁরা নকল গরু তৈরি করে নকল তৃণভূমিতে নিশ্চয়ই রাখেননি। তা ছাড়া বইতেও পড়েছে, একসময়ে মানুষ গরুর দুধ খেত। গরু ছিল গৃহপালিত পশু। কিন্তু এখন তো ওসব খাদ্য বা পানীয় দূষিত। চিকু কখনও দুধ দেখেনি।

ছবিটা দেখতে-দেখতে ওর নাকে ধুলো উড়ে আসছিল। কী সুন্দর!

তারপর দ্বিতীয় ছবিটা দেখাল বুড়ো। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। নদীর বুকে কালো ছায়ার মতো নৌকো ভেসে যাচ্ছে। ওপারে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য। আকাশে নানা রঙের মেঘ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভাসছে। অপূর্ব!

'নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।' আবার বিড়বিড় করল বুড়ো। তারপর বাকি ছবিগুলোও একে-একে দেখাল সে। ছেলেমেয়েরা পার্কে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাগানে রংবেরঙের ফুলের উৎসব! দীপাবলির আলোকসজ্জা। কত চিত্র-বিচিত্র পাখি...।

ছবিগুলো দেখানো শেষ হলে সেগুলো আবার প্যাকেটে ভরে রাখতে লাগল বুড়ো। বলল, 'এখন সূর্যও নেই, আর এসব কিছুও নেই, খোকাবাবু। আরও অনেক

ফটো ছিল আমার কাছে...নষ্ট হয়ে গেছে। এই বুড়ো শরীরে পালিয়ে বেড়ানো কি কম ধকলের কাজ!' খকখক করে কাশতে শুরু করল সে। কিছুক্ষণ পর কাশি থামলে জড়ানো গলায় বলল, 'এই নোংরা বাতাসে আমি শ্বাস নিতে পারি না। চারদিকে সব কেমন ধোঁয়াটে মেঘলা। অক্সিজেন কত কমে গেছে। চারদিকে শুধু বিষ-বাতাস।' কথা আটকে গিয়ে বুড়ো আবার কাশতে লাগল।

শ্বাস নিতে চিকুর কোনওরকম কষ্ট হচ্ছিল না। ও জানে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এখন অক্সিজেন শতকরা আট ভাগ। বাকি অংশে নাইট্রোজেন ছাড়াও রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড। গত পঞ্চাশ বছরে ক্ষতিকর গ্যাসগুলো পরিমাণে অনেক বেড়ে গেছে। কলকারখানা-যানবাহনের ধোঁয়া বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়াই গেছে পালটে। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশ-বাতাস মেঘলা, ঘোলাটে। সেইজন্যেই কি আসল পশু-পাখিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? মরে গেছে আসল ফুল, ফল, গাছ? তাই যদি হয়, তা হলে মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে রইল কেমন করে! সবকিছুই কেমন দুর্বোধ্য আর রহস্যময় ঠেকছিল চিকুর কাছে। ওর কোনও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না, অথচ এই বুড়ো মানুষটার কাশতে-কাশতে প্রাণ বেরুবার জোগাড়।

সেই কথাই ও জিগ্যেস করল লোকটাকে।

লোকটা কাশি থামিয়ে আলখাল্লার হাতায় মুখ মুছছিল। বারদুয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমি পুরোনো দিনের মানুষ, খোকাবাবু। জানি না, আমার মতো আর ক'জন এখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রাণে বেঁচে আছে। আর তোমরা হলে গিয়ে নতুন বিজ্ঞানের যুগের নতুন জাতের মানুষ। তোমাদের কাছে এই নোংরা বিষ-বাতাসই প্রিয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো। তারপর ঝোলার ভেতরে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। আপনমনেই নীচু গলায় বলল, 'বাতাস পরিষ্কার করতে আমরা বহু চেষ্টা করেছিলাম গো, খোকাবাবু। পরিষ্কারও হয়েছিল। ফলে মানুষের আয়ু গিয়েছিল বেড়ে।'

চিকুর দিকে তাকাল সে ঃ 'এই আমাকেই দ্যাখো না। কত বুড়োটি হয়েও বেঁচে আছি। যাই হোক...তারপর যুদ্ধ বাধল। ভয়ানক যুদ্ধ। বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিনের পর দিন। মানুষ বিষে মরতে লাগল। বাতাস পরিষ্কার করার চেষ্টাও গেল থেমে। কলকারখানা, গাড়িঘোড়ার ধোঁয়া আকাশে-বাতাসে জমতে লাগল। ওঃ, সে কি আজকের কথা! আমরা কিছু মানুষ গোপন জায়গায় অক্সিজেন সঞ্চয় করে বেঁচে রইলাম। দূষিত বাতাস পরিষ্কার করার জন্যে লড়াই করে চললাম গোপনে। কিন্তু পারলাম না। বাতাস আরও বিষিয়ে যেতে লাগল, আমরাও বুড়ো হয়ে গেলাম ধীরে-ধীরে, আর অক্সিজেনও এল ফুরিয়ে। তখন নিরুপায় হয়ে আমরা

বেরিয়ে পড়লাম মাঠে-ঘাটে-পথে—দূষিত পরিবেশে। একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলাম বাঁচার লড়াই—।'

বুড়ো আবার কাশতে শুরু করল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় লাঠিটা আঁকড়ে ধরতে গেল। চিকুর কেমন ভয়-ভয় করছিল। কী করবে, কী করা উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এমনসময় দূর থেকে ওর নাম ধরে কেউ ডাকল, 'চিকু—উ!'

ও চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বুড়োকে বলল, 'যাচ্ছি। মা ডাকছেন।'

'আমার কথা কাউকে বোলো না, খোকাবাবু। তুমি বরং কাল আবার এসো। তোমাকে পুরোনো দিনের অনেক গল্প শোনাব, কেমন! কী করে ফুল ফুটত, পাখি ডাকত, মৌমাছি মধু খেত—সব।'

'আচ্ছা, আসব।' বলে গোলাপ বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ি লক্ষ করে ছুটে চলল চিকু। ওর নাকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। শুনতে পাচ্ছিল গাছের ডালে বসে পাখি ডাকছে সুরেলা গলায়। চিকু ছুটতে-ছুটতেই মনে-মনে বলল, 'নকল গন্ধ। নকল পাখি। বিচ্ছিরি।'

বুড়োর দেখানো বিবর্ণ ফটোগ্রাফের ছবিগুলো ওর মনে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছিল বারবার।

কম্পিউটার-শিক্ষকের সামনে বসে লেখাপড়া করছিল চিকু। কিন্তু বারেবারেই ও আনমনা হয়ে পড়ছিল আর কম্পিউটার-শিক্ষকের ধমক টেলিভিশন পরদায় ফুটে উঠছিল, 'তুমি অমনোযোগী হয়ে পড়ছ। তোমার নম্বর কাটা যাচ্ছে।'

প্রতিদিন লেখাপড়ার জন্যে আলাদা নম্বর আছে। সারাদিন পড়াশোনার শেষে বাবা কিংবা মা কম্পিউটারের বোতাম টিপলেই নম্বর ফুটে ওঠে পরদায়, তাতে অন্যমনস্কতার জন্য কত নম্বর কাটা গেছে তাও লেখা থাকে। সেটা দেখলেই মা-বাবা বকাবকি করবেন।

চিকুর একটুও ভালো লাগছিল না। তবুও কোনওরকমে পড়া শেষ করে মা-র কাছে গেল। বলল, 'মা, মা, জানো, আমাদের বাগানের পাখিগুলো সব নকল —বিজ্ঞানীদের তৈরি।'

মা মাইক্রো-টিভি হাতে নিয়ে খবর শুনছিলেন, হাত থেকে টিভি পড়ে গেল। অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকালেন।

চিকু এক নিশ্বাসে বলে গেল পুরোনো দিনের কথা। আসল ফুলের কথা, আসল পাখির কথা, আসল মৌমাছির কথা। একদিন সূর্য ছিল আকাশে। দিনে থাকত উজ্জ্বল আলো, আর রাতে গাঢ় অন্ধকার।

মা কাছে এগিয়ে এলেন। হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন ছেলের সামনে। ওর দু-কাঁধে হাত রাখলেন, 'তুই এসব কার কাছে শুনেছিস?'

চিকু হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেল। মনে পড়ল, বুড়ো লোকটা ওকে বারবার করে বারণ করেছিল, তার কথা কাউকে না বলতে। বললে সাঙঘাতিক বিপদ হবে।

সুতরাং মা-র কথার জবাব না দিয়ে চিকু বলল, 'বলো না মা, এসব সত্যি?'

মা-র কপালে ভাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর বললেন, 'সব সত্যি। কিন্তু কে তোকে এসব কথা বলল! তোর বাবা জানতে পারলে...।'

বাবা ঘরে ছিলেন না। অফিসে গেছেন। অফিস বলতে বাড়ির লাগোয়া একটা ছোট ঘর। সেখানে নানারকম সব কম্পিউটার বসানো আছে। আর আছে চার-চারটে রঙিন টিভি। বাবা রোজ সেই ঘরে যান। সারাদিন বসে-বসে শুধু ছোট-বড় বোতাম টেপেন। টিভির পরদা খুঁটিয়ে লক্ষ করেন। কম্পিউটার থেকে যেসব ছাপা কাগজ বেরিয়ে আসে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন। বাবা বলেন, সারা দেশ জুড়েই নাকি এরকম শক্তিশালী কম্পিউটার যোগাযোগ রয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণের গোপন খবরাখবর আদানপ্রদান হয় হাজার-হাজার কম্পিউটারের মাধ্যমে।

'তোর বাবা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবেন। এসব কথা তোর বাবাকে বলিস না যেন।' মা অবাক চোখে ছেলেকে দেখছিলেন। চিকু যেন কোনও স্বপ্নের দেশে মগ্ন হয়ে গেছে। ওকে বুকে টেনে নিয়ে মা বললেন, 'তুই খুব সাবধানে থাকিস। তোর জন্যে আমার ভয় করছে।'

চিকু মা-র ভয়ের কারণ বুঝতে পারল না। ও শুধু বিস্ময়ে ভাবছিল, সমস্ত নকল জিনিসের মধ্যে থেকেও মা-বাবা কেমন নিশ্চিন্ত হাসিখুশি রয়েছেন। অথচ এই ভয়ঙ্কর রহস্যটা ফাঁস হয়ে যেতেই চিকুর বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছে।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে চিকু শুনতে পেল বাবা-মা চাপা গলায় কথা বলছেন। কী কথা তা স্পষ্ট না বুঝতে পারলেও চিকুর আন্দাজে মনে হল আলোচনাটা ওকে নিয়েই।

কিছুক্ষণ পরে বাবার একটা কথা কানে এল ওর, 'ঠিক আছে। কাল ওকে আমার সঙ্গে অফিসে নিয়ে যাব। সব বুঝিয়ে বলব। ও এখন বড় হয়েছে। সব ওর জানা দরকার।'

তারপরই চিকু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সত্যিকারের ফুল, পাখি, লতাপাতা, মেঘ, সূর্য, স-ব এসে ভিড় করল ওর চোখের সামনে। ও দেখল, সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাচ্ছে সত্যিকারের মৌমাছি।

পরদিন আরও ভোরে উঠে পড়ল চিকু। পা টিপেটিপে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল বাগানে।

চারদিক মেঘলা, ধোঁয়াটে। আবছা আলোয় বাগানের গাছপালা চোখে পড়ছে। চিকু গোলাপ বাগানের দিকে এগোল। লক্ষ করল, ফোঁটা-ফোঁটা শিশির জমে আছে রঙিন গোলাপের পাপড়ির ওপরে। এই শিশিরের ফোঁটাও কি নকল! ভাবল চিকু। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, গোলাপ বাগানের ভেতরে মাটির ওপরে শুয়ে আছে আলখাল্লা পরা বুড়ো লোকটা। চিকু ঝুঁকে পড়ল নীচু হয়ে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল তার কাছে।

বুড়ো মানুষটার দু-চোখ বোজা। হাঁফাচ্ছে। লাল-নীল তালি মারা আলখাল্লা নিশ্বাসের তালে-তালে ওঠানামা করছে। পুঁটলি আর লাঠি পড়ে রয়েছে পাশেই।

হয়তো কেউ এসেছে টের পেয়েই বুড়ো মানুষটা চোখ খুলল। প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু চিকুকে দেখেই ভয় কেটে গেল। ধবধবে সাদা দাড়ির ফাঁকে মলিন হাসল বুড়ো। ঘড়ঘড়ে স্বরে কোনওরকমে বলল, 'এসেছ, খোকাবাবু?'

সঙ্গে-সঙ্গে কাশির দমক শুরু হল। সাদা মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠল বারবার। চোখ-মুখ লালচে হয়ে গেল।

চিকু বুঝল, মানুষটার খুব কষ্ট হচ্ছে। ও তার বুকে হাত রাখল। কাশি থামলে লোকটা হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। তারপর হাতড়ে পুঁটলিটা টেনে নিল। অতিকষ্টে ভেতর থেকে বের করল একটা পলিথিনের স্বচ্ছ প্যাকেট। তার মধ্যে রয়েছে একটা শুকনো বিবর্ণ ফুল। গোলাপ।

বুড়ো মানুষটা অস্পষ্ট গলায় বলল, 'সত্যিকারের গোলাপ, খোকাবাবু। কতদিন ধরে আগলে-আগলে রেখেছি, আর পারব না। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে।'

চিকুর হাতে তাপ লাগছিল। ও লোকটার চুল সরিয়ে কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

'তুমি আমাদের বাড়িতে চলো। বাবা ওষুধ দিলেই তুমি সেরে উঠবে।'

চিকুর উদ্বেগে বুড়ো যেন মজা পেল। বলল, 'কোনও ওষুধেই আমি আর সেরে উঠব না গো। এ-যুগের ওষুধ আমার সইবে না। তা ছাড়া, তোমার বাবা-মা জানতে পারলে আমাকে...নাঃ, থাক খোকাবাবু, খোলা আকাশের নীচেই আমি থাকব।'

আবার কাশি। চিকুর খুব খারাপ লাগছিল বুড়ো মানুষটার জন্যে। আজ আর কোনও গল্প শোনা হল না ওর। তবে ওই সত্যিকারের গোলাপটা দেখা গেল। মুগ্ধ চোখে শুকিয়ে যাওয়া গোলাপ ফুলটা দেখছিল চিকু। হাজারটা টাটকা নকল ফুলের চেয়ে একটা শুকিয়ে যাওয়া আসল ফুল অনেক বেশি দামি।

এমন সময় বাবার ডাক শোনা গেল, 'চিকু! চিকু!'

বুড়ো মানুষটা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। শুকনো গোলাপটা বুকের ওপরে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে বুকটা উঠছে নামছে।

'পরে আবার আসব।' বলে চিকু উঠে এল বুড়োর পাশ থেকে। কিন্তু মানুষটার কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

রঙিন টেলিভিশনের পরদাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল চিকু। বাবা ওকে বাঁ-হাতে আলতো করে জড়িয়ে রেখেছেন, আর ডানহাতে বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নানান বোতাম টিপছেন। একইসঙ্গে কথা বলছিলেন বাবা।

'চিকু, তুমি কি জানো, কেন আমরা নকল গাছপালা, নকল ফুল, নকল পাখি—এসব তৈরি করেছি?'

টেলিভিশন-পরদায় বিভিন্ন জটিল অঙ্ক আর নকশা দেখতে-দেখতে চিকু জবাব দিল, 'জানি বাবা, জানি।'

অসুস্থ বুড়ো মানুষটার ছবি ওর চোখের সামনে ভাসছিল।

বাবা নরম গলায় বললেন, 'অনেক দিন আগে—আমার জন্মেরও আগে—নানান কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছিল। সেই বিষাক্ত বাতাসে একে-একে মরতে শুরু করল গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফল, পশু-পাখি—এমনকী মানুষও। তখন প্রাণে বাঁচার জন্যে বিজ্ঞানীরা মরিয়া হয়ে পথ খুঁজতে লাগলেন। সারা পৃথিবী জুড়েই চলল বেঁচে থাকার লড়াই। মানুষের সামান্য যা ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে ওই ভয়ঙ্কর দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ করার কোনও পথ ছিল না। ফলে বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, মানুষকেই যেমন করে হোক ওই বিষাক্ত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। চলল বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বেশিরভাগই সদ্যোজাত শিশুদের নিয়ে। কারণ বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন, আগামী দিনের মানুষের যেন দূষিত পরিবেশে কোনওরকম অসুবিধে না হয়। শিশুদের ফুসফুসে, শ্বাসনালীতে, নানারকম অস্ত্রোপচার করা হল। দূষিত বাতাসের চেম্বারে রেখে ওদের আচার-আচরণ লক্ষ করা হল। এ ছাড়া আরও কত কী! তারপর একদিন বিজ্ঞানীরা সফল হলেন—।'

বাবা কয়েকটা বোতাম টিপলেন। একটা মাইক্রোফোনে সাঙ্কেতিক কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন। কম্পিউটার থেকে বেরিয়ে আসা একটা ছাপা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'এইভাবে মানুষ টিকে গেল। আমরা দূষিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম। অবশ্য তখন মানুষের গড় আয়ু অনেক কমে গেল। কারণ পরিবেশের সঙ্গে মোটামুটি খাপ খেয়ে গেলেও মানুষের শরীরের কলকবজাগুলো তাড়াতাড়ি অকেজো হয়ে পড়তে লাগল...।'

চিকু বুঝল, কেন ও আগে কখনও বাগানের লোকটার মতো বুড়ো মানুষ দেখেনি। ও ঘুরে বাবার দিকে তাকাল। বাবা কত সহজভাবে শুনিয়ে যাচ্ছেন পুরোনো ইতিহাস। বাগানের বুড়ো লোকটার মতো বাবার চোখে স্বপ্ন নেই, গলা কেঁপে উঠছে না আবেগে। বাবা শুধু বিজ্ঞানের কথা শোনাচ্ছেন, বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কথা শোনাচ্ছেন।

'অবশ্য যতই নতুন-নতুন জেনারেশান আসবে গড় আয়ু ধীরে-ধীরে ততই বাড়বে। কারণ মানুষ ক্রমশ আরও বেশি করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে পরিবেশের সঙ্গে।'

'কিন্তু বাবা, গাছপালা, পাখি, এসব...।'

'ও, হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিলেন বটে, কিন্তু গাছপালা, ফুল-ফল, পাখি, কীটপতঙ্গ, এসব বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। একে-একে সব মরুভূমি হয়ে যেতে লাগল। মুছে যেতে লাগল প্রকৃতির সৌন্দর্য।'

চিকু পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া শুকনো গোলাপটার কথা ভাবছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবে মুছে গেছে কে জানে! শুধু স্মৃতি রয়ে গেছে। ও বলল, 'সেইজন্যেই নকল গাছপালা-পাখি তৈরি করে দিলেন বিজ্ঞানীরা?'

'হ্যাঁ। না তৈরি করলে আমাদের অসুবিধে হচ্ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য না থাকায় মানুষের মন খারাপ হচ্ছিল, মনটা খিটখিটে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল, ফলে মানুষের কাজ করার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছিল। তাই মনোবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিলেন, মানুষের মন ভালো রাখতে, মনে আনন্দ-ফুর্তি বজায় রাখতে, নকল প্রকৃতি তৈরি করা হোক। নইলে দেশের উন্নতির কোনও আশা নেই। তখন হাজার-হাজার বিজ্ঞানী বছরের পর বছর পরিশ্রম করে তৈরি করলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । পরিবেশ ক্রমশ গাঢ় ঘোলাটে হয়ে ওঠায় সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল—সূর্যকে তো আর দেখাই যেত না। তখন বিকল্প হিসেবে তৈরি হল ভাসমান আলোকপিণ্ড। তুমি তো সবই দেখেছ।'

বাবাকে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। যেন একটা অচেনা লোক বসে আছে চিকুর সামনে। লোকটা বিষাক্ত বাতাসে দিব্যি শ্বাস নিচ্ছে। প্রকৃতি আসল না নকল তা নিয়ে লোকটার কোনও মাথাব্যথা নেই। শুধু বাইরের চেহারাটা ঠিক থাকলেই সে খুশি। আজ যদি চিকু মানুষ না হয়ে একটা রোবট হত তা হলে বাবার বোধহয় কোনও অসুবিধে হত না। শুধু রোবটের চেহারাটা আসল চিকুর মতো হলেই হল!

বাবা এবার ওকে কাছে টেনে নিলেন। আদরের গলায় বললেন, 'চিকু, এখন বলো তো, তোমাকে পুরোনো দিনের সমস্ত কথা কে বলেছে?' তোমার মা বলছিলেন, 'তুমি নাকি কারও কাছে ওসব কথা শুনে এসেছ? কে বলেছে

তোমাকে?'

চিকুর শরীরটা কেমন কাঠ হয়ে গেল। এ-কথার উত্তর দিলেই অসুস্থ বুড়ো লোকটা হয়তো বিপদে পড়বে। কিন্তু কেন? ও পালটা প্রশ্ন করল, 'বাবা যখন সবকিছু আসল ছিল তখনকার মানুষেরা কেউ বেঁচে নেই?'

বাবার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাবা ধীরে-ধীরে বললেন, 'বেঁচে থাকা উচিত নয়। এই দূষিত পরিবেশে বেঁচে থাকতে তাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু তবুও যে কেউ-কেউ বেঁচে নেই তা নয়। তাদের খুঁজে পেলে বর্তমান সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। তা নইলে তারা পুরোনো দিনের সব গালগল্প শুনিয়ে এখনকার মানুষের মন অকারণে দুর্বল করে তুলবে। সেইজন্যেই তো তোমাকে বলছি, যার কাছে ওসব আজেবাজে কথা শুনেছ সে কে?'

চিকু কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'গতকাল সামনের রাস্তায় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কথাগুলো আমাকে বলেই ছুটে পালিয়ে গেল।'

বাবার সামনে এই প্রথম মিথ্যে বলল চিকু। ওর মনে হল, ভালো কাজের জন্য মিথ্যে বললে কোনও পাপ নেই।

বাবার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। আনমনাভাবে বললেন, 'হুঁ, ওরা বেছে-বেছে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদেরই এসব আজগুবি গল্প শোনাচ্ছে।'

ডানহাত বাড়িয়ে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় বাবা কতকগুলো বোতাম টিপলেন। কী সব দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করলেন মাইক্রোফোনে। তারপর ঠান্ডা গলায় ছেলেকে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। কারও আজেবাজে কথায় কান দিয়ো না।'

চিকু থমথমে মুখে অফিস-ঘর ছেড়ে চলে এল। বুড়ো মানুষটা এখন কেমন আছে সে-কথা জানতে ওর মন ছটফট করছিল।

সারাদিনে আর মা-বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাগানে বেরোতে পারেনি চিকু। সুযোগ এল পরদিন ভোরে।

গোলাপ বাগানে এসেই চিকু যেন একটা ধাক্কা খেল। রঙিন আলখাল্লা পরা শরীরটা টান-টান হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে কোনওরকম ওঠানামা নেই। মানুষটার বুকের ওপরে পলিথিনের প্যাকেটে মোড়া একটা শুকনো গোলাপ আর কয়েকটা মলিন ফটো। দেখামাত্রই জিনিসগুলো চিনতে পারল চিকু। ও ছুটে আরও কাছে এগিয়ে গেল। বুড়ো মানুষটার হাতে হাত রাখল। কপাল

ছুঁয়ে দেখল। বরফের মতো ঠান্ডা। চোখ বোজা। তবু যেন এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে মুখে। সাদা দাড়ি-গোঁফে হিমের ফোঁটা। হিমকণা রয়েছে ফটোগুলোর ওপরে, পলিথিন প্যাকেটের ওপরে। আঁকাবাঁকা লাঠি আর তালি মারা রঙিন পুঁটলি পড়ে আছে একপাশে।

চিকুর গলার ভেতরে ব্যথা করতে লাগল। বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত কষ্ট। বাগানে পাখিরা শিস দিচ্ছিল। মৌমাছি ফুলকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছিল। কতশত রঙের গোলাপ ফুটে রয়েছে বাগানে। কিন্তু সবকিছুর চেয়ে সুন্দর যেন ওই শুকনো গোলাপ আর পুরোনো ফটোগুলো। তা ছাড়া, বুড়ো মানুষটার আলখাল্লার রংবেরঙের তালিগুলো যেন এক-একটা তাজা ফুল। সেই ফুলের বিছানায় ফুটে রয়েছে পুরোনো দিনের আসল প্রকৃতির সজীব ছবি। রাখাল ভোরবেলা যাচ্ছে গরু চরাতে। কুলকুল করে বয়ে যাওয়া নদী। নদীর তীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে নানা রঙের মেঘ। ছেলেমেয়েরা পার্কে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। বাগানে রংবেরঙের ফুলের উৎসব। চিত্র-বিচিত্র কত পাখি।

চিকু মানুষটার বুকের ওপর থেকে শুকনো ফুল আর ফটোগুলো তুলে নিল। সেগুলো ছেঁড়া কাগজে জড়িয়ে লুকিয়ে নিল পকেটে। এগুলো ও চোখের মণির মতো আগলে রাখবে। বিষ-বাতাসের সঙ্গে ও লড়াই করবে। ওর বয়েসি সব ছেলেমেয়েদের ডেকে শোনাবে সত্যিকারের দিনগুলোর আশ্চর্য নানান ঘটনা। দেখাবে এই মলিন ছবি আর গোলাপ। তারপর চিকুরা দল বেঁধে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে আসল প্রকৃতিকে। তখন আবার সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাবে সত্যিকারের মৌমাছি। পৃথিবী আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে।

এমনসময় বাবা-মা দুজনের ডাক শুনতে পেল চিকু। ওর নাম ধরে দুজনে ডাকছেন। ও শেষবারের মতো তাকাল বুড়ো মানুষটার দিকে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলল অস্ফুট স্বরে, 'তোমার জিনিসগুলো আমি নিলাম।'

তারপর ছুট লাগাল বাড়ির দিকে। ওর ছোট্ট মনের ভেতরে ধীরে-ধীরে একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, সত্যিকারের ফুল থেকে সত্যিকারের মধু খাচ্ছে সত্যিকারের মৌমাছি।





সন্দেহের এক কণা

স্পেসপোর্টে 'ফ্যালকন-১' নেমে পড়তেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। ছ'মাস—মানে একশো আশি দিন পর আবার পৃথিবী। জন্মভূমি। আমার ঘর-বাড়ি। কেমন আছে রুনু আর টুনু? কেমন আছে সুমিতা?

মহাকাশযান থেকে নেমে ম্যাগনেটিক অটো ট্র্যাকে সবে পা রেখেছি, সঙ্গে-সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা দশাসই চেহারার দুজন লোক কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে গেল আমার দু-পাশে। ওদের পোশাকে সিকিওরিটি ডিভিশনের প্রতীক-চিহ্ন আঁকা। কোমরের কাছে উঁকি মারছে জেনারেটর গান। চোখে কালো চশমা। মাথায় মেটাল হেলমেট।

আমাদের জুতোর নীচে স্টিলের পাত লাগানো। ফলে চলমান ম্যাগনেটিক ট্র্যাকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। দ্রুতগতির অটো ট্র্যাক আমাদের নিয়ে ছুটতে থাকে।

ওদের একজন জিগ্যেস করল, 'আপনি সান্যাল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, চাঁদের এক সাঙঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে কোনওরকমে বেঁচে ফিরে এসেছি।'

দ্বিতীয়জন আমার বাহু চেপে ধরল শক্ত হাতে : 'সেটা অপারেশান ডিভিশন যাচাই করে দেখবে।'

তার মানে? আমি বেঁচে ফিরেছি কি না সেটা যাচাই করে দেখবে অপারেশান ডিভিশন? আমি, ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, গোটা মানুষটা জলজ্যান্ত বেঁচে ফিরে এলাম এটাই কি যথেষ্ট নয়? চাঁদের ওই সাঙঘাতিক দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমাদের ল্যাবরেটরি। শুধু ফ্যালকন-১ বেঁচে গিয়েছিল। ওটা আমি রেখেছিলাম ল্যাবরেটরি থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরের একটা খাদের মধ্যে। সেখান থেকে পাথর বেয়ে উঠে হেঁটে পেরিয়েছি পনেরো কিলোমিটার পথ। চাঁদের বুকে এটুকু পথ কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ মতো হওয়ায় চলাফেরায় কষ্ট অনেক কম, তবে অভ্যেসের দরকার। আমি আগে আরও চারবার বিভিন্ন অভিযানে চাঁদে গিয়েছিলাম। চাঁদ আমার মোটামুটি সয়ে গেছে।

অদ্ভুত দক্ষতায় লোক দুটো অটো ট্র্যাকের পথ পালটাচ্ছিল। ট্র্যাকের অসংখ্য কাটাকুটির মধ্যেও সিকিওরিটি বিল্ডিংয়ের পথ চিনে নিতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হচ্ছিল না ওদের। আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ইতস্তত করে বললাম, 'আগে বাড়িতে একবার দেখা করে গেলে হত না? আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, ছ'মাস ওদের দেখিনি।'

লক্ষ করলাম, আমার এই কথায় একজন আর-একজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে অভদ্রভাবে হাসল, তারপর বলল, 'ওসব পরে হবে, মিস্টার সান্যাল।'

অন্য সময় হলে এই অভদ্র উত্তরের উপযুক্ত জবাব দিতাম। কিন্তু এখন সবকিছুই কেমন অস্বাভাবিক গোলমেলে লাগছে। তবে সিকিওরিটি ডিভিশনে আমার ছোটবেলার বন্ধু রাকেশ ব্যানার্জি রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করলেই মনে হয় সব মিটে যাবে। ওদের বললাম, 'আমি রাকেশ, রাকেশ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

এবারে দ্বিতীয়জনের বিদ্রূপ-মাখানো হাসির পালা। বলল, 'ওঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেরকমই নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে।'

এবারে ভয় পেলাম। তা হলে কি সুমিতা বা রুনু-টুনুর কিছু হয়েছে! যে-ছ'মাস আমি ছিলাম না তার মধ্যে...ওঃ, ভগবান! আমি আর ভাবতে পারছি না!

চারপাশে অটো ট্র্যাকে অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। কোনও শব্দ নেই। সকলেই স্থির হয়ে ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে।

চারপাশের বাতাস বিশুদ্ধ! কারণ অক্সিজেন-নাইট্রোজেন সবই নিখুঁত শতকরা হিসেবে মিশিয়ে এই বাতাসকে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। অটো ট্র্যাকের মানুষগুলো সব ঝাপসা হয়ে আসছে। আর আমার কানে চাঁদের বিস্ফোরণের শব্দ আঘাত করছে বারবার।

তারই মধ্যে টের পেলাম প্রথম লোকটিও আমার হাত চেপে ধরল। ওদের হাতে বন্দি হয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। বন্দি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় একে!

*

ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। লুকোনো আলোয় আলোকিত। জানি, সাধারণ দৃশ্য-আলো ছাড়াও এ-ঘরে অবলোহিত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে এক্স-রে ছবি তোলার আধুনিক আয়োজন। ঘরে আসবাবপত্র বলতে চারটে এয়ার কুশন, বাতাসে ভাসমান গদিওয়ালা চেয়ার। আর তার পাশে একটা পলিমারের সাতকোণা টেবিলে হোস্ট কম্পিউটারের টার্মিনাল।

'জেনারেটর গানটা বের করে টেবিলে রাখুন, মিস্টার সান্যাল।'

আমার জেনারেটর গানটা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। যে-দুজন গার্ড আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে ওরাও পায়নি। কিন্তু এখন আদেশ শুনে বুঝলাম, অপরেশান ডিভিশনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারিনি। ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

রাকেশ কম্পিউটার টার্মিনালে বসে কি-বোর্ডের বোতাম টেপাটেপি করছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অপরিচিতের চোখে তাকাল। কিছু বলল না।

আমাকে জেনারেটর গান বের করে দেওয়ার নির্দেশ, অথবা আদেশ, যিনি দিয়েছিলেন এবারে তাঁকে দেখলাম। শক্ত চোয়াল, কপালে ভাঁজ, ফ্রেঞ্চকাট কাঁচাপাকা দাড়ি, মুখটা লম্বা ধরনের, রোগাটে দীর্ঘকায় চেহারা, আর শুধু চোখের নজর দিয়েই বোধহয় মানুষ খুন করতে পারেন।

'রাকেশ, আমি ফিরে এসেছি!' আমি জেনারেটর গানটা টেবিলে রেখে রাকেশের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম, 'তোদের ভালোবাসার টানেই বোধহয় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরেছি—।'

রাকেশ এক ঝটকায় কি-বোর্ড ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখের রেখাগুলো বীভৎস হয়ে গেল। ওর হাতে কখন যেন একটা জেনারেটর গান গজিয়ে উঠেছে। ওর কথার প্রতিটি শব্দ যেন ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের মতো শোনাল, 'মিস্টার দাসানি, এই রোবটটাকে জিগ্যেস করুন ইন্দ্রজিৎ সান্যালের ডেডবডিটা ও চাঁদের কোথায় লুকিয়ে এসেছে!'

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এসব কী শুনছি আমি? কোনওরকমে বললাম, 'রাকেশ, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? এই দ্যাখ, আমি, তোর ছোটবেলার বন্ধু—ইন্দ্রজিৎ—।'

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আমার পিঠে টোকা মারলেন। বললেন, 'ব্যানার্জি ভুল বলেছে। রোবট নয়, অ্যান্ড্রয়েড—যাদের চেহারাটা হুবহু মানুষের মতো কিন্তু ব্যাটারি ছাড়া চলতে পারে না।' হাসলেন দাসানি ঃ 'যাই হোক, মাথাগরম করে লাভ নেই, ব্যানার্জি। আমি এখনও কাজ শুরু করিনি। আগে শুরু করি, তারপর দেখবেন ওসব শেখানো বুলি কোথায় যায়। তবে আপাতত এই মেশিনটাকে আমরা ইন্দ্রজিৎ সান্যাল বলেই ডাকব। তাতে জেরার সুবিধে হবে। আপনি বসুন, মিস্টার

সান্যাল। আমার জেরা বহুক্ষণ ধরে চলে, অ্যান্ড্রয়েডদেরও পা ব্যথা হয়ে যায়।'

দাসানির হাতে একটা খুদে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট ছিল। সেটার কী একটা বোতাম টিপতেই ঘরের একমাত্র দরজায় নেমে এল স্বচ্ছ প্লাস্টিকের দেওয়াল। দরজা বন্ধ। ঘরে শুধু আমরা তিনজন।

রাকেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'সান্যাল, তুমি বোধহয় জানো না, নরেন্দ্র দাসানি কাউন্টার এসপাইয়োনেজ ইউনিটের রোবোসাইকোলজিস্ট। শত্রুপক্ষের রোবটরা আজ পর্যন্ত ওঁকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

আমি চেয়ারে বসে পড়েছিলাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, 'আজ ছ'মাস পর আমি দেশে ফিরে এলাম...সুমিতা, রুনু-টুনু...কতদিন ওদের দেখিনি।' একটু থেমে রাকেশকে লক্ষ্য করে অনুরোধ করলাম, 'বাড়িতে একটা ফোন করতে দিবি?'

রাকেশ একবার দাসানির দিকে তাকাল। তারপর ঘরের সাদা দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বিদ্রূপের হাসি হেসে আমার বাড়ির ভিডিয়োফোন নম্বরটা উচ্চারণ করল। রাকেশ নম্বরটা জানে। ও আমার বাড়িতে গেছে বহুবার। সুমিতাকে বউদি বলে ডাকে, আর রুনু-টুনুর কাছে কাকু।

রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা পকেটে রেখে দিয়ে নরেন্দ্র দাসানি চুপচাপ আমাকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর নজরে সন্দেহ। আর ভাবখানা এই, কতক্ষণ তুমি আমার চোখে ধুলো দেবে, বাছাধন!

রাকেশ নম্বরটা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা সাদা দেওয়াল জুড়ে ভেসে উঠল সুমিতার মুখ। রাকেশ বলল, 'বউদি, আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। ইন্দ্রজিতের বদলে এই রোবটটা ফিরে এসেছে চাঁদ থেকে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে—।'

রাকেশ একপাশে সরে গিয়ে ইশারায় আমাকে দেওয়ালের কাছে ডাকল। আমি ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম সুমিতার কাছে। সুমিতা আমাকে দেখছে। ভুরু কুঁচকে গেছে, চোখ সন্দেহে কুটিল। ওর প্রশ্ন ছুটে এল বুলেটের মতো।

'কোন তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল?'

আমার কান্না পেয়ে গেল। রাকেশ আর দাসানি সফল হয়েছে। সুমিতার মনেও সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে ওরা। কিন্তু রুনু-টুনু?

সুমিতা কঠিন গলায় প্রশ্নটা আবার করল।

আমি মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম। দেওয়ালের ছবির দিকে আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না।

সুমিতা আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমি জবাব দিলাম। রাকেশ ও দাসানি বাজপাখির নজরে খুঁটিয়ে দেখছে আমার প্রত্যেকটা প্রতিক্রিয়া। একবার মাথা তুলে দেখলাম, সুমিতার মুখের ভাব এতটুকু পালটায়নি।

এরপরই দেওয়ালে ফুটে উঠল রুনুর ছবি। আমার দশ বছরের মেয়ে রুনু।

ফুটফুটে। সবাই বলে আমার মতো নাকি দেখতে।

'রুনু, কেমন আছিস?'

রুনু হাসিমুখে সবসময় যেমন ঠাট্টা করে ঠিক সেভাবেই বলল, 'বাপি, বলো তো আমার জন্মদিন কবে?'

'রুনু—' যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে শব্দটা আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দু-হাতে মুখ ঢাকলাম আমি। গলার কাছটা ব্যথা করছে।

হঠাৎই শুনতে পেলাম কেউ আমাকে ডাকছে, 'বাপিসোনা!'

আমি দেওয়ালের দিকে তাকালাম। টুনু। আমার পাঁচ বছরের ছেলে। একমাথা কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো সবসময় কথা বলে। ও আমাকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না।

'টুনু—' আমি চিৎকার করে ডেকে উঠলাম।

'বাপিসোনা, বলো তো, আমার ভালো নাম কী? ওটা ছাড়া আর-একটা কোন্ নামে তুমি আমাকে ডাকো?'

আমি বসে পড়লাম মেঝেতে। আর পারলাম না। এতক্ষণের চেপে রাখা কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম।

আর তখনই শক্ত কঠিন একটা স্পর্শ টের পেলাম ঘাড়ে। জেনারেটর গানের নল। আর একইসঙ্গে দাসানির আদেশ, 'জবাব দিন, সান্যাল। যদি প্রমাণ করতে চান আপনি সত্যিই ইন্দ্রজিৎ সান্যাল—মানুষ!'

আমি কাঁদতে-কাঁদতেই টুনুর প্রশ্নের জবাব দিলাম।

একটু পরেই শুনতে পেলাম রাকেশের গলা, 'ওরা ট্রেনিংয়ে কোনও ভুল রাখেনি। ইন্দ্রজিৎ সান্যালের যাবতীয় তথ্য গুঁজে দিয়েছে এর পজিট্রনিক ব্রেনে।'

দাসানি এক হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। দেখলাম, দেওয়ালটা আবার আগের মতো ছবিহীন সাদা হয়ে গেছে।

রাকেশ অধৈর্য হয়ে বলল, 'দাসানি, ছুরি দিয়ে ওর হাত-পা চিরে দেখুন রক্ত পড়ে কি না।'

নরেন্দ্র দাসানি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ইশারায় শান্ত হতে বললেন রাকেশকে। তারপর আমাকে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎ, এখানে আসাটা আপনার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে। যাই হোক, আপনার মুখে চাঁদের গল্পটা একবার শোনা যাক। যদিও রেডিও মেসেজ আমরা ঠিকমতোই পেয়েছি।'

রাকেশ এগিয়ে এসে জেনারেটর গানটা ঠেকিয়ে ধরল আমার কপালে। এটা থেকে তিনরকম লেভেলে ফায়ার করা যায়, লো-লেভেল, হাই-লেভেল আর আলট্রা-হাই-লেভেল। দেখলাম সিলেক্টর সুইচটা এখন আলট্রা-হাই-লেভেলে।

দাসানি কিছু করে ওঠার আগেই রাকেশ বাঁ-হাতে কোথা থেকে একটা ছুরি

বের করে ক্ষিপ্রগতিতে বাতাস কেটে চালিয়ে দিল আমার গালে। পাকা হাত। গাল চিরে গেল শুধু। দাসানি চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্যানার্জি কী হচ্ছে! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?'

আমিও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। ডানগাল বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সত্যিকারের রক্ত। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরলাম গালে। রাকেশ রক্ত দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বোধহয় বুঝল আমি রোবট নই, মানুষ। ওর চোখে আবার আমার 'বন্ধু' রাকেশের দৃষ্টি ফিরে আসছিল। কিন্তু দাসানির কথায় আমার রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। রাকেশের দৃষ্টিও হয়ে গেল উদভ্রান্ত পাগলের মতো।

নরেন্দ্র দাসানি বললেন, 'কী তখন থেকে ছেলেমানুষি করছেন, ব্যানার্জি! আপনাকে তো সেই গোড়া থেকেই বলছি, এটা অ্যান্ড্রয়েড—রোবট নয়। অ্যান্ড্রয়েডদের রক্ত-মাংস থাকে—মানুষেরই মতো। শুধু ব্রেন আর হার্ট, ওই দুটোই যন্ত্র—চলে ব্যাটারিতে। কিন্তু এক্স-রে কিংবা মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না। আপনি যান তো, চেয়ারে গিয়ে চুপ করে বসুন।'

কিন্তু রাকেশ চেয়ারে গিয়ে বসল না। ছুরি ফেলে দিয়ে একহাতে আমার জামা খামচে ধরে ঝাঁকাতে লাগল আর বলতে লাগল, 'বল, ইন্দ্রজিৎকে তুই খুন করে কোথায় পুঁতে রেখেছিস—বল...।'

দাসানি এবার জোর করেই সরিয়ে দিলেন রাকেশকে। ঠেলে দিলেন একটা চেয়ারের দিকে। রাকেশ বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বড়-বড় শ্বাস নিয়ে হাঁফাতে লাগল।

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। পৃথিবী এখন আর আমার ঘর-বাড়ি নয়, কিচ্ছু নয়। এখানে আমার আপনজন বলতে আর কেউ নেই।

দাসানি আবার ফিরে এলেন আমার কাছে। কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎ, এবারে চাঁদের গল্পটা আপনি বলতে পারেন।'

আমি ধীরে-ধীরে সব বললাম।

তিন বছর আগে আন্তর্জাতিক খনন সংস্থা চাঁদের 'টেরা' অঞ্চলে একটা আধুনিক খনন কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নেয়। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এই কেন্দ্র তৈরি করা হয় দু-বছরের চেষ্টায়। এর কাজ হল চাঁদের মাটি ও পাথর থেকে দুষ্প্রাপ্য খনিজ নিষ্কাশন করা। লুনার হাইল্যান্ডস-এ অবস্থিত এই কেন্দ্রটি চাঁদের ওপিঠে। অর্থাৎ, চাঁদের যে-দিকটা সবসময় পৃথিবীর কাছ থেকে আড়ালে থাকে, সেই দিকে। নিউক্লীয় শক্তিচালিত এই কেন্দ্রের তদারকির জন্যে পালা করে বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়। কিন্তু সমস্যা বাধে টাইটান উপগ্রহের বিদ্রোহী সভ্যতাকে নিয়ে।

প্রায় চারশো বছর আগে যন্ত্রসভ্যতায় বিশ্বাসী কয়েক হাজার পৃথিবীবাসী শনির টাইটান উপগ্রহে গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তোলে। টাইটানের নাইট্রোজেন আর মিথেন ঘেরা আবহাওয়ায় আশ্চর্য দক্ষতায় তারা তৈরি করে নিরাপদ আবরণে

ঢাকা শহর। তারপর বছরের পর বছর ধরে তারা প্রযুক্তিকে উন্নত করেছে। আর একইসঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। শোনা যায়, ওদের বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। চাঁদে আমাদের নতুন পরিকল্পনার কথা যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা বোধহয় খবর পেয়ে যায়। তারপর ওদের গুপ্তচরের অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে—অন্তত আমার তাই অনুমান—চাঁদের খনন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসি।

এখন বুঝতে পারছি, টাইটানের অ্যান্ড্রয়েড গুপ্তচর সন্দেহ করে সিকিওরিটি ডিভিশনের গার্ড পাঠানো হয় আমাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করার জন্য। আর এখন আমার দেশপ্রেমের 'পুরস্কার' দেওয়ার জন্যে অপারেশান ডিভিশন উন্মুখ। একেই বলে অদৃষ্ট!

নরেন্দ্র দাসানি ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। মাঝে-মাঝে ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। ওঁকে আমি আগে কখনও এখানে দেখিনি। একটা বিশাল বাড়িকে দু-ভাগে ভাগ করে তৈরি হয়েছে দুটো ডিভিশন ঃ সেন্ট্রাল সিকিওরিটি ডিভিশন ও সেন্ট্রাল অপারেশান ডিভিশন। দাসানি কোনটায় চাকরি করেন কে জানে!

একটা বাতাস-চেয়ার টেনে নিয়ে দাসানি বসলেন আমার মুখোমুখি। তারপর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

'স্কটল্যান্ডের ফোর্থ ব্রিজের ওপরে আমাকে একটা সনেট লিখে দিন তো...।'

'ও আমার দ্বারা হবে না। কবিতা আমি একদম লিখতে পারি না।'

'৩৪৯৫৭-এর সঙ্গে ৭০৭৬৪ যোগ দিলে কত হয়?'

তিরিশ সেকেন্ড মতো চুপ করে থেকে বললাম, '১০৫৬২১।'

'আপনি দাবা খেলেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ধরুন দাবা খেলায়—।'

রাকেশ জেনারেটর গান টেবিলে রেখে কম্পিউটার কি-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ঝিম মেরে বসে ছিল, হঠাৎই খেপে উঠে চিৎকার করে বলল, 'দাসানি, আপনারা কি টুরিং টেস্ট নিয়ে খেলা করছেন?'

কোনও যন্ত্র ভাবতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে 'নকলনবিশি' নামে একটা খেলার পরিকল্পনা করেছিলেন এক প্রাচীন বিজ্ঞানী। নাম অ্যালান ম্যাথিসন টুরিং—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক। ওঁর সেই খেলাকে পরে অন্য বিজ্ঞানীরা 'টুরিং টেস্ট' নাম দেন। এখন, টুরিং মারা যাওয়ার প্রায় ছ'শো বছর পরে, নরেন্দ্র দাসানি আমাকে টুরিং টেস্টের প্রশ্নগুলোই করছিলেন, আর আমিও হুবহু সেই উত্তরগুলো দিচ্ছিলাম। সেইজন্যে যোগ অঙ্কের উত্তরটাও ভুল দিয়েছি।

দাসানি থেমে গেলেন। ভুরু কুঁচকে রাকেশের দিকে তাকালেন। একটু ভেবে বললেন, 'দেখুন তো, পোস্টমর্টেম টিম চাঁদে রওনা হয়েছে কি না। আমার মনে

হচ্ছে ওরা এই অ্যান্ড্রয়েডটার নকল ব্রেনে আসল ইন্দ্রজিতের সমস্ত স্মৃতির হুবহু ছাপ তুলে দিয়েছে...পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মেমোরি ম্যাপ। টুরিং টেস্ট দিয়ে একে ধরা যাবে না।'

দাসানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। পরনের মেটাল-ফাইবারের পোশাকের কোনও একটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট চেহারার একটা ডিজিটাল যন্ত্র বের করলেন। বললেন, 'এই স্ক্যানারটা এক্স-রে আর আলট্রাসনিক স্ক্যান দুটোই করতে পারে—।'

রাকেশ কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বোতাম টিপছিল। দাসানির দিকে চোখ তুলে বলল, 'ফ্যালকন-১ তল্লাশির কাজ শেষ করে পোস্টমর্টেম টিম লুনার হাইল্যান্ডস-এ পৌঁছে গেছে। ফ্যালকন-১-এ কিছু পাওয়া যায়নি। ওদের রেডিও মেসেজ আসছে কন্ট্রোল রুমে। আপনি জলদি একে স্ক্যান করে দেখুন, কোনও অস্বাভাবিক মেটাল পার্টসের ছবি পাওয়া যায় কি না।'

দাসানি বোধহয় ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কলার ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাকে। ওঁর শক্তি আমাকে অবাক করে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ধরা তোমাকে দিতেই হবে। শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা। প্রতিদিন আমি হাফডজন অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই—।'

তারপর ডিজিটাল স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যানিংয়ের কাজ শুরু করলেন।

যন্ত্রে কিছুই ধরা পড়ল না। আমি জানতাম পড়বে না। কিন্তু সন্দেহের বিষ ওদের পাগল করে দিয়েছে। সুমিতা, রুনু, টুনু—ওরাও বাদ যায়নি। বিশ্বাসের ভিত এত সহজে টলে যায় জানতাম না।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও দাসানির কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। যন্ত্রটা পকেটে রেখে আপনমনেই বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'যে করে হোক আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। এর আগে ডেল্টা থ্রি-র দুর্ঘটনার কথা আমরা কেউ ভুলে যাইনি। টাইটান থেকে এক অ্যান্ড্রয়েড স্পাই এসেছিল আমাদের ডেল্টা থ্রি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে। ওর শরীরের ভেতরে লুকোনো ছিল একটা এইচ বোমা। বিশেষ একটা কোড ওয়ার্ড যদি অ্যান্ড্রয়েডটা উচ্চারণ করে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে বোমাটা এক্সপ্লোড করবে। এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম টাইটানের আর এক মানুষ-গুপ্তচরকে সাইকোপ্রোব করে। তারপর অতিকষ্টে আমরা অ্যান্ড্রয়েডটাকে ধ্বংস করেছিলাম। পাওয়ার প্ল্যান্টটা অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল...' হঠাৎই গলার স্বর চড়িয়ে আমাকে লক্ষ করে দাসানি বললেন, 'আপনার কোড ওয়ার্ডটা কী, মিস্টার সান্যাল?'

আমারও ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল। তাই চেঁচিয়ে জবাব দিলাম, 'গণ্ডমূর্খ!'

দাসানি বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন আমার গালে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্তের স্বাদ পেলাম জিভে।

রাকেশ বলল, 'একে ইন্দ্রজিতের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চালান, দেখবেন ধরা পড়ে গেছে। সুমিতা বউদি, রুনু, কিংবা টুনু—কেউ না কেউ ঠিক ধরে ফেলবে একে। তারপর শুরু হবে আমাদের খেলা—।'

থাপ্পড় কষানোর পরমুহূর্ত থেকে দাসানি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন। সম্ভবত প্রতিক্রিয়া দেখছিলেন। রোবট আর মানুষের প্রতিক্রিয়ায় নিশ্চয়ই তফাত থাকবে। ওঁর গুণী চোখ নিশ্চয়ই সেটা বুঝতেও পারবে। আমি আশা-ভরা চোখ নিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডানগালটা অসহ্য জ্বালা করছিল।

দাসানি রাকেশকে লক্ষ করে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যানার্জি, ইন্দ্রজিতের বাড়িতেই নিয়ে যাই একে—।'

সেই মুহূর্তে দাসানির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করছিল আমার।

নরেন্দ্র দাসানি বিদ্রূপের স্বরে বলতে লাগলেন, 'আসলে এই যন্ত্রটার কোনও দোষ নেই। ইন্দ্রজিতের মেমোরি ম্যাপ করে দেওয়ায় ওর এখন বিশ্বাস যে, ও-ই আসল ইন্দ্রজিৎ সান্যাল। ফলে ওর অভিনয়ে কোনও ফাঁক থাকবে না। ও জানে যে, ও-ই আসল লোক। কিন্তু আমিও এত সহজে ছাড়ছি না।'

দাসানি আমাকে ইশারা করলেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। রাকেশকে একপলক দেখলাম। ও তখনও কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত।

দাসানি রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটটা বের করে বোতাম টিপলেন। প্লাস্টিকের দেওয়াল সরে গেল। আমরা বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সুমিতা, রুনু, টুনুকে সামনাসামনি দেখতে পাব ভেবে ততটা আর মনখারাপ হচ্ছিল না।

অটো টানেল ধরে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়িতে উঠেই দাসানি আমার বাড়ির স্থানাঙ্ক জানিয়ে দিয়েছেন কম্পিউটারকে। সঙ্গে-সঙ্গে সবচেয়ে সুবিধেজনক পথের ছবি ফুটে উঠেছে কম্পিউটারের পরদায় এবং গাড়িটাও সেই অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছুটতে শুরু করেছে।

শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলাম। সূর্য সবে ডুবে গেছে পশ্চিমে। আকাশে এলোমেলো লাল-হলুদ রং। হঠাৎই ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়ি। দাসানি পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে বললেন, 'তোমাকে এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি—' তারপর একটা জেনারেটর গান বের করে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'এখনও বলো, কে তুমি?'

লক্ষ করেছিলাম, ওঁর জেনারেটর গানের সেফটি লক খোলা নেই। সুতরাং চোখের পলকে জোরালো এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম দাসানির মুখে। আবার আর-একটা—এবারে রগের ওপরে। অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। দাসানির চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, কাত হয়ে পড়ে গেলেন সিটের ওপরে। ওঁর হাত থেকে খসে পড়া জেনারেটর গানটা তুলে নিলাম হাতে। দাসানিকে ঠেলে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। তারপর আবার গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

আমার বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। সেখানে বাগান করেছিলাম। ফুলগাছ লাগিয়েছিলাম নিজের হাতে। এখন শীতের শেষে গোধূলিতে

ফুলের গন্ধ পেলাম। দেখলাম, বাড়ির চারটে জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে বন্দুক ফেলে দিলাম। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম ফুলগাছগুলোর কাছে। বুকভরে ঘ্রাণ নিলাম। আঃ। ঠোঁটের কোণে জ্বালাটা আবার টের পেলাম। একটা ছোট্ট গোলাপ ছিঁড়ে নিলাম গাছ থেকে। ছোট্ট সুন্দর ফুলটা ওর রূপে আর ঘ্রাণে আমাকে যেন পোষ মানিয়ে নিল। ফুলটা আমাকে সন্দেহ করে না।

ফুলটা পকেটে রেখে বাড়ির দরজার দিকে এগোলাম। ছ'মাস চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে কাটিয়ে এখন যে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে না তা নয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা যান্ত্রিক স্বর আমাকে পাসওয়ার্ড জিগ্যেস করল। একমাত্র বাড়ির বাসিন্দারা ছাড়া পাসওয়ার্ড কেউ জানে না। জানানো হয় না। তবে খুব অন্তরঙ্গ পারিবারিক বন্ধু হলে অন্য কথা। যেমন রাকেশ আমাদের দরজা খোলার পাসওয়ার্ড জানে। আমি, সুমিতা আর রুনু জানি। টুনুকে এখনও শেখানো হয়নি।

আমি পাসওয়ার্ড বলতেই দরজা খুলে গেল এবং ভেতরে কোথাও একটা ঘন্টি বেজে উঠল।

সামনেই আলোয়-ভেসে-যাওয়া বসবার ঘর। আর-একটু দূরে দু-পাশে দাঁড়িয়ে রুনু আর টুনু।

'রুনু-টুনু—।'

রুনু কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। টুনু একটু যেন হাসতে চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎই কেঁদে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে!'

কোথা থেকে যেন আচমকা হাজির হল সুমিতা। ঠিক ওদের দুজনের মাঝে। আমি সুমিতার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। আর ঠিক তখনই সুমিতা ওর হাতে-ধরা জেনারেটর গান থেকে ফায়ার করল। আমি চৌকাঠের ওপর বসে-পড়লাম ঝরা ফুলের মতো।

সুমিতা তখন আতঙ্কে পাগলের মতো চিৎকার করছে। বলছে, 'রাকেশ আমাকে ঠিক সময়েই খবর দিয়েছিল। বলেছিল, ''নরেন্দ্র দাসানি রোবটটাকে সঙ্গে করে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এটা দাসানিকে শেষ করে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে না হাজির হয়। যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে তুমি তৈরি থেকো, বউদি। আমি হাতের কাজ শেষ করেই যাচ্ছি।'' রাকেশের কথাই শেষপর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। আমার স্বামীকে শেষ করে তুমি আমাদের সবাইকে শেষ করতে এসেছ!'

সুমিতা কোন লেভেলের ফায়ার করেছে জানি না, কিন্তু ওর কথাগুলো আমি যেন বহুদূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। রুনু, টুনু অবাক চোখে আমাকে দেখছিল।

সত্যিই তো, আগে কখনও কোনও রোবটকে মরতে দেখেনি ওরা।

ঠিক সেই সময়ে শুনতে পেলাম ভারী বুটের শব্দ। কারা যেন দৌড়ে আসছে অন্ধকার বাগানের পাশ দিয়ে। পায়ের শব্দ কাছে এল। রাকেশ আর দাসানি। সুমিতার হাবভাব আর জেনারেটর গান দেখেই ব্যাপারটা ওরা বোধহয় বুঝতে পারল।

দাসানি ঝুঁকে পড়ে আমার পোশাক তল্লাশ করতে লাগলেন। কিছু কাগজপত্র পেলেন। তারপরেই পেলেন গোলাপটা। লক্ষ করলাম, ওই ছোট্ট তাজা ফুলটা পাথরের মতো মানুষটাকে বদলে দিল। ওঁর চোখ ছোট হল, কপালে ভাঁজ পড়ল। হাঁটু গেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমার মুখের ওপরে। বিড়বিড় করে বললেন, 'অ্যান্ড্রয়েড কখনও নিজের খেয়ালে গাছ থেকে ফুল ছেঁড়ে না—কখনও না। অ্যান্ড্রয়েডদের সব কাজের পিছনেই একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে—কোনও না কোনও কারণ।'

উত্তেজিতভাবে রাকেশের দিকে তাকিয়ে দাসানি বললেন, 'ব্যানার্জি, আমাদের বোধহয় ভুল হয়েছে!'

রাকেশ তখন ছোট্ট একটা ডিজিটাল ট্রান্সিভারে কার সঙ্গে যেন বেতার-যোগাযোগে কথা বলছিল। খট করে যন্ত্রটার সুইচ অফ করল ও। দেখলাম, ওর চোখ চিকচিক করছে। ধরা গলায় থেমে-থেমে ও বলল, 'চাঁদে ওরা টাইটানের অ্যান্ড্রয়েড-স্পাইয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। ওরা যে ইন্দ্রজিৎ সান্যালের নকল করে অ্যান্ড্রয়েড গুপ্তচর পাঠাচ্ছে সেই খবরটা ঠিকই ছিল...কিন্তু মনে হয়, ডিজাইনে কোনওরকম গোলমাল থাকায় ঠিক সময়ের আগেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তারপর...।'

রাকেশ আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে, চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল, 'ইন্দ্র...ইন্দ্র...সত্যিই তুই ফিরে এসেছিলি...!'

আমার মুখে ওর হাতের ছোঁয়া টের পেলাম। ঠিক তখনই সুমিতা-রুনু-টুনু একসঙ্গে কেঁদে উঠল। চোখে জল ওদের সন্দেহ ধুয়ে-মুছে দিয়েছে।

প্রিয়জনেরা যদি চোখের জলে বিদায় জানায় তাহলে মরতে কারও খারাপ লাগে না। আমারও লাগবে না।





খেলতে-খেলতে

মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ডেকেই চলেছিলেন, কিন্তু সুনীতের কোনও খেয়াল নেই। পার্সোনাল কম্পিউটারের ওপর হুমড়ি খেয়ে দু-হাতে বোতাম টিপে যাচ্ছিল ও। আর কম্পিউটারের পরদায় খুদে একটা কালো বেড়াল এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।

'ক্যাট' খেলাটা গতকালই পেয়েছে গৌতমের কাছে। এমনি-এমনি অবশ্য দেয়নি। ক্যাটের বদলে 'ডিগার' গেমটা ওকে দিতে হয়েছে। আগে স্কুলের কম্পিউটারে বসে দিব্যি কম্পিউটার গেম্‌স খেলা যেত, কেউ কিছু বলত না। কিন্তু গত মাসে রঞ্জন গেম্‌স খেলার সময়ে কী করে যেন কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে ভাইরাস ঢুকিয়ে ফেলেছিল। ব্যস!

ওদের কম্পিউটার-টিচার মিস্টার গোম্‌স। দেখতে এমনিতেই লাল, তার মুখটা আরও লাল হয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে নবাবি ফরমান জারি হয়ে গিয়েছিল, 'নো গেম্‌স।' যদি কাউকে দেখা যায় গেম্‌স খেলছে কম্পিউটারে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে স্কুল থেকে বিদায়। ওদের প্রিন্সিপাল মিস্টার স্টুয়ার্টও খুব কড়া ধাতের মানুষ। উনিও গোম্‌সের কথায় একমত। তা ছাড়া, গোম্‌স স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়ার টিচার।

মা কাছে এসে পিঠে হাত রাখতেই সুনীত বোতাম টেপা থামাল। তখন

রঙিন পরদায় বেড়ালটা সবে একটা ডাস্টবিনের টিন থেকে লাফ দিয়ে কাঠের বেড়াটা টপকে কাপড়-ছড়ানো দড়ি ধরে ঝুলছে।

সুনীত বিরক্ত মুখে ফিরে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী যে ডাকাডাকি করো না! কী হয়েছে?'

মা-ও বিরক্তভাবে বললেন, 'কী আবার হবে, খাবার ঠান্ডা হচ্ছে। ক'টা বাজে খেয়াল আছে? তোমাকে কম্পিউটার কিনে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে। বলছি তোমার বাবাকে—।'

সুনীত কি-বোর্ড ছেড়ে উঠে পড়ল। কম্পিউটার অফ করে দিল। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট। এখন খেয়ে না নিলে কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটায় নতুন খেলাটা চালানো যাবে না। স্পষ্ট মনে আছে, লোকটা বলেছে রাত এগারোটার আগে গেম্‌সটা না খেলতে। তাহলে নাকি আসল মজাটাই পাওয়া যাবে না। নতুন এই খেলাটার কথা এখনও কাউকে বলেনি সুনীত। কারণ, বলতে বারণ করে দিয়েছে বারবার।

খাবার টেবিলে বসে চুপচাপ খেতে-খেতে সকালে দেখা লোকটার কথা মনে পড়ছিল সুনীতের। ও তখন গৌতমের সঙ্গে স্কুলের বন্ধ সদর দরজায় এসে লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঝালমুড়ি কিনছে। প্রথমে খেয়াল করেনি। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'খোকা, কম্পিউটার গেম্‌স নেবে? একেবারে নতুন, ম্যাজিকের মতো।'

চমকে তাকিয়েছিল সুনীত। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে তালিমারা একটা ছাই রঙের ওভারকোট। ময়লা গায়ের রং। ভাঙা তোবড়ানো গাল। কপালে অসংখ্য ভাঁজ। আর চোখ দুটো যেন বরফের টুকরো।

কথা বলতে-বলতে কোটের পকেট থেকে একটা ঝকঝকে ফ্লপি ডিস্ক বের করে এনেছিল লোকটা। বাড়িয়ে ধরেছিল সুনীতের দিকে। আরও কীসব বলছিল, কিন্তু রাস্তা দিয়ে ট্রাম ছুটে যাচ্ছিল। তার ঘড়ঘড় শব্দে কিছু শোনা যায়নি।

ঝালমুড়ি কেনা হয়ে গিয়েছিল। গৌতম লোকটার চেহারা দেখে চাপাগলায় বলেছিল, 'স্টোনম্যান। জলদি চলে আয়।'

কিন্তু সুনীত যে গেম্‌স-পাগল। তা ছাড়া, গৌতমের মতো ভীতুও নয়। সুতরাং সে গৌতমকে থামতে বলে লোকটাকে জিগ্যেস করে বসল, 'কত দাম?'

'দাম?' অদ্ভুতভাবে খ্যা-খ্যা করে হাসল লোকটা। বলল, 'এর কোনও দাম নেই, খোকাবাবু। জানের কি কোনও দাম হয়, অ্যাঁ? এই নাও। তবে ঠিক রাত এগারোটায় গেম্‌সটা চালাবে। তার আগে না।'

গরাদের ফাঁক দিয়েই ফ্লপিটা সুনীতের দিকে এগিয়ে দিল লোকটা। ওর শিরা বের করা হাতে হাত ঠেকে গেল সুনীতের। উঃ, কী ঠান্ডা! বরফ যেন। চমকে হাত টেনে নিল ও। দেখল, লোকটা হাসছে মিটিমিটি। হলদেটে দাঁত বের করে বলল, 'খোকাবাবু, তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর। এইরকমই আমার পছন্দ—কিন্তু

মনে থাকে যেন, রাত এগারোটার আগে না...।'

এই কথা বলে অদ্ভুত লোকটা জোরকদমে হাঁটা দিল বড় রাস্তা ধরে। ওর শরীরটা যেন বাতাসে ভর করে ভেসে যাচ্ছিল।

টিফিন শেষের ঘণ্টা বাজতেই ঘোর কাটল সুনীতের। গৌতম ওর জামা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ছুটতে শুরু করেছে ক্লাসরুমের দিকে। সঙ্গে অন্য ছেলেরাও ছুটছে। হইহই, এক জটপাকানো চিৎকার। তারই মধ্যে লোকটার কথা কানে বাজছিল, '...ঠিক রাত এগারোটায়...।'

খাওয়া শেষ হতেই আবার কম্পিউটার-রুমে এসে ঢুকল সুনীত। এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। ওকে আবার এ-ঘরের দিকে আসতে দেখে মা অনুযোগ করছিলেন কিন্তু বাবা থামিয়ে দিয়েছেন মা-কে। বলেছেন, 'কম্পিউটার ছাড়া এখানকার ছেলেমেয়েরা এক-পা চলতে পারে না। ও তুমি বুঝবে না। এ এক অবাক-করা যন্ত্র।'

সুতরাং লোকটার দেওয়া ফ্লপি ডিস্কটা ড্রয়ার থেকে বের করে নিয়ে বসল সুনীত। তাকিয়ে রইল ঘড়ির দিকে। ফ্লপিটা কেমন অদ্ভুত ঠান্ডা। ঠিক লোকটার হাতের মতো?

দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটার ঢং-ঢং আর সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ শুরু।

কম্পিউটার অন করে দিল সুনীত। দু-বার 'এনটার' বোতামটা টিপে ডস্ প্রম্পটে চলে এল। তারপর 'সি' ড্রাইভ থেকে 'এ' ড্রাইভে গিয়ে ফ্লপিটা ঢুকিয়ে দিল 'এ' ড্রাইভের স্লটে। ডাইরেক্টরি দেখল ঃ একটাই মাত্র ফাইল রয়েছে ফ্লপিটায়। নাম 'ওয়ান্ডার'। সুতরাং দ্রুতহাতে কি-বোর্ডের বোতাম টিপতে লাগল সুনীত। আর কম্পিউটারের পরদায় নানা রঙে ফুটে উঠল নানা লেখা। লেখাগুলো পড়তে-পড়তে সুনীতের মনে হচ্ছিল ওই হিম-চোখ লোকটা যেন ওকে পড়ে শোনাচ্ছে কথাগুলো ঃ

'কম্পিউটারের আশ্চর্য জগৎ নিয়ে ম্যাজিকের মতো এই খেলা ''ওয়ান্ডার ওয়ার্ল্ড''। এটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দুনিয়ায় মাত্র দুটো জগৎ রয়েছে ঃ একটা কম্পিউটারের বাইরের জগৎ, যেখানে বসে তুমি কি-বোর্ডের বোতাম টিপছ। আর-একটা কম্পিউটারের ভেতরের জগৎ—আশ্চর্য জগৎ, যেখানে বসে আমি কথা বলছি...।'

সুনীতের বেশ মজা লাগল। এরকম কম্পিউটার গেম্স ও জীবনে দেখেনি। লেখাগুলো পড়তে-পড়তে ওর গায়ে কাঁটা দিল। কেমন যেন শীত করে উঠল। সে কি ঘরের এয়ার কন্ডিশনের জন্য?

টিভি পরদায় লেখাগুলো তখন পালটে গেছে। ফুটে উঠেছে নতুন লেখা ঃ 'এবারে কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে ঢুকে পড়ার জন্যে ফাংশান-কি এফ-ওয়ান বোতামটা টেপো।'

বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে এফ-ওয়ান বোতামটা টিপল সুনীত। সঙ্গে -সঙ্গে রঙিন পরদায় পরপর ফুটে উঠল। ছবির মেলা—ঘর-বাড়ি, বাগান, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল—কত কী! একে-একে সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। আর ছবিগুলো কী আশ্চর্যরকম নিখুঁত! ঠিক যেন রঙিন ফোটোগ্রাফ। কম্পিউটার গ্রাফিক্স নিয়ে এত নাড়াচাড়া করেছে, সুনীত, কিন্তু এরকম নিখুঁত ছবি কখনও দেখেনি।

ছবির মেলা হঠাৎই থেমে গেল। তারপরই লেখা ফুটে উঠল পরদায় ঃ 'এইবার আসল খেলা শুরু। এই খেলায় ভীষণ মনোযোগ দরকার। আর দরকার নিরিবিলি ঘর—যাতে কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। সেইজন্যেই বলেছি, রাত এগারোটার আগে এ-খেলা খেলবে না। তোমার আশেপাশে কেউ নেই তো?' ''ওয়াই কিংবা এন'' বোতাম টিপে জবাব দাও ''হ্যাঁ'' অথবা ''না''।'

সুনীত জানে, কেউ নেই। বাবা এখন বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়ছেন, আর মা কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত উলবোনা মেশিনে নতুন-নতুন নকশা তুলছেন। তা সত্ত্বেও ও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল পিছন দিকে। তারপর 'এন' বোতাম টিপে জবাব দিল, 'না, ঘরে আর কেউ নেই।' তখন আবার নতুন নির্দেশ ফুটে উঠল পরদায় ঃ 'এবারে তুমি তোমার ইচ্ছেমতো তৈরি করো আশ্চর্য জগৎ। তোমার খুশিমতো ঘর-বাড়ি, বাগান, সমুদ্র, পাহাড়—সব সাজিয়ে নাও। ঠিক যেমনটি তোমার পছন্দ।'

তারপরই পরদায় ফুটে উঠল কোন-কোন বোতাম টিপতে হবে তার লিস্ট। সুনীত কাজ শুরু করল সঙ্গে সঙ্গেই।

দ্রুত হাতে বোতাম টিপে ও সাজাতে লাগল ঘর-বাড়ি। নানা রঙের নানারকম বাড়ির নকশা থেকে ও ওর পছন্দসই বাড়িটা বেছে নিল। তারপর তার খুঁটিনাটি রদবদল করে তৈরি করল সুন্দর একটা বাড়ি। কম্পিউটার গ্রাফিক্সে খেয়াল-খুশিমতো যেভাবে ছবি আঁকে, এও ঠিক তেমনই।

বাড়ি তৈরি শেষ হতেই সুনীত তার লাগোয়া একটা ফুলবাগান জুড়ে দিল। তারপর বাড়ির পিছনে এঁকে দিল একটা পাহাড়। তার মাথায় বরফ। বাঃ, বেশ চমৎকার লাগছে বাড়িটা! আপনমনেই ভাবল সুনীত। এবারে একটা সমুদ্র জুড়ে দিলে কেমন হয়?

যা ভাবা তাই কাজ। একটা সমুদ্র জুড়ে দিল টিভির ছবিতে। তাতে মাঝারি মাপের ঢেউ। বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে সমুদ্রের শুরু। মাঝের জায়গাটায় বালি। বালিতে দুটো রঙিন ছাতা এঁকে দিল ও। এবারে দারুণ সুন্দর লাগছে। নোনা হাওয়ায় ছাতার ঝালরগুলো উড়ছে। বেলাভূমিতে শব্দ করে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। বাতাসে উড়ছে জলকণা। আর বাগানের রঙিন ফুলগাছগুলো খুশিতে মাথা নাড়ছে। এই তো আশ্চর্য জগৎ!

ছবি আঁকা শেষ হতেই ‘কন্ট্রোল’ বোতাম টিপে দিয়ে সুনীত জানাল যে, ওর কাজ শেষ। আর সঙ্গে-সঙ্গেই রঙিন হরফে ফুটে উঠল নতুন লেখা ঃ ‘এবারে তাহলে গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক। এসো, ঢুকে পড়ো তোমার বাড়িতে। ‘‘অলটারনেট’’ আর ‘‘কন্ট্রোল’’ বোতাম টিপে রেখে ‘‘স্পেসবার’’টা টেপো।’

কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল সুনীতের। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ও ডুবে যাচ্ছিল ‘ওয়াণ্ডার ওয়ার্ল্ড’ এ-কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে। টিভি পরদায় ফুটে ওঠা নির্দেশ পালন করতে এতটুকু দেরি করল না ও। অলটারনেট, কন্ট্রোল আর স্পেসবার—ব্যস। সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্রের জোলো হাওয়া এসে লাগল ওর চোখেমুখে।

কী আশ্চর্য! এই তো সেই রঙিন ছাতা দুটো। দিব্যি ছোঁওয়া যাচ্ছে! আর ওই তো নীল সমুদ্র! কী সুন্দর লাগছে ঢেউগুলো! রোদ-ঝকঝকে বালির ওপরে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করল সুনীত। দূরে দাঁড়ানো সুন্দর বাড়িটা দেখল। দেখল তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বরফের সাদা টুপি পরা পাহাড়ের চুড়োটা। সত্যি, অদ্ভুত! কম্পিউটারের ভেতরের জগৎটা তাহলে মিথ্যে নয়—সত্যি!

হঠাৎই ওর মনে পড়ল, কম্পিউটার ওকে বাড়িতে ঢুকে পড়তে নির্দেশ দিয়েছে। সুনীতের বাড়ি। এত সুন্দর বাড়ি ও জীবনে কখনও দেখেনি। কাল স্কুলে গিয়ে গৌতমকে এই গেম্‌সটার কথা বলবে। ও যে সে-কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না, সুনীত সেটা বাজি রেখে বলতে পারে।

এবারে ছুটে বাড়িটার কাছে গেল ও। সদর দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। টিভি পরদার ছবিতে এটা নজরে পড়েনি। সুনীত দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল নতুন বাড়ির দরজায়। ঘরের ভেতরে কয়েকটা মাকড়সার জালও ওর নজরে পড়ল। আর একইসঙ্গে কেমন শীত-শীত করে উঠল। হয়তো পিছনের পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঠান্ডা নেমে আসছে।

ঘরটা মাপে বেশ বড়। তবে আবছা অন্ধকার আর চেহারায় পুরোনো। সিমেন্ট খসে পড়া বড়-বড় থাম। সিলিঙের ফাঁকে-ফোকরে নড়াচড়ার শব্দ। শোনা যাচ্ছে পাখি-টাখির ডানার ঝাপটানি। ডানদিকের দেওয়ালে বসানো কাচের শার্সি দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। সেই আলোর রেখায় উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ধূলিকণা। আর ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে।

শীতটা ধীরে-ধীরে বাড়ছিল। দু-হাত বুকের কাছে জড়ো করে সুনীত এগিয়ে গেল সিঁড়িটার দিকে। কেউ যেন ওকে টানছিল। ধুলোমাখা সিঁড়ির ধাপে পায়ের ছাপ ফেলে ও ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলায় দু-পাশে দুটো বিশাল ঘর। তার মাঝে অন্ধকার একটা অলিন্দ। অলিন্দের শেষে একটা বারান্দা। তার দরজার চৌকো ফ্রেমে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎই বাঁ-দিকের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল অলিন্দে। পিছনে

আলো থাকায় লোকটার সিলুয়েট ছবি ধরা পড়ল সুনীতের চোখে। ছায়াটা দ্রুতপায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। যেন হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে গেল ওর কাছে। খুব চেনা সুরে হাসল লোকটা। বলল, 'এসো খোকাবাবু, এসো...।'

লোকটার ওভারকোট থেকে ন্যাপথলিনের গন্ধ নাকে আসছিল সুনীতের। একই সঙ্গে ভীষণ অবাক লাগছিল ওর। কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে এই লোকটা কেমন করে ঢুকে পড়ল?

লোকটা ওর হাত চেপে ধরল। কী ঠান্ডা হাত! সুনীতের হাত যেন অবশ হয়ে গেল। লোকটার সঙ্গে দু-পা হেঁটে যেতেই ডানদিকের ঘরটার ভেতরে চোখ পড়ল ওর। আবছায়া অন্ধকারে কয়েকটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলেমেয়ের মলিন মুখ। সুনীতের নজর লক্ষ করে লোকটা মন্তব্য করল, 'ওরাও তোমার মতো কম্পিউটার গেমস্-পাগল। তাই তোমারই মতো ঢুকে পড়েছে কম্পিউটারের আশ্চর্য জগতে।'

ঠিক তখনই মায়ের মুখটা মনে পড়ল সুনীতের। অমনিই সব ভুলে গেল ও। একটানে লোকটার হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর ছুটে গেল বারান্দার দরজার দিকে।

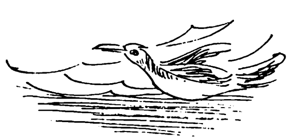
লোকটা প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়া করল সুনীতকে।

কিন্তু ততক্ষণে সুনীত পৌঁছে গেছে বারান্দায়। বারান্দায় এসেই এক অদ্ভুত দৃশ্য ওর নজরে পড়ল।

ওর চোখের সামনেই একটা ঘর। ঘরটা খুব চেনা। ওর কম্পিউটার-রুম। ঘরের চেয়ার, টেবিল আর কম্পিউটারের কি-বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎই ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন মা। ওর খালি চেয়ারটা দেখে অবাক হয়ে বোধহয় একটা চিৎকার করে উঠলেন। কোনও শব্দই শুনতে পেল না সুনীত। ওর চোখ গেল ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা। পেণ্ডুলামটা দুলছে, কিন্তু কোনও শব্দ হচ্ছে না।

'মা! মা!' করে ডেকে উঠে সামনে হাত বাড়াল সুনীত। আর তখনই লেন্সের মতো বাঁকানো কাচের দেওয়ালটা ওর হাতে ঠেকল।

সুনীত চিৎকার করে উঠল পাগলের মতো। দুমদুম করে কিল মারতে লাগল কাচের দেওয়ালে। যে করে হোক, দু-জগতের মাঝের এই দেওয়ালটা ওকে ভাঙতেই হবে। তাই কাঁধের ওপরে সদ্য চেপে বসা ঠান্ডা হাতটাকে ও মোটেই আমল দিচ্ছিল না।





ইনস্পেক্টর রনি

আমি বন্দুক সমেত ডানহাতটা সামনে টান-টান করে বাড়িয়ে ধরলাম। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বললাম, 'কাঁধের কাছটায় লাগছে। তা ছাড়া, লক্ষ করেছেন, হাতটা সামান্য কাঁপছে?'

ডক্টর মজুমদার আমার হাতটা ধরে সামান্য নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'কাঁধের জয়েন্টটা একবার চেক করে দিচ্ছি। আর সফ্‌টওয়্যারটা একটু ঠিকঠাক করে দিলেই কাঁপুনিটা থেমে যাবে।'

শুরু হল ডক্টর মজুমদারের খুঁটিনাটি চিকিৎসা। আমি চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম লেসার বন্দুক-ধরা হাতটা। কেমন অবাক লাগল। আমার শরীরের কোথায় কী একটা মাইক্রোপ্রসেসর রয়েছে, তার প্রোগাম সামান্য রদবদল করে দিলেই বন্দুক-ধরা হাতের কাঁপুনি থেমে যাবে। কী আশ্চর্য! অবশ্য এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর পক্ষে সবই সম্ভব। রোবটশাস্ত্র আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণায় দুনিয়া-জোড়া নাম। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ শুধু-শুধু এঁকে বিশাল অঙ্কের মাইনে দিয়ে রাখেনি। তা ছাড়া, এই যে আমি এখন বেঁচেবর্তে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি, তা একমাত্র ডক্টর মজুমদারের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। নইলে আমি এখন কোথায়! এক মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টের পর এই মানুষটাই আমাকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এটা আমার দ্বিতীয় জীবন। আগের জীবনটা

তেমন করে মনে পড়ে না।

প্রতি মাসে একবার করে আমি অভিজিৎ মজুমদারের কাছে চেক আপের জন্যে আসি। এখনও এসেছি সেইজন্যেই।

আমার কাঁধের কাছে ধাতব ঢাকনাটা খুলে ডক্টর মজুমদার কীসব করছিলেন। এসব কাজের সময় মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন তিনি। ফলে আমি কিছুই টের পাচ্ছিলাম না। বরং বিশ বাই তিরিশ মাপের বিশাল ঘরের বিচিত্র জিনিসগুলো দেখছিলাম।

ঘরটা অগোছালো। দেওয়ালে টাঙানো নানা ছবি। শরীরের বিভিন্ন হাড়ের গঠন, স্নায়ুবর্তনি, হাত-পায়ের নানারকম জয়েন্ট, আরও কত কী! এ ছাড়া, ঘরে ছড়ানো রয়েছে রাজ্যের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট, সল্‌ডারিং আয়রন, তার, ধাতুর পাত, মাইক্রোপ্রসেসর কিট, আর দুটো কম্পিউটার। এর মধ্যে একটা লালবাজারে আমাদের হেড কোয়ার্টারে হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে। ফলে এটাই ওঁর অফিস, এটাই ওঁর বাড়ি।

এখন রাত দশটা। ডক্টর মজুমদার আমাকে সাধারণত রাতেই আসতে বলেন। কারণ তখন ওঁর ল্যাবের আর সব লোকজন থাকে না। উনি জানেন, আমি নিরিবিলি পছন্দ করি।

হঠাৎই ডানহাতের সাড় ফিরে পেলাম। ডক্টর মজুমদার আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার মাঝখানটায় টাক, চারপাশে সাদা চুলে ঝালর। বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষটি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বয়সের ভারে একটু নুয়ে গেছেন। ফরসা চামড়া তামাটে হয়ে গেছে। চোখের নীচে ভাঁজ পড়েছে। ঘিয়ে রঙের ঢোলা জামা, তার চেয়েও ঢোলা কালো প্যান্ট। কোমরে সেকেলে ঢঙের বেল্ট। এই আমার জীবনদাতা, ঈশ্বর।

'নাও, রনি, এবারে ডানহাতটা নাড়াও দেখি—।'

ওঁর কথামতো কাজ করলাম। না, আর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই জাদু জানেন।

ঘরের শেষপ্রান্তে এককোণে একটা চৌকো বোর্ডে অনেক কালো বৃত্তের ছবি—শুটিং টারগেট। বৃদ্ধ বললেন, 'রেডি—।'

আমি টারগেট বোর্ড লক্ষ্য করে লেসার বন্দুক উঁচিয়ে ধরলাম। এখান থেকে দূরত্ব উনতিরিশ ফুট। আমার ডিসট্যান্স মিটার সেইরকমই সংকেত জানাচ্ছিল আমাকে।

'অন ইয়োর মার্ক—।'

আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক তীক্ষ্ণ চোখ টারগেটের ঠিক মাঝখানের কালো বিন্দুটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিল।

'ফায়ার—!'

তৎক্ষণাৎ ফায়ার করলাম—পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আঠেরোবার।

ডক্টর মজুমদার হেসে বললেন, 'দারুণ!' তারপর রওনা হলেন টারগেট বোর্ডের দিকে। বোধহয় স্বচক্ষে দেখতে চান, সেখানে প্রতিবারের মতো শুধু একটাই ক্ষতচিহ্ন রয়েছে কি না।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ডক্টর মজুমদারকে দেখতে লাগলাম। উনি টারগেটের ছাপা কাগজটা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। বুল্‌স আইয়ের ফুটো দিয়ে আমাকে দেখতে-দেখতে মজা করে বললেন, 'তোমার টিপ একেবারে যাচ্ছেতাই, রনি। আঠেরোবার ফায়ার করলে, আর টারগেটে একটাই মাত্র ফুটো!'

আমি কষ্ট করে হাসলাম। মুখের পেশিতে টান লাগছিল। ডক্টর মজুমদার মুখের সামনে থেকে কাগজের আড়াল সরিয়ে অবাক হয়ে আমার হাসি দেখলেন। বললেন, 'বাঃ, তুমি দেখছি রসিকতা বুঝতে পারছ! জানো, একটা সত্যিকারের রোবট কখনও রসিকতা বুঝতে পারে না!'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আমি যে আসলে কী, তা-ই আমি জানি না, ডক্টর—।'

আমার মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। কতগুলো স্মৃতি হাঁকপাঁক করছিল ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না ওরা।

অভিজিৎ মজুমদার একটা টুলে বসে পড়ে গালে হাত দিলেন। চোখ বুজে কীসব চিন্তা করলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওসব কথা থাক, রনি। তুমি আমার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জানি, আমাকে তুমি হতাশ করবে না। একটু সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর পুরোনো কথা যখন যা মনে পড়বে, সব টেপ করে রাখবে—যেন কোনওরকম ভুল না হয়।'

এসব কথা উনি প্রায়ই বলেন। প্রতি মাসেই একবার করে শুনতে হয়। কিন্তু এতে কী লাভ, তা জানি না।

অভিজিৎ মজুমদার হঠাৎই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কাছে এসে বললেন, 'নাও, এবারে শেষ কাজটুকু হয়ে যাক—প্রশ্ন-উত্তরের খেলা।'

প্রত্যেকবারই সব পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে এই প্রশ্ন-উত্তরের পরীক্ষা দিতে হয় আমাকে। যদি আমার উত্তরে কোনও গোলমাল হয়, তা হলে উনি বুঝতে পারেন আমার ব্রেন সার্কিট ঠিকমতো কাজ করছে না। এই পরীক্ষায় পাশ করলেই আমার ছুটি।

'তুমি কে?' ডক্টর মজুমদারের প্রথম প্রশ্ন।

আমার ইলেকট্রনিক স্মৃতিকোষে রাখা যাবতীয় তথ্য গড়গড় করে আওড়ে গেলাম।

'আমার নাম রনি সরকার। লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অপারেশন ডিভিশনের ইনস্পেক্টর।'

'তোমরা আর কে কে আছ?'

'কেউ নেই। আমি একা—।'

'আমি একা' এই শব্দ দুটো আমার মাথার ভেতরে প্রতিধ্বনি তুলে ঘোরাফেরা করতে লাগল অনেকক্ষণ।

'তুমি থাকো কোথায়?'

'১৬৩ বিবেকানন্দ রোড, ব্লক-জি, ফ্ল্যাট নাম্বার ২৭২।'

'আমি তোমার কে হই?'

'আপনি, আপনি আমাকে প্রাণ দিয়েছেন। আপনি না থাকলে আমি...।'

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বললেন, 'না, আমি তোমার বন্ধু। তোমার ভালো চাই।'

আমি ওঁর কথাগুলো আবৃত্তি করলাম, 'আপনি আমার বন্ধু, আমার ভালো চান।'

ডক্টর মজুমদার হাসলেন, বললেন, 'এই তো ভালোছেলের মতো কথা!' তারপর কিছুক্ষণ আনমনে কী ভেবে বললেন, 'তোমার গলার আওয়াজে সামান্য একটু মেটালিক নয়েজ রয়ে গেছে। ওটা কী করে বাদ দেওয়া যায় দেখি। পারলে পরের মাসের চেক আপের সময়—।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের একটা কম্পিউটার বিপ-বিপ শব্দ তুলে 'অন' হয়ে গেল। হেড কোয়ার্টার থেকে কোনও খবর দেওয়ার থাকলেই এই কম্পিউটারটা চালু হয়ে যায়।

ডক্টর মজুমদার ব্যস্তভাবে ওটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁর পায়ে ধাক্কা লেগে বসার টুলটা কাত হয়ে পড়ে গেল। মেঝেতে কিছু কাগজপত্র ছিল—সেগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। ততক্ষণে বৃদ্ধের অভিজ্ঞ হাত কি-বোর্ডের বোতাম টিপতে শুরু করেছে।

আমি 'আসি, ডক্টর' বলে বেরিয়ে আসছিলাম, ডক্টর মজুমদার ডাকলেন আমাকে, 'হেড কোয়ার্টার থেকে তোমাকে চাইছে। ইমার্জেন্সি।'

আমি ভারী-ভারী পা ফেলে কম্পিউটারটার দিকে এগোলাম। লেসার বন্দুকটা ঊরুর লাগোয়া সিকিওরিটি চেম্বারে রেখে দিলাম। হেড কোয়ার্টার থেকে এত রাতে আবার কী ইমার্জেন্সি কল? আমি যে এখানে রুটিন চেক আপের জন্য আসছি সেটা অপারেশন ডিপার্টমেন্টের ওসি জানেন। কারণ খবর রেখে আসাটাই আমাদের রেওয়াজ।

কম্পিউটারের পরদার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে। কারণ, গোটা-গোটা হরফে ফুটে উঠেছে আমার কোড

নম্বর আর নির্দেশ ঃ এক্ষুনি আমাকে পৌঁছে যেতে হবে সল্টলেক সিটিতে, এ-ই ব্লকের ৬৭ নম্বর বাড়িতে। উলটোডাঙা ভি. আই. পি. রোডের মুখে এ. এস. আই. বর্মন অপেক্ষা করবে। তার কোড নম্বরও ফুটে উঠল পরদায়। আমি যেন বর্মনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাই। যাওয়ার পথে বর্মন আমাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে।

আমি সম্মতি জানিয়ে বোতাম টিপে আমার কোড নম্বর জানালাম এবং বললাম যে, এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। তারপর শেষ বোতামটা টিপতেই কম্পিউটারের সব লেখা মুছে গেল পলকে।

ডক্টর মজুমদার আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক।'

আমি বেরিয়ে আসার আগে প্রতিভাবান বৃদ্ধ মানুষটিকে কয়েক মুহূর্ত দেখলাম। এই লোকটি ছাড়া আর কেউই আমাকে ভালোবাসে না। ওঁর চোখে আমি যেরকম স্নেহ-ভালোবাসা-মাখানো দৃষ্টি দেখি, আর কারও চোখে দেখি না। অথচ ভাসা-ভাসা মনে পড়ে, পুরোনো জীবনে আমি কী সুখীই না ছিলাম!

উলটোডাঙা ভি. আই. পি. রোডের মোড়ে গাড়িটা পার্ক করতেই সন্দীপ বর্মন কোথা থেকে এসে গাড়িতে উঠল। আমার গাড়ির মাথায় ঘুরপাক-খাওয়া লাল-নীল বাতি রয়েছে। সুতরাং গাড়িটা চিনে নিতে ওর অসুবিধে হয়নি। ওকে দেখেই সামনের সিটের দরজা খোলার অটোমেটিক বোতাম টিপে দিয়েছিলাম। লক্ষ করলাম, বর্মন একটু ইতস্তত করছে। বোধহয় আমার পাশে বসে পথ চলায় ওর পুরোপুরি সায় নেই। আমি জানি, সহকর্মীরা আমাকে একটু-আধটু এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু একসঙ্গে কাজ করতে গেলে আর উপায় কী! প্রথম-প্রথম আমার খারাপ লাগত, কিন্তু এখন মজা পাই।

সুতরাং বর্মনকে ডাকলাম, 'আরে, কী ভাবছেন, উঠে আসুন জলদি—।'

বর্মন উঠে বসল আমার পাশে। গাড়ির দরজা কোনওরকম শব্দ না করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে গেল আবার। ড্যাশ-বোর্ডের সেলুলার ফোন চালু করে হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিলাম যে, বর্মন আমার গাড়িতে উঠে পড়েছে, আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সল্ট লেক সিটির নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাচ্ছি।

বর্মনের চেহারা মোটার দিকে, তবে গায়ে জোর আছে। আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে যাওয়ার আগে প্রায় সাত সেকেন্ড টিকে ছিল। আগে কথায়-কথায় আমাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, পাঞ্জায় হেরে যাওয়ার পর থেকে আর করে না।

সন্দীপ বর্মনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, থুতনিতে ভাঁজ, রগের চুলে নুন-মরিচ। সিগারেট খাওয়ার ভীষণ নেশা ওর। গাড়ি চলতে শুরু করতেই লাইটার জ্বেলে ফস করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে আমার দিকে না তাকিয়েই বলল,

'সরকার, এটা দয়া করে বস্‌কে জানাবেন না।'

আমি ধাতব শব্দ করে হাসলাম। বললাম, 'না, বলব না। কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? কোনও ইমার্জেন্সি কাজে?'

বর্মন ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'আমরা প্রফেসর রূপেশ কোঠারির বাড়ি যাচ্ছি। ওঁর এগেইনস্টে কিডন্যাপিংয়ের চার্জ আছে।'

আমি চমকে উঠলাম। প্রফেসর রূপেশ কোঠারি! আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছরে নোবেল পুরস্কারের তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল। হয়তো এবারে পেয়ে যাবেন। ওঁর 'ইউনিফায়েড জেনারেল থিয়োরি অব স্পেস-টাইম'কে বলা হয় গত সত্তর বছরের সেরা আবিষ্কার। কারণ একাত্তর বছর আগে ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কার করেছিলেন জন ভিনসেন্ট অ্যাটানাসফ ও ক্লিফোর্ড বেরি।

সেই রূপেশ কোঠারির বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ!

আমার মুখে অভিব্যক্তিগুলো ঠিকঠাক ফোটে না। সেটাই হয়তো বর্মন লক্ষ করছিল। দেখেছি, সহকর্মীরা সবসময় আমাকে কৌতূহলের চোখে দেখে।

সন্দীপ বর্মন নির্বিকারভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আমি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বর্মনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রায় দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বললাম, 'ব্যাপারটা খোলাখুলি জানতে পারি?'

উত্তেজিত হলে আমার গলার স্বরে ধাতব ঝংকার বেড়ে যায়। অন্তত ডক্টর মজুমদারের বক্তব্য তাই। এখন গলাটা অনেকটা সেইরকম শোনাল বলেই মনে হল।

বর্মন এবারে মুখ খুলল। ওর কাছ থেকে গোটা গল্প শোনা গেল।

রূপেশ কোঠারি ও বিক্রম সেনগুপ্ত দুই নামজাদা বিজ্ঞানী, আর ছোটবেলাকার বন্ধুও বটে। পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ডক্টর কোঠারির খ্যাতি রীতিমতো ঈর্ষা করার বিষয়। আর পাশাপাশি বিক্রম সেনগুপ্ত ভারতের একজন সম্মানিত বিজ্ঞানী হলেও, আন্তর্জাতিক আসরে কখনও রূপেশ কোঠারির মর্যাদা পাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁরা দুজনে যৌথভাবে গবেষণা করেছেন, দুজনের নামে বিদেশের পত্রপত্রিকায় কয়েকটি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ওঁরা একটি চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, তবে কে এর প্রধান আবিষ্কারক, তা নিয়ে দুজনের মধ্যে বেধে গিয়েছিল ঠান্ডা লড়াই।

মনে পড়ে গেল, তিনদিন আগেই টিভি, নিউজপেপারে এই বিতর্কের খবর প্রচার করা হয়েছে এবং বিক্রম সেনগুপ্ত আবিষ্কারের সিংহভাগ দাবি করেছেন। তিনি এও বলেছেন, অধ্যাপক কোঠারির বহু গবেষণাপত্রেই তাঁর অবদান রয়েছে। সোজা কথায়, কোঠারি তাঁর গবেষণার ফল আগে একাধিকবার আত্মসাৎ করেছেন।

কিন্তু এইবারে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেননি।

'এ-ব্যাপারে রূপেশ কোঠারি কী বলছেন?' আমি জানতে চাইলাম। সন্দীপ বর্মনের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা গাড়ির ডিসপোজাল বক্সে ফেলে দিয়ে বলল, 'কী আবার বলবে, একই কথা। তিনি বলছেন, বহু ক্ষেত্রেই তিনি দয়া করে নিজের গবেষণায় বিক্রমকে ভাগ বসাতে দিয়েছেন। বিক্রম সেনগুপ্ত ব্যর্থ বিজ্ঞানী, অন্তত রূপেশ কোঠারির মতে।'

'এর মধ্যে কিডন্যাপিং এল কোত্থেকে?'

বর্মন হাসল, বলল, 'শুনলে আপনি হাসবেন। আজ রাতে ডক্টর কোঠারির বাড়িতে ডক্টর সেনগুপ্তের নেমন্তন্ন ছিল—সপরিবারে। সেনগুপ্তের স্ত্রী আলসারের রোগী, তাই নেমন্তন্নে যাননি। তবে সেনগুপ্ত তাঁর মেয়ে নিনিকে নিয়ে গিয়েছিলেন কোঠারির বাড়িতে। নিনির বয়স বছর বারো, ক্লাস সিক্সে পড়ে, লোরেটো—বউবাজারে। খাওয়াদাওয়ার শেষে নিনি নাকি ডক্টর কোঠারির ল্যাবরেটরি দেখতে চায়। বিক্রম সেনগুপ্ত তখন ড্রইংরুমে বসে কী একটা ম্যাগাজিন দেখছিলেন। রূপেশ কোঠারি নিজের বাড়িতেই বিশাল ল্যাবরেটরি করেছেন, সেটা আবার ড্রইংরুমের লাগোয়া। ফলে, বলতে গেলে একরকম সেনগুপ্তের চোখের সামনে দিয়েই নিনি আর কোঠারি ল্যাবে ঢুকেছে, কিন্তু ল্যাব থেকে ওরা কেউ বেরোয়নি। কয়েক মিনিট পরেই সেনগুপ্ত ল্যাবে গিয়ে দেখেন, সেখানে কোঠারি একা দাঁড়িয়ে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটের সামনে ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন। নিনি নেই। ভোজবাজির মতো মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!'

বুঝলাম—তারপরই হইচই, লালবাজারে টেলিফোন ইত্যাদি হয়েছে। রূপেশ কোঠারি প্রকাণ্ড মাপের বিজ্ঞানী, কিন্তু অভিযোগটাও তো নেহাত ছোট মাপের নয়।

বর্মনের কাছেই শুনলাম, ব্যাপারটা হেড কোয়ার্টারে পৌঁছয় সাড়ে আটটা নাগাদ। সঙ্গে-সঙ্গে তদন্তকারী দল হাজির হয়েছে ডক্টর কোঠারির আস্তানায়। সেই দলে বর্মনও ছিল।

ডক্টর সেনগুপ্ত কোঠারির বাড়িতেই ছিলেন। কোঠারি বিয়ে-থা করেননি। সুতরাং বাড়িতে দুজন কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। পুলিশ যতরকমভাবে সম্ভব জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ওঁদের, তবে যথারীতি কোনও লাভ হয়নি। তারপর তারা হিমশিম খেয়ে গেছে দুই বিজ্ঞানীকে নিয়ে। আমি সমস্যাটার কথা অবাক হয়ে ভাবছিলাম। বললাম, 'কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে কোঠারি কী বলছেন?'

সল্টলেকের ভেতরে ফাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি হুহু করে ছুটছিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বর্মন বলল, 'কোঠারি বলছেন, নিনি একাই ল্যাব ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আর সেনগুপ্ত বলছেন, অসম্ভব। কারণ এক মুহূর্তের

জন্যও ল্যাবের দরজা তাঁর চোখের আড়াল হয়নি। ব্যস!'

গাড়ির সেলুলার ফোন বিপ-বিপ করে বেজে উঠল। ফোন তুলে কানে দিলাম।

'রনি সরকার বলছি—।'

ওপাশ থেকে এ. সি. বিকাশ মিত্রের গলা শোনা গেল।

'সরকার, আপনারা স্পটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছেন। বর্মন আপনাকে সব কথা হয়তো বলেছে, তবে সব খবর জানাতে পারলেও একটা ব্যাপার ও বলতে পারবে না। এই কেসে হঠাৎ আপনাকেই বা ডেকে পাঠানো হল কেন? সেটাই এখন আপনাকে জানাচ্ছি—আপনার জানা দরকার।' চিফ একটু থেমে আবার বললেন, 'নিনির উধাও হওয়ার পেছনে কোনও সায়েন্টিফিক মিস্ট্রি রয়েছে বলে আমার ধারণা। কোঠারির ল্যাবের সমস্ত ডিটেইল্স আমাদের চাই। আমি জানি, আপনার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। আর আমার এই ডিপার্টমেন্টে বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ আপনার চেয়ে ভালো কেউই বোঝে না। সুতরাং, বেস্ট অফ লাক।'

লাইন কেটে গেল।

সন্দীপ বর্মন একটা কথাও শুনতে পায়নি। ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে?'

আমি বললাম, 'বসের ফোন।'

আর বারো সেকেন্ডের মধ্যেই ডক্টর রূপেশ কোঠারির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক স্থাপত্যের বিশাল বাড়িটা দেখে মনেই হয় না, এ-বাড়িতে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। নিনিকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে তো?

দোতলার আধুনিক সুসজ্জিত ড্রইংরুমে ওঁদের দুজনকে পেলাম। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে দুটো সোফায় বসে। একজনের হাতে একটা ম্যাগাজিন। অন্যজন দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির প্রতিকৃতি দেখছেন। দেখেই বোঝা যায়, দুই বিজ্ঞানীর এখনও আড়ি রয়েছে, ভাব হয়নি।

আমাদের ঢুকতে দেখেই দ্বিতীয়জন ছেঁড়া স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে। সন্দীপ বর্মনের কাছে গিয়ে বললেন, 'নিনিকে পাওয়া গেল, ইনস্পেক্টর?'

ভদ্রলোক যেরকম উদ্‌গ্রীব এবং তাঁর মুখচোখ যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত, তাতে

সন্দেহ নেই, ইনিই বিক্রম সেনগুপ্ত। পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। কপাল বেশ বড়। মাথার চুল তেলতেলে, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ বড়-বড়, বুদ্ধিদীপ্ত। ভুরু ঘন এবং টানা। মুখে বয়সের সূক্ষ্ম ভাঁজ। কথা বলেন সামান্য টেনে-টেনে।

বর্মন বেশ গম্ভীর মুখে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'ইনস্পেক্টর রনি সরকার। আপনাদের কেসটা এখন ইনিই ইনভেস্টিগেট করবেন—।'

রূপেশ কোঠারি ইতিমধ্যে হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখেছেন টেবিলে। কৌতূহলী চোখে আমাকে লক্ষ করতে-করতে উঠে এসেছেন কাছে। স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হ্যান্ডশেক করার জন্য।

সাধারণত আমি হ্যান্ডশেক ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কিন্তু এখন এড়ানো গেল না। আড়ষ্টভাবে হ্যান্ডশেক করলাম। হাতের চাপ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম একই সঙ্গে। তবুও লক্ষ করলাম, রূপেশ কোঠারির মুখে কিছুটা যন্ত্রণা ও বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

ঘরে বেশ কয়েকটা সোফা ছিল। আলাপের পালা শেষ করে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলাম সোফাগুলোয়। আমি যে-সোফাটায় বসলাম, সেটা মচমচ শব্দ করে উঠল। তবে তার বেশি কিছু হল না।

অধৈর্য বিক্রম সেনগুপ্তকে হাতের ইশারায় শান্ত হয়ে বসতে বললাম আমি। তারপর রূপেশ কোঠারিকে উদ্দেশ করে বললাম, 'প্রফেসর কোঠারি, পুরো ব্যাপারটা আপনার মুখ থেকে আর-একবার শুনব। প্লিজ, বিরক্ত হবেন না।'

কোঠারি শব্দ করে হাসলেন। ওঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। চনমনে চোখ। লম্বাটে মুখ। দাড়ি এমনভাবে কামিয়েছেন যে, এত রাতেও খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরোয়নি। সরু করে ছাঁটা গোঁফ। আর মাথার চুল প্রায় কদমছাঁট। পরনে সবুজ রঙের সরু চেক-কাটা বুশ শার্ট। সাদা টেরিকটের প্যান্টের ভেতরে গুঁজে পরেছেন।

কোঠারির গলার স্বর বেশ চমৎকার। ভদ্রলোক বিজ্ঞান না শিখে গান শিখলেও বোধহয় কেউকেটা হতে পারতেন। প্রায় ধারাবিবরণী দেওয়ার মতো করে নিনির উধাও হওয়ার ব্যাপারটা বলে গেলেন তিনি। ওঁর কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকেই বিক্রম সেনগুপ্ত উত্তেজিত হয়ে বাধা দিয়ে উঠছিলেন, বর্মন কোনওরকমে তাঁকে নিরস্ত করে রাখল।

শুনছিলাম, আর বারো বছরের নিনির কথা ভাবছিলাম। মেয়েটা গেল কোথায়?

রূপেশ কোঠারির গল্পে নতুন আর কিছু পাওয়া গেল না। সুতরাং, বর্মনকে

বিক্রম সেনগুপ্তের কাছে বসতে বলে ডক্টর কোঠারিকে নিয়ে এগোলাম ল্যাবরেটরির দিকে। বললাম, 'চলুন প্রফেসর কোঠারি, আপনার ল্যাবরেটরিটা একবার দেখব—।'

প্রফেসর কোঠারি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যার অর্থ হল, 'ল্যাবরেটরি দেখে আপনি কি কিছু বুঝবেন?'

আমি ওঁর তাকানোয় আমল দিলাম না। কোঠারি জানেন না, আমি ঘুরে-ঘুরে ওঁর ল্যাবরেটরি দেখা মানেই ল্যাবরেটরির প্রতিটি ইঞ্চি ধরা পড়ে যাবে আমার অপ্টো-ইলেকট্রনিক চোখে এবং রেকর্ড হয়ে যাবে ভিডিয়ো টেপে।

বর্মন আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কিছু একটা বলতে চাইল। আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কিছু বলবেন?'

ও তখনও ইতস্তত করছে দেখে বুঝলাম, দুই বিজ্ঞানী হাজির থাকায় ও ঠিক মুখ খুলতে পারছে না। আমি ঠোঁট টেনে হাসার চেষ্টা করে বললাম, 'জোরে বলার দরকার নেই, শুধু ঠোঁট নাড়লেই আমি বুঝতে পারব—।'

বর্মনের বোধহয় খেয়াল নেই, আমি লিপ রিড করতে পারি। আমার কথায় ওর খেয়াল হল। শুধু ঠোঁট নেড়ে ও বলল, 'আমরা ল্যাবরেটরি তন্নতন্ন করে দেখেছি, ওখানে কিছু নেই। তা ছাড়া, প্রত্যেকটা জানলায় শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো—।'

আমি হাত নেড়ে ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ঠিক আছে—।'

তারপর কোঠারির সঙ্গে ঢুকে গেলাম ল্যাবরেটরিতে।

ল্যাবরেটরি আমি আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডক্টর কোঠারির ল্যাব আমাকে চমকে দিল।

বিশাল মাপের ঘরে প্রচুর যন্ত্রপাতি। তার কোনও কোনওটার চেহারা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনই কিম্ভূত। চেনা যন্ত্রের মধ্যে একটা পার্টিক্‌ল অ্যাকসিলারেটর আর একটা এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন স্পেক্‌ট্রোমিটার চোখে পড়ল।

রূপেশ কোঠারির খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। সুতরাং ওঁকে ল্যাবরেটরি তৈরির টাকা দেওয়ার সংস্থার অভাব নেই। তা ছাড়া, বহু বিদেশি যন্ত্রপাতি তিনি স্রেফ উপহার হিসেবে পেয়েছেন।

আমি ল্যাবরেটরি দেখছিলাম আর মনে-মনে এ-পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের লজিকগুলো যাচাই করে দেখছিলাম। কোথায় গেল নিনি?

একটা বারো বছরের মেয়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলে চিন্তার ব্যাপার। আর এক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাপারটা হয়েছে রূপেশ কোঠারির বাড়িতে, সেহেতু তাঁর দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত আরও বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় তাঁকে যেন বেশ নিশ্চিন্তই দেখাচ্ছে। হাসিখুশি, খোশমেজাজি। বরং বিক্রম সেনগুপ্তের হাবভাব

অনেক স্বাভাবিক। ওইরকম একটা মেয়ে হারিয়ে গেলে যেরকম দুঃখ পাওয়ার কথা, যেরকম উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার কথা, ওঁকে দেখে ঠিক সেইরকম মনে হয়েছে। মেয়ে হারানোর কষ্ট বড় সাংঘাতিক। আমি জানি। আমারও একটা মেয়ে ছিল। কতই বা বয়স ছিল? সাত? আট? ঠিক মনে পড়ছে না।

রূপেশ কোঠারির কথায় সংবিৎ ফিরল। কোঠারি তখন বলছিলেন, 'মিস্টার সরকার, বলুন, আমার ল্যাবের কী-কী দেখতে চান আপনি?'

একপাশের একটা টেবিলে নানান কাগজপত্রের স্তূপ পড়ে ছিল। আমি সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললাম, 'প্রফেসর কোঠারি, ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে আপনার কী ঝামেলা আছে জানি না, তবে এটা বলতে পারি, একটা ছোট মেয়ে বোধহয় কোনও দোষ করেনি—। বেচারা কৌতূহলের বশে শুধুই আপনার ল্যাব দেখতে চেয়েছিল।'

প্রফেসর কোঠারি বেশ বিরক্তভাবে বললেন, 'ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় অন্যদের তুলনায় বেশি ইনটেলিজেন্ট। এখন দেখছি, আমারই ভুল। কম করে হাজারবার আমি বলেছি যে, নিনির ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না। ল্যাব দেখতে-দেখতে ও হঠাৎই এ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছে। তারপর কোথায় গেছে, সে আমি কী করে বলব!'

আমি টেবিলের কাছে গিয়ে কয়েকটা কাগজ উলটেপালটে দেখলাম। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনার ল্যাবের যন্ত্রগুলোর বিষয়ে আমাকে একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলুন—যদি আপনার কোনওরকম আপত্তি না থাকে।'

'না, না, আপত্তির কী আছে?' রূপেশ কোঠারি দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তবে, সবই কমপ্লিকেটেড অ্যাপারেটাস, কতটা সহজ করে বোঝাতে পারব জানি না—।'

শেষদিকে ওঁর কথার মধ্যে একটা অবজ্ঞার সুর ধরা পড়ল। আমি সেটা গায়ে মাখলাম না। কারণ আমার শরীরে লুকিয়ে রাখা অটো-রেকর্ডার শুরু থেকেই চালু হয়ে গেছে। যাবতীয় শব্দ ধরা পড়েছে সেই নিখুঁত যন্ত্রে। পরে সেই যন্ত্র প্লে-ব্যাক করে শোনা হবে বারবার। তারপর বিশেষজ্ঞরা তার চুলচেরা বিচার করবেন। সুতরাং যন্ত্রগুলোর বিবরণ বা কার্যপ্রণালী আমি না বুঝলেও কোনও ক্ষতি নেই। তবে বোঝার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

ডক্টর কোঠারি বলতে শুরু করলেন। যন্ত্রগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর কথার মধ্যে নানান জটিল শব্দ উঁকি মারতে শুরু করল : স্পেস-টাইম কার্ভেচার, ট্যাকিয়ন অ্যাকসিলারেটর, এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন, রিলেটিভ রিলেটিভিটি, অ্যান্টিগ্র্যাভিটেশন, ফিফ্‌থ ফোর্স এস্টিমেশন ইত্যাদি।

এইসব কথার ফাঁকে আমি টেবিলের কাগজপত্রগুলোই ঘাঁটছিলাম। যদি

কোনওকিছুর হদিশ পাওয়া যায়! এর মধ্যে হঠাৎই বিক্রম সেনগুপ্ত ক্ষিপ্তভাবে ছিটকে এলেন ঘরের মধ্যে। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ইনস্পেক্টর সরকার, এভাবে আপনি ওর কাছ থেকে কোনও কথা বের করতে পারবেন না। ও বড় শক্ত চিজ—।'

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপ বর্মন এসে ঘরে ঢুকল। ও হাই তুলতেই তাকালাম হাতঘড়ির দিকে। রাত হয়েছে। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

বর্মন তাড়াতাড়ি এসে প্রফেসর সেনগুপ্তের হাত ধরল, বলল, 'প্লিজ প্রফেসর, ও-ঘরে চলুন। এরকম করলে ইনভেস্টিগেশনে অসুবিধে হবে—।'

প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দুজনের। তখন আমি বর্মনকে ইশারায় থামতে বললাম। ডক্টর সেনগুপ্তের সাফারি স্যুটে ভাঁজ পড়েছে, মাথার পরিপাটি চুল আর ততটা পরিপাটি নেই।

রূপেশ কোঠারি একটি যন্ত্রের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত নেড়ে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়লেন চেক শার্ট থেকে। লম্বাটে মুখে সামান্য যেন মজার ছোঁয়া।

আমি বিক্রম সেনগুপ্তকে কাছে ডাকলাম। গলা নামিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ড্রইংরুমে বসে আপনি এমন কিছুই শুনতে পাননি, যাতে ব্যাপারটার একটা আঁচ পাওয়া যায়! ভালোভাবে মনে করে দেখুন তো!'

ডক্টর সেনগুপ্ত মাথার চুল ঠিকঠাক করতে-করতে বললেন, 'মনে করে নতুন কী আর বলব! সবই তো বলেছি—' অসহায় চোখে বর্মনের দিকে তাকালেন তিনি।

আমার মাথার ভেতরে বিভিন্ন লজিক কাটাকুটি খেলছিল। রূপেশ কোঠারির চোখেমুখে সামান্য তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপ—এইসব আরও উত্তেজিত করে তুলেছে বিক্রম সেনগুপ্তকে।

আমি ওঁকে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, প্রফেসর কোঠারি নিনির সঙ্গে কী কথা বলছিলেন? আপনি শুনতে পাননি কিছু?'

সেনগুপ্ত বললেন, 'পাব না কেন? পুলিশকে সেসব বলেওছি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'নেহাতই মামুলি ছেলেমানুষি কথা।'

আমি বর্মনকে বললাম, 'মিস্টার বর্মন, আপনি প্রফেসর কোঠারিকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আমরা একটু নিরিবিলি কথা বলব।'

সন্দীপ বর্মন ঠোঁট উলটে এমন একটা মুখের ভাব করল, যার অর্থ ঃ হুজুরের যা মর্জি।

ওরা চলে যাওয়ার পর সেনগুপ্তকে বললাম, 'প্রফেসর, আপনার সেই মামুলি ছেলেমানুষি কথাগুলো এবারে আর-একবার বলুন, প্লিজ—।'

একটু সময় নিয়ে বিক্রম সেনগুপ্ত বোধহয় মনে-মনে গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'এই একবার শুনলাম নিনি বলছে, বাব্বাঃ, ঘরটা কত বড়! এতসব যন্ত্র দিয়ে কী হয়? উত্তরে রূপেশ বলল, বিজ্ঞানের নানারকম গবেষণার কাজ হয়। তারপর আরও কী কী বলেছিল, ভালো করে খেয়াল করিনি। আবার একসময় নিনির কথা কানে এল ঃ কাকু, একটাও খেলার যন্ত্র নেই? তাতে রূপেশ বলল, আছে, এই তো—লুকোচুরি খেলার যন্ত্র। নিনি বলল, কই, দেখি—। তারপর আর কোনও কথা শুনতে পাইনি।'

আমি বললাম, 'নিনিকে আপনি খুব ভালোবাসতেন?'

অবাক মারমুখী নজরে আমাকে দেখলেন ডক্টর সেনগুপ্ত। প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'ভালোবাসতেন? তার মানে? এখনও ভালোবাসি, ইন্সপেক্টর। ওকে আপনি যে করে হোক খুঁজে এনে দিন—প্লিজ...।'

শেষদিকে ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। গলার স্বর ভেঙে গেল। হাত ঘষলেন চোখে।

আমার কষ্ট হচ্ছিল। শরীরের ভেতরে লজিক সার্কিটগুলো ঠিকঠাক কাজ করছিল। মনে হল, বিক্রম সেনগুপ্ত বড় অসহায়। নিনি অন্তর্ধান রহস্যের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ডক্টর রূপেশ কোঠারির আস্তিনের ভেতরে। কোঠারি পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারেন, কিন্তু পিতৃস্নেহ সম্পর্কে ওঁর জ্ঞান স্রেফ শূন্য।

ডক্টর সেনগুপ্তকে বললাম, 'আপনি ড্রইংরুমে গিয়ে বিশ্রাম নিন—।'

বিক্রম সেনগুপ্ত চলে যেতেই ঘরে আমি একা, আর শুধু কতকগুলো জটিল যন্ত্র। এর মধ্যে সত্যিই কি কোনও লুকোচুরি খেলার যন্ত্র রয়েছে?

যন্ত্রগুলো একে-একে দেখতে-দেখতে আবার ফিরে গেলাম টেবিলের কাছে। কাগজপত্রগুলো দেখতে শুরু করলাম আবার।

খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎই একটা কাগজে নজর আটকে গেল আমার। সাদা কাগজে কালি দিয়ে চৌকোনা ঘর আঁকা রয়েছে একটা। সেই ঘরের ভেতরে কিছুটা দূরত্বে আঁকা রয়েছে দুটো বিন্দু। বিন্দু দুটোর মাঝামাঝি বরাবর একটা ভাঁজের দাগ রয়েছে। তা ছাড়া, ঘরের ছবিটার বাইরে ছোট মাপের কয়েকটা জ্যামিতিক ছবিও আঁকা রয়েছে।

কেন জানি না, ছবিটা দেখামাত্রই একটা বিদ্যুৎরেখা যেন ঝলসে উঠল মাথার ভেতরে। কাগজটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ল্যাবের বাইরে। ড্রইংরুমের দরজায় উঁকি মেরে রূপেশ কোঠারিকে ডেকে নিলাম।

কোঠারি বেশ হাসিখুশি মেজাজে চটপটে পায়ে উঠে এলেন আমার কাছে। গালে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, 'অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ইনস্পেক্টর—।'

আমি ওঁকে নিয়ে ল্যাবের প্রায় মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'প্রফেসর কোঠারি, আমি আপনার লুকোচুরি খেলার যন্ত্রটা দেখতে চাই—।'

টের পেলাম, কথাগুলো বলার সময় আমার গলায় ধাতব ঝংকার বেশ প্রকট হল।

আমার কথায় রূপেশ কোঠারি যেন খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। মুখের হাসিখুশি ভাবের ওপরে চকিতে একটা মলিন ছায়া নেমে এল। একটু সময় নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'লুকোচুরি খেলার যন্ত্র? তার মানে?'

এইবার আমি ওঁর বাঁ-হাতটা চেপে ধরলাম। ওঁর গায়ের জোরকে সরাসরি উপেক্ষা করে ওঁকে ঠেলে বসিয়ে দিলাম ফোমের গদিওয়ালা একটা সুদৃশ্য টুলের ওপরে। বললাম, 'ডক্টর কোঠারি, আপনার নাম দুনিয়া-জোড়া। সামনের বছরে নোবেল প্রাইজও পেতে পারেন। কিন্তু নিনিকে ফিরিয়ে না দিলে কি কাউকে মুখ দেখাতে পারবেন?'

কথা শেষ করে আমি ওঁকে হাতের ভাঁজ-করা কাগজটা দেখালাম। বললাম, 'আপনার মতো একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপার বলে ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারটা জানাজানি হলে সবাই হয়তো বিক্রম সেনগুপ্তের অভিযোগগুলোই সত্যি বলে ধরে নেবে। ডক্টর সেনগুপ্তের বহু রিসার্চের ফল আপনি স্রেফ হজম করে নিজের নামে ছাপিয়েছেন, জালিয়াতি করে নাম কিনেছেন বিজ্ঞানীদের জগতে।'

রূপেশ কোঠারির মুখ ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছিল। হাসির রেশটুকুও সেখানে আর নেই। এখন শুধু রাগ থমথম করছে। ডানহাত দিয়ে বাঁ-হাতের একটা জায়গা ম্যাসাজ করছিলেন। ওই জায়গাটাই একটু আগে আমি চেপে ধরেছিলাম।

রূপেশ কোঠারি ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন টুল ছেড়ে। হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'না ইনস্পেক্টর, রূপেশ কোঠারি আজ পর্যন্ত কোনওদিনও কারও রিসার্চে ফাঁকি দিয়ে ভাগ বসায়নি! আপনি জানেন, বিক্রমের জন্য আমি কী না করেছি! আর ও কিনা টিভি নিউজে আমার নামে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে!'

কথা বলতে-বলতে কোঠারি চলে গেলেন একটা দেওয়াল আলমারির কাছে। এক হ্যাঁচকায় তার পাল্লা খুলে একটা মোটা ফাইল বের করে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার বায়োডেটা। মাধ্যমিক থেকে সব রেজাল্টই রয়েছে। কখনও সেকেন্ড হইনি। আর রিসার্চ পেপারের লিস্টটাও দেখুন।'

আমি ফাইলটা নিয়ে খুলে দেখলাম। সত্যিই, ভদ্রলোক অদ্বিতীয়। ওঁর সব গবেষণাপত্রই ছাপা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নামী জার্নালগুলোতে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে কোঠারি বললেন, 'বিক্রমের জন্য আমি অনেক করেছি। কিন্তু হিংসেয় ওর এখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই আমার নামে যাচ্ছেতাই

কাদা ছেটাচ্ছে—।'

আমি ফাইলটা রেখে দিলাম টুলের ওপরে। বললাম, 'আর তাইতেই আপনার মতো লোকেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

রূপেশ কোঠারি ফাইলটার ওপরেই ধপ করে বসে পড়লেন। মাথা ঝুঁকিয়ে দু-ভুরুর মাঝের অংশটা চেপে ধরলেন বাঁ-হাতে। মাথা নাড়লেন বারকয়েক। একটা চাপা শব্দও বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

যখন মুখ তুললেন, তখন একেবারে ভাঙাচোরা মানুষ। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন 'স্পেস-টাইম কার্ভেচার' যন্ত্রটির দিকে। ভাঙা গলায় বললেন, 'এটাই সেই লুকোচুরি খেলার যন্ত্র। নিনি এই ঘরেই আছে, অথচ আবার নেই। এই ঘরের স্পেসে একটা ভাঁজ তৈরি করে ওকে আমি লুকিয়ে ফেলেছি। রাগের মাথায় হঠাৎ যে কী হয়ে গেল...।'

কী বলতে-বলতে যন্ত্র চালু করে দিলেন তিনি। যন্ত্রের কয়েকটা বাতি জ্বলে উঠল। অসংখ্য ডিজিটাল মিটারে রিডিং পালটাতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি। আমার শরীরের কয়েকটা সেন্সর সার্কিট হঠাৎই যেন একটা ঝটকা খেল। আর তারপরই...।

ল্যাবরেটরির মেঝেতে আবির্ভূত হল নিনি। পরনে কচি কলাপাতা রঙের সুন্দর কুচি-দেওয়া ফ্রক, তাতে সোনালি জরির কাজ। মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে অঘোরে।

আমি আচমকাই ওর নাম ধরে ডেকে উঠলাম, 'নিনি!'

হঠাৎই মনে পড়ল, আমার মেয়ের নাম ছিল টুসি। নিনির মতোই মিষ্টি নাম। মিষ্টি মেয়ে। নামটা আলতো করে উচ্চারণ করলাম, যাতে রেকর্ড হয়ে যায়। এটা শুনলে অভিজিৎ মজুমদার খুশি হবেন।

বোধহয় আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন বিক্রম সেনগুপ্ত। তিনি প্রায় ছুটেই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। নিনিকে দেখে পাগলের মতো মেয়ের নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল, চারঘণ্টা নয়, চার যুগ পরে বিক্রম সেনগুপ্ত মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন। ওঁদের দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। আমার চোখে হয়তো জল আসত, কিন্তু এল না। কারণ, আমার শরীরে ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ডগুলো বসানো হয়নি। অভিজিৎ মজুমদার এখনও বসাতে দেননি। ওগুলো না থাকলে চোখের জল তৈরি হয় না।

নিনির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওর চোখ ফোলা। হয়তো কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠেই ও 'বাপি' বলে ডেকে উঠল। জড়িয়ে ধরল বাবাকে।

ডক্টর সেনগুপ্তের পিছন-পিছন ঘরে ঢুকেছিল সন্দীপ বর্মন। আচমকা

নিনিকে দেখে ও কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'ইনস্পেক্টর সরকার, কী ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'পরে বলছি—।'

রূপেশ কোঠারি ইতিমধ্যে বন্ধুর কাছে চলে এসেছেন। নিনির মাথায় আদর করে চুমু খেলেন একটা।

বিক্রম সেনগুপ্ত মেয়েকে কোল থেকে নামাতেই কোঠারি 'বিক্রম!' বলে বন্ধুকে একেবারে বুকে জাপটে ধরলেন। বললেন, 'আমার মাথার মধ্যে একটা অমানুষ ঢুকে পড়েছিল। আমাকে ক্ষমা করে দাও—।'

কোঠারির কণ্ঠস্বরে বেদনা ছিল। চোখ চিকচিক করছে। ওঁর অনুশোচনা মিথ্যে নয়। ডক্টর সেনগুপ্ত কোঠারির ডাকে সাড়া দিলেন। বললেন, 'নিনিকে ফিরে পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। তোমার ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। শুধু তুমি নও, ভুল আমিও করেছি। তোমার মতো বন্ধুকে হিংসে করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। গবেষণার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই চলে না।'

এবারে আমার আর বর্মনের বিদায়ের পালা।

বিক্রম সেনগুপ্ত তাঁর সমস্ত অভিযোগ ফিরিয়ে নিলেন।

নিনি বলল, 'বাপি, বাড়ি চলো, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

সন্দীপ বর্মন আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আমারও ইনস্পেক্টর সরকার। চলুন, এবারে যাওয়া যাক—।'

আমরা বেরিয়ে এলাম রূপেশ কোঠারির বাড়ি ছেড়ে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলাম। টেলিফোন করে হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিলাম, কাজ শেষ। নিনিকে পাওয়া গেছে, আর ডক্টর সেনগুপ্ত সব অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

সন্দীপ বর্মন একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'বসকে বলবেন না।' তারপর ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে হাই তুলল একটা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল আমাদের। বর্মন বোধহয় বুঝল, আমি নিজে থেকে মুখ খুলব না। তখন বাঁকা সুরে জিগ্যেস করল, 'নিনিকে কী করে পাওয়া গেল, সেটা জানতে পারি কি?'

আমার হাসি পেল। কয়েক ঘণ্টা আগে রূপেশ কোঠারির বাড়ি যাওয়ার পথে বর্মন আমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখতে চেয়েছিল। এখন দান উলটে গেছে।

কোঠারির ল্যাব থেকে পাওয়া চৌকোণা ঘর-আঁকা কাগজটা আমার কাছেই ছিল। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ অটোপাইলটের ওপরে ছেড়ে দিয়ে কাগজটা সমান করে পেতে নিলাম কোলের ওপরে। তারপর ড্যাশ-বোর্ডের খুদে ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে বর্মনকে বললাম, 'এটা ভালো করে দেখুন—।'

সন্দীপ বর্মন ছবিটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

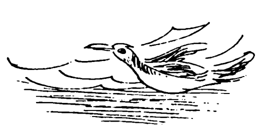
আমি বলতে শুরু করলাম, 'এই চৌকোনা ঘরটা একটা টু ডাইমেনশান ওয়ার্ল্ড—দ্বিমাত্রিক জগৎ। তার মধ্যে এই ফুটকি দুটো হচ্ছে, ধরে নিন, দ্বিমাত্রিক জগতের দুটি প্রাণী। এরা কাগজের গায়ে লেপটে ঘুরে বেড়ায় এই চৌকোনো ঘরে চৌহদ্দির মধ্যে। চৌহদ্দির লাইনগুলোই হচ্ছে ওদের কাছে দেওয়াল। কিন্তু আপনি বা আমি হচ্ছি ত্রিমাত্রিক জগতের জীব। আমরা যে কেউই ইচ্ছেমতো একটা দ্বিমাত্রিক প্রাণীকে তুলে নিয়ে আসতে পারি আমাদের জগতে। তার জন্যে ওদের দেওয়াল টপকানোর দরকার নেই—স্রেফ ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেই হল। সুতরাং দ্বিমাত্রিক জগতের প্রাণীকে কোনও ঘর থেকে দেওয়াল না ভেঙে কিডন্যাপ করতে গেলে ত্রিমাত্রিক জগতের তৃতীয় মাত্রা বা থার্ড ডাইমেনশনের দিক থেকে এগোতে হবে। এ ছাড়া, আর একভাবে ব্যাপারটা হতে পারে...।'

বর্মন সিগারেটে টান দিচ্ছিল ঘন-ঘন। কাগজটা একমনে দেখছিল। আমার কথার খেই ধরে বলে উঠল, 'কাগজটা ভাঁজ করে?'

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। মুখের পেশিতে টান লাগল। বললাম, 'ঠিক তাই। এই দুটো ফুটকির মাঝ-বরাবর কাগজটা ভাঁজ করে দিলে একটা ফুটকি আর একটা ফুটকিকে সরাসরি দেখতে পাবে না। কিন্তু এই ভাঁজটা করতে হবে ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে দিয়ে। কারণ, তখন কাগজটা আর নিছক দ্বিমাত্রিক সমতল থাকছে না—ভাঁজ হয়ে গেছে। রূপেশ কোঠারি ঠিক একইভাবে ওঁর ল্যাবের স্পেসে একটা ভাঁজ তৈরি করে ফেলেছিলেন—ওই 'স্পেস-টাইম কার্ভেচার' মেশিন দিয়ে। ন্যাচারালি, ভাঁজটা করতে হয়েছে ফোর্থ ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে দিয়ে। আর স্পেস-টাইম নিয়ে ওঁর গবেষণা তো বলতে গেলে ওয়ার্ল্ড ফেমাস—।'

নির্জন অন্ধকার পথ ধরে গাড়ি ছুটছিল। বর্মনের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ও বলল, 'সরকার, নিনি মেয়েটা বেশ লাকি। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও, ওই যে ফোর্থ ডাইমেনশনাল স্পেস না কী বললেন, ওখান থেকে দিব্যি বেড়িয়ে এল—।'

আমি নিনির কথা ভাবলাম। তারপরই মনে পড়ল টুসির কথা। টুসি এখন কোথায়! ওর মিষ্টি মুখটা যে এখনও আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।





পাশের বাড়ির বন্ধু

একদিন ভোরবেলা জানলা দিয়ে নজর পড়তেই পাপু অবাক হয়ে গেল। পাশের বাড়িটায় লোকজন এসেছে। এতদিন ধরে বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল। অনেকটা পোড়ো বাড়ির মতো। আর চেহারাটাও ভারী অদ্ভুত। প্রায় পাঁচতলা উঁচু গির্জার মতো। ছুঁচোলো মাথাটা সোজা আকাশমুখো উঠে গেছে।

কিন্তু চেহারায় বড়সড়ো হলে হবে কী, বাড়িটার চারদিক আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে। সারা গায়ের পলেস্তারা খসে গেছে। জানলাগুলোর হালও সেইরকম। রাত্তিরে দেখলে গা-ছমছম করে পাপুর। অন্ধকারে কালো কুচকুচে দেখায় বাড়িটা। একটা তালঢ্যাঙা ভূত যেন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনেরবেলা দেখলে অবশ্য অতটা ভয় করে না। তবে স্কুলে যাওয়ার পথে পাপু রোজই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। চারপাশে মরচে-ধরা লোহার রেলিং। বিশাল লোহার গেট। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাড়িটার ভারী সদর-দরজা-বন্ধ। আর নীচের দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে আগাছায়।

বাড়িটা যে কবে কে তৈরি করেছে তা কেউ জানে না, বাবাও না। পাপু বাবাকে জিগ্যেস করেছিল। তাতে বাবা বলেছেন, 'এদিকে সবই তো নতুন ফ্যাক্টরি কোয়ার্টার। কী করে একটা পোড়ো বাড়ি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে জানে! হবে হয়তো কোনও সাহেবসুবোর ফেলে-যাওয়া বাড়ি।'

উত্তরটা পাপুর মনে ধরেছিল। কারণ সত্যিই এ-অঞ্চলের প্রায় সব বাড়িই নতুন। বছর দশেক হল কয়েকটা বড়-বড় কলকারখানা চালু হওয়ায় নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। হয়েছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, দোকানপাট সবকিছু, অথচ একইসঙ্গে রয়েছে সবুজ মাঠ, ফুলের বাগান, গাছপালা। আর তারই মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর ছোট-ছোট নতুন বাড়ি। ব্যতিক্রম শুধু আগাছায় ভরা ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল পোড়ো বাড়িটা।

সেই বাড়িতেই নতুন লোক এসেছে।

পাপু তাড়াতাড়ি বাবাকে ডেকে নিয়ে এল জানলার কাছে। বলল, ‘ওই বাড়িটায় নতুন লোক এসেছে, বাবা।’

বাবা ফ্যাক্টরিতে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। পাপুর কথায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, ‘না, দেখতে পাচ্ছি না। যাকগে, পরে নিশ্চয়ই আলাপ হয়ে যাবে।’

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর মাকে ধরে নিয়ে এল পাপু। বলল, ‘মা, ওই দেখো! ও-বাড়িটায় লোক এসেছে।’

মা ভালো করে তাকিয়ে রইলেন পোড়ো বাড়িটার ভাঙা জানলার দিকে। কিন্তু না, কোনও মানুষজনই নজরে পড়ল না। তখন মা বললেন, ‘ঠিক আছে, এখন রান্না বসাই গিয়ে, পরে আবার দেখব। তুমি পড়তে বোসো। এখন দেরি করলে পরে আবার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।’

মা চলে গেলেন। পাপু বুঝল, মা কিংবা বাবা, দুজনের কেউই ওর কথাকে বিশেষ আমল দেননি। নেহাতই কথার পিঠে দুটো কথা বলে চলে গেছেন। পাপুর একটু রাগও হল। বড়রা সবসময়েই এইরকম। ছোটদের গ্রাহ্যই করতে চান না। পাপু বই নিয়ে পড়তে বসল বটে, কিন্তু ওর চোখ বারবারই ছুটে যেতে লাগল ওই পোড়ো বাড়ির জানলাগুলোর দিকে। এতদিনের পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়িটা হঠাৎই কারা ভাড়া নিল, নাকি কিনে নিল? পাপুর বেশ অবাক লাগছিল। স্কুলে রওনা হওয়ার ঠিক আগেই আশ্চর্য ঘটনাটা ওর চোখে পড়ল।

যে-জানলা দিয়ে পাপু নজর রাখছিল, তার কিছুটা অংশ একটা নিম গাছের ডালপালা-পাতায় ঢাকা। তা ছাড়া, পোড়ো বাড়িটার তেতলার জানলাটা খুব একটা যে কাছে তাও নয়। কিন্তু তবুও পাপুর দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

তেতলার জানলা দিয়ে একটা ছোট বাক্সমতো কী যেন পড়ে গেল নীচের আগাছার জঙ্গলে। আর তার ঠিক পরেই একজন লোক গরাদ-ভাঙা জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল। নীচে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কীসব দেখল। আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ‘স্পাইডারম্যান’ কমিকস-এর পিটার পার্কারের মতো পোড়ো বাড়িটার দেওয়াল বেয়ে তরতর করে হেঁটে নেমে এল নীচে। বাক্সটা খুঁজে নিয়ে আবার একইভাবে তেতলায় উঠে জানলা

দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

বলতে গেলে পাপুর দম আটকে আসছিল। ও একছুটে গিয়ে 'স্পাইডারম্যান' কমিকস-এর পাতা খুলে বসল। পিটার পার্কারের ছবিটা একদৃষ্টে দেখতে লাগল। তা হলে কি পাশের বাড়িতে কোনও মাকড়সা-পরিবার এসে উঠেছে? পার্কারের গল্প তা হলে গল্প নয়! পাপু ভাবল মাকে ডেকে এক্ষুনি এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মাকে বলে লাভ নেই, মা পাপুর কথা একটুও বিশ্বাস করবেন না। বলবেন, 'ও তোমার চোখের ভুল। আর রাজ্যের গল্পের বই পড়ার নেশাটা একটু কমাও তো!'

সুতরাং এই দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার কথা অতিকষ্টে বুকে চেপে পাপু স্কুলে চলে গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আর গোপন রাখতে পারল না। প্রাণের বন্ধু বিজনকে সব খুলে বলল ও। বিজন কাছাকাছিই একটা কোয়ার্টারে থাকে। রোজ বিকেলে আরও সব বন্ধুবান্ধব মিলে ওরা পাপুদের বাড়ির কাছে মাঠে খেলা করে। বিজন বলল, 'চল, বিকেলে খেলার সময় বাড়িটার দিকে নজর রাখব।'

যে কথা, সেই কাজ।

বিকেলে খেলতে বেরিয়ে পাপু, বিজন, আর ওদের অন্য বন্ধুরা বাড়িটার দিকে নজর রাখতে লাগল। চট করে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না বাড়িটায় কেউ আছে। খেলাধুলো ছেড়ে যখন ওরা গোয়েন্দাগিরিতে নামবে বলে মতলব আঁটছে, ঠিক তখনই বাড়ির দরজাটা খুলে গেল।

আর বেরিয়ে এল ওদেরই বয়েসি একটি ছেলে। ফুটফুটে, হাসিখুশি মুখ।

বড় লোহার গেটটা খুলে সে সোজা এগিয়ে এল পাপুদের কাছে। বলল, 'আমার নাম টনি। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব। তোমাদের নাম কী?'

পাপু, বিজন, সবাই যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তোতলানো স্বরে আলাপ সেরে নিল নতুন বন্ধুর সঙ্গে।

কথায়-কথায় জানা গেল, টনিরা আজ খুব ভোরে এসেছে। এ-বাড়িটা ওদেরই ছিল। তবে এদিকে আসা হয়নি। হঠাৎ দরকার পড়ায় বাবা-মা-টনি হঠাৎ করে চলে এসেছে।

তখনও বেশ দিনের আলো ছিল। ওরা দল করে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলতে লাগল।

খেলা শুরু হলেও পাপুর বারবার সকালের ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। দেওয়াল বেয়ে নেমে-আসা ওই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই টনির বাবা। টনিকে জিগ্যেস করবে সে কথা? নাকি...।

পাপু একপাশে বসে স্কোর লিখছিল আর এলোমেলো ভাবছিল। এখন টনি ব্যাট করছে, বিজন বল করছে। অন্য প্রান্তে রয়েছে ওদেরই আর-এক বন্ধু তাতান।

কেউ একজন আউট হলেই পাপু নামবে ব্যাট হাতে। কিন্তু হঠাৎই টনি বলটাকে ওপরের দিকে মারল। মারতে গিয়ে খুব যে একটা জোর খাটিয়েছে, তা মনে হল না। কিন্তু বলটা সেই যে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেল আর নীচে পড়ল না।

টনি মুখে অপরাধী ভাব ফুটিয়ে বলল, 'কিছু মনে কোরো না। মারটা একটু জোরে হয়ে গেছে।'

বিজন অবাক হয়ে একবার আকাশের দিকে, আর একবার টনির দিকে দেখতে লাগল। ঘটনাটা ওদের বন্ধুরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাঝপথে খেলা পণ্ড। সুতরাং ওরা গল্প করতে-করতে যে-যার বাড়ির দিকে চলল। পাপু টনিকে বলল, 'আমি পাশের বাড়িতেই থাকি।'

টনি সেটা শুনে বলল, 'আমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এসো। মা-বাবা তোমাকে দেখলে ভীষণ খুশি হবে। কাল আসবে নাকি?'

পাপু বলল, 'ঠিক আছে। মা যদি বারণ না করে তা হলে আসব।'

ওদের বাড়িটা সম্পর্কে পাপুর ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। কৌতূহল হচ্ছিল টনি আর তার বাবা-মা সম্পর্কেও।

টনি হাত নেড়ে লোহার গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর...পাপু স্পষ্ট দেখল, মরচে-ধরা লোহার গেটটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। অথচ টনি একটিবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। ও তখন সদরদরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকছে।

সদরদরজাটাও একইভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

যদিও তখন সন্ধের আঁধার নেমে আসছে, তবুও পাপুর যে দেখতে এতটুকু ভুল হয়নি তা ও হলফ করে বলতে পারে।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ও আবার দেখল, টনিদের বাড়িটার সবক'টা জানলায় একসঙ্গে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। আলোগুলোর রং কেমন যেন অদ্ভুত। এরকম আলো পাপু আগে কখনও দেখেনি। তা ছাড়া, ওই পোড়ো বাড়িতে এত আলোর ব্যবস্থা ছিল!

পাপু ঠিক করল, বিশ্বাস করুক আর না করুক, আজ ও মা-বাবাকে সব খুলে বলবে। আর কাল বিকেলে ও টনিদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে।

অদ্ভুত সব চিন্তা মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাওয়ার দরুন পড়াশোনায় ঠিকমতো মন বসল না পাপুর। শেষে রাতে খাওয়ার সময় ও মাকে আর বাবাকে টনিদের কথা বলল। কোনও কথাই বাদ দিল না।

ওর কথা শুনে বাবা তো গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। 'এসব তোমার কমিকস পড়ার ফল। ভালো করে রাত্তিরে ঘুমোও, দেখবে কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

পাপু বলল, 'না বাবা, সব সত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস

করো।'

তখন মা বললেন, 'ঠিক আছে, কাল বিকেলে তোমাকে নিয়ে আমরা টনিদের বাড়িতে বেড়াতে যাব। তোমার বাবাও যাবে আলাপ করতে। দেখবে, তখন তোমার ভুল ভেঙে যাবে।'

পাপু আর কী করে, চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ওর মনে হল, ওইসব উদ্ভট ব্যাপারগুলো ঠিক-ঠিক ও দেখেছিল তো! নাকি...।

সে-রাতে পাপু স্পাইডারম্যান কমিকস-এর পিটার পার্কারকে স্বপ্ন দেখল।

পরদিন সকালে উঠে শুধু পাপু নয়, মা-বাবাও একেবারে তাজ্জব। ভেলকিবাজি, ভানুমতীর খেল, নাকি ময়দানবের কীর্তি? সবাই দু-চোখ কচলে বারবার দেখতে লাগল আশ্চর্য ঘটনাটা।

টনিদের বাড়িটা সূর্যের আলোয় যেন ঝকঝক করছে। কোনওদিন যে সেটা পোড়ো বাড়ি ছিল সেটা বিশ্বাস করাই এখন মুশকিল।

পাপু মা-বাবার গোল-গোল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, এখন বিশ্বাস হল তো আমার কথা! দেখলে তো টনিরা কীরকম সব আশ্চর্য কাণ্ড করতে পারে!'

মা কোনওরকমে থেমে-থেমে বললেন, 'এ যে একেবারে নতুন বাড়ি!'

বাবা বাড়ির চারপাশের আগাছার জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'শুধু ওই জঙ্গল আর মরচে ধরা লোহার রেলিংগুলো না থাকলে বাড়িটা আর চেনাই যেত না।'

পাপু আগ্রহ-ভরা গলায় বলল, 'টনিকে একবার ডেকে জিগ্যেস করব, বাবা?'

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, 'না, না, তার দরকার নেই! শেষপর্যন্ত কী থেকে কী হবে...।'

বাবা সাবধানি সুরে পাপুকে বললেন, 'তুমি যেন একা-একা ওদের বাড়িতে যেয়ো না।'

পাপু ঘাড় নাড়ল। তারপর হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসল।

বাবা ফ্যাক্টরিতে বেরোনোর পর থেকেই পাপু জানলার কাছে সর্বক্ষণ খাড়া হয়ে রইল। তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে টনিদের বাড়ির ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। টনি, ওর বাবা কিংবা মা, কাউকেই দেখা গেল না। পাপু অবাক হয়ে ভাবছিল, কোন শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় বাড়িটা রাতারাতি ভোল পালটে ফেলল!

উত্তরটা ও পেল স্কুলে যাওয়ার সময়।

পাপু একা-একাই স্কুলে যায়-আসে। এদিককার রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া কম। শুধু একটু যা সাইকেলের ভিড় রয়েছে। ও সবে টনিদের বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়েছে, এমন সময় ওর ঠিক সামনে হাজির হল টনি। যেন বাতাস থেকেই ফুটে উঠল

ওর নতুন বন্ধুর চেহারা।

'কোথায় যাচ্ছ, স্কুলে?' টনি জিগ্যেস করল।

পাপু নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুটা ভয়ে-ভয়েই বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি স্কুলে ভরতি হবে না?'

টনি হাসল। হেসে বলল, 'না। আমি তো দেশের বাড়িতে স্কুলে পড়ি। তোমাদের এখানে স্কুল-কলেজে যা শেখায়, সব আমার জানা। আমাদের স্কুলে পড়া খুব কঠিন। তুমি বুঝবে না।'

পাপু কিছুটা অপমানবোধ করল। বলল, 'তোমার দেশের বাড়ি কোথায়?'

টনি হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সে অনেক দূর। জায়গার নাম বললে তুমি চিনবে না।'

পাপু কথা বলতে-বলতে এগোচ্ছিল। টনিও ওর পাশে-পাশে হাঁটছিল। স্কুলের কাছাকাছি এসে পাপু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের বাড়িটা রাতারাতি কে মেরামত করল বলো তো?'

টনি স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কে আবার! বাবা।'

'একা?'

'হ্যাঁ, একা। কেন?'

'তোমার বাবা দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে পারেন?'

পাপু টনিকে খোঁচা দিয়ে অপমানের শোধ নিতে চাইছিল, কিন্তু ওর কথায় টনি আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে জবাব দিল, 'শুধু বাবা কেন? মা-ও পারে, আমিও পারি। দেখবে?' বলেই টনি একছুটে সামনের একটা কোয়ার্টারের দেওয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে গেল, তারপর একইভাবে আবার নেমে এল।

পাপু হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে টনি বলল, 'শুধু আমি কেন, আমাদের দেশের সবাই পারে। তুমি বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসো, তোমাকে আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখাব। খুব মজা পাবে তুমি।'

পাপুর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কী ভেবে ও কোনওরকমে বলল, 'সন্ধেবেলা যাব। আমার মা-বাবাকে নিয়ে যাব। নইলে একা-একা আমাকে ছাড়বে না।'

টনি হেসে বলল, 'নিয়ে এসো ওঁদের। আলাপ হলে আমার মা-বাবাও খুব খুশি হবে। আমাদের দেশের বাড়ির দারুণ-দারুণ সব গল্প শোনাব। আচ্ছা, ওই যে তোমার স্কুল এসে গেছে, আমি এখন যাই। সন্ধেবেলা আবার দেখা হবে।'

পাপুর চোখের সামনে টনি আবার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

স্কুলে বিজনকে সব ঘটনা জানাতেই ও বলল, 'সন্ধেবেলা যাবি যা, তবে সাবধানে থাকিস।'

পাপু গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। ক্লাসের পড়া ওর মাথায় ঢুকছিল না।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আর খেলতে বেরোল না পাপু। শুধু মায়ের কাছে বসে জেদ ধরল টনিদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যেতে হবেই। কারণ টনি কত মজার-মজার খেলা দেখাতে পারে, পড়াশোনায় কত ভালো, ও পাপুকে নিশ্চয়ই সব শিখিয়ে দেবে। তা ছাড়া, টনির কাছে ওর দেশের গল্প শুনবে পাপু। টনি বলেছে দারুণ-দারুণ সব গল্প শোনাবে।

বাবা অফিস থেকে ফিরেই রাজি হয়ে গেলেন এককথায়। মনে-মনে তাঁরও বোধহয় খুব কৌতূহল হচ্ছিল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনজন তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে।

বিকেল পেরিয়ে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। টনিদের তালঢ্যাঙা বাড়ির ছোট-ছোট জানলায় গতকালের মতোই অদ্ভুত আলো জ্বলছে। মা-বাবার হাত ধরে লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল পাপু। তারপর আগাছা মাড়িয়ে সদর-দরজা। দরজা খুলে ভেতরে।

ভেতরে ঢুকতেই মেঝেটা নিঃশব্দে ওপরে উঠতে লাগল। ঠিক যেন অটোমেটিক লিফট। তারপরই টনি আর ওর মা-বাবার দেখা পাওয়া গেল। বিশাল ঘর। অনেকগুলো টিভির পরদায় নানান রঙিন লেখা। তাদের সামনে অসংখ্য রঙিন বোতাম। কম্পিউটার নাকি? পাপু কম্পিউটারের ছবি বইতে দেখেছে।

টনির বাবা দ্রুত হাতে নানান বোতাম টেপাটেপি করছিলেন, ওদের দেখেই হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। টনির মা সুন্দর-সুন্দর খাবার সাজিয়ে দিলেন প্লেটে। ওরা আনন্দে গল্প করতে লাগল। টনিদের দেশের হরেকরকম অদ্ভুত গল্প পাপুদের অবাক করে দিচ্ছিল। টনির বাবা বারবার করে বললেন, 'চলুন না, আমাদের দেশে ক'দিন বেড়িয়ে আসবেন। কোনও অসুবিধে হবে না। আজ রওনা হলে ধরুন কাল পৌঁছে যাবেন। আর যদি বলেন তো পরশু আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। চলুন, চলুন। গেলে খুব ভালো লাগবে। তা ছাড়া, আমাদেরও ক'টা দিন বেশ ফুর্তিতে কাটবে।'

পাপু আর টনি ছুটোছুটি করে খেলছিল। পাপু নেমন্তন্নের কথা শুনে বাবাকে আর মাকে রাজি করানোর জন্য বারবার করে আর্জি পেশ করতে লাগল। সকলের অনুরোধে ওঁরা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

তখন টনির বাবা হেসে বললেন, 'তা হলে আর দেরি নয়, এখনই রওনা হওয়া যাক।' বলে তিনি কম্পিউটারের কাছে গিয়ে পরপর কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

একটা গুড়গুড় শব্দ শুরু হল। তারপর ভোঁ-ভোঁ। শেষে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে টনিদের গোটা বাড়িটা শূন্যে উঠতে লাগল রকেটের মতো।

পাপুর মা চিৎকার করে উঠলেন।

বাবা বললেন, 'এসব কী হচ্ছে!'

টনির বাবা হেসে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। আমরা আপনাদের এপসিলন এরিড্যানির সতেরো নম্বর গ্রহে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানেই আমাদের দেশ। পৃথিবী থেকে সাড়ে দশ আলোকবর্ষ দূরে। যেটাকে আপনারা আমাদের বাড়ি ভাবছেন, সেটা আসলে একটা মহাকাশযান। অনেকদিন আগে পৃথিবীতে এসে বিকল হয়ে পড়েছিল। অন্য একটা মহাকাশযান আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে এই মহাকাশযানটাকে মেরামত করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তাই এখন নিয়ে যাচ্ছি।'

টনির মা বললেন, 'আমরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টাতেই বারবার এই গ্রহে যাতায়াত করি। এবারে আপনাদের পাপুর সঙ্গে আমাদের টনির যা ভাব হয়েছে তাতে আমরা খুব খুশি। তা ছাড়া, আপনাদের সঙ্গেও আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে। মিছিমিছি ভয় পাবেন না। মনে করুন না, ছুটিতে ক'দিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন! মাত্র কয়েকটা তো দিন, তার বেশি তো নয়।'

পাপুর মা-বাবার ভয় আস্তে-আস্তে কেটে যাচ্ছিল। রকেটযান তখন সাংঘাতিক গতিতে ছুটে চলেছে। সামনের টিভি-পরদাগুলোয় অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে।

টনি ঘরের দেওয়ালে ছাদে ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করছিল। খেলা করছিল পাপুর সঙ্গে। পাপু কিন্তু এতটুকু ভয় পায়নি। সেও খেলা করতে-করতে লাফিয়ে-লাফিয়ে টনিকে ছুঁতে চেষ্টা করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে পাপুর বাবা টনির বাবাকে বললেন, 'বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন চলুন, কিন্তু দেওয়ালে হাঁটাহাঁটি করাটা আমাকে অবশ্যই শিখিয়ে দিতে হবে।'

পাপুর মা বললেন টনির মাকে, 'আমাকে নতুন-নতুন কয়েকটা রান্না শিখিয়ে দেবেন, দিদি।'

পাপুর বাবা সে-কথা শুনে বললেন, 'যে আছে যার তালে!'

এ-কথায় চারজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।





আবার মুশকিল হতে পারে

ঘটনাটা কেউ খেয়াল করেনি। আর করবেই বা কেমন করে? ভোর ছ'টার সময়ে ক'জনই বা মানুষজন ছিল রাস্তায়! ফলে প্রফেসর মজুমদার ছাড়া ব্যাপারটার সাক্ষী আর কেউ ছিল না। কিন্তু বেলা বাড়তেই হুলস্থুল। রাস্তায় গাড়িঘোড়া লোকজন যেমন বাড়তে লাগল, হইচইও বাড়তে লাগল সমান তালে। তারপর যানজট, পুলিশ, ক্রেন। সে এক এলাহি কাণ্ড।

শুরু থেকেই তা হলে শুরু করা যাক।

গত কয়েকমাস ধরেই প্রফেসর শান্তনু মজুমদার একটা গোপন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পাড়ার সকলেই জানে, ওঁর সব গবেষণাই বেশ গোপন। আর উনি নানাভাবে ভারতের সামরিক বিভাগকে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং এবারের গবেষণাটাও যে সেইরকম তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ওপরেই প্রফেসর মজুমদারের সুন্দর তিনতলা বাড়ি। সেই বাড়ির একতলাটাই ওঁর গবেষণাগার। মাত্র দুজন সহকারী নিয়ে গত দশ বছর ধরে তিনি দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। লোকে বলে, ওঁর খ্যাতি নাকি দুনিয়া জোড়া। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিটায়ার করার পরেও তিনি বসে থাকতে পারেননি হাত গুটিয়ে। রাত-দিন বিচিত্র সব গবেষণায় ব্যস্ত থেকেছেন। ওঁর যেসব গবেষণা খুব গোপন সেগুলোর জরুরি খুঁটিনাটি

সহকারীদেরও বুঝতে দেন না তিনি। আর সেই গবেষণা নিজে চালিয়ে যান রাত জেগে। যদি ঘুম পায়, তার জন্য রয়েছে ঘুমতাড়ানি ট্যাবলেট আর কড়া কফি।

প্রফেসর মজুমদার সাংঘাতিক বিজ্ঞানী হলে কী হবে, ভীষণ হাসিখুশি আর মিশুকে। পাড়ায় সবাই তাঁকে পছন্দ করে। সুন্দর সুঠাম চেহারা, সাহেবদের মতো টকটকে গায়ের রং, মাথার চুলে সবসময় দামি তেল, আর পোশাক-আশাক অষ্টপ্রহর ফিটফাট। শুনলে বিশ্বাস হবে না, কিন্তু তিনি দু-দিন অন্তর-অন্তর বাজার করেন। বাজারে চেনা লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে বেশ খোলামনেই আলাপ করেন। লোকের বিপদে-আপদে সাহায্যও করেন দরকার মতো।

সুতরাং প্রফেসর মজুমদারের বিপদে পাড়াপড়শিরা যে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে আর আশ্চর্য কী!

সারারাত জেগে কাজ করতে-করতে ভোরের দিকে সামান্য তন্দ্রামতো এসেছিল প্রফেসর মজুমদারের। আর তখনই হঠাৎ হাত ফসকে সংকর ধাতুর বলটা গড়িয়ে পড়ে ল্যাবরেটরির মেঝেতে। না, বলটা সেখানেই থামেনি। স্যার আইজ্যাক নিউটনের সূত্র অনুযায়ী গতিজাড্যের ঠেলায় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে যায় দরজার বাইরে। তারপর সেখান থেকে রাস্তায়, একেবারে ট্রাম লাইনের ওপরে।

বলটা শেষপর্যন্ত থেমেছে বটে, কিন্তু এমনই থামান থেমেছে যে, সেখান থেকে কেউ আর সেটাকে নড়াতে পারছে না।

একটা নতুন ধরনের সংকর ধাতু তৈরির চেষ্টায় গবেষণা করছিলেন শান্তনু মজুমদার। সেটা যখন প্রায় তৈরি হওয়ার মুখে, তখনই এই বিপত্তি।

এলোমেলো চুলে বিভ্রান্ত অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে এলেন প্রফেসর। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, বলটা যতই রাস্তার দিকে গেছে, ততই যেন গভীর হয়েছে তার চলার দাগ। ল্যাবরেটরির বাইরে বেরোনোর পরই সিমেন্ট-বাঁধানো মেঝেতে ফাটল ধরার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। তারপর যতই বলটা রাস্তার দিকে এগিয়েছে ততই ফাটল বেড়েছে। তারপর ট্রাম লাইনের ওপরে পৌঁছে বলটার প্রায় অর্ধেকটাই ডুবে গেছে পিচের রাস্তায়।

এর অর্থ একটাই হতে পরে। বলটার ওজন এখন বেড়ে গেছে অস্বাভাবিকরকম। অথচ একটু আগেই যখন তিনি সদ্য তৈরি করা বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন তখন তো ওটা বেশ হালকাই ছিল! আসলে একটা হালকা সংকর ধাতুই তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন প্রফেসর মজুমদার। কিন্তু হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়েই বলটা কেমন যেন গোলমেলে হয়ে গেল। হালকা বলটা গড়াতে-গড়াতে ওজনে বাড়তে-বাড়তে চলে গেল রাস্তায়।

এপাশ-ওপাশ তাকালেন প্রফেসর। বহুদূরে চাদর মুড়ি-দেওয়া দুজন

মানুষকে দেখতে পেলেন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে। দৌড়ে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? উঁহু, আসবে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটা ট্রাম আসছে মনে হচ্ছে! নাকের ওপরে দূরদৃষ্টির চশমাটা ঠিক করে বসালেন প্রফেসর। হ্যাঁ, ট্রামই আসছে। কী হবে এখন! প্রফেসর মজুমদার সত্যি-সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ওঁকে ট্রাম লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ট্রাম ড্রাইভার ঘণ্টি বাজাচ্ছে ঘনঘন। ট্রামটা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে। দু-হাত মাথার ওপরে তুলে চিৎকার করতে শুরু করলেন প্রফেসর, 'থামো! থামো!'

অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এসে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ঘস' করে ব্রেক কষার শব্দ হল। রাস্তা থেকে ধুলো উড়ল খানিকটা। তারপর ফার্স্টক্লাসের কন্ডাক্টর নেমে এল ট্রাম থেকে।

'কী ব্যাপার! ওটা আপনার?'

প্রফেসর মজুমদার কেমন হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমার—মানে, হাত থেকে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে...।'

ঠং-ঠং করে আওয়াজ করল ট্রাম ড্রাইভার। চিৎকার করে কী যেন বলল।

কন্ডাক্টরও ব্যস্ত হয়ে বলল, 'জলদি সরিয়ে নিন ফুটবলটা—।'

যদিও বোঝা যাচ্ছিল বৃথা চেষ্টা, তবুও ঝুঁকে পড়ে বলটাকে টানাটানি করলেন প্রফেসর। না, একচুলও নড়ানো গেল না। মসৃণ পাথরের গম্বুজ যেন একটা।

নড়ানো যে যাবে না সেটা বলটার রাস্তা কেটে বসে যাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু তবুও দু-হাতে ওটাকে খানিকক্ষণ টানাটানি করে যেন চরম পরীক্ষা করলেন প্রফেসর।

হ্যাঁ, মাপে বলটা এখন ফুটবলেরই মতো। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে যখন ওটা নিয়ে প্রফেসর মজুমদার নাড়াচাড়া করছিলেন তখন আরও বেশ খানিকটা বড় ছিল। খুঁটিয়ে লক্ষ করলে এও নজরে পড়ে, মাপের সঙ্গে-সঙ্গে বলটার রংও পালটেছে। তার মানে, বলটার ঘনত্ব যেমন বেড়েছে, ওটা আরও ভারী হয়েছে, সেইসঙ্গে মাপ বদলেছে, রংটাও আর ঠিক আগের মতো নেই। এ কোন বহুরূপী সংকর ধাতু তৈরি হয়ে গেল ল্যাবরেটরিতে!

রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন প্রফেসর মজুমদার। তারপর হেরে-যাওয়া গলায় বললেন, 'কী করব ভাই, একচুলও নড়ানো যাচ্ছে না।'

ততক্ষণে ড্রাইভার ও জনাকয়েক যাত্রী নেমে পড়েছে ট্রাম থেকে। দ্বিতীয় কন্ডাক্টর এসে যোগ দিয়েছে প্রথম জনের সঙ্গে। কিন্তু বল অটল। নট নড়ন-

চড়ন নট কিচ্ছু!

এইভাবে শুরু হওয়ার পর বেলা যতই বাড়তে লাগল, গোলমালও ততই বেড়ে চলল। ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে যেতে লাগল লাইনের ওপরে। জনাচারেক ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে এসে যানজট সামাল দিতে লাগল। প্রফেসর মজুমদারের পাড়ার ছেলেরা আর স্থানীয় লোকজন বিচিত্র গোলকটাকে ঘিরে ব্যারিকেড করে দাঁড়াল। দর্শকের ভিড় উপচে পড়তে লাগল। নানাজনের নানা প্রশ্ন ঃ 'ওটা কী, দাদা? শিবলিঙ্গ?', 'মাটি ফুঁড়ে উঠল, না আকাশ থেকে পড়ল?', 'ভোররাতে উল্কাপাত হল নাকি?', 'দমকলে খবর দিন, ওদের গাড়ির ধাক্কায় ঠেলে তুলে দেবে।', 'পাতাল রেলকে বলুন ক্রেন নিয়ে আসতে'।

প্রফেসর শান্তনু মজুমদার ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনছিলেন। ভাবছিলেন, কী করা যায় এখন। কী করে বলটাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় ল্যাবরেটরির ভেতরে।

হঠাৎই পুলিশের এক হোমরাচোমরা অফিসার হাজির হলেন ঘটনাস্থলে। ভিড়ের লোকজন সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিল। একটি ছেলেকে কী যেন জিগ্যেস করলেন অফিসার। উত্তরে ছেলেটি আঙুল তুলে ইশারা করল প্রফেসর মজুমদারের দিকে। অফিসারটি এগিয়ে এলেন শান্তনু মজুমদারের কাছে। মাটিতে বসে-থাকা বলটার দিকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন, 'ওটা আপনার?'

একটু চুপ করে থেকে প্রফেসর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমার—।'

'সাতসকালে এই পিকিউলিয়ার বলটা নিয়ে কী করছিলেন জানতে পারি?'

প্রশ্নের কঠিন সুরটা প্রফেসর মজুমদারের কানে বাজল। একে তো নিজের গবেষণা নিয়ে সমস্যা, তার ওপরে এইরকম খোঁচা-দেওয়া প্রশ্ন। চশমাটা নেড়েচেড়ে বসিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সাতসকালে ওটা নিয়ে ফুটবল খেলছিলাম না। আমার নাম শান্তনু মজুমদার। বিজ্ঞান নিয়ে একটু-আধটু গবেষণা করে থাকি...।'

নামটা শোনামাত্রই পুলিশ অফিসারের চোয়ালের রেখা নরম হল। খবরের কাগজের দৌলতে শান্তনু মজুমদার নামটা তাঁর শোনা। সুতরাং এরপর প্রশ্নের ধাঁচ ও সুর দুই-ই পালটে গেল।

প্রফেসর মজুমদারের কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর অফিসারটি তড়িঘড়ি ক্রেনের ব্যবস্থা করতে ছুটলেন।

শান্তনু মজুমদার ভাবছিলেন। ভাবতে-ভাবতে সকালের মিঠে রোদ চড়া হয়ে গেল মাথার ওপরে। কিন্তু সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। চারপাশে লোকজনের কোলাহল, বাস-গাড়ি-লরির হর্ন। কাছেপিঠে কোথায় যেন মাইকের চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

প্রফেসর মজুমদার বলটাকে লক্ষ করছিলেন। ওটার রং এখন অনেকটা নীলচে-বেগুনি। আর মাপে কি খানিকটা ছোট হয়েছে আরও!

হঠাৎই ভিড় ঠেলে চলে এল দুজন ফটোগ্রাফার। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে বলটার ফটো তুলতে লাগল। রোগা চেহারার একটি ফরসা ছেলে এগিয়ে এল প্রফেসরের কাছে। হাতে নোটবই, ডটপেন। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। সব মিলিয়ে দেখে মনে হল, ভিটামিনের অভাবে ভুগছে। নিশ্চয়ই সাংবাদিক।

অতএব ব্যাপারটা দু-চার কথায় ছেলেটিকে বুঝিয়ে বললেন প্রফেসর। তারপর যখন বাড়ি ফিরে আসবেন বলে ভাবছেন, তখনই দেখতে পেলেন একটা ক্রেন এগিয়ে আসছে অকুস্থলের দিকে।

ক্রেনটাকে দেখেই সকলে একেবারে হইহই করে উঠল। ভিড় সরে গেল পলকে। ক্রেনটা ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল কাছে। তার পাশাপাশি পায়ে হেঁটে হাজির হল পাঁচ-ছ'জন লোক। তার মধ্যে সেই পুলিশ অফিসারটিও আছেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত যা হওয়ার তাই হল। ক্রেন দিয়ে টানাহ্যাঁচড়ার চূড়ান্ত করেও বলটাকে একচুল নড়ানো গেল না। ক্রেন যখন বলটাকে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড টান মারছিল তখন ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষজন চেঁচিয়ে উঠছিল, 'মারো জোয়ান হেঁইও...।' কিন্তু লাভের মধ্যে শেষপর্যন্ত শেকলটাই গেল ছিঁড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে তুমুল হট্টগোল, শব্দ, চিৎকার। আর প্রফেসর মজুমদারের দীর্ঘ শরীরটা যেন ঝুঁকে পড়ল খানিকটা। নিজের অজান্তে এ কী ভয়ংকর বস্তু তৈরি করলেন তিনি!

পুলিশ ভিড় সামলানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু খুব একটা যে পারছিল তা নয়। ক্যামেরা হাতে বেশ কয়েকজন পটাপট ছবি তুলছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, আগামীকালের কাগজে 'বলবান বলের রহস্য' কিংবা 'গোলক নিয়ে গোলমাল'—এ-জাতীয় কোনও হেডিং দিয়ে এই রোমাঞ্চকর বিবরণ ছাপা হবে।

কিন্তু এখন এই প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে কে উদ্ধার করবে!

এমনসময় ভিড় ঠেলে প্রফেসর মজুমদারের দুজন সহকারী অতুল আর বিমান এসে হাজির হল। ততক্ষণে ক্রেনটাকে বিদায় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রোগা চেহারার অল্পবয়েসি ছেলে অতুল জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, স্যার?'

প্রফেসর মজুমদার হাত-পা নেড়ে ব্যাপারটা বললেন অতুলকে। বিমানও শুনল। কিন্তু দুজনের একই অবস্থা। প্রফেসরের এই গোপন গবেষণায় ওদের কোনও হাত ছিল না। ওরা চুপচাপ মাথা চুলকোতে লাগল।

বেলা বাড়তে-বাড়তে যখন দুপুর, খিদেয় অনেকেরই পেট চোঁ-চোঁ করছে, ঠিক এমনসময় এক অদ্ভুত চ্যাঁচামেচি শোনা গেল।

ট্রাম লাইন থেকে বেশ খানিকটা দূরে পুবদিকের ফুটপাথ ঘেঁষে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ আছে। তার নীচে সিমেন্ট-বাঁধানো চাতালে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা আড্ডা মারে। গোলমালটা ভেসে এল সেদিক থেকেই।

অনেকেই গলা উঁচু করে তাকাল সেদিকে। কীসের গোলমাল? শান্তনু মজুমদারও একটু হকচকিয়ে গেলেন। অতুল আর বিমানকে জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী বলো তো হে—?'

ওরা ব্যাপারটা ঠাহর করার জন্য সেদিকে এগোতে যাবে, ঠিক তখনই জনাকয়েক লোক 'ফুঁয়াবাবা! ফুঁয়াবাবা!' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আর তার একমিনিটের মধ্যেই ভিড় ঠেলে চার-পাঁচজন লোক হাজির হল প্রফেসরের সামনে। তারা যাকে টেনে হিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে এল, সে এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী।

শুধু গেরুয়া নয়, সন্ন্যাসীদের সাধারণত যেমনটি থাকে, তার গালে মুখে সেরকম কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। নাক-মুখ ফোলা ফোলা। মোটা ভুরু। বড়-বড় চোখ। বেশ নাদুসনুদুস চেহারা।

সন্ন্যাসী পাবলিকের হাতের বাঁধন ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর বলছে, 'না, না, এ আমার দ্বারা হবে না। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। নরকেও তোমাদের ঠাঁই হবে না, পাপিষ্ঠ!'

সঙ্গের লোকগুলো একেবারে নাছোড়বান্দা। তারা সবাই মিলে বলতে লাগল, 'না, বাবা, আপনাকে এটুকু উপকার করতেই হবে। মানবজাতিকে লিয়ে। ম্যানকাইন্ডের জন্যে।'

সাধুবাবার আপত্তি ক্রমশ প্রবল হচ্ছিল। সে তার ভারী শরীর নিয়ে মাঝে-মাঝেই লাফ মারার চেষ্টা করছিল। আর মুখে 'না, না—মুঝে ছোড় দো' বলে চিৎকার করে উঠছিল।

এই হই-হট্টগোল চেঁচামেচি শুনে পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে চেঁচামেচি থামল। সকলে এবার বলটার দিক থেকে নজর সরিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখছে।

অফিসারের জেরার উত্তরে জানা গেল, আজ প্রায় দিন-দশেক হল এই সাধুবাবা এসে ওই অশ্বত্থ গাছের নীচে আস্তানা গেড়েছে। আর তারপর থেকে নামমাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে স্রেফ ফুঁ দিয়ে গরিব-দুঃখীদের অসুখ-বিসুখ সারিয়ে দিচ্ছে।

দু-চারদিন পর থেকেই ওই গাছতলায় ভিড় বাড়তে থাকে। নানা জায়গা থেকে লোকজন এসে হাজির হতে থাকে নানা প্রার্থনা নিয়ে।

এরকম অলৌকিক 'বাবা'দের ওপরে প্রফেসর মজুমদারের কোনওকালেই

কোনও আগ্রহ ছিল না। তাই অশথতলার ব্যাপারটা তিনি বিশদভাবে জানতেন না। এখন সাধুটিকে সামনাসামনি দেখে তাঁর কিন্তু কৌতূহল হচ্ছিল।

পুলিশ অফিসার জিগ্যেস করলেন, 'ওকে এভাবে ধরে এনেছেন কেন?'

একটি ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, 'বলটাকে সরানোর জন্যে—।'

সাধুবাবার হাত ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। সে অফিসারটির দিকে হাতজোড় করে অনুনয় করে বলল, 'আমাকে মাপ করুন, স্যার। এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, 'না, না, ওঁর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ফুঁ দিয়ে আমার ছেলের জন্ডিস সারিয়ে দিয়েছেন।'

সাধুবাবা তো হাত-পা নেড়ে অস্থির। কাতর গলায় সে পুলিশ অফিসারকে বলল, 'স্যার, আমার আসল নাম পঞ্চানন দাস। আমার কোনওরকম অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা নেই, স্যার। আগে আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ম্যাজিক দেখাতাম। এখন শরীরে আর বয় না। তাই এই গেরুয়া পরে গাছতলায় বসে ঝাড়ফুঁকের কাজ করি। অলৌকিক ক্ষমতার নাম করে দু-একটা ম্যাজিক ট্যাজিক দেখিয়ে দিই। বিশ্বাস করুন, তার বেশি কিছু নয়, স্যার—।'

বেচারা পঞ্চানন অফিসারের হাত চেপে ধরল মুঠো করে, 'আপনি আমায় বাঁচান, স্যার।'

প্রফেসর মজুমদার বলতে যাচ্ছিলেন, লোকটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে জনতা নতুন মজা পেয়ে গেছে। তারা তখন সবাই মিলে হইহই করে বলল, 'সাধুবাবাকে একবার চেষ্টা করতেই হবে! আমরা কোনও কথা শুনব না!'

সুতরাং অবস্থার চাপে পড়ে পুলিশ অফিসারটিও কিছু বলতে পারলেন না। এত সময় নষ্ট হয়েছে এই বলের পিছনে, না হয় আরও পাঁচ মিনিট বাড়তি নষ্ট হবে। প্রফেসর মজুমদার কপালে ভাঁজ ফেলে ব্যাপার স্যাপার লক্ষ করতে লাগলেন। আর জনতার তুমুল চিৎকারের মধ্যে সাধুবাবা এগিয়ে যেতে লাগল বলটার দিকে। বেচারার মুখের চেহারা দেখলে মনে হবে যেন ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বলের কাছে পৌঁছে সাধুবাবা থমকে দাঁড়াল। আর তার পিছনে দাঁড়ানো লোকজন চিৎকারে ফেটে পড়ল, 'ফুঁয়াবাবা কী জয়!'

কেউ বলল, 'এইবারে বল নড়বে—।'

আর-একজন বলল, 'জলদি ফুঁ দিন, বাবা, জলদি ফুঁ দিন—।'

ফুঁয়াবাবা, ওরফে পঞ্চানন দাস, উপায়ান্তর না দেখে ঝুঁকে পড়ল মাটিতে গেঁথে-থাকা বলের ওপরে। তারপর দু-চোখ বুজে গাল ফুলিয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিল

বলটাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে বলটা নড়ে উঠল। ভেসে উঠল শূন্যে। মাটি থেকে হাত-তিনেক উঁচুতে স্থির হয়ে ভেসে রইল।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় গোল হলে যে-চিৎকার শোনা যায় তার অন্তত দশগুণ চিৎকার শোনা গেল। বলটা শূন্যে ভেসে ওঠায় উল্লাসে একেবারে ফেটে পড়ল জনতা।

ফুঁ দেওয়ার পরেও চোখ বুজেই ছিল পঞ্চানন। হয়তো ভাবছিল, ঠিক কখন ওর পিঠে পাবলিকের প্রথম আঘাতটা পড়বে। কিন্তু আনন্দের হইচই শুনে অবাক হয়ে চোখ খুলল সে। দেখল মাটির দিকে। শুধু গর্তটা দেখা যাচ্ছে, বলটা নেই। তার পরক্ষণেই বলটাকে শূন্যে ভেসে থাকতে দেখল পঞ্চানন। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে রইল বলটার দিকে।

জনতা প্রবল চিৎকার করে উঠল, 'জয় ফুঁয়াবাবার জয়!'

আর সঙ্গে-সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গোড়া-কাটা কলাগাছের মতো খসে পড়ল সাধুবাবা। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা তিন-চারজন লোক ধরে ফেলল তাকে। কেউ বলল, 'জল নিয়ে এসো।' কেউ বা বলল, 'জোরে-জোরে বাতাস করো—'। আর তক্ষুনি অচৈতন্য সাধুবাবার জন্য শুরু হয়ে গেল ছুটোছুটি।

প্রফেসর মজুমদার লক্ষ করলেন, বলটা মাপে যেন কিছুটা বড় হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে রংও আবার পালটে গেছে। এখন খানিকটা বাদামি রঙের দেখাচ্ছে।

বলটা শূন্যে ভেসে থাকা অবস্থাতেই সামান্য এপাশ-ওপাশ নড়ছিল। অতুল আর বিমান তাজ্জব হয়ে দেখছিল বলটাকে। প্রফেসর মজুমদার আর দেরি করলেন না। চেঁচিয়ে ওদের বললেন, 'বলটা শিগগিরই ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাও। এরপরে আবার মুশকিল হতে পারে—।'

অতুল আর বিমান চমকের ঘোর কাটিয়ে দৌড়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরল বলটা। ফটোগ্রাফাররা ঘনঘন ছবি তুলছিল। দু-চারজন লোক অতুল আর বিমানকে কী যেন জিগ্যেস করছিল। কিন্তু ওরা কোনওদিকে কান না দিয়ে পাখির পালকের মতো হালকা বলটাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে সোজা রওনা দিল প্রফেসর মজুমদারের ল্যাবরেটরির দিকে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন শান্তনু মজুমদার। বেলা তিনটে পার হয়ে গেছে। ক্লান্ত পায়ে তিনি এগোলেন অতুল আর বিমানের পিছু-পিছু।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবেন, দেখেন চার-পাঁচজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে সেই সাংবাদিক ছেলেটি আর পুলিশ অফিসারটিও রয়েছে। একজন ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশগান ঝলসে উঠল। প্রফেসর মজুমদার সামান্য বিরক্তভাবে বললেন, 'প্লিজ, এখন এসব নয়। আমি ভীষণ টায়ার্ড।'

সাংবাদিক ছেলেটি চশমা ঠিক করতে-করতে বলল, ‘স্যার, গোটা ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। আমরা এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। যদি আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন—।’

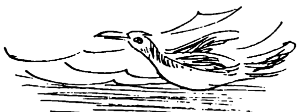
শান্তনু মজুমদার নিজেও মনে-মনে হাতড়াচ্ছিলেন। কী করে হল এমন আজব ব্যাপার? দেখলেন, অতুল আর বিমান বলটাকে ল্যাবরেটরির মেঝেতে সাবধানে নামিয়ে রেখে তার চারপাশ নানান জিনিস দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে—যাতে বলটা আর না গড়ায়।

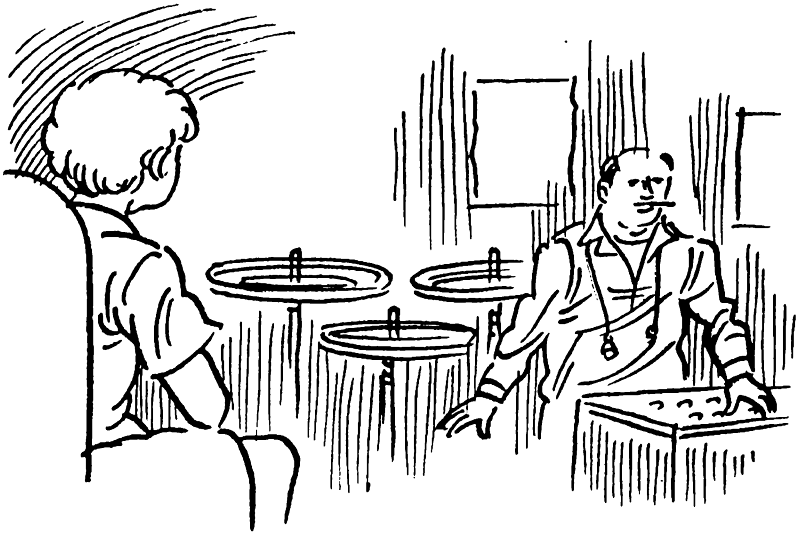
একটু আমতা-আমতা করে পুলিশ অফিসার বললেন, ‘প্রফেসর মজুমদার, এই বলের ব্যাপারটা নিয়ে একটা—ইয়ে, মানে, রিপোর্ট দিতে হবে আমাকে। তাই...আপনি যদি...।’

শান্তনু মজুমদার তখন ভাবছিলেন। কতরকম পদার্থ আছে এই দুনিয়ায়। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে অণু, পরমাণু। পরমাণুর ভেতরে আবার আছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। অণুই হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা পদার্থের নিজস্ব ধর্ম বজায় রাখে, আর স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। অণুর গঠনের জন্যই তো সোনার রং সোনালি, আর ঘনত্ব এত বেশি। আবার ওই অণুর গঠনের জন্যই তুলোর রং সাদা, আর তুলো এত হালকা যে, ফুঁ দিলেই উড়ে যায়। তা হলে নতুন এই পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ করে এমন কোনও পদার্থ তৈরি হয়ে যায়নি তো যার অণুর গঠন অস্থায়ী, নিজে থেকেই ঘনঘন পালটে যাচ্ছিল! কখনও তার ঘনত্ব বাড়ছিল, আবার কখনও ঘনত্ব কমে গিয়ে হয়ে যাচ্ছিল পালকের মতো হালকা। এই একই কারণে হয়তো বলটার রংও বদলে যাচ্ছিল থেকে-থেকেই। মাঝখান থেকে শুধু-শুধু ওই গোবেচারা পঞ্চানন দাস অজ্ঞান হয়ে গেল।

নাঃ, ব্যাখ্যাটা যে শান্তনু মজুমদারের পুরোপুরি মনের মতো হচ্ছিল তা নয়। কিন্তু এতগুলো কৌতূহলী মানুষকে তো নিরাশ করা যায় না। সুতরাং আপাতত এই অণুর গঠনের ব্যাপারটাই ওদের বলা যাক। এই ভেবে প্রফেসর মজুমদার বলতে শুরু করলেন। আর একই সঙ্গে ভাবছিলেন, আশ্চর্য এই বলটা নিয়ে আরও জটিল, আরও জোরালো গবেষণা তাঁকে করতে হবে। একেবারে গোপন গবেষণা—যার বিন্দুবিসর্গ অতুল আর বিমানকেও তিনি জানাবেন না।

বাইরের রাস্তায় তখন লোকজনের ভিড় কমতে শুরু করেছে।





বুদ্ধি যদি বৃদ্ধি পায়

'সোমা! সোমা! শিগগির একটু বরফ নিয়ে এসো—' গলা ফাটিয়ে হাঁক ছেড়েছেন পুরন্দর, আর ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে একবার যাচাই করে নিয়েছেন ওটা ঠিকঠাক ফুল স্পিডে ঘুরছে কি না। পুরন্দরের মাথার ভেতরটা কীরকম অস্থির-অস্থির করছিল। মনে হচ্ছিল, দুজন ধুনুরি তাঁর মাথার ভেতরে বসে তোশক তৈরির কম্পিটিশান লাগিয়ে দিয়েছে।

বিকুন বেশ ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাবার দিকে। বরফ দিয়ে কী করবেন বাবা? মুখ লালচে, থমথমে। বিকুনকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আজ বোধহয় তাঁর অফিসটাই কামাই হয়ে যাবে!

এর মধ্যে মা-ও এসে হাজির হয়ে গেছেন। আটপৌরে শাড়ি পরে রান্না করছিলেন। হাতে হলুদের রং, মুখে বিনবিন ঘাম। বোঝা যায়, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও জরুরি হাঁক শুনে ছুটে এসেছেন।

সোমা বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে! ও-মা ও-মা করে ডাকছিস কেন? এখন আমার মরবার সময় নেই—।'

ও, রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দের জন্য মা তা হলে বরফ আনার ব্যাপারটা শুনতে পাননি! বিকুন ভাবল। আর বাবার 'সোমা' ডাককে বিকুনের 'ও-মা' বলে ভুল করেছেন।

পুরন্দর রাগ-থমথমে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'ও ডাকেনি, আমি ডেকেছি। জলদি ফ্রিজ থেকে একটু বরফ দাও—একটা রুমালে জড়িয়ে দিয়ো।'

'বরফ! বরফ দিয়ে এখন কী করবে? তুমি চান করতে যাবে না? এরপর অফিসে দেরি হয়ে গেলে আবার আমাকে—।'

পুরন্দর এবার ফেটে পড়লেন, 'বলছি তো জলদি বরফ নিয়ে এসো, আমার মাথায় দেব। ওকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আমার মাথাটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।'

সোমার ভুরু কুঁচকে গেল। বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, আবার কী ভুল করলি?'

বিকুন ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় গর্জন করে উঠলেন পুরন্দর, 'ভুল আবার কী! ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না। তোমার ছেলের মাথায় কিস্যু নেই। ও...ও একটা শম্বুক নাড়ুগোপাল!'

বিকুন তো একেবারে থ। শম্বুক মানে যে শামুক সেটা ও জানে। কিন্তু শামুক আর নাড়ুগোপালের মধ্যে কোথায় যে মিল তা ওর মাথায় ঢুকছে না। তা ছাড়া, ওই দুটি বস্তুর সঙ্গে বিকুনেরই বা মিল কোথায়!

সোমা জানেন, ভীষণ রেগে গেলে পুরন্দর বিকুনকে 'তোমার ছেলে' বলে অভিযোগ করেন।

তিনি কোনওরকমে ঠান্ডা করতে চেষ্টা করলেন উত্তেজিত পুরন্দরকে, 'আহা, কী হয়েছে বলবে তো—।'

পুরন্দরের কথা থেকে ব্যাপারটা জানা গেল। তিনি সাধারণ একটা আয়-ব্যয়ের অঙ্ক বোঝাতে বসেছিলেন বিকুনকে। তাতে রয়েছে, রামবাবু মাসে ২০০০ টাকা আয় করেন, আর প্রতি মাসে তাঁর ১৬০০ টাকা করে খরচ হয়। তা হলে বছরের শেষে তাঁর সঞ্চয় কত? তা অঙ্ক কষা তো দূরের কথা, বিকুনের বক্তব্য, প্রতি মাসে সমান টাকা খরচ হতে পারে না—বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই! বাবাকে সে স্পষ্ট জানিয়েছে, 'তুমিই তো সবসময় এ-কথা বলো—।'

ব্যস, অঙ্ক উঠেছে মাথায়। বাবা-ছেলেতে লেগেছে তর্ক। পুরন্দর যতই বোঝান, 'এটা অঙ্ক।' বিকুন ততই বলে, 'না, অঙ্কে ভুল আছে।'

বিকুন যে মাথা নীচু করে এবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে সেটা খেয়াল করেছেন সোমা। তাই পুরন্দরকে বলেছেন, 'তুমি যাও তো, তাড়াতাড়ি চান করে তৈরি হও। ও-অঙ্ক আমি বুঝিয়ে দেব—।'

ফোঁস করে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরন্দর উঠে পড়লেন। তিনি যে পড়াশোনায় বরাবরই তুখোড় ছিলেন এটা আর কাউকে বলা যাবে না। সবই নিয়তি।

বিকুনকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা কম নয়। কী করে ছেলেটা এমন বোকা-সোকা হল! কেন ওর মাথায় একফোঁটা বুদ্ধি নেই? অথচ ওর দিদি ঝুনু লেখাপড়ায় কী দারুণ! মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পাঁচটা বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছিল, তা ছাড়া স্টার তো বটেই। সামনের বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সারাদিন শুধু মন দিয়ে পড়ে। মা-বাবা তো ভালো করেই জানেন, ঝুনু সবাইকে খুশি করার মতো রেজাল্ট করবে। আর তারই ছোটভাইয়ের কিনা এই দুরবস্থা!

পড়াশোনা করতে বিকুনের যে খুব একটা খারাপ লাগে তা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগে গাছপালা, পাখি আর প্রজাপতি দেখতে। সেগুলো দেখে ও যেসব রঙিন ছবি আঁকে তা দেখে বড়দের তাক লেগে যায়। তা ছাড়া, কবিতা আবৃত্তি করতেও বেশ লাগে ওর। পাড়ার দু-একটা ফাংশানে ও কয়েকবার আবৃত্তি করে বেশ প্রশংসাও পেয়েছে। তখন তো বাবা-মা দুজনেই ওকে আদর-টাদর করেছিলেন! অথচ অঙ্ক আর বিজ্ঞানের মাথা না খুললে সেই দুজন মানুষই কেমন যেন হয়ে যান। আচ্ছা, সবাই কি সব পারে! কেন যে সবসময় দিদির কথা বলে বিকুনকে সবাই খোঁচা দেয় কে জানে! দিদি মোটেই ছবি আঁকতে পারে না। আর আবৃত্তির ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।

কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, বিকুনকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই বাবা-মা বেশ মুশকিলে পড়ে যান। এমনকী অপ্রস্তুতের একশেষও হয়েছেন এক-একবার।

এই তো গত সপ্তাহে সোনামাসিরা বেড়াতে এসেছিলেন বিকুনদের বাড়িতে। সোনামাসি ভীষণ ভালোবাসেন বিকুনকে। সবসময় ওর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। সেদিন সন্ধেবেলা মাসি-মেসো, ওঁদের দুই ছেলেমেয়ে—নিশানদাদা আর রীতাদিদি, মা-বাবা, ঝুনু-বিকুন—সবাই মিলে খুব হই হুল্লোড়, গল্পগুজব হচ্ছিল। তারই মধ্যে বিকুন ফস্ করে হঠাৎ বলে বসেছে, 'সোনামাসি, জানো তো, স্কুলে বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধুমাস্টার বলে ডাকে।'

সোনামাসি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছেন, 'সে আবার কী নাম!'

বিকুন বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছে, 'বুঝলে না, যাদের মাথায় খুব বুদ্ধি—মানে, অনেক বুদ্ধিমানের মোট বুদ্ধির চেয়েও বেশি বুদ্ধি—তাদেরকেই বুদ্ধুমাস্টার বলে...বন্ধুরা বলেছে।'

হাসিঠাট্টার তাল কেটে গেল। সবাই চুপ। তারপর হাসিতে ফেটে পড়েছে নিশান, রীতা আর ঝুনু। বাবা আর সোনামেসো ওদের ধমক দিয়েছেন। বিকুন লক্ষ করেছে, মা-বাবার মুখ কেমন লালচে হয়ে গেছে। একটু পরেই মা ওকে নিয়ে চলে এসেছেন পাশের ঘরে। প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলেছেন, 'তোর কি কোনওদিন এতটুকু বুদ্ধি হবে না মাথায়!'

হয়তো সেই কারণেই পরদিন সকালে ঝুনু রবীন্দ্রনাথের 'মাকাল' কবিতাটি বিকুনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুই এবার থেকে শুধু এই কবিতাটাই আবৃত্তি

করবি, বুঝলি?' বলে ঝুনু বেরিয়ে গেছে কোচিং ক্লাসে।

বিকুন যখন সত্যি-সত্যিই সেটা মুখস্থ করে আবৃত্তির চেষ্টা করছিল তখন মা কোথা থেকে এসে ওকে থামিয়েছেন।

প্রায়ই এইরকম সব ব্যাপার হয় বলে বিকুন সবসময় ভাবে, ইস্‌ আমার যদি সত্যি-সত্যি অনেক-অনেক বুদ্ধি হত! মাঝে-মাঝে ও স্বপ্ন দেখে, চোখের পলকে কঠিন-কঠিন সব অঙ্ক কষে ফেলছে, আর বাবা-মা চোখ ছানাবড়া করে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন।

ক'দিন পর ঠিক এইরকম অবস্থাই হল পুরন্দরের। সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আয়েশ করে খবরের কাগজ পড়াটা তাঁর রোজকার অভ্যেস। সেদিন কাগজের তিন নম্বর পৃষ্ঠার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর চোখ ছানাবড়া, মুখ হাঁ। তিনি ভুল দেখছেন না তো! সাতবার পড়ার পরেও যখন বিজ্ঞাপনটা এতটুকু পালটে গেল না, তখন তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। পাশের টেবিলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে যেতে লাগল, কিন্তু পুরন্দরের চোখ বিজ্ঞাপনের দিকে একেবারে গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা।

বিজ্ঞাপনটা এইরকম ঃ

বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র
পরিচালক ঃ ড. বিকাশ বর্ধন (বিদেশ প্রত্যাগত)
এই চিকিৎসা কেন্দ্রে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের
আই. কিউ./বুদ্ধি বাড়ানো হয়। আধঘণ্টায়
নিশ্চিত ফল। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

তার নীচে সেই বিদেশ প্রত্যাগত ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে।

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সোমার নাম ধরে হাঁক পাড়লেন পুরন্দর। বিকুনের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার এরকম অপূর্ব সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে!

সোমা এসে হাজির হতেই পুরন্দর বিজ্ঞাপনটা ওঁকে দেখালেন। তারপর বললেন, 'আজ আর অফিস যাব না। ঝুনু কলেজে বেরিয়ে গেলে বিকুনকে নিয়ে চলো, আমরা এই সেন্টার থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখি না কী হয়!'

সোমা ইতস্তত করে বললেন, 'কত টাকা নেবে কে জানে! তা ছাড়া...ইয়ে...মানে, ঠকাবে না তো?'

'টাকার চিন্তা তুমি কোরো না—।' হাত নেড়ে জবাব দিলেন পুরন্দর, 'আর ঠকালেই হল! বিজ্ঞাপনে তো লিখেছে আধঘণ্টায় নিশ্চিত ফল। ফল না পেলে টাকা দেব কেন।'

সুতরাং বিকুনকে সঙ্গে নিয়ে সোমা এবং পুরন্দর কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক দশটার সময় বেরিয়ে পড়লেন বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধি অভিযানে। ট্যাক্সি ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র'র ঠিকানায়।

কেন্দ্রের চেহারাটা বেশ আহামরি। কাচের দরজা। তার ওপরে ডক্টর বিকাশ বর্ধনের নাম লেখা। নামের শেষে ডিগ্রি জানাতে ইংরেজি বর্ণমালার প্রায় ছাব্বিশটা হরফই ফুটকি দিয়ে বসানো। আর তার পাশে 'বিদেশ প্রত্যাগত' ব্যাপারটাও জানানো আছে।

চেম্বারে ঢুকে একজন রিসেপশনিস্টের কাছে নাম-ধাম ইত্যাদি বিবরণ লিখে দিলেন পুরন্দর। তারপর সোমা আর বিকুনকে নিয়ে একটা লম্বা সোফায় বসলেন। ঘরে আরও কয়েকজন বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই কেমন একটা আশঙ্কার ভাব।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি একটা পার্সোনাল কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে ছিল, আর তার কি-বোর্ডের বোতাম টেপার ফাঁকে-ফাঁকে পাশে রাখা একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে কীসব কথা বলছিল। হঠাৎই ফোন নামিয়ে রেখে সে ডেকে উঠল, 'মিস্টার নকুল সামন্ত।'

ঘরের এককোণে বসে থাকা এক রোগামতন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি—।'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভেতরের দিকে যাওয়ার একটা কাচের দরজা দেখিয়ে বলল, 'যান, ভেতরে যান ছেলেকে নিয়ে।'

নকুল সামন্ত তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বিকুন এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। তিনটে কী সুন্দর-সুন্দর ক্যালেন্ডার! একটাতে পাহাড়ের ছবি, একটায় জঙ্গলের মাঝে হাতির পাল, আর একটাতে হাতে আঁকা নদী আর গাছপালা। এ ছাড়া, আরও একটা বিশাল রঙিন ছবি টাঙানো রয়েছে ঘরে ঃ মানুষের মগজের ছবি। ছবিতে অনেকগুলো লাল-নীল তিরচিহ্ন আঁকা। তাদের পাশে-পাশে ইংরেজিতে অনেক কথা লেখা।

হঠাৎই ভেতরের দরজা ঠেলে তিনজন বেরিয়ে এল বাইরে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা, আর একটি বছর আটেকের মেয়ে। মেয়েটির চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বাইরের দরজার দিকে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই মেয়েটি হঠাৎ বিরক্তভাবে বলল, 'বাপি, আমার চশমার ডানদিকের লেন্সের ফোকাল লেংথটা ঠিক নেই—দু-মিলিমিটারের মতো গোলমাল রয়েছে।'

পুরন্দর লক্ষ করলেন, বাবা-মা বেশ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে-করতে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিকুনের ডাক পড়ল।

ভেতরের ঘরে ঢুকে তো সোমা আর পুরন্দরের একেবারে তাক লেগে

যাওয়ার জোগাড়। বিকুনও বেশ অবাক হয়ে গেল। ও হাঁ করে সবকিছু দেখতে লাগল।

বেশ বড় ঘর। ঘরটা সিনেমা হলের মতো ঠান্ডা। তার একপাশে বিশাল টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন বেঁটেখাটো একজন টাক-মাথা মানুষ। পোশাকে বেশ চেকনাই রয়েছে। গলায় স্টেথো, ঠোটের ফাঁকে চুরুট। চুরুটটা নিভে গেলেও ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পাননি, কারণ মাঝে-মাঝেই ওটাকে নেড়েচেড়ে টান মারছেন। আর তাঁর মুখে সবসময়েই একটা হাসি লেগে রয়েছে।

ঘরের দেওয়ালে নানারকম রঙিন চার্ট আর ছবি টাঙানো। একপাশে নানা যন্ত্রপাতি আর একটা অদ্ভুত ধরনের গদিওয়ালা চেয়ার।

পুরন্দরদের দেখে ভদ্রলোক চুরুটটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর একগাল হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আসুন-বসুন। আমারই নাম ডক্টর বিকাশ বর্ধন। তবে ওটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম হরিপদ তলাপাত্র। বুঝতেই পারছেন, নামটাই এমন যে, ও-নাম শুনে রুগিটুগি বিশেষ আসত না। তাই নাম পালটে বিকাশ বর্ধন নাম নিয়েছি। নামটা এমনিতে বেশ ভালো—তার ওপর বুদ্ধি বাড়ানোর কাজ নিয়ে যখন আছি তখন "বিকাশ", "বর্ধন"—এইসব ক্যাচি ওয়ার্ডগুলো পেশেন্টদের মা-বাবাদের কাছে খুব এফেক্টিভ হবে।'

পুরন্দর আর সোমা হতবাক হয়ে ডাক্তারবাবুটিকে দেখছিলেন। ছদ্মনামধারী ডাক্তার! এঁর কাছে এসে ওঁরা ভুল করেননি তো! প্রায় ধপাস করেই ওঁরা দুজনে বিকাশ বর্ধনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লেন। সোমা হাত ধরে টেনে বিকুনকে বসিয়ে দিলেন নিজের পাশের চেয়ারটিতে।

'ডাক্তার জেঠু, আপনি ফরেনে গিয়েছিলেন?' ফস্ করে প্রশ্ন করে বসল বিকুন।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। বললেন, 'হ্যাঁ, জেঠু, ফরেন... ইয়ে...মানে নেপাল আর ভুটানে আমি অনেক বছর ছিলাম। ওখানেও এই বুদ্ধিতে শান দেওয়ার কাজ করতাম।'

'ডাক্তারবাবু, আমাদের এই ছেলেটার মাথায় ভীষণ বুদ্ধি কম। যদি আপনি ওর একটা ব্যবস্থা করেন...।' সোমা রীতিমতো কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন।

'নো প্রবেলম।' বলে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলেন বিকুনের কাছে। তারপর সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুদ্ধি বেশি হলে আমার কাছে কেউ আসে না।'

এইবার বিকুনকে লক্ষ্য করে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'বলো তো জেঠু, ইফ যদি ইজ হয় বাট কিন্তু হোয়াট মানে কী?'

বিকুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

ডক্টর বর্ধন হাতে হাত ঘষে আবার হাসলেন। বিকুনের দিকে সামান্য ঝুঁকে

পড়ে বললেন, 'পারলে না তো! ওই সেনটেন্সটার মধ্যে, ইফ, ইজ, বাট আর হোয়াট শব্দগুলোর বাংলা মানে কায়দা করে বলা আছে।'

সোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ডাক্তারবাবুর ওপরে ওঁর ভরসা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

এইবার টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কী যেন পড়লেন ডক্টর বর্ধন। তারপর বিকুনের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ভালো নাম শুভঙ্কর মিত্র?'

বিকুন ঘাড় নাড়ল।

'বাঃ, চমৎকার নাম! এইবার এসো তো, শুভঙ্করবাবু, এদিকটায় এসে বসো তো এই চেয়ারটায়—।' বিকুনকে ডেকে বিশেষ ধরনের গদিওয়ালা চেয়ারটায় বসতে বললেন বিকাশ বর্ধন। তারপর সোমা আর পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আই. কিউ. মিটার দিয়ে ওর আই. কিউ.-টা প্রথমে একবার টেস্ট করে নেব।'

বিকুন ভয়ে-ভয়ে গদিওয়ালা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। ডক্টর বর্ধন কাপের মতো ছোট-ছোট চারটে টার্মিনাল লাগিয়ে দিলেন ওর মাথার চারপাশে। তারপর দূরে একটা বোর্ডের কাছে সুইচ অন করে একটা ডিজিটাল মিটারে কীসব দেখলেন। পরক্ষণেই সুইচ অফ করে আক্ষেপের 'চুকচুক' শব্দ করলেন, মাথা নাড়লেন ধীরে-ধীরে। বললেন, 'খুবই স্যাড ব্যাপার। শুভঙ্করকে নিয়ে আপনাদের তো প্রবলেম হবেই। ওর আই. কিউ. মাত্র ৮৮। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক বলা হয়, তাদের আই. কিউ. হয় ১০০। আর যাঁরা খুব নামকরা বিজ্ঞানী, তাঁদের আই. কিউ. জেনারেলি খুব বেশি হয়। যেমন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আই. কিউ. ছিল ১৪৬।'

পুরন্দর আমতা-আমতা করে বললেন, 'বিকুনের—মানে, শুভঙ্করের আই. কিউ.-টা ওইরকম বাড়িয়ে দেওয়া যায় না?'

ঘাড় নাড়লেন ডক্টর বর্ধন। হেসে বললেন, 'যায়, যায়, নিশ্চয়ই যায়। তবে বুঝেশুনে ধাপে-ধাপে বাড়াতে হবে—যাতে ও বুদ্ধিবৃদ্ধির চাপটা সইতে পারে। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওটা আমার ব্যাপার। আজ আমি কয়েকটা স্পেশাল ডোজ দিয়ে ওর বুদ্ধি বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওর ব্রেনের, মানে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্যারিটাল লোব আর ফ্রন্টাল লোবে একটু এক্সাইটিং সিগনাল দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। নানারকম সেন্স আর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি প্যারিটাল লোব থেকেই জন্ম নেয়। আর ফ্রন্টাল লোবের কাজ হল যুক্তিপ্রয়োগ আর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সাহায্য করা। এই দুটো লোবকে একটু চাঙ্গা করে দিলেই শুভঙ্করের বুদ্ধি বেড়ে যাবে। তবে এই বাড়তি বুদ্ধির এফেক্ট মাত্র তিনদিন—মানে ৭২ ঘণ্টা থাকবে। যদি ব্যাপারটা ঠিকমতো শুভঙ্করের সুট করে যায় তা হলে আর কোনও প্রবলেম নেই—তিনদিন পর ওকে নিয়ে আসবেন, ওই বর্ধিত বুদ্ধিটা একেবারে

পারমানেন্ট করে দেব। মানে, কংক্রিট ঢালাই যাকে বলে—।'

কথা বলতে-বলতে শুভঙ্করের চেয়ারের মুখোমুখি রাখা কয়েকটা লোহার স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেছেন ডক্টর বর্ধন। তারপর একটা বড় বাক্স থেকে চারটে বড়-বড় চাকতি বের করে পাশাপাশি দাঁড় করানো স্ট্যান্ডগুলোয় ফিট করে দিয়েছেন। চক্রগুলোয় দাবার ছকের মতো কালো-সাদা ছক কাটা রয়েছে। সেই ছকগুলো চক্রের কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে মাপে ক্রমশ বড় হতে-হতে এগিয়ে এসেছে চক্রের কিনারায়।

বিকাশ বর্ধন কোথায় কী একটা বোতাম টিপে দিতেই চক্রগুলো ধীরে-ধীরে ঘুরতে শুরু করল।

এইবার সুইচ টিপে ঘরের সবক'টা আলো নিভিয়ে দিলেন তিনি। তারপর হঠাৎই দেখা গেল চারটে জোরালো আলোর ছটা এসে পড়েছে চারটে চক্রের ওপরে। বিকুনের মাথায় লাগানো টার্মিনালগুলো পালটে দিয়ে আরও কীসব সুইচ খটাখট করে বিকাশ বর্ধন গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিকুনবাবু, তুমি পালা করে পরপর ওই চারটে চক্রের দিকে একমনে তাকিয়ে যাও। লক্ষ্মী ছেলে! দেখবে, একটু পরেই তোমার বুদ্ধি বেড়ে যাবে। আর তোমার লেখাপড়ার খিদে এমন বেড়ে যাবে যে, সবাই একেবারে চমকে যাবে।'

হালকা আলোর আভায় বিকাশ বর্ধনের মুখ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর চোখেমুখে উৎসাহ আর আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

বিকুন কেমন যেন ঝিমুনির ঘোরের মধ্যে বলে উঠল, 'ডাক্তার জেঠু, শুধু চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই তোমার বুদ্ধি একেবারে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।'

'আমার মাথার ভেতরটা কেমন চুলকোচ্ছে—' বিকুন একটু ভয়ার্ত গলায় বলল, 'যেন অনেকগুলো শুঁয়োপোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে...।'

'ইউরেকা! শুঁয়োপোকা! ব্রেনোটিকা!' উৎফুল্ল হয়ে হাতে হাত ঘষলেন বিকাশ বর্ধন ঃ 'সাকসেসফুল, মিস্টার মিত্র, সাকসেসফুল! ওই শুঁয়োপোকার ব্যাপারটাই হল আসল—মানে, ওটাই হল মগজের ভেতরে বুদ্ধির কামড়। আর কোনও চিন্তা নেই আপনাদের। আজ বুধবার। আপনারা শনিবার এরকম সময়ে শুভঙ্করকে আমার এখানে নিয়ে আসুন—তখন একেবারে ফাইনাল ঢালাই করে দেব।'

মাত্র ৫০০ টাকা নিলেন বিকাশ বর্ধন। পুরন্দর যা ভেবেছিলেন তার তুলনায় বলতে গেলে একেবারে জলের দর।

'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র' থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে সোমা চাপা গলায় পুরন্দরকে জিগ্যেস করলেন, 'কী গো, ডাক্তারবাবু তো বললেন ওর বুদ্ধি বেড়ে গেছে, কিন্তু আমরা বুঝব কেমন করে!'

বিকুন মা-বাবার একটু আগে-আগে হাঁটছিল। হঠাৎই পিছনে তাকিয়ে সোমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'মা, তুমি একটু সাবধানে হাঁটো। এ-জায়গাটার মেঝের সঙ্গে তোমার জুতোর হিলের কোইফিশেন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন ভীষণ কম। সাবধানে না হাঁটলে তুমি পা পিছলে পড়ে যাবে—।'

সোমা বিকুনের কথা শুনতে-শুনতে সত্যিই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন, পুরন্দর ওঁকে সময়মতো ধরে ফেলে পদভঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তারপর অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ফ্রিকশন বললি?'

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বিকুন বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, 'স্ট্যাটিক কোইফিশেন্ট অফ ফ্রিকশন—স্থিতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। মেঝের সঙ্গে মায়ের জুতোর হিলের যে ঘষা লাগছে তা থেকে এটা হিসেব কষে বের করা যায়। সে ভীষণ জটিল ব্যাপার...।'

পুরন্দর ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু খুশিও হলেন ভেতরে-ভেতরে। ঘণ্টা দেড়েক আগে শোনা আট বছরের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। চশমার লেন্সের ফোকাল লেংথের গোলমাল নিয়ে কী যেন বলছিল মেয়েটা। এইটুকু এইটুকু বাচ্চা ছেলেমেয়ে এরকম সব দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলছে! বিকাশ বর্ধনের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে কি এইরকমই হয়?

বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকবার পুরন্দর আর সোমাকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হল। কারণ ফ্রিকশনের কীসব দিয়ে শুরু করেছিল বিকুন, পথে গতিবেগ, ত্বরণ, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের শতকরা হিসেবের গরমিল, বুলবুলি পাখি কেন সাধারণত জোড়ায়-জোড়ায় থাকে, পিঁপড়ে কেন লাইন ধরে চলে—এসব বিষয় নিয়ে পুরন্দর আর সোমাকে প্রায় কাহিল করে দিল।

দুপুরে বাড়ি ফিরে পুরন্দর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র'র গোটা ব্যাপারটা তাঁর কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

একটু দম নিয়ে পুরন্দর যখন স্নান করতে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন, বিকুন স্নানটান সেরে ডাইনিং টেবিলে বসে অঙ্ক বই নিয়ে একমনে পাতা ওলটাচ্ছে। পুরন্দর খুশি হলেন। যাক, ছেলেটার তাহলে অঙ্কে আগ্রহ বেড়েছে!

তিনজনে যখন খাওয়া শুরু করলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পুরন্দর গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, 'অঙ্ক বই নিয়ে কী করছিলি?'

একগ্রাস ভাত মুখে পুরে দিয়ে বিকুন নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্কগুলো একবার করে কষে নিলাম।'

পুরন্দরের খাওয়া থেমে গেল।

সোমার হাতে ধরা ডালের হাতা থেকে ডাল চলকে পড়ে গেল।

মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলেছে বিকুন!

পুরন্দর তাকালেন সোমার দিকে। সোমার কপালে ভাঁজ পড়েছে। ওঁরা দুজনে হাঁ করে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

*

এরপর প্রায় দেড় দিন বিকুন শুধু বইপত্র নিয়ে কাটাল।

নিজের যত বইখাতা তার সমস্ত লেখা গোগ্রাসে গিলল। তারপর শুরু করল তিনরকম ডিক্‌শনারি আর দিদির বই। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে পাড়ার লাইব্রেরিতে হানা দিল। এ ছাড়া, আরও কোথায়-কোথায় যে ও ঘুরে বেড়াল কে জানে!

যতক্ষণ ছেলেটা বাড়িতে থাকে ততক্ষণই নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ওর যত অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা।

একদিন সন্ধেবেলা ঝুনু মাকে বলছিল, পাশেই ওর বন্ধু অরুণাদের বাড়িতে যাবে ভিডিয়োতে সিনেমা দেখতে। বিকুন ইংরেজি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। ফস্‌ করে জিগ্যেস করল, 'দিদি, বলতো, ভিডিয়ো কথাটার মানে কী?'

ঝুনু ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল মায়ের দিকে। ওর মুখ বেজার। এ আবার কী বিপদ!

বিকুন বলল, 'ভিডিয়ো মানে হচ্ছে, আমি দেখি। তেমনই অডিয়ো মানে হচ্ছে, আমি শুনি। এ দুটোই ল্যাটিন শব্দ।'

ঝুনু বেশ ভয়ের চোখে ভাইকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিন রাতেও সেই একই ব্যাপার।

রেডিয়োতে গান শোনা পুরন্দরের বরাবরের অভ্যাস। নিজে এককালে সংগীতচর্চা করতেন, হয়তো সেইজন্যই। ট্রানজিস্টর রেডিয়ো হাতে নিয়ে মেজাজে আধুনিক গান শুনতে-শুনতে এঘর-ওঘর আর বারান্দা করছিলেন তিনি। বিকুন হঠাৎই বলে উঠল, 'বাবা, বড্ড ডপ্‌লার এফেক্ট হচ্ছে।'

'ডপ্‌লার এফেক্ট!' পায়চারি থামিয়ে চোখ কপালে তুললেন পুরন্দর।

'জানো না, চলতে-চলতে শব্দ করলে সেই শব্দ যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শোনে, তার মনে হয় শব্দের কম্পাঙ্ক পালটে গেছে!'

পুরন্দরের বিষয় ছিল ইকনমিক্স। ডপ্‌লার কী-না-কী—এই ব্যাপারটা বোধহয় বিজ্ঞানের। কিন্তু তিনি ধৈর্য না হারিয়ে বিকুনের খুব কাছে এসে মোলায়েম গলায় জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপারটা আর-একটু খোলসা করে বল তো—ঠিক বুঝলাম না।'

বিকুন নড়েচড়ে বসল। বলল, 'শোনো। তুমি ধরো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ। আর দূর থেকে হুইসল বাজিয়ে ট্রেন আসছে। তখন তোমার কানে হুইসলের শব্দটা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ শোনাবে। মানে হুইসলের শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে বলে মনে হবে। আবার এর উলটোটাও হতে পারে। ট্রেন যখন হুইসল বাজিয়ে

তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে তখন সেই শব্দের তীক্ষ্ণতা অনেক কম মনে হবে। এই ব্যাপারটা প্রথম ব্যাখ্যা করেন অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী সি. জে. ডপ্‌লার।'

পুরন্দর ছেলের কথা শুনতে-শুনতে রেডিয়োর সুইচ অফ করে দিয়েছিলেন। এবার হাঁ করে নিজের ছেলেকে দেখতে লাগলেন।

বিকুন এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'এরকম করে তাকিয়ে থেকো না, বাবা, তোমার রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। রেটিনায় যেসব রড আর কোন রয়েছে...।'

পুরন্দর ছেলেকে বাধা দিলেন, 'থাক, থাক, আর তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—।'

তখন বিকুন বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। পাখার আর. পি. এম.-টা একটু বাড়িয়ে দেবে, বাবা?'

'আর. পি. এম.!'

'রিভোলিউশান্‌স পার মিনিট—সংক্ষেপে আর. পি. এম.। তোমরা যাকে চলতি কথায় স্পিড বলো আর কী!'

পাখার স্পিড বাড়িয়ে ফুলস্পিড করে দিলেন পুরন্দর। তারপর মানে-মানে সরে পড়লেন ছেলের কাছ থেকে।

রাতে এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে একটু আলোচনা করতে চাইলেন পুরন্দর।

সোমা প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় নিজের হেনস্থার কথা জানালেন স্বামীকে। বললেন, 'আর বোলো না! আজ সকালে বিকুন রান্নাঘরে ঢুকে আমাকে খাবার-দাবারের ক্যালরি, মেটাবলিজ্‌ম, গ্যাসের দহন, পরিবেশ দূষণ এসব নিয়ে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। তারপর বলে কী, নুনের মধ্যে আছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন। নুন নোনতা। আর চিনির মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। চিনি মিষ্টি। এরকম তফাত হল কেন? তারপর টাইঅ্যালিন নামে কী একটা জিনিসের নাম করে বলল, ওটা নাকি একটা এনজাইম, আমাদের থুতুর মধ্যে আছে। আবার সেটার বানান নাকি 'পি' অক্ষর দিয়ে শুরু। আমি তখন তরকারিতে হলুদগুঁড়ো দিচ্ছিলাম, বলে কি হলুদের মধ্যে কী-কী রাসায়নিক উপাদান আছে বলো তো মা।' সোমা কাতর গলায় অনুযোগ করে বললেন, 'তুমি বলো, এসব আমি কখনও বলতে পারি?'

পুরন্দর সিগারেট খাচ্ছিলেন। তাতে হিংস্রভাবে এক লম্বা টান মেরে বললেন, 'বিকাশ বর্ধন বলেছিলেন, ঠিক তিনদিন এর এফেক্ট থাকবে। তিনদিন শেষ হতে আর কত ঘণ্টা বাকি আছে বলো তো?'

সোমা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'প্রায় সাঁইতিরিশ ঘণ্টা!'

সাঁইতিরিশ ঘণ্টা! সাঁইতিরিশ ঘণ্টা বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধির এফেক্ট ঠিকমতো সহ্য করতে পারলে হয়! ভাবলেন পুরন্দর।

*

ব্যাপারটা যে ঝুনুর পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা পরদিন ওর অসহায় অবস্থা দেখেই বোঝা গেল। ও মাকে এসে অভিযোগ জানাল, বিকুনের সঙ্গে এক ঘরে বসে ও আর পড়বে না। বিকুন প্রায় মিনিটে-মিনিটে ওকে থামিয়ে দিয়ে কীসব উলটোপালটা বোঝাচ্ছে।

সোমা ঝুনুকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঝুনুর তখন শান্ত হওয়ার মতো মনের অবস্থা আর নেই। ও প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'সব তো মনে নেই...তবুও ওর যে ক'টা প্রশ্ন মনে আছে শোনো। ওডোমিটার কাকে বলে? ইংল্যান্ডের কোন রাজা ইংরেজি বলতে পারতেন না? জেরান্টোলজিস্টরা কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন? মোটরগাড়ির চাকায় খাঁজ কাটা থাকে কেন? বাংলাভাষায় কোন তিনটে অক্ষরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি? ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে বিজ্ঞানী স্টিফেন কী যেন...।'

সোমা সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'এ কী বিপদে পড়লাম বল তো! এ কী সর্বনাশ হল আমাদের!'

ঝুনু হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আর সর্বনাশ! অপর্ণাদি বলেছেন বিকুন সামনে বসে থাকলে উনি আমাকে আর পড়াবেন না।'

অপর্ণাদি ঝুনুর প্রাইভেট টিউটর। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। প্রায় তিনবছর ধরে ঝুনুকে পড়িয়ে আসছেন।

সোমা কান্না থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে জিগ্যেস করলেন, 'সে কী! অপর্ণাদিকে বিকুন আবার কী করেছে?'

'কী আবার, ওই আই. কিউ.-র ওভারডোজ!' বিরক্তভাবে বলল ঝুনু।

সোমা দুশ্চিন্তায় চোখ বুজে ফেললেন। বোধহয় ভগবানের নাম-টাম নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সত্যি, শেষ পর্যন্ত কী যে হবে কে জানে! ছেলেটা এ দু-দিনে একটাও ছবি আঁকতে বসেনি, এক লাইনও কবিতা আওড়ায়নি। বারান্দায় একটিবারও যায়নি গাছপালা বা পাখি দেখতে। তা ছাড়া, বিকেলে আজ আর খেলতে বেরোয়নি। কাল সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর গলায় মাকে বলেছে, 'আমি আর টিটো, তাতন, চুনির সঙ্গে খেলব না। ওরা আমার সঙ্গে খেলতে চাইছে না।'

সোমা ব্যাপারটা খানিক যেন আঁচ করতে পারলেন। তবু জানতে চাইলেন, 'সে কী রে, কেন?'

বিকুন গজগজ করতে-করতে উত্তর দিল, 'কে জানে কেন! আমি কাল বল খেলার সময় ওদের বারনুলির থিয়োরেম আর ম্যাগনাস এফেক্টের কথা জিগ্যেস করেছিলাম। তাতে ওরা কেমন ভয় পেয়ে গিয়ে আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল।'

সোমা অবাক হলেন না। কারণ আজ প্রায় একই কারণে বিকুনের স্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই ফোন করেছিলেন পুরন্দরের অফিসে। ফোন করে তিনি বলেছিলেন, 'আপনার ছেলের মাথায় বোধহয় সামান্য কিছু প্রবলেম হয়েছে। সেটা সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওকে স্কুলে পাঠাবেন না। মাস্টারমশাইরা কেন জানি না খুব ভয় পেয়ে গেছেন।'

সোমা বেচারা ঝুনুকে একবার দেখলেন, তারপর আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ডক্টর বর্ধনের হিসেবমতো এখনও প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা বাকি।

চোদ্দো ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা বিকুন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সেটুকু সময়ই যা নিশ্চিন্ত! বাকি সময়টা পুরন্দর-সোমা বেশ ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছেন। ছেলেকে আশেপাশে দেখতে পেলেই পুরন্দর হয় বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছেন নয়তো সটকে পড়েছেন রাস্তায়। আর সোমা কাজের ছুতো করে সারাক্ষণ এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। ঝুনু বিজ্ঞ ভাইয়ের কবল থেকে বাঁচতে বইপত্র নিয়ে চলে গেছে অরুণাদের বাড়ি।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিকুনকে ঘিরে জড়ো হল সবাই। ও তখন একমনে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে। তখনকার মতো ওরা সরে গেলেও ঘুরে-ফিরে নজর রাখতে লাগল বিকুনের ওপরে। একটু পরেই দেখা গেল বিকুন ইংরেজি কাগজের ক্রসওয়ার্ডটা চটপট সল্‌ভ করছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই বিকুন মুখ তুলে বাবা-মা-দিদিকে একবার সামান্য অবাক চোখে দেখল, তারপর আবার মন দিল শব্দছকের দিকে।

পুরন্দর আজ অফিস কামাই করেছেন। ঝুনুও কলেজে যায়নি। বিকাশ বর্ধনের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আজ বারোটা নাগাদ তাঁর অভিনব চিকিৎসার এফেক্ট শেষ হওয়ার কথা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে পুরন্দর বিকুনের কাছে হাজির থাকতে চেয়েছেন। কে জানে, নতুন করে আবার কোনও বিপত্তি হবে কি না! ঝুনুও একই আগ্রহে ক্লাস ডুব মেরেছে। আর সোমা বারবার তাকাচ্ছেন দেওয়াল ঘড়ির দিকে। সময়টা ঠিক কখন?

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘটনাটা ঘটল। শব্দছকের শেষ শব্দটা খুঁজতে গিয়ে আটকে গেল বিকুন। ওর দুচোখে কেমন এক শূন্যদৃষ্টি। একটা হাত এলোমেলোভাবে মাথায় বোলাচ্ছে। ওর মুখ থেকে 'উঃ', 'আঃ', 'ইস' ইত্যাদি টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছে থেকে-থেকে।

পুরন্দর অতি উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কীরে, লাস্ট শব্দটা পারছিস না?'

বিকুন কেমন বিমূঢ় গলায় জবাব দিল, 'না। দেখো না, শব্দটা একেবারে মাথায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু ফস্ করে কী যে একটা ওলটপালট হয়ে গেল...।'

পুরন্দর খুশির এক চিৎকার করে সোমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একছুটে ওর অঙ্ক বইটা নিয়ে আসি। ওটা দিয়েই ফাইনাল টেস্ট করব...।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুরন্দর ঘর থেকে উধাও। আর সোমা বিকুনের কাছটিতে এসে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ঝুনু তখনও অবাক চোখে ভাইকে দেখছে।

বলতে গেলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই পুরন্দর সেই অঙ্ক বই নিয়ে বিকুনের সামনে এসে হাজির, এবং চোখের পলকে আয়-ব্যয়ের সেই সহজ অঙ্কটি মেলে ধরেছেন ছেলের সামনে।

'বল তো! এই সহজ অঙ্কটা মুখে-মুখে বুঝিয়ে দে তো আমায়।'

বিকুন গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে অঙ্কটা রিডিং পড়ল। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মন্তব্য করল, 'অঙ্কটায় ভুল আছে, বাবা। প্রতি মাসে কখনও সমান টাকা খরচ হতে পারে না। বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই!'

আর যায় কোথায়! পুরন্দর হাত-পা শূন্যে ছুড়ে পাক্কা দু-হাত লাফিয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'হিপ হিপ হুররে! সোমা, দ্যাখো, দ্যাখো, বিকুন আবার অঙ্কে কাঁচা হয়ে গেছে। ওঃ, বাঁচা গেল!'

সোমা ছেলেকে একেবারে জাপটে ধরলেন। ওঁর চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, 'বুঝলে, আমার বোকাসোকা সুন্দর ছেলেটাই অনেক ভালো। ওর মুখটা কী মিষ্টি! কী সুন্দর আঁকতে পারে ও! আর আবৃত্তিতে তো একেবারে চ্যাম্পিয়ান! আমার আর বুদ্ধিমান ছেলের দরকার নেই গো!'

ঝুনু বিকুনের ছোট্ট মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নরম গলায় বলল, 'মা, যা স্বাভাবিক তাকে কখনও চাপ দিয়ে বোধহয় পালটাতে নেই। পালটালে তার ফল ভালো হয় না—।'

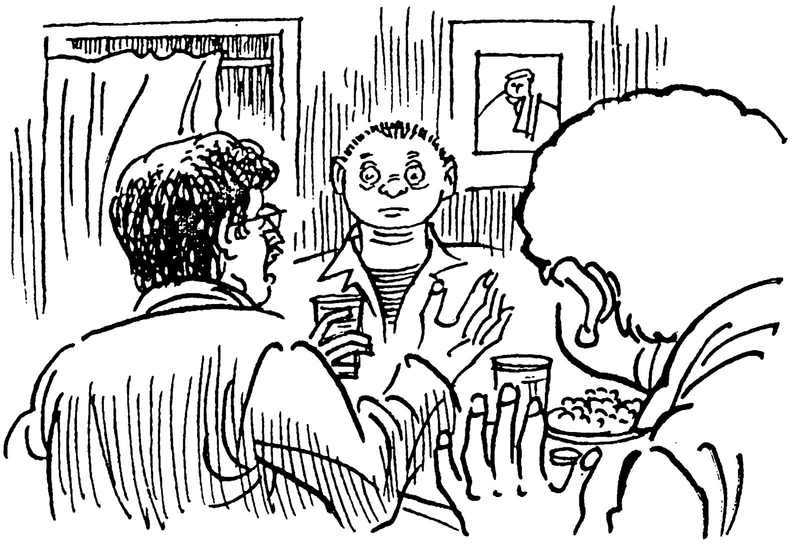
পুরন্দর হেসে বললেন, 'এইজন্যেই কথায় বলে, খোদার ওপর খোদকারি করতে নেই। আমি যাই, যতই বেলা হোক, এককেজি মুরগির মাংস নিয়ে আসি। বিকুনের অনারে আজকের স্পেশাল মেনু কষা মাংস আর পরোটা উইথ জলপাইয়ের চাটনি। ঝুনু, আজ তুই মায়ের সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাবি।'

বাজারের থলে হাতে বেরোনোর সময় সোমার কানের কাছে মুখ এনে পুরন্দর চাপাগলায় বললেন, 'ভাগ্যিস হরিপদ তলাপাত্রের কথায় বিকুনের বুদ্ধিটা ফাইনাল ঢালাই করিনি! তা হলে এক্ষুনি হয়তো ছেলেটা আমাকে মুরগির মাংসের কেমিক্যাল কম্পোজিশন জিগ্যেস করে বসত।'

স্বামীর কথায় সোমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

দুপুরের রোদ তখন জানলায় খেলা করছে।





ভোলাকে ভোলা যাবে না কিছুতেই

না, ভোলাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যাবে না। তার মানে এমন নয় যে, আমি ওকে ভুলতে চেষ্টা করেছি। বরং এটাই আমি সাদা-কালোয় জানাতে চাই, ওকে ভুলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও এমন সব কাণ্ড করেছিল যে, এই তিরিশ-বত্রিশ বছরেও ওর ছবিটা এতটুকু মলিন হয়ে যায়নি।

অনেকে ভাবতে পারেন, এ আর এমনকী! অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকেই তো আমরা চিরদিন মনে রাখি! তা হলে ভোলাকে ভুলতে না পারার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে!

আছে এই কারণেই যে, ভোলা মানুষ নয়—রোবট।

এইবার বলুন, আজকের এই কলকবজার যুগে একটা যন্ত্রের কথা এতবছর ধরে কেউ মনে রাখতে পারে—যদি না সেই যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত কিছু থাকে!

আজ সেই ভোলার কথাই বলব।

খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গিয়েছিল। আমার বাবা যখন আমাকে নিয়ে বেজায় হিমশিম খাচ্ছে, তখনই 'এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি' থেকে ভোলাকে নিয়ে আসে। ভোলা ছিল ভি. এক্স.-থ্রি মডেলের 'ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট', অর্থাৎ, গৃহস্থের উপযুক্ত সঙ্গী রোবট।

এসব কথা আমি বড় হয়ে বাবার কাছে শুনেছি।

ছোটবেলা থেকেই ভোলাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়াটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। একবারের জন্যেও মনে হয়নি ও যন্ত্রদাস কিংবা রোবট।

ভোলার চেহারায় চোখে পড়ার মতো আলাদা কিছু ছিল না। ও যে আসলে কী, সেটা ওকে দেখে একটুও বোঝা যেত না। তবে চলাফেরা কথাবার্তায় ব্যাপারটা আঁচ করা যেত।

ভোলার মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখটা গোল ধরনের। চোখজোড়া সবসময়েই ছানাবড়া—যেন কোনও কিছু দেখে অবাক হয়ে গেছে। গায়ে রংচঙে হাফশার্ট, পায়ে ডোরাকাটা পাজামা। হাত-পাগুলো সরু-সরু হলেও তেমন বেমানান নয়। আর উচ্চতা ছিল চার ফুট।

ভোলার সঙ্গে খেলাধুলো করে আমার দিব্যি সময় কাটত। খেলতে-খেলতে আমি একসময় হাঁফিয়ে পড়তাম, ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ধপাস করে বসে পড়তাম মেঝেতে।

ভোলা কিন্তু মোটেই ক্লান্ত হত না, হাঁফাত না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছানাবড়া চোখে আমাকে দেখত। তারপর জিগ্যেস করত, 'কী হল, ভাইটি, আর খেলবে না?'

আমি বলতাম, 'না, ভোলা, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তোমার লাগছে না?'

'না, গো—আমার টায়ার্ড হওয়ার জো নেই।'

আমি অবাক হয়ে ভোলাকে দেখতাম। ভাবতাম, মানুষের চেয়ে যন্ত্রই ভালো—ইচ্ছেমতন যতক্ষণ খুশি খেলতে পারে।

প্রথম-প্রথম ভোলাকে আমি 'ভোলাদা' বলতাম। কিন্তু বাবা একদিন শুনতে পেয়ে আমাকে বারণ করল ঃ 'কী বলছ, সন্তু! রোবট আবার দাদা কীসের! ওকে তুমি নাম ধরেই ডাকবে—যেমন আমি ডাকি।'

ভোলা কিন্তু বরাবর আমাকে 'ভাইটি' বলেই ডাকত।

আমরা দুজনে সমসময় একসঙ্গে থাকতাম। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে ভোলার কাছে আমাকে নিশ্চিন্তে রেখে যেত।

আমার স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই ভোলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। বড় রাস্তা পার করে বাস ধরে আমাকে পৌঁছে দিত স্কুলে। তারপর সারাক্ষণ স্কুলের বাইরে একটা গাড়িবারান্দার নীচে বসে অপেক্ষা করত।

স্কুল ছুটি হলে আবার আমাকে আগলে নিয়ে আসত বাড়িতে।

ওকে নিয়ে সবচেয়ে ঝামেলা হত পরীক্ষার সময়। সবসময় কানের কাছে বলত, 'ভালো করে পড়ো, ভাইটি, ভালো করে পড়ো।' বাবা যত না বলত তার চেয়ে অনেক বেশি বলত ভোলা। পড়তে-পড়তে যখন আমি ঘুমে ঢুলে

পড়তাম তখন ভোলা আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকত ঃ 'ভাইটি, লক্ষ্মী আমার, ঘুমিয়ো না। কাল যে পরীক্ষা!'

আমি চোখ ডলে ঘুম তাড়িয়ে আবার পড়তে শুরু করতাম। কিন্তু খুব রাগ হত ভোলার ওপর। বলতাম, 'তোমার কি কখনও ঘুম পায় না!'

ভোলা হাসত। হাসলে ওর ঠোঁটটা সামান্য চওড়া হত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'ঘুম পেলে আমাদের চলে না, ভাইটি।'

অনেকসময় এমন হয়েছে যে, ইতিহাস পড়তে-পড়তে ভীষণ বিরক্ত হয়ে 'চটাস' শব্দে বই বন্ধ করে ফেলেছি ঃ 'দুর, কিচ্ছু মুখস্থ হতে চাইছে না! বারবার ভুলে যাচ্ছি।'

ভোলা তখন বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়েছে ঃ 'কই, আমায় বইটা দাও দেখি! কোন জায়গাটা বলো তো...।'

ওকে পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, 'শুধু সাল-তারিখ আর গুচ্ছের রাজা-বাদশার নাম! এসব কখনও সহজে মুখস্থ হয়!'

ভোলা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে দু-পলক তাকাল, তারপর বইটা বন্ধ করে বলল, 'নাও, তুমি এবার চোখ বুজে শুনে যাও। একমনে শুনবে কিন্তু...।'

ব্যস! ভোলা গড়গড় করে পৃষ্ঠাগুলো মুখস্থ বলে যেত আমার কানের কাছে। আর আমি ওর তাকলাগানো ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ওর মুখে শুনতে-শুনতে ইতিহাসের পড়া দিব্যি মুখস্থ হয়ে যেত।

আমি ভোলাকে বলতাম, 'আমার বদলে তুমি পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট অনেক ভালো হত।'

ভোলা প্রতিবাদ করে বলত, 'না, ভাইটি, আমি ফেল করতাম। কোথা থেকে কোন পর্যন্ত লিখতে হবে সেটাই তো আমি বুঝতে পারি না!'

'তা হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি পরীক্ষা দেব।'

আমার এই অদ্ভুত বায়না শুনে ভোলা হেসে বলত, 'ভাইটি, এভাবে পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করার মধ্যে কোনও আনন্দ নেই।'

আমি ওর কথাটা মন দিয়ে ভাবতাম। এতসব ও বোঝে কেমন করে!

আমার সঙ্গী হয়ে সময় কাটানো ছাড়াও কিছু-কিছু বাড়তি কাজ ভোলাকে করতে হত। যেমন, বাবার ফাইফরমাশ খাটা, দোকানে যাওয়া, টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিকের বিল জমা দিয়ে আসা—এইসব। কিন্তু এত কাজ করেও ভোলাকে কখনও বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। ওকে যদি জিগ্যেস করতাম, 'এত কাজ করতে-করতে কখনও তোমার বিরক্ত লাগে না?' তা হলে ও হয়তো হেসে বলত, 'বিরক্ত হলে আমাদের চলে না, ভাইটি।'

আমার দেখাদেখি ভোলা বাবাকে 'বাবা' বলেই ডাকত। বাবার অফিসের

ব্যাগটা হাতে তুলে দিত, জুতো পালিশ করে দিত, বাবা কখন অফিস থেকে ফিরবে জিগ্যেস করত, সাবধানে যাতায়াত করার জন্যে পরামর্শ দিত।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বাবা মাঝে-মাঝে আমাকে বলত, 'একটা ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবটের কাছ থেকে এত সার্ভিস পাব ভাবিনি।'

আমি কোনও জবাব দিতাম না। তবে ভোলার সঙ্গে 'রোবট', 'সার্ভিস', এই শব্দগুলো জুড়ে কথা বলাটা আমার ভালো লাগত না।

একদিন আমরা তিনজনে ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—আমি, বাবা, আর ভোলা। ছবিটার নাম 'দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক'। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আর নাচ-গান নিয়ে দারুণ জমাটি ছবি। হল থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎই শুনলাম ভোলা গুনগুন করে গান গাইছে ঃ 'ডো আ ডিয়ার, আ ফিমেল ডিয়ার/রে আ রে অফ গোল্ডেন সান/ মি আ নেম আই কল মাইসেল্‌ফ...।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ভোলা, ছবি কেমন লাগল?'

ভোলা বলল, 'দারুণ! যদিও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।'

বাবা হেসে বলল, 'যাক, ভোলা অন্তত সত্যি কথাটা বলেছে!'

আমি বললাম, 'রোবটরা মিথ্যে কথা বলে না, বাবা।'

ফেরার পথে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখনও আমরা একটা খালি ট্যাক্সি জোগাড় করতে পারিনি। ছাতা সঙ্গে না থাকায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করছি।

হঠাৎই একটা বিশাল অফিসবাড়ির আড়ালের এক অন্ধকার কোণ থেকে তিনটে ছায়া এগিয়ে এল আমাদের দিকে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পরনে টি-শার্ট আর চোঙা প্যান্ট।

খুব কাছাকাছি এসে একটা ছেলে বাবাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদা, ফুলকি হবে, ফুলকি?'

বাবা থতোমতো খেয়ে বলল, 'ফু-ফুলকি...মানে?'

তখন পাশ থেকে তার এক সঙ্গী কড়া মেজাজে মন্তব্য করল, 'আরে ফুলকি মানে আগুন—সালা ন্যাকাষষ্ঠী!' একটা সিগারেট কোথা থেকে বের করে ঠোঁটে রাখল সে।

এইবার বাকি দুজন বাবার দু-পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'মালকড়ি যা আছে ঝটপট দিয়ে দে।'

তিননম্বর ছেলেটা একটা ক্ষুর বের করে বাবার গলার পাশটায় চেপে ধরল।

আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের করতে পারছিলাম না।

তা ছাড়া, কাছাকাছি এমন কাউকে চোখেও পড়ল না যে আমাদের বিপদে এগিয়ে আসবে।

হঠাৎই ভোলা দিব্যি স্বাভাবিক গলায় আমায় বলল, 'ভয় পেয়ো না, ভাইটি। দেখছি কী করা যায়।' তারপর ছেলেগুলোকে লক্ষ্য করে ঠান্ডা এবং শান্ত গলায় বলল, 'বাবাকে ছেড়ে দাও। তা হলে তোমাদেরও আমি ছেড়ে দেব।'

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছেলে তিনটে খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল।

একজন পেটে হাত চেপে হাসতে-হাসতে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল। তারপর কোনওরকমে হাসির দমক কমিয়ে বলল, 'লে, চারফুটিয়া কী বলছে শোন।' তারপর বাচ্চাদের আধো-আধো উচ্চারণে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'ওলে বাবা! বিলাট মাছতান এচে গ্যাচে! পালা, পালা, ছিগ্‌গিল পালা!'

কথা বলতে-বলতে ছেলেটা ভোলাকে লক্ষ্য করে লাথি চালিয়েছে। ভোলা কিন্তু নড়ল না—চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোহার সঙ্গে মানুষের পায়ের সংঘর্ষ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে বিকট চিৎকার করে ছেলেটা বসে পড়ল রাস্তায়। ডান পা-টা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, আর কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

ক্ষুর হাতে ছেলেটা ভোলার মুখ লক্ষ করে অস্ত্রটা চালাল। ভোলা বাঁ-হাতে ওর ডানহাতটা খপ্ করে ধরে ফেলল। এবং ডানহাতে একটা মামুলি থাপ্পড় বসিয়ে দিল ছেলেটার গালে।

থাপ্পড়ের শব্দ কিংবা ফলাফল কোনওটাই মামুলি হল না।

ছেলেটার মুণ্ডুটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। চোয়ালের হাড়ও সরে গেল বোধহয়। ও ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

তিন নম্বর ছেলেটা ভীষণ বুদ্ধিমান। তাই ও চোখের পলকে বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ঘটনা আমাকে আর বাবাকে একরকম হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আমরা যেন আবার সিনেমা দেখছিলাম—যার নায়ক চারফুট উচ্চতার একটি নিরীহ গেরস্থালি রোবট।

আমাদের মাথা কাজ করছিল না। বুঝতে পারছিলাম না, থানায় যাব, নাকি অকুস্থল থেকে সরে পড়ব।

সমস্যাটার সমাধান করে দিল ভোলা।

একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে চট করে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। রাস্তায় পড়ে থাকা ছেলে দুটোকে দেখিয়ে বলল, 'এইমাত্র চারটে গুন্ডা এই ছেলে দুটোকে মারধোর করে পালিয়ে গেল। এক্ষুনি হয়তো গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। আমাদের

একটু হেল্‌প করুন—শিগগির এখান থেকে নিয়ে চলুন, ভালো বকশিশ দেব।'

বাড়িতে ফিরে ধাতস্থ হতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লাগল। তারপর বাবা ভোলাকে বলল, 'অতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার ঠিক হয়নি। যদি এরপর পুলিশের ঝামেলা হয়?'

আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকালাম। ভোলা মারাত্মক বিপদে আমাদের বাঁচাল, আর বাবা বলছে 'বাড়াবাড়ি'!

ভোলা গায়ের জামাটা ঠিকঠাক করতে-করতে বলল, 'ঝামেলা কিছু হবে না, বাবা। দেখবে, ওই ছেলেগুলোর নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় নাম আছে।'

বাবা যা-ই বলুক, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল, ভোলার কাছে আমাদের ঋণ থেকে গেল। বাবাকে এসব কথা কিছু বলিনি। কারণ, বললেই বাবা হয়তো বলে বসবে, 'রোবটের কাছে আবার ঋণ কীসের! যতসব আজগুবি ভাবনা!'

এর কয়েকমাস পর বাবা বাড়িতে একটা কম্পিউটার কিনে নিয়ে এল। তারপর থেকেই বাবা ওই যন্ত্রটা নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। সময় পেলেই শুধু কম্পিউটারের কি-বোর্ড নিয়ে মেতে ওঠে। আর আমাকেও একটু-আধটু শিখিয়ে দেয়।

তখন থেকে বাবা প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে, 'ভোলাটার যদি ঘটে আর-একটু বুদ্ধি থাকত তা হলে ওকে কম্পিউটারে বসিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম।'

বাবা কিন্তু ভোলাকে দিয়ে কম্পিউটার চালানোর চেষ্টা করতে ছাড়েনি। তবে হলে হবে কী, ভোলা মেশিন ছেড়ে উঠে চম্পট দিতে পারলেই বাঁচে! ও আমাকে আড়ালে বলত, 'ভাইটি, সবাইকে দিয়ে কি সব কাজ হয়!'

আমি ওর কথা শুনে হাসতাম।

একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে এ-কথা সে-কথা বলতে-বলতে বাবা হঠাৎই ভোলার প্রসঙ্গ তুলল।

ভোলার নানান কাজ নিয়ে, কাজের খুঁত নিয়ে কয়েকটা মন্তব্য করল বাবা। তারপর ও কম্পিউটার চালাতে পারে না, আধুনিক যুগের কাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, এইসব বলে বেশ বিরক্তি দেখাল।

ভাগ্যিস ভোলা তখন সামনে ছিল না। থাকলে আমার ভীষণ বাজে লাগত। তা ছাড়া, বাবার মুখে-মুখে আমি ঠিক কথা বলতে পারি না। তাই বাবার কথায় আমার খারাপ লাগলেও কিছু বলতে পারিনি।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, রান্নাঘরের দিক থেকে ভোলা একগ্লাস জল নিয়ে আসছে। আমিই ওকে জল আনতে বলেছিলাম।

বাবা খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, 'শোনো, সন্তু। ''এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি'' একটা এক্সচেঞ্জ অফার অ্যানাউন্স করেছে। ভি. এক্স.-থ্রি মডেলের রোবট আর তিরিশ হাজার টাকা দিলে ওরা ওদের লেটেস্ট কম্পিউটার কম্প্যাটিব্‌ল ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট দেবে। মডেলটার নাম ভি. এক্স. আই. কিউ—ওয়ান। এই রোবটটা কম্পিউটার চালাতে তো জানেই, তা ছাড়া আরও বহু আধুনিক কাজ জানে...।'

আমি বুঝতে পারছিলাম বাবা কী বলতে চলেছে। তাই মুখের মধ্যে ভাত নিয়ে শক্ত করে চোয়াল বন্ধ করে বসেছিলাম। কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল আমার।

ভোলা অনেকটা কাছে চলে এসেছিল। বাবার কথা ও ঠিক কতটা শুনতে পেয়েছে বুঝতে পারলাম না। ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভাইটি, এই নাও তোমার জল।' গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ভোলা।

বাবা মাথা ঘুরিয়ে একবার বিরক্তভাবে ভোলাকে দেখল। তারপর বলল, 'নাঃ, আর কোনও উপায় নেই! ভোলাকে পালটে ওই নতুন মডেলের রোবটটা নিয়ে আসতেই হবে। কাজের ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে...।'

'বাবা।' ভোলা এক অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। ওর হাত থেকে জল ভরতি গ্লাসটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

আমি যেন স্লো-মোশানে কোনও সিনেমা দেখছিলাম।

জল ভরতি গ্লাসটা বাতাস কেটে পড়ছে-তো-পড়ছেই। তার মধ্যে বন্দি জল চলকে উঠে ঢেউ তুলছে। তারপর গ্লাসটা ধাক্কা খেল মেঝেতে। কাচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হল, জল ছিটকে পড়ল চারিদিকে। জলের ফোঁটাগুলো শূন্যে লাফিয়ে উঠে হিরের কুচির মতো দেখাল। তারপর মেঝের অনেকটা ভিজে গেল। জলে মাখামাখি কাচের টুকরোগুলো এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে পড়ে রইল।

আমার বারবার মনে হচ্ছিল, মেঝেতে জল নয়—রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাচ ভাঙার এককণা শব্দও আমার কানে ঢোকেনি। কারণ, ভোলার বুক ভাঙা 'বাবা!' ডাকটা বারবার আমার কানে বাজছিল।

বাবা মেঝের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটার হাল দেখে বলল, 'হোপলেস।'

ভোলা পায়ে-পায়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কদমছাঁট চুল, ছানাবড়া চোখ, চারফুট হাইট, অথচ ওকে দেখে এখন মোটেই হাসি পাচ্ছিল না।

'বাবা, আমার মডেলটা পুরোনো বলে, তুমি আমাকে বদলে ফেলতে চাইছ!'

বাবা কোনও জবাব দিল না।

ভোলা উত্তরের জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর আবার

বলতে শুরু করল, 'আমি যে এত বছর তোমাদের কাছে রইলাম, তোমাকে, ভাইটিকে এত যত্ন করলাম, তার কোনও দাম নেই! তুমি বলছ, বাজারে এখন অনেক ভালো মডেলের রোবট পাওয়া যাচ্ছে—তাই আমাকে বদলে ফেলতে চাও। তা হলে একটা পালটা উদাহরণ তোমাকে দিই—শুনতে হয়তো তোমার খারাপ লাগবে।' ভোলা একবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ঃ 'ভাইটির বয়েসি অনেক ছেলেকে আমি দেখি যারা ভাইটির চেয়ে দেখতে ভালো, লেখাপড়ায় ভালো, অনেক গুণ আছে—মানে, অনেক ভালো মডেলের ছেলে। তা হলে তুমি কি চাইবে, ভাইটিকে বদলে আর একটা ভালো মডেলের ছেলে নিয়ে আসতে? সম্পর্কের কোনও দাম নেই তোমার কাছে?'

বাবা রাগে কাঁপতে শুরু করেছিল। ভোলার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এসব কী উলটোপালটা বকছ! তোমার আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।'

'আজ আমাকে বলতেই হবে, বাবা!' জেদি গলায় বলল ভোলা, 'তুমি বলছ আমি অনেক কাজ পারি না। ঠিক কথা। কিন্তু অন্য অনেক কাজ তো পারি! তুমিও তো অনেক কাজ পারো না, বাবা! এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম ঃ কেউই সব কাজ পারে না। তাতে তো লজ্জার কিছু নেই! এত বছর ধরে তোমাদের জন্যে যা-যা কাজ আমি করেছি সবই তো নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছি। কখ্খনও তো বিরক্ত হইনি। তা হলে বলো, আমার দোষটা কোথায়! আমি তোমাদের ছেড়ে কোত্থাও যাব না, বাবা।'

বাবা ভোলার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়ল ঃ 'নাঃ, একে বোঝানো যাবে না। মনে হয়, ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলো সব ঘেঁটে গেছে।'

ভোলা আবার যখন কথা বলল ওর গলাটা কেমন ভাঙা কান্নার মতো শোনাল ঃ 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না, বাবা। তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

বাবা এবার অন্য পথ ধরল। হাত নেড়ে বেশ শান্ত গলায় ভোলাকে বোঝাতে চাইল।

'শোনো, ভোলা, তুমি আসলে একটা রোবট—চাকর রোবট। তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকো বটে, কিন্তু আমি তোমার বাবা নই, তুমিও আমার ছেলে নও। আমার মনে হয়, তোমার ভেতরের প্রোগ্রামগুলো সব গোলমাল হয়ে গেছে। তুমি একটু স্থির হয়ে...।'

'কী বলছ, বাবা! তুমি আমার বাবা নও! আমিও তোমার ছেলে নই!'

ভোলার কথাগুলো আমাকে বিরাট ধাক্কা দিল। এই শক্ত কথাগুলো বাবা ওকে না বললেও পারত। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে আমি ওর কাছে

গিয়ে বললাম, 'প্লিজ, ভোলা, ভুল বুঝো না। তুমি ছেলে না হলে কী হয়েছে—ছেলের মতো তো বটেই! আমিও তোমার ভাইয়ের মতো...।'

ভোলা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ছিটকে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। ওর অভিব্যক্তিহীন যান্ত্রিক চোখজোড়া যেন পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল। সে-চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আমি ওর চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলাম না—চোখ সরিয়ে নিলাম।

ভোলা খুব ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে বলল, 'ভাই...এর...মতো! ছেলে...র...মতো!'

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, আমাকে আর বাবাকে বারবার দেখতে লাগল।

অবশেষে খুব আলতো গলায় বলল, 'সম্পর্কের তা হলে কোনও দাম নেই, ভাইটি? বুঝেছি...তোমরা আসলে মানুষ নও....মানুষের মতো...।'

শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করতে-করতে ঘরের দরজার দিকে এগোল ভোলা। ওর চোখের নজর বোধহয় ঠিকমতো কাজ করছিল না—কারণ, ও একটা চেয়ারে ধাক্কা খেল, তারপর দেওয়ালের কোণে ওর মাথা ঠুকে গেল।

কোনওরকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজার পাশটিতে উবু হয়ে বসে পড়েছিল ভোলা। মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল ভাঁজ করা দুটো হাতের ফাঁকে।

পরদিন বিকেলে 'এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি'র গাড়ি এসে ওকে তুলে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ও একইভাবে বসে ছিল।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি বেশ কয়েকবার ওকে ডেকেছিলাম। কিন্তু ও কোনও সাড়া দেয়নি। হয়তো আমাদের কথায় ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলো তছনছ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওর ভেতরটা শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছিল। কে জানে!

সেই থেকে ভোলাকে আমি কখনও ভুলতে পারিনি—ভুলতে পারবও না।

ও আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয়, আমি মানুষের চেয়ে একটুখানি কম। সেইজন্যেই আমি সারাটা জীবন ধরে পুরোপুরি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।





আমরা সবাই সমান

বাপি অফিসে বেরিয়ে গেলে রূপান নিজেকে একজন কেউকেটা বলে মনে করে। কারণ, তখন বাড়িতে সে-ই একমাত্র পুরুষ সিংহ—অতএব হেড অফ দ্য ফ্যামিলি।

সদর দরজার কলিংবেলটা যখন বাজল তখন মা রান্নাঘরে—গরম কড়াইয়ে ছ্যাঁকোর-ছোঁকর শব্দ তুলতে ব্যস্ত। আর রূপান অঙ্কের হোমটাস্ক নিয়ে মশগুল ছিল।

কিন্তু কলিংবেল বেজে উঠতেই রূপানের মনে হল, দরজা খোলার দায়িত্বটা হেড অফ দ্য ফ্যামিলিরই নেওয়া উচিত। তাই দৌড়োনো আর হাঁটার মাঝামাঝি ঢঙে ও পৌঁছে গেল দরজার কাছে।

কে এল এই অসময়ে? এখন তো কারও আসার কথা নয়!

'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রেখে চকচকে একটা কিছু চোখে পড়ল। ঠিক যেন স্টিলের বাসন-টাসন।

কিন্তু দরজা খুলতেই অবাক হয়ে দেখল স্টিলের বাসন নয়, একটা রোবট দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়।

পথে-ঘাটে এখন যে-হারে রোবট ঘুরে বেড়ায় তাতে একটা মেটাল বডির রোবট দেখে ক্লাস সেভেনে পড়া রূপানের মোটেই অবাক হওয়ার কথা নয়।

ও অবাক হয়েছে ওদের বাড়ির দরজায় একটা রোবটকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

রোবটটা লিকলিকে। চোখগুলো মানুষের মতো। বেশ টানা টানা। মাথায় চকচকে নাইলনের চুল—অ্যালবার্ট কেটে আঁচড়ানো। পরনে রঙিন হাফশার্ট আর প্যান্ট। তবে মুখ আর দু-হাতে কোনও ঢাকাঢুকি নেই। রোদ পরে চকচক করছে।

'কাকে খুঁজছেন?' রূপান গলাটা একটু ভারী করে জানতে চাইল।

'আমি ম্যাথামেটিকা গ্রহ থেকে আসছি, স্যার,—' রূপানকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে মিহি গলায় বলল রোবটটা, 'আমার নাম লেবেস্‌গিউ। আমি প্রফেসর শান্তারাম মিত্রের বাড়িটা খুঁজছি। আমাদের কাছে যা ডেটাবেস রয়েছে তাতে ওঁর বাড়িটা এই এলাকাতেই হওয়ার কথা, স্যার...।'

রোবটটা ওকে 'স্যার' বলে দুবার ডাকায় রূপানের মনে হল, ও আর মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই—দু-চার ফুট শূন্যে উঠে পড়েছে। একইসঙ্গে ও লেবেস্‌গিউর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ঃ রোবটটার ভেতরের কলকবজা কিংবা সফ্‌টওয়্যার বিগড়ে যায়নি তো! যার জন্য ও ভুল করে ভাবছে যে, ও অন্য গ্রহ থেকে এসেছে!

না, প্রফেসর শান্তারাম মিত্র নামে এই এলাকায় কেউ থাকেন না। কিন্তু রোবটটা ওঁকে খুঁজছে কেন? ভীষণ জানতে ইচ্ছে করল রূপানের।

'এই নামে এ পাড়ায় কেউ থাকে বলে মনে হয় না।' গম্ভীর গলায় বলল, রূপান, 'কিন্তু ওঁকে খুঁজছেন কেন জানতে পারি?'

'হ্যাঁ, স্যার, বলছি—' হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লেবেস্‌গিউর নাক দিয়ে, তারপর বলল, 'সমান চিহ্ন নিয়ে ওঁর কাছে আমাদের একটা কমপ্লেন আছে। আপনাদের এই পৃথিবীতে ওটা ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করা হয় না।'

'মানে?' তাজ্জব হয়ে গেল রূপান। এ-রোবটটা বলছে কী! ও নিজে সমান চিহ্ন ব্যবহার করে কত যে অঙ্ক করেছে তার হিসেব নেই।

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি তো জানেন, অঙ্কে এই ''ইকোয়াল্‌স টু'' চিহ্নটা সবসময় ব্যবহার করা হয়। কারণ অঙ্ক মানেই তো ''ইকোয়েশান''—বাঁ-দিকের সাথে ডানদিন সমান। এই সমান চিহ্নটা ছাড়া অঙ্ক অচল। অন্তত আমাদের গ্রহে তো তাই, স্যার...।'

রূপান তখনও বুঝতে পারছিল না, লেবেস্‌গিউ কী বলতে চায়। তাই ও চুপ করে রইল।

'যেমন ধরুন স্যার...' রোবটটা বলে চলল, 'ছয় যোগ চার সমান দশ। এই অঙ্কটা লিখে ফেললে দেখবেন, সমান চিহ্নের বাঁ-দিকে ছয় যোগ চার, আর ডানদিকে দশ। ''৬+৪'' লেখাটার সঙ্গে ''১০'' লেখাটার চেহারার কোনও মিল

নেই—কিন্তু চেহারার মিল না থাকা সত্ত্বেও ওরা সমান...।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠিক বলেছেন...' রূপান সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা ভেবে একটু অবাকও হল।

'তারপর, মনে করুন, এই পৃথিবীর সমস্ত অঙ্ক থেকে যদি সমান চিহ্নটা উধাও করে দেন তা হলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে! সবকিছু একেবারে ঘেঁটে যাবে। তার মানে, যে-কোনও অঙ্কে সমান চিহ্ন থাকাটা সবচেয়ে জরুরি...।'

রূপান আবার সায় দিল।

'আমাদের গ্রহে দুজন মানুষের মধ্যে চেহারা কিংবা অন্য কিছুর মিল না থাকলেও তাদের মধ্যে সমান চিহ্ন বসানো হয়। অর্থাৎ, ওরা সমান। দেখতে আলাদা হলেও ওদের মধ্যে আসলে কোনও তফাত নেই। তাই আমাদের গ্রহে সবাই সমান। কিন্তু পৃথিবী গ্রহে "ইকোয়াল্স টু" চিহ্নটার ব্যবহার শুধু অঙ্কের মধ্যেই আটকে গেছে—মানুষের মধ্যে আসতে পারেনি। সেটা জানানোর জন্যেই ম্যাথামেটিকা গ্রহের মানুষরা আমাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছে। বলেছে, ম্যাথামেটিশিয়ান প্রফেসর মিত্রকে আমাদের অভিযোগ জানাতে। উনি যদি বিষয়টা সবাইকে বোঝাতে পারেন...। ঠিক আছে, চলি, স্যার—প্রফেসর মিত্রের বাড়িটা খুঁজতে হবে...।'

রূপানের মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'রূপান, কে এসেছে?'

রূপান বলল, 'কেউ না, মা—'

লেবেস্গিউ লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে রূপানের খুব ভালো লাগছিল। আজ ওকে রোবটটা অভিনব এক অঙ্ক শিখিয়ে গেল ঃ সমান চিহ্নের ঠিকঠাক ব্যবহার।

আসলে আমরা সবাই সমান।



কল্পবিজ্ঞানের গল্পে কখনও থাকে
অসীম মহাকাশ, রোবট, কিংবা অন্য কোনও
গ্রহের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। নানা রঙের
এই জগৎ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এই বইয়ের ৪টে উপন্যাস ও ২৪টি গল্পে রয়েছে
সেইরকমই রঙিন জগতের নানান গল্প।



9 788183 741927
www.bookspatrabharati.com